CUK-1104771-6-P03609

জয়শ্রী

বর্ষ – ৬৪

সংখ্যা – ৬, ৫, ৭-৮, ১০-১২

১৩৭৬

P 36,090

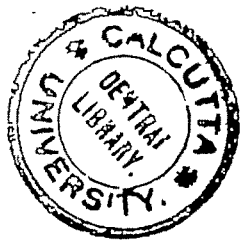

সূচীপত্র

আষাঢ় : জয়শ্রী : ১৩৭৬

লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	১৩৯	কবিতাগুচ্ছ :	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	১৮৫
	১৪০	এখন ভীষণ সময়		
রাজনীতি		হৈ চৈ আর্তনাদের মধ্যে		
সুনীল দাস	১৪৩	যে-ভূমিকায় প্রতিদিন		
দেশ ও		অন্বেষণ		
গ) অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য	১৫২	কণ্ঠভরা বিষ	মিহির মুখোপাধ্যায়	১৯০
কালীচরণ ঘোষ	১৫৫	(ধারাবাহিক উপন্যাস)		
তক প্রবন্ধ)		পুস্তক পরিচয়		১৯৫
পথচারী	১৬৩			
াচনা : অনুবাদ)				
শঙ্কর	১৭১			
সঙ্গ)				
বারীন বর্ধন	১৭৯			
ভ্রমণকাহিনী)				

সম্পাদনা : সুনীল দাস
সহযোগী সম্পাদক

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

'...আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত স্কুল কলেজে সুভাষের মহান জীবন জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত

শ্রীসুরেশচন্দ্র

...'সুভাষচন্দ্র' প্রথম খণ্ড পাঠের ফলশ্রুতি কেবল সমুদ্র স্নানের চরিতার্থতার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। সমুদ্র সন্তরণ নিছক শারীরিক ব্যায়াম নয়, মানসিক সাহস বীর্যেরও উদ্দীপক। পবিত্রকুমারের সাধনার মধ্যে যে-কোনো পাঠক যুগপৎ ব্যায়াম ও বীর্যে নিষ্ণাত হতে পারার সঞ্জীবতাটুকু সংগ্রহ করতে পারবেন'—

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

'... এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।' —যুগান্তর

...'বিস্মিত হয়েছি লেখকের গভীর গবেষণায় আর অনুভূতির তীব্র মাধুর্যে, ঐতিহাসিক সমীক্ষায় আর রাজনীতিক দূরাবগাহনে, পুলকিত হয়েছি তাঁর প্রসাগুণসমৃদ্ধ ভাষার সাবলীল শ্রীমণ্ডিত ব্যবহারে, গভীর শ্রদ্ধার অকৃত্রিম আন্তরিকতায়

—যুগব

দাম : নয় টাকা

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন : ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক। জয়শ্রী প্রকাশন : ২৫১-এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড,

কলিকাতা-৪৭

ভারতী

৩৪ বর্ষ ০ তৃতীয় সংখ্যা ০ আষাঢ় ১৩৭৬

সুভাষ-বাণী

".....যে জাতির অস্তিত্বের আর সার্থকতা নেই, যে জাতির প্রাণের সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হয়েছে—সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পায় অথবা কীট-পতঙ্গের মত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করতে থাকে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাহিরে তার অস্তিত্বের নিদর্শন আর থাকে না।

ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে সেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে ; ভারতের শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য—এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মনীষীগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না করে কি মরতে পারি ?"

[গোড়ার কথা : তরুণের স্বপ্ন]

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। আগামী ৪ঠা আগষ্ট পি, জি, হসপিটালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় একাদিক্রমে তার এক বছর অতিক্রান্ত হবে এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আঠার মাস উত্তীর্ণ হবে। প্রায় প্রতিদিনই বিকেলের দিকে তাঁর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। সে-সময়টা মাঝে মাঝেই Spasms দেখা দেয় এবং ফলে শরীরের গ্লানি বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে স্বল্পক্ষণস্থায়ী convulsion আরও কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রতিদিনই আমরা তাঁর ক্যাবিনের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আসি।

পরিচালকমণ্ডলী

৩১শে জুলাই, ১৯৬৯ জয়শ্রী

মানুষের জয়যাত্রা

মাটির পৃথিবীর দুইটি মানব সন্তান লক্ষ লক্ষ মাইল অতিক্রম করে চাঁদে অবতরণের পর আবার এই ধরণীর ধূলায় ফিরে এসেছেন। ১৬ই জুলাই সন্ধ্যায় তাদের যাত্রাক্ষণ থেকে সুরু করে ২৪শে জুলাই রাত্রিবেলা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাদের নিরাপদ অবতরণ মুহূর্তটি পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের চিত্ত আনন্দে ও উদ্বেগে আন্দোলিত হয়েছে। এই অভিযান বিজ্ঞানের দুরূহতম সাফল্যের জয়মাল্য চন্দ্রলোকে যেমন পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি দুর্গমের অতন্দ্র সাধনায় মানুষের দুর্জয় সঙ্কল্পের নিঃশঙ্ক-অভিযাত্রার পদচিহ্ন নিঃসীম নীলিমায় এঁকে দিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে মানুষের পরিচিত পৃথিবী বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলের অপার সমুদ্রে কত অকিঞ্চিৎকর, সেই বিস্ময়ের চমক আর একবার মাটির পৃথিবীর মানুষকে বিনম্র ও বিনীত করে তুলে নিরবধি কালে এবং এই বিপুল পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব একটি কণিকায় নিঃশেষিত,—এই সুগভীর রূঢ় সত্যকে অবারিত করবে। চন্দ্রলোকে অবতরণের গৌরব, উদ্বেগ ও আনন্দ দেশ-কাল-জাতির সীমানা অতিক্রম করে সর্বকালের ও সর্বমানুষের সম্পদরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আর্মষ্ট্রং, যিনি প্রথম চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছেন—এবং 'ঈগল' নামক চাঁদের ভেলায় তার সহযাত্রী-আলড্রিন এবং 'কলাম্বিয়া' নামক মহাকাশযানে যিনি চাঁদের কক্ষপথে পরিক্রমা করে তার দুই সহযাত্রীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষারত সেই কলিন্সকে—আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'কলাম্বিয়ার' চন্দ্রযাত্রার তিনদিন আগে, অর্থাৎ ১৩ই জুলাই চন্দ্রে অবতরণের জন্য সোভিয়েট রুশ লুনা-১৫ নামক যাত্রীবিহীন মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করেছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল লুনা-১৫ কে চাঁদে অবতরণ করিয়ে [illegible] মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন। [illegible] যাত্রীদের পূর্বেই লুনার চাঁদে অবতরণের সম্ভাবনা থাকলেও 'ঈগল'

নামক কলাম্বিয়া মহাকাশযানের চাঁদের ভেলাটি চাঁদে অবতরণের উনিশ ঘণ্টা তেত্রিশ মিনিট পরে 'ঈগলের' অবতরণের ৫০০ মাইল দূরে লুনা-১৫ অবতরণ করে। লুনার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলেও এই অভিযান মানুষের জয়যাত্রার আর একটি নূতন পদক্ষেপ।

চাঁদের পর মঙ্গলের অভিমুখে মানুষের জয়যাত্রার অভিযান সুরু হয়েছে। ছয় কোটি মাইল দূর থেকে 'ম্যারিনার-৬' এবং 'ম্যারিনার-৭' মঙ্গলের ছবি পৃথিবীর পর্দায় পৌঁছে দিয়েছে। অনন্তের অভিসারে মানুষের উদ্যোগ মর্ত্যের মানুষকে হিংসা-দ্বেষ-উৎপীড়নের উর্ধে উত্তোলিত করবে, এই শুভকামনা সারা পৃথিবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে মর্ত্যের মানুষকে সার্থক করে তুলুক—সমবেতভাবে পৃথিবীর মানুষ এই কামনা করবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আগামী ১৬ই আগষ্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন হবে, ফলাফল ঘোষিত হবে ২০শে আগষ্ট। এই নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে ভারতবর্ষের রাজনীতির পরিবর্তনে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে তার শেষ কোথায় সে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অতর্কিত প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাঙ্গালোরের গত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ১২ জুলাই যে ভূকম্পন সৃষ্টি করেছিলেন, ১৩ই জুলাই কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের বৈঠকে তার স্ব-উচ্চারিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৪-২ ভোটে তাকে পরাজিত করে সঞ্জীব রেড্ডিকে [illegible]পতি পদের জন্য মনোনয়নে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের [illegible] আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর হলো। তারপর [illegible]ানমন্ত্রীর প্রত্যাঘাত। ১৬ই জুলাই মোরারজী [illegible] হাত থেকে তিনি অর্থমন্ত্রক কেড়ে নিয়ে [illegible]র পদত্যাগে বাধ্য করলেন এবং অবশেষে ১৯শে [illegible]াঙ্ক জাতীয়করণের অর্ডিন্যান্স জারী করে রাজনৈতিক কূটচালের আর একটি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন।

এই আঘাত-প্রত্যাঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরগুলি দাঁনা বেধেছে। ভি, ভি, গিরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি থাকাকালীনই পার্লামেন্টারী বোর্ডে প্রার্থীরূপে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্বীয় প্রার্থীত্ব ঘোষণা করলেন। ইন্দিরা গান্ধীর ইসারায় তিনি এ-কাজ করেছেন বলে সাধারণের ধারণা, যদিও প্রধানমন্ত্রী সে-কথা অস্বীকার করেছেন। তবে কম্যুনিষ্ট পার্টির যুগপৎ সমর্থন এবং মস্কোর সরকারী পত্রিকায় গিরির আনুকূল্য, গিরির প্রতি কম্যুনিষ্ট পার্টির তথা মস্কোর সমর্থনের পূর্বসর্ত অনুমান করলে ভুল নাও হতে পাতে। কম্যুনিষ্ট পার্টি সচরাচর এই ধরণের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা না করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। গিরির সমর্থনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখে এই অনুমান আরও দৃঢ়মূল হবে। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির গিরিকে সমর্থনের যে দ্বিধা ছিল সে দ্বিধা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর অপসারিত হয়। সঞ্জীব রেড্ডির মত গিরিও কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন এবং কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের জোড়াতালি দিয়ে মীমাংসা হয়ে গেলে গিরি নাম প্রত্যাহার করে নেন কি না সেটাও মার্ক্সবাদীরা লক্ষ্য করছিল। সংযুক্ত সোসালিষ্ট পার্টি, পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের ছোট ছোট দলগুলি এবং মাদ্রাজের ডি, এম, কে গিরিকে সমর্থন করেছে।

গিরি প্রত্যাখ্যাত কংগ্রেস প্রার্থী এবং গিরির যোগ্যতা এবং জনসেবার ঐতিহ্য যতই থাক না কেন, মনোনয়নে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্বীয় প্রার্থীত্ব ঘোষণার মধ্যে যে অনৈতিকতা রয়েছে, গিরির প্রার্থীত্ব সেই কলুষমুক্ত নয়। তাছাড়া, কম্যুনিষ্টদের নির্বিচার এবং যুগপৎ সমর্থনের জন্য কংগ্রেস বিরোধীদলগুলির পক্ষে ১৯৬৭র মত ঐক্যমত হয়ে একটি প্রার্থী মনোনয়নের সুযোগ না থাকাতে তৃতীয় আর একজন

প্রার্থীকেও তিনটি দল দাঁড় করিয়েছেন। জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র এবং ক্রান্তি দল এই তিনদলের প্রার্থী সি, ডি, দেশমুখও তার নির্ভীকতা, মেধা, এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার জন্য সুপরিচিত। পি, এস, পি গিরি কিম্বা দেশমুখের মধ্যে একজনকে প্রথম, বাছাই এবং অপর জনকে দ্বিতীয় বাছাই-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সঞ্জীব রেড্ডি কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট গোষ্ঠির প্রতিভূ; ভি, ভি, গিরি দলছুটের কাছাকাছি নিজেকে স্থাপন করেছেন, বিফল কংগ্রেসপ্রার্থী—যদিও তিনি কংগ্রেসের সদস্য দীর্ঘদিন যাবৎ নন, তবুও তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত নীতির প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন, বিভিন্ন মনোনীত ও নির্বাচিত পদে। দেশমুখ স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি, কিন্তু তার প্রস্তাবকদের মধ্যে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধী; বি, কে, ডি অবশ্য জাতীয়করণের স্বপক্ষে। দেশমুখও জাতীয়করণ বিনা প্রস্তুতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এই জটিল পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গুরুতর অনিশ্চিতি দেখা দিয়েছে। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কিম্বা ডঃ রাধাকৃষ্ণন শতকরা ৮০ ভোটের বেশী পেয়েছেন। ডঃ জাকির হোসেন পেয়েছিলেন শতকরা ৫৬ ভাগের কিছু বেশী ভোট। এবার কংগ্রেস প্রার্থীর ভোটের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৫২-৫ ভাগ, ১৯৬৭র সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় এবার কংগ্রেস বিরোধীদের ভোট কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদের ভোটের পদ্ধতিও কিছুটা জটিল। রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলকে হাজার দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ-ফল পাওয়া যায় ঐ রাজ্যের বিধান সভার সদস্যদের প্রত্যেকের ভোটের মূল্য তাই হবে। পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা ৩৪, ৯২৬, ২১৯, আসন সংখ্যা [২৮০, এ-রাজ্যের প্রত্যেক সদস্যের ভোটের মূল্য হবে ১২৫; উত্তর প্রদেশে জনসংখ্যা ও আসনের সংখ্যা বেশী, তাদের ভোটমূল্যও বেশী ১৭৪। তেমনি নাগাভূমির জনসংখ্যা ও আসন সংখ্যা দুই-ই কম, তাদের ভোটমূল্য ৭।

পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোটমূল্য নির্ণয় করবার জন্য রাজ্য বিধান সভাগুলির সদস্যদের মোট ভোট মূল্য নির্ণয় করে ঐ ভোট মূল্যকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ ফল হবে সেটাই হল পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটমূল্য। এই হিসাবে লোকসভা ও রাজ্যসভার ভোটের মূল্য ৫৭৬। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এবার মোট ভোটমূল্য ৮,৬৯,৬৯৫; ১৯৬৭ সালে ভোটমূল্য ছিল ৮ লক্ষের মত। এই সংখ্যার মধ্যে এবার কংগ্রেসের ভোটমূল্য সাড়ে চার লক্ষ, স্বতন্ত্রের ৫৮,০০০; জনসঙ্ঘের ৪৯,০০০; সি, পি, আই-এর ৩৫,০০০, সি, পি, এম-এর ৩৪,০০০; এস, এস, পি ৩৪,০০০; ডি, এম, কের ৩৬,০০০, পি, এস, পির ২১,০০০ বি, কে, ডির ২১,০০০, মুসলীম লীগ ৫০০০, নির্দলীয় ৪৭০০০, রাজ্যস্তরের দলগুলির ৬৬,০০০, শূন্য সদস্যপদের জন্য ৪০০০ ভোট মূল্য রয়েছে। হিসাবে দেখা যায় গিরির পক্ষে আড়াই লক্ষ এবং দেশমুখের পক্ষে ১'২৮ লক্ষ ভোটমূল্য রয়েছে।

কংগ্রেসের কত ভোট সঞ্জীব রেড্ডি পাবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতার মুখে রেড্ডী মনোনীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকদের মধ্যে রেড্ডী বিমুখতা প্রবলভাবে কাজ করছে, যদিও প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীকালে প্রকাশ্যে রেড্ডীকে সমর্থন জানিয়েছেন কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাজনৈতিক কূটকৌ আঘাতে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কতটা করবে তার পরিমাপ করা এখনই সহজ কারণে এবারকার নির্বাচনে সেকেণ্ড

[শেষাংশ ১৯৮ পৃষ্ঠায়]

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাজনীতি

সুনীল দাস

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ রাজনীতির হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা এ-প্রশ্ন উঠেছে। উঠেছে এই কারণে গত কুড়ি বছর যাবৎ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবী উত্থাপিত হয়েছে, এই দাবী উঠেছে কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সে-দাবী অগ্রাহ্য করে এসেছেন। দুই বছর পূর্বে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে দশ-দফা অর্থনৈতিক দাবী গ্রহণ করেছিল, ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ তার অন্যতম হলেও সে-দাবী পূরণে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার তৎপরতা দেখান নি। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যারা 'তরুণ তুর্কী' নামে পরিচিত, তাদের দিক থেকে নেতৃত্বের উপর দুরন্ত দাবী এসেছে, দশ-দফা দাবী পূরণের। শেষ পর্যন্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আইন রচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সে আইন কার্যকরী করেছেন।

'কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাবের বিতর্ক সেখানেই থামেনি যদিও গত ৯ই জুলাই বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য পূর্ববর্তী দিল্লীর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সুব্রহ্মনিয়মকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষার ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক প্রস্তাব রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে সুব্রহ্মনিয়ম ছয়টি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সুপারিশ জানিয়ে একটি রিপোর্ট রচনা করেছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালোরের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা সহ ব্যাঙ্ক সরকারী আর্থিক সংস্থাগুলি থেকে পাবলিক সেক্টরভুক্ত শিল্পে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগের সুপারিশের মধ্যে কংগ্রেসের সরকারী প্রস্তাব সীমাবদ্ধ থাকবে, এর চাইতে বেশী কিছু আশা করা যায় নাই।

কিন্তু বাদ সাধলো 'তরুণ তুর্কীর' দল। তাদের পক্ষ থেকে গত ৭ই জুলাই একটি অর্থনীতি সংক্রান্ত দলিল প্রকাশিত করে তারা দশ-দফা অর্থনৈতিক প্রস্তাবের বিলম্বিত রূপায়নে নৈরাশ্য জ্ঞাপন করেন এবং আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি লক্ষ্য করে তারা অবিলম্বে সকল বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি ও জেনারেল ইনস্যুরেন্স জাতীয়করণ করে ক্রমবর্ধমান আমানতের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেন ("Nationalise all private commercial Banks and General Insurance Companies to gain control over the fast growing public deposits")। এ-ছাড়া শহুরে আয়ের (urban income) উচ্চসীমা নির্ধারণ, অনুৎপাদক ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, করপোরেট সেকটরের উপর ক্রমবর্ধমান কর আরোপ, মনোপলি কমিশন গঠনে ত্বরান্বয়ন এবং শোষণ-নিরোধকল্পে কৃষিনীতি নির্ধারণও তাদের ঘোষিত নীতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯ই জুলাই বাঙ্গালোরে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এর শেষের দিকে ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ অর্থনৈতিক প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রধান মন্ত্রীর একটি নোট কমিটির কাছে পেশ করলে দেখা যায় যে প্রধান মন্ত্রী ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্থা জাতীয়করণের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাবে শহুরে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সমেত

'তরুণ তুর্কীদের' আরও কতকগুলি প্রস্তাবও স্থান পায়। প্রধান মন্ত্রীর এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব অতর্কিতে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট উপস্থাপনের ফলে কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিস্ময় ও উষ্মার সৃষ্টি হয়। পাতিল ও দেশাই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আইনের দুই বছর পরীক্ষার পূর্বে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব তার কাছে অবান্তর মনে করেন। কামরাজ মনে করেন ওয়ার্কিং কমিটির উচিত 'নোট'টি রূপায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো। প্রধান মন্ত্রীর এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিলম্বিত ভূমিকা, তার এই প্রস্তাবকে নিছক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দুর্বার পরিপ্রেক্ষিতে রচনার স্বীকৃতি না দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রসূতরূপে চিহ্নিত করেছে। যদি তাই না হোতো বাঙ্গালোর-পূর্ববর্তী দিল্লীর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেই প্রধান মন্ত্রী তার অর্থনৈতিক প্রস্তাব উপস্থাপিত করে সুব্রহ্মনিয়মের উপর কেবলমাত্র কৃষি-সমস্যা ও শিশুকল্যাণ সংক্রান্ত প্রসঙ্গের উপর অর্থনৈতিক প্রস্তাব রচনার ভার না দিয়ে সামগ্রিক অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব দিতে পারতেন। এ-ছাড়া আমদানী ব্যবসায় জাতীয়করণ করে শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় জাতীয়করণের প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী 'তরুণ তুর্কীদের' প্রস্তাব বহুলাংশে হুবহু গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্যি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিকল্প প্রস্তাবরূপে ব্যাঙ্কের আমানতের আরও কিছু অংশ, শতকরা ৫ ভাগ, পাবলিক সেকটরে বিনিয়োগের সর্ত আরোপ করে কঠোরতর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করেছিলেন। এই খাতে আরও ২০০ কোটি টাকা সরকারের অধিকারে বিনিয়োগের জন্য আসতে পারতো। এ-বিষয়েও সুব্রহ্মনিয়মের রিপোর্টের অনুসরণে প্রধানমন্ত্রী তার নোটে বৃহত্তর পাঁচ-ছয়টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সুপারিশ করেছিলেন, ব্যাঙ্কগুলির শিল্পপতি চেয়ারম্যানদের অপসারণের জন্য আইন রচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও, প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পঞ্চাশটি অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ প্রস্তাবে উত্থাপন করেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাবগুলিতে সংশয়াতীত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কারণ তাঁর বিবরণীর শেষভাগে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এগুলি তাঁর প্রস্তাব মাত্র; যা অংশতঃ কিম্বা পূর্ণতঃ কার্যকর করা যেতে পারে ("for full or partial action") আর সব চাইতে তাজ্জবের কথা এতো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি খুব বেশী ভাবনা-চিন্তার অপেক্ষা না রেখে প্রধানমন্ত্রী তাড়াতাড়ি খাপছাড়াভাবে রচনা করে পাঠিয়ে দিলেন ("Those are just some stray thoughts rather hurriedly dictated")। প্রধানমন্ত্রীর এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে তার আত্যন্তিক আগ্রহের অভাব লক্ষিত হয়। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যেন এ-কথাই বলতে চেয়েছেন যে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হলেও হয়, না হলেও গুরুতর আপত্তি নেই। প্রধান মন্ত্রীর অর্থনৈতিক 'নোট'টি কতো দায়সাড়াভাবে রচিত হয়েছিল, তিনি নিজেই সে-কথা বাঙ্গালোরে এ, আই, সি, সির গত ১৩ই জুলাই-এর অধিবেশনে স্বীকার করেছেন। এই নোটটি যে ওয়ার্কিং কমিটিতে আসবে সে-সম্পর্কেও তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা, তা থাকলে আরও বিশদ বিবরণী দিয়ে নোটটি রচিত হতো। ("The Prime Minister referred to her note to the Working Committee and said it was prepared in haste when it appeared she might not be able to come to Bangalore at all because of her indisposition. She had no idea that it would be placed before the Working Committee. If she had known about it she would have prepared a much more comprehensive note." The Statesman, 13th July '67.)

সুতরাং খাপছাড়াভাবে রচিত প্রধানমন্ত্রীর নোটে যে পরিমাণ অর্থনীতি নিহিত ছিল, তার চাইতে বেশী ছিল রাজনীতি। কারণ, তার এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে দুটি চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। একদল প্রধানমন্ত্রীকে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তকরূপে চিহ্নিত করে তাঁকে বামপন্থীরূপে পরিচিত করতে ব্যগ্র হলেন, আর একদল এই প্রস্তাব রূপায়নের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করে কার্যত প্রস্তাবটিকে প্রধানমন্ত্রীর দরজায় পৌঁছে দিতে চাইলেন। মোরারজী দেশাই ব্যর্থহীনভাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধিতা করলেও, অন্য কোনো মেতাই সদরে জাতীয়করণ-বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন নাই। চ্যবন, কামরাজ, অতুল্য ঘোষ—এরা জাতীয়-করণের স্বপক্ষে রইলেন।

শেষ-পর্যন্ত এই রফা হোলো যে প্রধানমন্ত্রীর নোটটিকে স্বাগত জানিয়ে, নোটটিকে কার্যকরী করবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উপর ন্যস্ত করা হবে। এই জোড়াতালির দায়িত্ব পড়লো চ্যবনের ওপর এবং প্রস্তাবের খসড়ায় বলা হয় যে পরবর্তী এ, আই, সি, সির অধিবেশনে সরকারকে প্রস্তাব রূপায়নের রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। এই খসড়া প্রস্তাবে দেশাই যে খুশী নন সেটা বোঝা গেল যখন প্রস্তাবের যে অংশে পরবর্তী এ, আই, সি, সির অধিবেশনে—"the next session"—প্রস্তাব রূপায়নের রিপোর্ট দাখিল সম্পর্কে নির্দেশ ছিল, দেশাই আপত্তি জানিয়ে প্রস্তাব থেকে সেই অংশের এই "পরবর্তী অধিবেশন"—"the next session" —কথাটি বাদ দেবার জন্য তাগিদ দিলেন। এই জোড়াতালির ফলে বাঙ্গালোর এই, আই, সি, সির সভায় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ঠেকিয়ে রাখা গেলো বটে, কিন্তু 'তরুণের' দল জাতীয়করণের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে জাতীয়করণ নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করে তুললেন।

এই জোড়াতালির সেতু রচয়িতা চ্যবন প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন, উত্থাপন করলেন দেশাই। দেশাই ও চ্যবনের বক্তৃতার ধারা এবং ঝাঁঝ যে ভিন্ন মেজাজের তাদের বক্তৃতা থেকেই বোঝা গেল। দেশাই-এর বক্তৃতায় স্পষ্টই বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রীর নোটটি তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করেন নাই, যদিও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাবে কোনো নূতনত্ব নেই বলে দেশাই মন্তব্য করেন এবং প্রস্তাবটির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অর্থনৈতিক প্রস্তুতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। দেশাই স্পষ্টই বলেন কংগ্রেসের মধ্যে কেউ আশু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন, কেউ বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণকেই অগ্রাধিকার দিতে চান। তার মতে গত বছর ব্যাঙ্কগুলি তাদের মোট সম্পদের শতকরা ২৯ ভাগ সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করেছেন এবং এই বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগে অনায়াসেই বর্ধিত করা যেতে পারে। এ-ছাড়া দেশাই বলেন প্রধানমন্ত্রীর অনেকগুলি প্রস্তাব ইতিমধ্যে কার্য্যকরী রূপ দেওয়া হয়েছে। যেমন করপোরেট ক্ষেত্রে অনুৎপাদক ব্যয়ের সঙ্কোচন-এর এবং মাত্রাতীত ভোগ হ্রাসের ব্যবস্থা, কর আইন-অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের দায়িত্ব সমবায় সংস্থাগুলির হাতে দেওয়া সুরু হয়েছে—বিশেষভাবে বস্ত্রশিল্প এবং শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে। মনোপলি কমিশন গঠনের প্রস্তাব পার্লামেন্টের সামনে রয়েছে, আমদানী জাতীয়করণের সমস্যাটিও হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে শতকরা ৬২ ভাগ আমদানী সরকারী খাতে বরাদ্দ রয়েছে। নোটের কোনো কোনো প্রস্তাব সম্পর্কে দেশাই বলেন যে সেগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্ব রয়েছে এবং কংগ্রেস কেবল কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিতেই নির্দেশ দিতে পারে। শহরে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে দেশাই বলেন পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থমন্ত্রক এ-বিষয়ে আলোচনা করছেন এবং মীমাংসার সূত্র পেলেই তাদের সমাধান উপস্থাপিত করবেন।

দেশাই প্রস্তাবের উত্থাপকরূপে প্রধানমন্ত্রীর নোটটির অর্থনৈতিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেও প্রস্তাবের সমর্থকরূপে চ্যবন জাতীয়করণের রাজনৈতিক দিকটিতে তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। চ্যবন স্পষ্টতই বলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি রাজনীতিবিদদের সংগঠন, তাই অর্থনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক ভূমিকার দিকে তার দৃষ্টি দিতে হবে ("The A. I. C. C was a body of politicians and it had to think of economic problems in political terms")। চ্যবন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্বপক্ষে হলেও তার মতে সুস্পষ্ট সামাজিক নীতি (social policy) ব্যতিরেকে জাতীয়করণ নিরর্থক হয়ে পড়বে। জাতীয়করণ আজ হবে, কি কাল হবে, কি আগামী বছর হবে, ("...today, tomorrow or next year") তা নির্ভর করবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার উপর ("political wisdom")। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক রূপায়নের দিক-নির্দেশ হয়ে যাবে এবং আর পেছু হটা সম্ভব হবে না। চ্যবনের জোড়াতালি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যে একত্র থাকবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ("trying to remain together") সে কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে চ্যবন বলেন কেউ কেউ একত্র থাকবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন কিসের জন্য একত্র থাকা হবে ("remain together for what")? এই সংশয়ের উত্তর চ্যবনের ভাষায় কিসের জন্য পৃথক হবে ("But divide for what")?

জোটবাঁধার রাজনীতির তাগিদে চ্যবন জোড়াতালি দিয়ে অর্থনৈতিক প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করলেও, সে জোড়াতালি সেদিনই খসে পড়ে। বাঙ্গালোরে ১২ই জুলাই চ্যবনের জোড়াতালি দেওয়া খসড়া মোরারজী দেশাই-এর উত্থাপনায় এবং চ্যবনের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও, স্বচ্ছন্দচিত্তে যে এই প্রস্তাব নেতৃস্থানীয়েরা গ্রহণ করেন নাই, সেদিনকার পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় তা রূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। নিছক যুগান্তকারী পরিবর্তনের চাইতে ('mere radicalism doesnot amount to much') 'একত্র থাকবার রাজনীতি'র শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেও চ্যবন পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় একত্র থাকতে ব্যর্থ হলেন। প্রধান মন্ত্রীর নোটটিকে স্বাগত জানিয়ে এবং গ্রহণ করে যে রাজনীতির পরিচর্যায় চ্যবন আত্মসন্তুষ্ট হলেন, আর এক রাজনীতির আঘাতে তার সে প্রচেষ্টা খান খান হল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাজনীতি রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের রাজনীতির কাছে পরাজিত হল।

ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর অতর্কিত নোট কংগ্রেস সংগঠনের অভ্যন্তরে তার প্রতিপক্ষদের ত্বরিত আক্রমণে ঘায়েল করলেও রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিপক্ষরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। প্রধান মন্ত্রী এই পদের জন্য গোড়ায় ভি, ভি, গিরিকে মনোনয়ন দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হবার কোনো আশা যখন রইলো না, তখন তিনি জগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করলেন; উদ্দেশ্য জগজীবন রামের অনুরক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমর্থন লাভ। লোক সভার স্পীকার সঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়নে প্রধানমন্ত্রীর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও, সংখ্যাধিক্যে সে-প্রস্তাব গৃহীত হলে প্রধানমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে তার প্রতিপক্ষকে বলতে ভুললেন না যে 'তাদের এই ঘটনার পরিণতি ভোগ করতে হবে।' জগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করলেন প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বস্ত এবং অনুগত ফকরুদ্দিন আলী আহম্মদ আর সমর্থন করলেন প্রধানমন্ত্রী। জগজীবন রাম ভোটদানে বিরত থাকলেন। কামরাজ, পাতিল, চ্যবন, দেশাই সঞ্জীব রেড্ডিকে ভোট দিয়েছেন; কংগ্রেস সভাপতিও ভোটদানে বিরত থাকেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে 'সিণ্ডিকেট' নামে পরিচিত

গোষ্ঠি সঞ্জীব রেড্ডিকে মনোনয়ন দিয়েই যে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে পরাজিত করলেন তা নয়, চ্যবন ও দেশাইকে তাদের স্বপক্ষে টেনে এনে প্রধানমন্ত্রীর পরাজয়কে অসহনীয় করে তুললেন। তার চাইতেও তারা আত্মতৃপ্তি পেলেন এই কারণে ১৯৬৭ সালে কামরাজের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ডঃ জাকির হোসেনকে মনোনয়ন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী 'সিণ্ডিকেট'কে যে ভাবে অপদস্থ করেছিলেন এবার তার প্রতিশোধ নিলেন। সেবার পার্লামেণ্টারী বোর্ডে কামরাজ ও প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন আধাআধি ছিল। তাই কামরাজকে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মেনে নিতে হয়েছিল। ১৯৫৭ সালেও একবার এ-ধরণের ঘটনা ঘটেছিল। সেবার প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও পার্লামেণ্টারী বোর্ড রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। সেবার ডঃ রাধাকৃষ্ণানকে রাষ্ট্রপতি পদে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন নেহেরু এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিরুদ্ধে ১৯-দফা অভিযোগও তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেহেরু মেনে নিয়েছিলেন। সংগঠনের সঙ্গে প্রবল বিরোধে নেহেরু সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণে বিরত থেকে কংগ্রেসে ফাটল ধরতে কখনও দেন নাই।

১৩ই জুলাই কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির নাম ঘোষণা করবার এক ঘণ্টার মধ্যে বাঙ্গালোরে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে পার্লামেণ্টারী বোর্ড তার মতের বিরুদ্ধে প্রার্থী মনোনয়নের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক সংক্রান্ত নোটের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বটে। কিন্তু এই মনোনয়নের মধ্য দিয়ে তার মত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সামাজিক এবং বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে ("my views and attitudes and my social and foreign policies")। প্রধানমন্ত্রীর [illegible] অভিযোগ তার উষ্মায় বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রাষ্ট্রপতি পদের মনোনয়নে মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির চাইতে ব্যক্তির প্রশ্ন এবং সংগঠনে কর্তৃত্বের প্রশ্ন জড়িত ছিল। অবশ্য সংগঠনের কর্তৃত্বের পেছনে মতসংঘাতের প্রশ্নটি নিহিত রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদ কোনো দলীয় পদ নয় এবং এই পদের জন্য এক 'কনসেনাস' গঠনে প্রধানমন্ত্রীর ব্যগ্রতা ভি, ভি, গিরি এবং জগজীবন রামের নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে, প্রধানমন্ত্রীর সে ব্যগ্রতার পশ্চাতে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ("...the office of the President was not a party post and had therefore, sought to evolve a consensus.")। দলীয় পরিধির বাইরে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য উপযুক্ত যারা রয়েছেন, তাদের নাম প্রধানমন্ত্রীর এই 'কনসেনসাস' প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত থাকলে প্রধানমন্ত্রীর উক্তির আন্তরিকতা সপ্রমাণ হোতো। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের মধ্যে বিরোধীদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষায় আর এক ধাপ এগিয়ে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের গভীরতা, প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে চাপা রাখতে না পেরে রেড্ডিকে সমর্থন করবার জন্য চ্যবন সম্পর্কে যা বলেছেন তার অর্থ দাঁড়ায় চ্যবন কথা দিয়ে কথা রাখেননি। ("I trust people when they tell me something. It is very difficult for me not to believe them.") কে কার দলে, এটাই ঘটনার নিয়ামক হয়েছে। কার কী নীতি, রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী মনোনয়নে সেটা অপ্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী যদি ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্মীদের উপেক্ষা না করে, তাদের সঙ্গে পূর্ব-আলোচনা করে তার অর্থনৈতিক নোট উপস্থিত করতেন, সেক্ষেত্রে হয়তো চ্যবন ও কামরাজের সমর্থন পেতেন। সহকর্মীদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করে জাতীয়করণের রাজনীতির আশ্রয় নেওয়ার ফলেই পার্লামেণ্টারী বোর্ডে তিনি পর্যুদস্ত হয়েছেন এবং চ্যবনকে

ও মোরারজী দেশাইকে মুখ্যত সে-জন্য দায়ী করেছেন। এই রাজনীতি একদিকে তাকে সমাজবাদের পৃষ্ঠভূমিকায় ঠেলে দিলো, অপরদিকে সংগঠনের মধ্যে প্রবল বৈপরীত্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিলো। এই দুই স্থিতিভূমি থেকে তার আর পশ্চাদপসরণের উপায় নেই, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাকে উত্তরোত্তর সমাজবাদের ভূমিকা তীব্রতর ও তীক্ষ্ণতর করতে হবে এবং সংগঠনে বিরোধীদের সঙ্গে দ্বৈরথ সংগ্রামে নামতে হবে। এই দ্বৈত-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তীব্রতর বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়ে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হবে কিনা সে-প্রশ্ন আজ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে।

জাতীয়করণের রাজনীতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সহস্র-বাহু হয়ে বহু দূরে প্রসারিত হয়েছে। সঞ্জীব রেড্ডির নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভি, ভি, গিরি স্বীয় প্রার্থীত্ব ঘোষণা করেছেন। ভি, ভি, গিরি নিঃসংশয়ে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোনয়ন-প্রার্থী ছিলেন এবং সেই মনোনয়নে বিফল হয়ে স্বীয় প্রার্থীত্ব ঘোষণা করেছেন। সঞ্জীব রেড্ডি একেবারেই গোষ্ঠি প্রার্থী—তাকে কংগ্রেস প্রার্থী না বলে 'সিণ্ডিকেট' প্রার্থী বলাই শ্রেয়। প্রধানমন্ত্রী তাকে ক্যাবিনেটে স্থান দেন নাই, তার সম্পর্কে হাইকোর্ট-এরও বিরূপ অভিমত আছে। তা সত্ত্বেও ১৯৭২-এর নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠি তাদের স্বার্থসাধনের জন্য রেড্ডিকে মনোনয়ন দিয়েছে। ১৯৭২-এর নির্বাচনের পর পার্লামেন্টে কংগ্রেসের একক সংখ্যাপরিষ্ঠতার সম্ভাবনা কম। তাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির বিচার প্রয়োগের অবাধ সুযোগ থাকবে। ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে তাকে তাদের পক্ষপুটে আবদ্ধ রাখবার প্রয়াসে সিণ্ডিকেট ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া শ্রীমতী গান্ধীর মস্কো এর এবং মস্কোপন্থীদের প্রতি আনুকূল্য, তার আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক রাজনীতির প্রতি সংশয়ের অবকাশ রেখেছে। তাই সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক উভয় কারণেই ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কংগ্রেস সংগঠনের কর্তৃত্বাসীনদের মনোভাব কঠোর করে তুলেছে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পেলে, সেদিন রাষ্ট্রপতির পদে আসীন 'সিণ্ডিকেট'-এর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তি, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আহ্বান না-ও করতে পারেন, সঞ্জীব রেড্ডির নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর ভয় সেখানে, আবার সেখানেই 'সিণ্ডিকেট'-এর ভরসাস্থল। তাই গিরির প্রার্থীত্বের পশ্চাতে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনের সম্ভাবনা অনুমিত হয়েছিল, যদিও বন্দিরা গান্ধী তার দৃঢ় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে লৌকিকভাবে সঞ্জীব রেড্ডিকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

গিরির প্রার্থীত্বের পশ্চাতে তিনি নীতির দাবী করলেও সেখানে নীতির আবেদন কতটা তার বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। গিরি কোনো জাতীয় 'কনসেনসাসের' ভিত্তিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোনয়ন প্রার্থী ছিলেন না বা ইন্দিরা গান্ধী সকল দলের সর্বসম্মত মত নিয়ে তাকে প্রার্থীরূপে তার নাম বোর্ডের নিকট উত্থাপন করেন নি। রাষ্ট্রের প্রধান, জাতির ঐক্যের প্রতীক হবেন সেটাই কাম্য। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তো জাতির প্রতীক নয়? শ্রীগিরি এ কথা কেন ভুলে গেলেন যখন তিনি পার্লামেন্টারী বোর্ডের মনোনয়নের প্রার্থী ছিলেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড নিঃসংশয়ে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রার্থী মনোনীত করেছেন। কিন্তু গিরিকে মনোনয়ন দিলেও, সেটা কংগ্রেসেরই মনোনয়ন হতো, জাতির নয়। গিরির নিষ্ঠা, জনসেবা ও শ্রমিক কল্যাণে অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ তাকে যেমন ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধে স্থান নির্ণয় করে দিয়েছিল, তেমনি কংগ্রেসের মনোনয়নে বিফল মনোরথ হয়ে প্রার্থীত্ব ঘোষণায় নীতির নিরিখে সেই সুউচ্চ আসন থেকে তিনি নেমে এসেছেন। পার্লামেন্টারী বোর্ডের রাজনীতির অনুকরণে গিরির প্রার্থীত্বের আর এক নামও [illegible]নীতি—ব্যাক

জাতীয়করণের রাজনীতির ছায়াপাত যাকে স্পর্শ করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার এবং পার্লামেন্টের সদস্যরা যদি গিরির প্রার্থীত্ব, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তের পূর্বেই, নির্বাচকদের কোনো মঞ্চ থেকে ঘোষণা করতেন এবং গিরিও সেই মনোনয়ন স্বীকার করে নিতেন, সে-ক্ষেত্রে তিনি 'দলত্যাগী' কিম্বা নীতিহীনতার অভিযোগে চিহ্নিত হোতেন না। গিরি তের বছর আগে কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ-যাবৎ যে সকল নির্বাচিত পদ অধিকার করেছেন তার সব কটাই কংগ্রেসের মনোনয়নে কিনা? কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনায় মুখর হলে. তিনি কখনই নির্বাচন প্রার্থীরূপে কংগ্রেস মনোনয়ন লাভ করতেন না। রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসের মনোনয়ন না পেয়ে তিনি সে কাজ করেছেন। সুতরাং জীবনব্যাপী জনসেবার দ্বারা গিরি জনমানসে যে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাকে সেখান থেকে নিশ্চিতরূপে বহুলাংশে অপসারিত করেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গিরি অবশ্যই বহু সদস্যদের সমর্থন পাবেন। কিন্তু তার কারণ ভিন্নতর। কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় সুনিশ্চিত করবার জন্য বহু নির্বাচক গিরিকেই বেছে নেবেন। তবে এ কথাও সত্য, প্রধানমন্ত্রী যদি পার্লামেন্টারী বোর্ডে পরাজিত হয়ে প্রকাশ্যে তার প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করতেন এবং সিণ্ডিকেট রেড্ডীকে মনোনীত করে তার উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার ঘটনাটিকে 'অবশ্যই দুঃখজনক' (certainly distressing এবং এই মনোনয়নের পর পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় এই 'মনোনয়নের সকল রকম পরিণতি সম্পর্কে তাকে ভেবে দেখতে হবে' ["I shall have to think out or consider all the consequences (after its decision)"] না বলতেন, সেই অবস্থায় গিরি স্বীয় প্রার্থীত্ব নিয়ে অগ্রসর হতেন কিনা সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অতর্কিত 'নোট' ওয়ার্কিং কমিটিতে হাজির করিয়ে প্রধান মন্ত্রী যে রাজনীতির সূচনা করেছেন গিরির স্বীয় প্রার্থীত্ব সেই রাজনীতির অন্যতম পরিণত ফল।

বাঙ্গালোরে প্রধান মন্ত্রীর ১৩ই জুলাই-এর সাংবাদিক সম্মেলনের পরই সম্ভাব্য ক্যাবিনেট পরিবর্তনের কথা ওঠে। চ্যবন-মোরারজী দুজনই পার্লামেন্টারী বোর্ডে তার বিরাগ-ভাজন হয়েছেন, বিশেষভাবে চ্যবন। কারণ চ্যবন এযাবৎ কখনও প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করে 'সিণ্ডিকেট'র আনুকূল্য দেখান নাই। তাই ক্যাবিনেটে পরিবর্তন হলে চ্যবনেরই সর্বপ্রথম ভাগ্যবিপর্যয় হবে, অনুমানটা তাই ছিল। কিছু যে একটা ঘটবে তার আভাস প্রধানমন্ত্রী নিজেই সাংবাদিক সম্মেলনে দিয়েছেন। দলীয় সংগঠনের মধ্যে বিরোধীদের ("Organisation men in the Congress") বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মন্তব্য করলেন দলীয় ঐক্য বজায় রাখতে হবে এবং দলকে দুর্বলও করা হবে না। কিন্তু ঐক্য কিসের জন্য ("certainly there should be unity, but unity of purpose for what")? সুতরাং ঐক্যের খড়্গ উঁচিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাঙ্গালোর থেকে দিল্লী ফিরে এলেন; আদর্শগত ও উদ্দেশ্যগত ঐক্য বজায় রাখতে অনৈক্যের উপর খড়্গাঘাতের সঙ্কল্প প্রধানমন্ত্রীর বাক্যে ও আচরণে ইতিমধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী ১৬ই জুলাই দুপুরবেলা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাজনীতির আর একটি পদক্ষেপে ভূকম্পন সৃষ্টি করলেন। সেদিন বেলা ১২-৪৫ প্রধান মন্ত্রী মিঃ দেশাইকে পত্রযোগে জানালেন অর্থমন্ত্রকের ভার দেশাই-এর হাত থেকে নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যেই দেশাই অনন্যোপায় হয়ে ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করে পত্র দিলেন। দেশাই-এর নিকট থেকে কোনো উত্তর পাবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি ভবন

থেকে অর্থ মন্ত্রকের পরিবর্তন ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশাইকে প্রত্যাখ্যানের অনমনীয় দৃঢ়তা ব্যক্ত হোলো। সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য অর্ডিন্যান্স তৈরী হচ্ছে, কিন্তু অর্থমন্ত্রক সে গুজব ভিত্তিহীন বলে প্রচার করে।

বাঙ্গালোর এ, আই, সি, সির অর্থনৈতিক প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর নোটটিকে স্বাগত জানানো হয়েছে ('welcomes the Note of the Prime Minister)'। প্রধানমন্ত্রী এই স্বাগতকে নির্দেশরূপে ('mandate') মেনে নিয়ে সে-প্রস্তাব রূপায়নের দায়িত্ব নিজের হাতে নেবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। অর্থমন্ত্রক মোরারজীর হাত থেকে কেড়ে নেবার এই যুক্তি প্রধানমন্ত্রী দাঁড় করালেও, পার্লামেন্টারী বোর্ডে পরাজয়ের গ্লানি মুছবার এই কৌশল সম্পর্কে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। সাংগঠনিক দ্বন্দ্বে সময়ক্ষেপণ করলে ক্ষমতাচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই আশঙ্কায় আর সময়ক্ষেপণ না করে প্রধানমন্ত্রী দেশাইকে অপসারণ করে সাংগঠনিক নেতৃত্বকে ("organisation men') প্রবল আঘাত দিতে দ্বিধা করবেন না। বাঙ্গালোরের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে এই প্রবল দ্বন্দ্বে তাঁর শিরস্ত্রাণ এবং বর্মস্ত্রাণ উভয়রূপেই তাকে প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে নিরাপদ রাখতে এই রণকৌশল অবলম্বন করেই প্রধানমন্ত্রী তার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তা যদি না হতো তার উত্তোলিত খড়্গের আঘাতে চ্যবন কেবিনেট থেকে অপসারিত হতেন কারণ সংগঠনে চ্যবন একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রস্তাবকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করলে চ্যবন নাগালের বাইরে থাকবেন, সেখানে দেশাই-ই সহজ লক্ষ্যস্থল হবেন। হলেনও তাই। সংগঠনের চাপ, অনুরোধ, চোখ রাঙানী কিছুতেই কাজ হোলো না। দেশাইকে অর্থমন্ত্রক প্রত্যর্পণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয়করণের রাজনীতি আর এক ধাপ অনিবার্যভাবে এগিয়ে গেলো।

সাংগঠনিক নেতৃত্বকে ("organisation men") দ্বন্দ্বে আহ্বান করে মাঝপথে থেমে যাওয়া আর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এগিয়ে আসছে, ১৬ই আগষ্ট, তারপরই এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে নূতন শক্তি সমাবেশ হবে। সুতরাং তার পূর্বেই আরো আঘাত দেবার প্রয়োজন রয়েছে, অথচ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাংগঠনিক ঐক্য বজায় না রাখলে প্রত্যাঘাতের ঝাপ্টা এসে প্রধানমন্ত্রীর সকল কূটকৌশল বানচাল করে দিতে পারে। তাই রেড্ডীকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সাংগঠনিক নেতৃত্বকে নিশ্চিত করে তার আগামী কৌশল রচনার জন্য ১৭ই অর্থমন্ত্রকের সচিবদের সঙ্গে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করলেন পরবর্তী কর্মসূচী। ১৯শে জুলাই এই কর্মসূচী রূপ নিয়ে ক্যাবিনেটে এলো: ক্যাবিনেট আধ ঘণ্টার মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে ১৪টি বড় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব গ্রহণ করলো। ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। চ্যবন 'নূতন অর্থ মন্ত্রীকে' এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানালেন। প্রায় একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোরারজীর পদত্যাগ গ্রহণ করলেন।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাজনীতির এই শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর রণকৌশল তাঁর বিরোধীশিবিরে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের বিস্ময় বিমূঢ় করে দিলো। চ্যবন, কামরাজ প্রকাশ্য অভিনন্দন জানালেন, পাতিলের অসন্তোষ ও অস্বস্তি চাপা রইলো না, দলের মধ্যে এবং দলের বাইরে সমাজবাদী ও বামপন্থীরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সমর্থন প্রসারিত করলেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলে প্রধানমন্ত্রী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন, ওয়াকিং কমিটি নিরীর্য হয়ে গেলো এবং মোরারজী দেশাই-এর অর্থ মন্ত্রকে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেলো। মোরারজী দেশাই দেখলেন তিনি নিঃসঙ্গ, একা; যে চ্যবন তার অবমাননার শরিক হয়ে ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করবেন শোনা গিয়েছিল, সেই চ্যবন তাঁকে বর্জন করে

ক্যাবিনেটে রয়ে গেলেন। আর সিণ্ডিকেটেরও আসতে পর্যুদস্ত হয়ে মোরারজীর দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী প্রথম দফায় নিঃসংশয়ে জয়ী হয়েছেন। বাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসেই সেনাবাহিনীর নূতন সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যানেকসর-সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিযোগ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী অস্বীকার করলেও এই ধরণের ঘটনা দ্বিতীয় দফায় সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সে-সংঘাত দেখা দিবে ১৯শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর। এই নির্বাচনে রেড্ডীর জয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অশুভসূচক। আর গিরির জয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভিন্নতর পরিবেশ সৃষ্টি করবে। গিরির প্রার্থীত্বের পশ্চাতে সোভিয়েত রুশের ঔৎসুক্য, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির অশুভ ছায়াপাতও সঞ্চারিত করেছে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক অস্থৈর্যের সম্ভাবনা রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী সেই সম্ভাব্য অস্থৈর্যের মধ্যে কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের চূড়ান্ত পরিণতি, এর অব্যবহিত পরিণতিতে সংগঠনের নেতৃত্ব সুনিশ্চিতভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনা : উদ্দেশ্য ও সাধন পদ্ধতি

ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য লইয়া মতদ্বৈধ হইবার অবকাশ খুবই অল্প, এই পত্রিকার পূর্ব্ববর্তী সংখ্যায় তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। কৃষির উন্নতি, শিল্পের বিস্তার, সংযোগব্যবস্থার উন্নতিসাধন, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার, এই সকল উদ্দেশ্যই জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু এই সব বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান সময়ে সমাজের আছে কিনা এবং না থাকিলে সমাজের চলিষ্ণুতা কিরূপে বাড়ানো সম্ভব তাহা লইয়া বাদ-বিসংবাদের অবধি নাই। প্রথমেই দেখা যাক্, আমাদের পরিকল্পনা কমিশন এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন। আগামী পাঁচ বৎসরে জাতীয় উন্নয়নের প্রয়াস কিরূপ তালে চলিবে, তাহা স্থির করিয়া দিতে গেলেই প্রথমে ভাবিতে হয় উদ্বৃত্ত সম্পদের কথা। উদ্বৃত্তের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটিলে উন্নয়নের চেষ্টা মরীচিকায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। পরিকল্পনা কমিশন এই উদ্বৃত্তের হিসাব করিতে বহু সময় ও যত্ন ব্যয় করিয়াছেন। পরিকল্পনার আকার ছোট হইবে কি বড় হইবে তাহা লইয়া গত করেক বৎসর বাদানুবাদের সীমা ছিল না। অবশেষে স্থির হইয়াছে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মোটামুটি প্রায় ২৩, ৭৫০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত নানাভাবে সংগৃহীত হইতে পারে। নীচের তালিকা হইতে দেখা যাইবে এই উদ্বৃত্ত কোথা হইতে কিরূপে আসিতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব হইতে (কর বৃদ্ধি ইত্যাদি ধরিয়া)
— ৩৮৩৫ কোটি টাকা

রেলপথ সমূহের উদ্বৃত্ত (ভাড়া বৃদ্ধির কথা না ধরিয়া)
২৬০ কোটি টাকা

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য সংস্থার উদ্বৃত্ত—
৭৬০ কোটি টাকা

সাধারণের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় ঋণ গ্রহণ দ্বারা—
৭০০ „ „

স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাপ্তব্য— ৩৬০ „ „

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমার টাকা হইতে—
১৮৮০ „ „

রাজ্য সরকার সমূহের রাজস্ব উদ্বৃত্ত (নূতন কর ধরিয়া)
— ১৯০৫ „ „

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থার উদ্বৃত্ত— ৩২৫ „ „

রাজ্য সরকারের ঋণপত্র বিক্রয় ও আমানত হইতে
— ৯৪০ „ „

অন্যান্য খরচ সংক্ষেপ করিয়া উদ্বৃত্ত — ৩৩৫ „

বিদেশ হইতে লব্ধ ঋণ বা সাহায্য হইতে উদ্বৃত্ত
৪৭০০ „ „

সরকারী তহবিলের মোট উদ্বৃত্ত— ১৬০০০ কোঃ টাঃ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ হইতে উদ্বৃত্ত
— ১৩০০ কোঃ টাঃ
ব্যক্তিগত সঞ্চয় হইতে উদ্বৃত্ত — ৮৩৭০ ,, ,,
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষয়ক্ষতির তহবিল হইতে প্রাপ্তব্য
— ৯১০ ,, ,,
বিদেশ হইতে লব্ধ বে-সরকারী ঋণ বা সাহায্য
— ৬৮৫ ,, ,,
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বে-সরকারী লগ্নীতে বিনিয়োগ
— ১২৫ ,, ,,

বে সরকারী মোট উদ্বৃত্ত — ১১৩৯০ ,, ,,
উপরের উদ্বৃত্ত হইতে সরকারী ঋণগ্রহণ
— ৩৬৫০ ,, ,,

বে-সরকারী লগ্নীতে নিয়োজিতব্য উদ্বৃত্ত
— ৭৭৪০ কোঃ টাঃ

উপরের হিসাব অনুযায়ী দেখা যাইতেছে সরকারী এবং বে-সরকারী উদ্বৃত্ত মিলাইয়া ২৩৭৪০ কোটি টাকা জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াসের জন্য পাওয়া অসম্ভব নয়। এই হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়াই ২৩৭৫০ কোটি টাকার নূতন চতুর্থ [illegible] গ্রহণ করিতে পরিকল্পনা কমিশন সম্মতি দিয়াছেন [illegible] ও রাজ্য সরকার সমূহ সেই অনুসারে

আস্থার অভাব দেখা দেয় কিংবা রাজনৈতিক রেষারেষির জন্য এক দল অন্য দলকে কর বৃদ্ধি করিতে বাধা দেয় তবে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব কি খুব কাজে লাগিবে? তারপর ধরা যাক সরকারী সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্তের কথা। নানা কারণে এই সব সংস্থার অধিকাংশই এখনও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতি অপারগ। বরঞ্চ অনেক সময়ে সরকারকেই ঋণ অথবা অনুদান দিয়া এই সংস্থাগুলিকে জীয়াইয়া রাখিতে হয়। সংস্থাগুলির পরিচালনা-নীতি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এমন আশা করা কি বৃথা নয় যে উহাদের উদ্বৃত্ত হইতে পরিকল্পনার রসদ যথেষ্ট পরিমাণে জুটিবে? সরকারী ব্যয়সংকোচের দ্বারা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের যে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহারও সমর্থন পাওয়া শক্ত। সুতরাং বাকী রহিল দেশ ও বিদেশ হইতে পাওয়া নানা ধরণের ঋণ ও সাহায্য। জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনায় এই দুই খাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে বাধ্য।

দেশের জনসাধারণের কোন্ অংশ সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করেন? সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগত উদ্বৃত্ত বলিতে প্রায়ই কিছু থাকে না, থাকিলেও তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। বর্ত্তমান সময়ে আরও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এই জন্য যে বিভিন্ন সৌখীন সামগ্রীর চাহিদা নিম্নবিত্তদের মধ্যেও দেখা দিয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের মজুরি বা [illegible]য় যদি ক্রমাগত বাড়িয়াও চলে, সেই বাড়তি অর্থ যে [illegible]খীন সামগ্রীর জন্য খরচ হইয়া যাইবে না তাহার নিশ্চয়তা

পরিকল্পনার রসদ জোগাইবার কথা ভাবিতে পারেন না। ধনিক শ্রেণীর মূলোচ্ছেদ এবং শিল্পবাণিজ্যে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করা হইলেও এই সমস্যাটি প্রায় একই অবস্থায় থাকিয়া যায়। তখন প্রয়োজন হয় লোকের উপর জোর খাটাইয়া ব্যক্তিগত ব্যয়ের মাত্রা কমাইয়া আনার। তাহার জন্য আবার প্রয়োজন শক্তিশালী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষবিহীন কোনো শাসকগোষ্ঠীর। কাজেই দেখা যাইতেছে পরিকল্পনার স্বার্থে হয় ধনিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষণ করিয়া সরকারকে চলিতে হইবে, নয়তো সমস্ত শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত করিয়া কঠোর হস্তে ব্যক্তিগত ব্যয় নিয়ন্ত্রণের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এই দুইটি পদ্ধতির কোনোটির প্রতিই অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো সহজ নয়।

দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি যেমন পরিকল্পনার সাফল্যকে প্রভাবান্বিত করে, বৈদেশিক রাজনীতিও সেইরূপ। বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ ও সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারটি অনেকাংশেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত। আগামী পাঁচ বৎসরে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য প্রাপ্তির যে হিসাব উপরে দেওয়া হইয়াছে, বহির্জগতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সেই হিসাব কোনো কাজেই না লাগিতে পারে। অনেকের চোখেই এখন এই সাদা কথাটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে যে যতদিন আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক রেষারেষি প্রবল ছিল, ততদিন অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য দিবার একটা প্রতিযোগিতাও তাহারা চালাইয়া যাইতেছিল। আগামী কয়েক বৎসরে যদি এ

কাজে বড় কোনো বাধার সৃষ্টি হইবে না, তাহা হইলেও কিন্তু পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য অন্যান্য নানা বস্তুর অভাব দেখা দিতে পারে। অর্থ ছাড়াও আরও যে দুইটি প্রধান বস্তু পরিকল্পনা প্রয়াসের জন্য প্রয়োজনীয় তাহাদের বলা যাইতে পারে বাহুবল ও বুদ্ধিবল, কিংবা শ্রমশক্তি ও সংগঠনশক্তি। বাহুবল দ্বারা সকল কাজ সিদ্ধ হয় না একথা যেমন বলার অপেক্ষা রাখে না, সংগঠনশক্তিও বাহুবলের সহযোগিতা না পাইলে নিষ্ফল ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। যদি এই উভয় শক্তির সমন্বয় সাধনের পর্যাপ্ত প্রয়াস পরিকল্পনায় না থাকে, তবে আর্থিক বরাদ্দ ত্রুটিবিহীন হইলেও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

বিগত তিনটি পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্যটি আজ মোটামুটি স্পষ্ট যে সংগঠকশ্রেণী এবং সাধারণ উৎপাদকশ্রেণীর সম্পর্কের সমন্বয় বিধান করিবার যথোপযুক্ত প্রচেষ্টার অভাবই আমাদের পরিকল্পনা-প্রয়াসকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দই সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের মধ্যে যদি এই ব্যবস্থার ফলে সংঘাত আরও বাড়িয়া চলে, যদি শ্রমিক শ্রেণী উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং কৃষিজীবীশ্রেণী উপযুক্ত শিক্ষক—সংগঠকের সন্ধান না পায়, তবে পরিকল্পনার শিল্প-সম্ভার [illegible]

বাঙ্গলার জাগৃতি

কালীচরণ ঘোষ

গোড়ার কথা

বাঙ্গলায় সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা লিখতে গেলে তার পটভূমিকার অন্ততঃ কিছুটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন। বহুবর্ষ ধরে স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ ও প্রসারের শান্ত ধারা আর আন্দোলন যখন বিফল হয়ে যায় এবং পরাধীন অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন স্বতঃই প্রকাশ্য সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। মৃদু প্রতিবাদের উত্তরোত্তর তীব্র ব্যঞ্জনা তীরধনু, বল্লম, ছোরা, তলোয়ার, গুলি, বারুদ, বোমা, বন্দুক কামানের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করে। ভারতের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ইংরেজ ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের প্রহসনে এবং জাল-জুয়াচুরি উৎকোচ, প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন দ্বারা যখন নিজ দখল পাকা করতে থাকে তখন একজন লোক বেশ বুঝতে পেরেছিলেন এর পরিণতি কোথায়। ইংরেজ একটি শাক্ষীগোপাল খুঁজছিল। এলেন মীরজাফর। তিনি রঙ্গমঞ্চ হতে অন্তর্হিত হবার পর এসেছিলেন মীরকাসিম। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি; এঁর বুঝতে কষ্ট হয়নি, ইংরেজ একবার পাকাপোক্ত-ভাবে বসতে পারলে পরে তাকে বাঙ্গলা থেকে বিদায় করা আর সম্ভব হবে না।

এক দল ছলেবলে কৌশলে প্রভাব বিস্তার করতে চায়, অপর পক্ষ তার বড় প্রতিবন্ধক, সুতরাং সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিছুদিন দুপক্ষে হার জিত চলতে থাকে। তখন ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না; ১৭৬৩ অক্টোবর ২৩-এ বকসার যুদ্ধে মীরকাশিমের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে।

মীরকাশিমের আগে ও তাঁর তিরোধানের পরে ইংরেজের সঙ্গে "বাজা", সুবেদার, নবাব, জমিদার, সন্ন্যাসী, আদিবাসী ও অন্যান্য দলের সঙ্গে নানা গুরুত্বের যুদ্ধ ঘটেছে।

একটু বড় রকমের প্রতিবাদ ও ইংরেজ বিতাড়ন ব্যবস্থায় হাত দিয়েছিলেন মহারাজা নন্দকুমার। আয়োজনটা সশস্ত্র নয়, তবে সম্ভাবনাশূন্য ছিল না। তাঁর সঙ্গে রাজ্যশাসনী বুদ্ধিতে বিপর্যস্ত হয়ে ইংরেজ অতি কদর্য্য, হীন প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে। সুপ্রীম কোর্টে বিচার অভিনয়ের ফলে ফাঁসিকাষ্ঠে ১৭৭৫, আগষ্ট ৫-ই তাঁর জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। বাঙ্গলা দেশে ইংরেজ নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে।

মহারাজার তিরোধানের পর ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বিদ্রোহ ঘটেছে, বাঙ্গলা তা থেকে বাদ যায় নি। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে তার বিশদ বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। এই সময়কার সবটাই খণ্ড যুদ্ধ এবং অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রের ব্যবহার চলেছে।

অপর দিকে ইংরেজ শাসনে দেশে কতকটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিককার কথায় সুরেন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) বলেছেন ("a common system of administration and education")—সর্ব্ব ভারতীয় শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবাসীকে এক করে ভাবতে শিখিয়েছে, এক লক্ষ্য হয়ে সকল প্রদেশ জাতীয় স্বার্থরক্ষা এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য মন তৈরী করে তুলেছিল ("had prepared the ground for the realisation of our most cherished ideals, namely, united action

by the different Indian provinces for the fulfilment of our common national aims and aspirations.")

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান" নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করা সত্ত্বেও পরস্পর স্বার্থ বিজড়িত হয়ে দেশ এক ভারতীয় "নেশন" বলে ভাবতে শিখলো।

আর্থিক বিপদ

এটা আরও একটু পরের অবস্থা; কিন্তু তখন আভাষে ও লক্ষণে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তখন জাতির স্বার্থ-রক্ষার কথা নানা কোলাহলের মধ্যেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। তার উপযুক্ত কর্ম্ম পদ্ধতির চিন্তা বড় করে দেখা দিল। ইংরেজ অধিকারে অপরাপর ক্ষতিবৃদ্ধি যাইই হ'ক প্রথমতঃ যে বিভীষিকা চিন্তাশীলকে ব্যাকুল করলো সেটা হলো ভারতের দারুণ আর্থিক অবনতি। দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে, রোধ করার শক্তি নেই। শিল্প নষ্ট হচ্ছে, অর্থ উৎপাদনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, খেটে খুটে লোকের ভরপেট অন্ন জোটে না। পুরাতন ব্যবস্থা রহিত হয়ে যাচ্ছে, নূতন শাসনে রোগে চিকিৎসা নেই; শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই; চারিদিকে একটা অসহায় ভাব। প্রতিবাদ করার উপযুক্ত লোক নেই। আর কার কথা কে বা শোনে? রাজশক্তি কেবল অর্থ সংগ্রহে মত্ত। 'কালা' জাতের ভালমন্দ তার দেখবার অবসর নেই।

এ অসহায় মনোভাব কেটে উঠেছে, যদিও ধীরে ধীরে পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। প্রায় নিজ চেষ্টায় যথাসম্ভব শিক্ষালাভ করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনার পর ক্রমে ক্রমে অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিচক্ষণ লোকরা মুখ ফুটে দেশের অধোগতির কথা প্রথমে কাছের পরে দূরের লোককে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। আবেদন-নিবেদনের সাহায্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কাজও চলতে লাগল।

রামমোহন

বিরোধের যাত্রা সুরু করে দিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩)।

রামমোহনের ক্ষেত্রে অপর নানা ব্যাপারের ন্যায় ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করবার আগেই তাঁর জাতীয়তা বোধ অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং নানা কাজের মধ্যে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহার মূলে অর্জ্জিত ইংরেজী ভাষার একটা বড় অংশ আছে। মেজর বি, ডি, বসু (B. D. Basu: History of Education in India, p.114) লিখেছেন যে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা তার জাতীয়তা উন্মেষের অন্যতম কারণ ("English education has been one of the causes of birth of national consciousness in India"). এ বিষয়ে বিরুদ্ধ মত প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। যাঁরা গোড়ার দিকে দেশভক্তিকে আঁকড়ে ধরে অপরের মধ্যে সংক্রামিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ। ইংরেজী ভাষার কথা কাকে কাকেও ভাবতে হয়েছে ইংরেজি শিক্ষার বিধিবদ্ধ চেষ্টা হবার আগে থেকে। যাঁরা কার্য্যব্যপদেশে ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা নিজ চেষ্টায় কাজ-চালানো ইংরেজী শিখতে বাধ্য হন। ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাদ পেয়ে অনেকে ভাল করেই ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত করেন।

ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হেয়ারের উদ্যমে, ১৮১৬ যে ১৪-ই, প্রথম সভা এবং পরের সপ্তাহে এক কমিটি গঠিত হয়। প্রায় ছ'মাস বাদে, ১৮১৭ জানুয়ারী ২০-এ, হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। তখনও গভর্ণমেণ্ট ইংরেজী প্রসার নীতি গ্রহণ করেনি, সেটা আসে ১৮৩৫ সালে। রুদ্ধ কবাট

খুলে গেলে ইংরেজীর বন্যা দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামমোহনও ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সংস্রবহীন নন। পেস্কারের কাজ আরম্ভ করার পূর্ব্বেই বাঙলা, সংস্কৃত, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল হয়েছিল। যখন বুঝলেন ইংরেজীকে উপেক্ষা করা চলে না তখন তাঁর নূতন শিক্ষা-লাভের সহজাত শক্তি দিয়ে ইংরেজীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সুপণ্ডিত ইংরেজরাও তাঁর বৈদেশিক ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতির জ্ঞানের গভীরতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

বিদেশী শাসকদের তিনি খুব বিশ্বাসের চোখে দেখেননি। যেটুকু সংযোগ, যেটুকু সম্ভ্রম, প্রীতি, তার মূলে ছিল ভারতের কল্যাণ। ইংরেজের সংকল্পে দৃঢ়তা, সাহস, কর্ম্মকুশলতা, ক্লেশসহনশীলতা, জ্ঞানার্জন স্পৃহা, সর্ব্বদা নিজ দেশের হিত চিন্তা এবং নিজেদের স্বার্থে সুনাম-দুর্নাম সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া গুণ বা দোষগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। ইংরেজের শাসন সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠেন এবং অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ভারতে তার স্থায়িত্ব কামনা করেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন ভারতের নিজ শক্তিতে অধিষ্ঠিত হবার এ একটি সোপান মাত্র।

সকল ক্ষেত্রেই তাঁর দুটো দিক বিচার করবার অভ্যাস ছিল। তিনি শাসকবর্গকে দূরদর্শী ঋষির মত alternative বা বিকল্প ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের নৈকট্য হেতু আয়র্লণ্ডকে দমনে রাখা বা তার স্বাধীনতা লাভ স্পৃহা খর্ব্ব করা যত সহজ হয়েছিল, সুদূরে অবস্থিত ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখা তত সহজ নয়। তার লোকবল, প্রাকৃতিক ও শিল্পোৎপাদিত সম্পদের সঙ্গে আয়র্লণ্ডবাসীদের জ্ঞান ও উদ্যমের এক চতুর্থাংশও যদি যুক্ত থাকতো তা হলে ভারত অন্য মূর্ত্তি ধারণ করতো। তা যাই হ'ক বর্ত্তমান অবস্থায় যা দাঁড়াচ্ছে তাতে তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হিতকারী বন্ধু অথবা বিরক্তিকর ক্ষতিসাধনতৎপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু বলে গ্রহণ করতে হবে ["She (India) would prove from her remote situation, her riches and vast populations either useful and profitable and a willing province, an ally of the British empire, or troublesome and annoying as a determined enemy."]

ইংরেজ কি করবে সেটা সম্পূর্ণ তার অভিরুচি; দুটো রাস্তাই খোলা রয়েছে। যতদিন ভারত বুঝবে ইংরেজের সহযোগিতায় তার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, ততদিন শিষ্ট, বন্ধু, সহকর্ম্মী সম্বন্ধ স্থাপনে দ্বিধা করবে না। এর ব্যতিক্রমে সে বিপরীত বা বিরূপ আচরণ করতে বাধ্য হ'বে।

সূচনা

হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। "সহস্র-বৎসরাবধি একৈক নিয়ম" প্রচলিত থাকাতে সংস্কারের অভাবে তাতে কূপমণ্ডুকতা, জড়তা, মলিনতা এসে জুটেছিল, তাতে দেশ অনড় পঙ্গু হয়ে পড়ে। বড় কাজের চিন্তা ছেড়ে মন ছোট হ'য়ে গিয়ে মনের জগতে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে' পড়েছে। ধর্ম্মান্ধতা, জাতিবৈষম্য ও বৈরিতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, আচারসর্ব্বস্বতা, বিচারবিমুখতা, সঙ্কীর্ণতা, আত্ম-কলহ প্রবৃত্তি, ভীরুতা প্রভৃতি নানা দোষ সাধারণ অসাধারণ সকল বাঙ্গালীর মনে বাসা বেঁধে থাকায় জাতি মরণের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি এ সকল দেখে স্থির থাকতে পারেন নি।

P 36090

লেগে গেলেন বেদের অভ্রান্ততা প্রমাণের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষ জীবনযাত্রার প্রণালী ও বহুসমর্থিত মত ধরে থাকবে বা বর্জ্জন করবে। যে সকল কুপ্রথা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত

করছে, মনুষ্যধর্ম্মে ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে, সে সকলকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। সতীদাহ প্রথাকে তিনি চিরতরে নির্ব্বাসন দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, (১৮২৮ ডিসেম্বর ৪ ঠা), আর করেছিলেন অনাচার, কদাচার, অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত।

তিনি এক নতুন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর "আত্মীয় সভা" (১৮১৫) আর ব্রহ্ম সভা (১৮২৮) নতুন পথ দেখিয়েছে। সকল দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরা বলেন সমাজনীতি, অর্থ-নীতি, রাষ্ট্রনীতির একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয় নব প্রবর্ত্তিত এক ধর্ম্মকে অবলম্বন করে। এই ভাবধারা এনে দিলেন তাঁর নূতন ধর্ম্ম মতের ভিতর দিয়ে। এক ভগবান, এক ধর্ম্ম, এক মানবজাতি। সমাজকে গুরুতর আঘাত মেরে তার সম্বিৎকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম সে যুগে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ভারতের মহৎ উপকার সাধন করেছে। তিনি যেমন হিন্দুদের অন্ধ গোঁড়ামি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই সঙ্গে তিনি খৃষ্টধর্ম্মী পাদ্রীদের ধর্ম্মপ্রচারে বাধা দান করেছেন। "পর ধর্ম্ম" ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। স্বজন পরিজন সমাজ থেকে বিচ্যুত লোক পরার্থে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়; দেশের মাটী হাওয়া জল তাকে আর সরস রাখতে পারে না। নিজের প্রাণ রক্ষা করতেই তার প্রাণান্ত।

কয়েকজন বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক ছাড়া কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে, সমাজের নির্য্যাতনে, নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন পরিচয় লাভের আশায় সাধারণ দরিদ্র লোকই খৃশ্চান হতে আরম্ভ করে। খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব, ধর্ম্মান্তরিত শতকরা নব্বই পঁচানব্বই জন বুঝতো না। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে সকল অভাবই ব্রাহ্মধর্ম্ম মেটাতে সক্ষম ছিল।

পাদ্রীদের সঙ্গে রামমোহনের বিতর্ক ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে স্থান লাভ করেছে। বহু চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে পেয়ে খৃশ্চান হওয়া থেকে বিরত হয়েছে। না হলে আরও সহস্র সহস্র হিন্দু অ-কারণে যৎসামান্য লাভের লোভে সমাজ পরিজন ছেড়ে চলে যেত। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে (St. Xavier) সেণ্ট জেভিয়ার একাই গোয়া অঞ্চলে দশ সহস্রাধিক হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাজগতে ভারতবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ, বিশেষতঃ রাজনৈতিক লাভ ক্ষতির হিসাব অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করতে গেলে বাঙলার ধর্ম্মানুশাসনের ধারার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। আজ একবার মনে প্রশ্ন ওঠে হয়ত তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের জন্যই ধর্ম্মের টান দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়:

"Some changes in the religion of the Indians were necessary for their political advantages and social comfort." তিনি বলে-ছিলেন প্রচলিত ধর্ম্মমত আচার বিচার সামাজিক রীতিনীতি ভারতবাসীর মঙ্গলের প্রতিকূল ("it is not well-calculated to promote their political interests"). নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিবদমান হিন্দু সমাজ, সহস্র প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় একত্ববোধের অভাবে সকল ব্যাপারেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ঘুরে মরছে। পদে পদে প্রায়শ্চিত্ত বিধি তাকে নিগৃহীত করেছে; সৎসাহস নিয়ে নতুন পথে চলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। স্বজাতি প্রেম, স্বাজাত্যবোধ পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর ধারায় প্রবাহিত হ'তে বাধ্য হচ্ছে।

পরাধীনতার গ্লানি রামমোহনকে ব্যাকুল করেছিল। চিন্তাশীল ব্যক্তি পরাধীনতার কলঙ্ক কখনও ভুলে থাকতে পারে না। ("It is impossible for a thinking man

not to feel the evils of political subjection and dependence upon foreign people".) এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি সকল সময় এই গ্লানি সম্বন্ধে জাতিকে অবহিত করে গেছেন। দেশ যাতে যোগ্যতা লাভ করে অপর নানা স্বাধীন দেশের মত আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়, সেই কথাই তিনি বলেছেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে এই চিন্তাকে প্রবুদ্ধ করবার প্রেরণা দিয়েছেন। কোনো কোনো দেশ স্বাধীনতা লাভ করার সংবাদে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হয়েছেন, আবার স্বাধীন দেশ পরকবলিত হলে সমভাবে বেদনা প্রকাশ করে গেছেন। কখনও কখনও আনন্দের আতিশয্যে তিনি প্রকাশ্য ভোজের ব্যবস্থাও করেছেন।

স্বাধীনতার শত্রু এবং যথেচ্ছাচারের সমর্থকরা কখনও সফলকাম হয়নি বা কস্মিন্‌কালেও হবে না—এই হ'লো রামমোহনের রাজনীতি দর্শনের মূল মন্ত্র। জাগ্রত দেশ আপন প্রচেষ্টায় একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই; অত্যাচারী যত বড়ই শক্তিমান হক, তাকে পরাভব স্বীকার করতেই হবে। এ-ধারণা ভারতে ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে। বিপিনচন্দ্র পাল সত্যই বলেছেন (Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj, p. 8) রাজার মনে অতি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। ("Swaraj even in the limited sense was present in the mind of Raja Rammohun Roy.")

তাঁর প্রথম পত্রিকা (১৮২১) ব্রাহ্মণ সেবধি ও মিশনারী সংবাদ (Brahmunical Magazine). সঙ্গে ছিল সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)। পর বৎসর ফার্সী ভাষায় মিরাৎ উল-আকবর প্রকাশ করেন ১৮২২, এপ্রিল ১৮ই।

জাতির আত্মসম্মানের নজির রেখে গেছেন রামমোহন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের সরকারী নীতির প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী পত্রিকা 'মিরাৎ-উল আকবর' বন্ধ করে দিয়েছিলেন (১৮২৩ এপ্রিল, ৪-ঠা)। ভারতের শাসন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন চেষ্টায় তাঁর অসাধারণ কৃচ্ছ্র-সাধনের কথা মনে করতে হয়। পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল (শাসন সংস্কার বিধি) আলোচনা-কালে তিনি ইংরেজ জাতিকে ভারতের অবস্থা অবহিত করার জন্য স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তাঁর একান্ত চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছিল।

রামমোহন ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর শত বৎসর ধরে সেই পথে ভারতবাসী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে এমন দিন আসতে পারে যখন আমার নগণ্য প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যৎ ভারতবাসী যোগ্য দৃষ্টিতে দেখবে, হয় ত বা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে ("That a day may come when my very humble endeavours will be viewed with justice—perhaps acknowledged with thanks.")

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব

তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম শক্তিলাভ করেছে, খ্যাতিমান, মহাপ্রাণ ব্রাহ্ম বন্ধু অনুচরদের সহায়তায়। এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০৩-১৮৬৮), দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী (১৮৪৪-১৮৯৮), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ, দেশমাতৃকার সুসন্তানগণ।

ধর্ম্মসাধনায় কেশবচন্দ্রের মতবাদ মানুষকে আরও উদার হতে শিখিয়েছে। সমভাবোধ এনেছে, জাতিভেদ রহিত, বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টা, ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, ন্যূনতম মূল্যের "সুলভ সমাচার" প্রকাশ করে। বাঙলার বাইরে হলেও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাক্ স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৭-১৮৮৩)র কথা। তাঁর আর্য্যসমাজ—

জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়ে দিয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রাদির মূল তত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করে হিন্দুর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছে। হিন্দুধর্ম্ম কিছুটা রূপান্তরিত—হয়েও বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করেছে।

সমাজ সংস্কারের ধারা উত্তরোত্তর বহুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অতি দ্রুত পট পরিবর্ত্তন হয়েছে। পরে পরে বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৮৯৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) (সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নাম স্মরণ করতে হয়) এসে হাওয়া একেবারে বদল করে ছেড়েছেন। বিবেকানন্দ জাতি, জন, দেশ, দেবতা এক করে দেখিয়ে বাঙ্গালীকে 'মানুষ' হবার পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

খৃশ্চান ধর্ম্মযাজক

রামমোহনকে একদিকে গোঁড়া হিন্দুদের ধর্ম্মসভা (১৮৩০) ও অপর দিকে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে। বাঙ্গলার নব জাগৃতিতে পাদ্রীদের একটা বিশেষ অবদান আছে। তিন সহকর্ম্মী, (William Carey) কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), (Joshua Marshman) মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) ও (William Ward) ওয়ার্ড (মৃঃ ১৮২৩) খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসে কার্য্য ক্ষেত্রে নামলেও (বাঙ্গলা) সাহিত্য রচনা ও প্রসারে, মুদ্রাযন্ত্র ও টাইপ প্রবর্ত্তনে, বিদ্যালয় স্থাপনে, স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনায় সংবাদপত্র পরিচালনে অগ্রদূত বল্লে অত্যুক্তি হয় না। ১৮১৮ এপ্রিলে কেরী (Friend of India) ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া এবং (John Clarke Marshman) মার্শম্যান বাঙ্গলা মাসিকপত্র 'দিগ্‌দর্শন' এবং মে ২৩-শে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন। এ অসমসাহস সে দিনের পক্ষে দুর্লভ।

তাঁরা যে উদ্দেশ্যে এই কঠিন পথ গ্রহণ করেছিলেন তাতে এ দেশীয় লোকের কাছে সমাদর লাভ করার পরিবর্ত্তে অনাদর অবজ্ঞা পেয়েছেন অনেক বেশী। গভর্ণমেণ্ট ও যে সকল সময় সদয় ছিল তাও নয়। খেয়ালমত যথেষ্ট সহায়তা ও বিরূপতা করেছে। স্বার্থ প্রণোদিত হ'লেও তাঁদের প্রচেষ্টার সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের সাহিত্য প্রসার লাভ করেছে ("the project would greatly encourage the spread of Asian literature"). কথাটা খুবই সত্য।

পাদ্রীদের "অপকর্ম্ম" প্রচেষ্টা ছিল না, সে কথা কেউ বলবে না। প্রলোভন দেখিয়ে, কখনও ছলে এমন কি বলপ্রয়োগে অসতর্ক লোককে ধর্ম্মান্তরিত করার দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে স্থায়ী মঙ্গলও করেছে যথেষ্ট। কেশবচন্দ্র সেন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তাঁরা ভারতবর্ষে বহু জনহিতকর ও আত্মসুখ-লেশহীন শুভ অনুষ্ঠান ("the many noble deeds of philanthropy and self-denying benevolence") এবং জ্ঞানবিস্তার, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে ("the various intellectual social and moral improvements which they have effected, need no flattering comment") কৃতকার্য্য হয়েছেন তার জন্য কোনো (অপ)স্তুতি প্রয়োজন হয় না, জাতির কৃতজ্ঞতার ফলকে সে কাহিনী উৎকীর্ণ আছে।

বাঙ্গলার বুকে খুব বড় করে আঘাত লেগেছিল যখন বাঙ্গলার কয়েকটি কৃতী সন্তান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ সকলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০৭), গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (তরু দত্তর পিতা) প্রমুখ মনীষীরা। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে

যে এঁরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন নিজ বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। নূতন ধর্ম্ম এঁদের অ-মানুষ বা অ-বাঙ্গালী 'সাহেব' করতে পারে নি। প্রত্যেক জনই নানা ক্ষেত্রে নিজস্ব ধাঁচে বাঙ্গলার সেবা করছেন; বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সমসাময়িক বা উত্তরকালে যশস্বী দেশ-প্রেমিক যত জন জন্মেছিলেন তাঁদের কেবল সমকক্ষতা নয়, হয় ত চরিত্রবত্তা, দৃঢ়চিত্ততা, স্বাধীন মতে অবস্থিতি এবং জ্ঞানের বিশালতায় উচ্চস্থান অধিকার করে গেছেন।

আর এক সুলক্ষণ। এঁদের ভয়ে ঘটেছিল ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্ম সভার মিলন। স্থানান্তরে সে ব্যাপার বিবৃত করা হয়েছে।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৭·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্ম্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃ ১৫ কলেজ স্কোয়ার ঃ কলিকাতা—১২

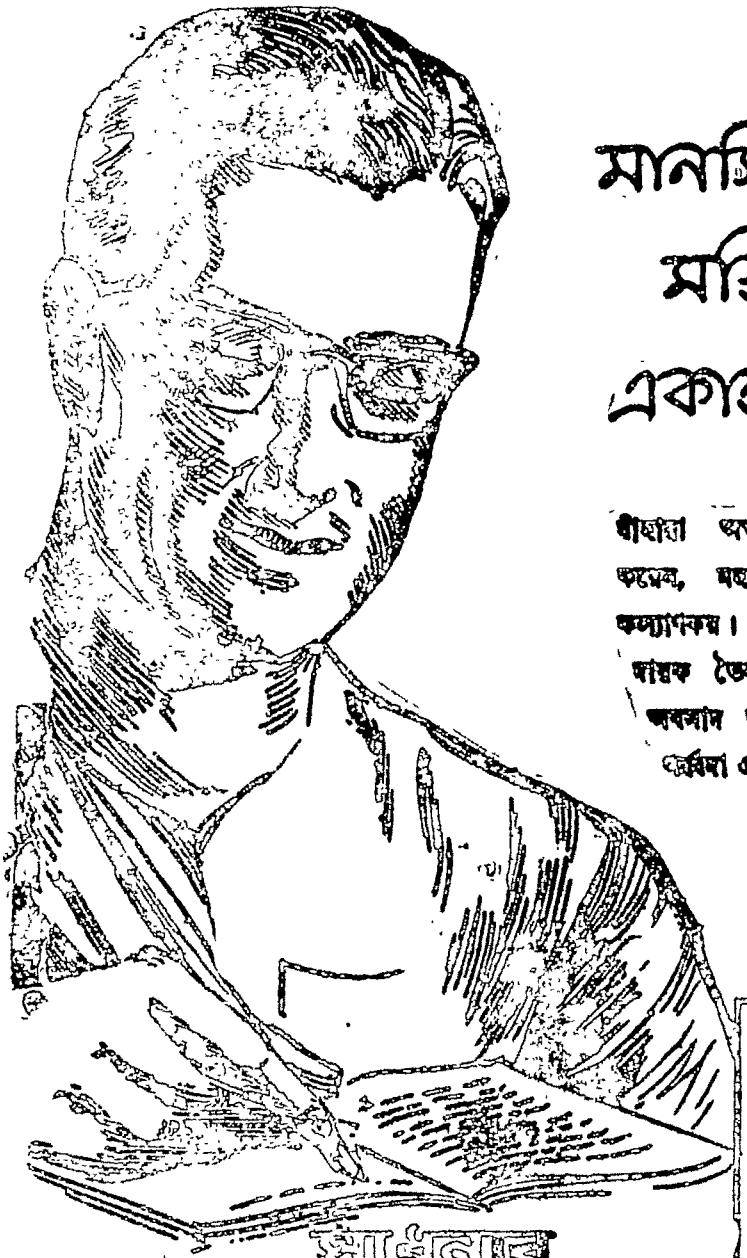

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে।

সাধনার

মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৩৮

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এল, এম, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এফ, সি, এস (আমেরিকা)
ঢাকেশ্বরী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

চার্লস ডিকেন্স

পথচারী

ঘটনাক্রমে ডিকেন্স তাঁর দুটি উপন্যাসে (বার্ণাবি রাজ ও অ্যা টেল অব টু সিটিজ্) সংকীর্ণ অর্থে বিপ্লবের কথা বলেছেন। বার্ণাবি রাজ-এ (Barnaby Rudge) ব্যাপারটা আসলে বিপ্লব নয়, দাঙ্গা। ১৮৭০ সালের গর্ডন দাঙ্গার (The Gordon Riots of 1870) ধর্মীয় গোঁড়ামির অছিলা ছিল, তবু তাকে নিরর্থক লুঠতরাজের চেয়ে বেশী কিছু মনে করা যায় না। ডিকেন্স তিনটে পাগলা-গারদ-পালানো উন্মাদকে এই দাঙ্গার নেতৃত্ব দেবার কথা প্রথম চিন্তা করেছিলেন, এতেই এই ব্যাপারে তাঁর মনোভাবের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বিরত করা হয়েছিল, কিন্তু বইটির প্রধান চরিত্র হল গাঁয়ের একটি জড়বুদ্ধি লোক। যে সব অধ্যায়ে দাঙ্গার কথা আছে সেখানে জনতার হিংস্র আচরণে ডিকেন্স আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন। জনসমাজের নিকৃষ্টাংশের জঘন্য পাশবিক আচরণের বর্ণনায় তিনি আনন্দ পান। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এই অধ্যায়গুলো অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ এ বিষয়ে তাঁর গভীর চিন্তার পরিচয় এখানে বর্তমান। তাঁর বর্ণিত বিষয়গুলি সমস্তই কল্পনা-প্রসূত বলে মনে হয়, কারণ তাঁর জীবদ্দশায় এমন ব্যাপক দাঙ্গা বা অনুরূপ কোনো ঘটনাই ঘটে নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে তাঁর একটি বর্ণনা দেওয়া গেল :

"সে রাতের উন্মাদনায় যে ক্ষিপ্তের দল সৃষ্টি হয়েছিল বেড্‌লাম গেট (Bedlam gates) খুলে দিলেও, তেমন ক্ষিপ্তের দল ছুটে বেরুত না। লোকগুলো ফুল-শেজের ওপর নৃত্য করছিল, যেন মানুষ-দুশমনদের মাড়িয়ে গুড়িয়ে যাচ্ছে ; আর বোঁটা থেকে ফুলগুলো ছিঁড়ে ফেলছিল, যেন হিংস্র অসভ্যের দল মানুষের ঘাড় মুচড়ে মটকে দিচ্ছে। সেখানে এমন লোক ছিল যারা তাদের জ্বলন্ত মশালগুলো হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে আবার সেগুলোকে নিজেদের মাথায় ও মুখের ওপরেই ধরছিল, তাতে তাদের চামড়া পুরে বিশ্রী ফোস্‌কা পড়ে যাচ্ছিল। কতক লোক আবার সেই আগুনের কাছে ছুটে গিয়ে হাত দিয়ে সেই আগুন ঘাঁটছিল, যেন জল ঘাঁটছে ; আর উগ্র বাসনা-তৃপ্তির জন্য সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল এমন অনেক লোককে জোর করে ঠেকানো হচ্ছিল। একটি মাতাল ছেলে বোতল মুখে করে মাটিতে পড়ে ছিল—চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল বিশ বছরও বয়স হয় নি—তার মাথায় গলিত আগুনের মতো সীসার ধারা ছাদ থেকে নেমে আসছিল আর তার মাথাটা মোমের মতো গলে যাচ্ছিল। ...কিন্তু এই সব দৃশ্য দেখে ঐ বিশাল গর্জমান জনতার মধ্যে একটি লোকেরও না হল ঘৃণার উদ্রেক বা করুণার শিক্ষা ; না হল হিংস্র কাণ্ড জ্ঞানহীন ক্রোধের পরিতৃপ্তি।"

আপনার মনে হতে পারে, সেনাপতি ফ্র্যাঙ্কোর দলভুক্ত কোনো অনুচরের লেখা 'রক্ত' স্পেনের বর্ণনা পড়ছেন। অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, ডিকেন্স যে-সময়ে লিখছিলেন তখনো লণ্ডন 'জনতা' বর্তমান ছিল। (আজ কাল 'জনতা' নেই, আছে শুধু মানুষের 'পাল') স্বল্প মজুরি এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও স্থানান্তরের ফলে এক বিরাট

বিপজ্জনক বস্তিবাসীর উদ্ভব হয়েছে, আর উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পুলিশ-বাহিনী বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। ইট-পাটকেল ছোঁড়া শুরু হলে জানালার খড়খড়ি বন্ধ করা ও ফৌজকে গুলী করার হুকুম দেওয়া—এ দুইয়ের মাঝে অন্য পথ ছিল না। অ্যা টেল অব্ টু সিটিজ্-এ (A Tale of Two Cities) ডিকেন্স বিপ্লবের কথা পেড়েছেন, যার মধ্যে সত্যিকার কিছু ছিল, আর ডিকেন্সের মনোভাবও ছিল স্বতন্ত্র, তবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে 'অ্যা টেল অব টু সিটিজ' এমন একখানা বই যা পড়ে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়—বিশেষত কিছুকাল চলে গেলে।

যিনিই 'অ্যা টেল অব টু সিটিজ' পড়েছেন তাঁর একটা কথা মনে থাকবেই, আর সেটা হল বিভীষিকার রাজত্ব (The Reign of Terror)। সমস্ত বইটাতে গিলোটিনের প্রাধান্য —ইতস্তত: গর্জিত টাম্‌রিল গাড়ি, রক্তাক্ত ছোরা, চুপড়ির মধ্যে লাফিয়ে-ওঠা মুণ্ডগুলো, আর অলক্ষুণে বুড়িগুলো—যারা এ সব দেখছে আর বোনার কাজ করে চলেছে। প্রকৃত পক্ষে মাত্র গুটিকয়েক অধ্যায়ে এই দৃশ্যগুলি ছড়িয়ে আছে, কিন্তু প্রচণ্ড তীব্র ভাষায় সেগুলো লেখা; আর বাকী বইটা অনেকটা মন্থর-গতি। কিন্তু 'অ্যা টেল অব টু সিটিজ' —'স্কারলেট্ পিমপরেল'-এর (Scalret Pemperel) জুরিদার বই নয়। ডিকেন্স স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে ফরাসী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, আর যাদের প্রাণ দণ্ড হয়েছিল তাদের অনেকেরই সেটা ছিল ন্যায্য প্রাপ্য। তিনি বলছেন, ফরাসী অভিজাত-শ্রেণী যে আচরণ করেছিল তাতে প্রতি-হিংসা আসতে বাধ্য। তিনি বার বার একথা বলেছেন। বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, কর্তা যখন বিছানায় গড়ান, উর্দিপরা চার-চারটে ভাণ্ডারী যখন তাঁকে চকোলেট এগিয়ে দেয় আর বাইরে চাষীরা উপবাসে থাকে তখন বনের মাঝের কোথাও গাছ বেড়ে উঠতে থাকে, যা কেটে গিলোটিন-মঞ্চের ভক্তা তৈরী হবেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ আছে একথা স্বীকার করলে বিভীষিকা যে অবশ্যম্ভাবী তাও স্পষ্ট ভাষায় বার বার বলতে হয়:

"যে দুনিয়ায় বীজ বোনা হয়নি সেখানে এই ভয়ংকর বিপ্লবই যেন চির-পরিচিত ফসল—যেন কিছুই করা হয়নি বা করতে বাকী নেই যার পরিণামে এই বিপ্লব এসেছে—ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ দুর্গতদের প্রতি, তাদের সমৃদ্ধি সাধনের সহায়ক সম্পদরাশির অপচয় ও অপব্যবহারের প্রতি যাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁরা যেন দেখতে পাননি যে এই বিপ্লব অবশ্যই আসছে এবং যা তাঁরা দেখেছিলেন তা যেন স্পষ্ট ভাষায় লিখে রেখেও যাননি—এভাবে এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবের কথা বলাই ছিল প্রবল রীতি।"

পুনশ্চ—

"কল্পনা লিপিবদ্ধ হয়েছিল যে কালে সেই কাল থেকে তৃপ্তিলেশহীন সর্বভুক যত দানব কল্পিত হয়েছে সব একীভূত হয়ে একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে—সে হল গিলোটিন। আর তবুও যে-অবস্থায় এই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে তার চেয়ে নিশ্চিত অবস্থারও একটি অঙ্কুর, একটি পাতা, একটি মূল, একটি চারাও পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি। বিচিত্র উর্বর ভূমি ও জলবায়ু-সমৃদ্ধ ফরাসীদেশে আর একবার এইরকম হাতুড়ির ঘায়ে মানুষের স্বাভাবিক রূপটা ভেঙেচুরে ফেলুন, মানুষ বেঁকেচুরে এমনি নির্যাতিত বিকৃত রূপই ধারণ করবে।"

ভাষান্তরে, ফরাসী অভিজাতশ্রেণী নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছিল। কিন্তু আজ যাকে ইতিহাসের বিধান (historic necessity) বলা হয়, তার উপলব্ধি এখানে নেই। ডিকেন্স, দেখতে পেয়েছেন যে, কারণ থাকলে কার্য বা ফল অনিবার্য, কিন্তু তিনি মনে করেন যে কারণগুলো এড়ানো যেত। বিপ্লব নামক ঘটনাটি ঘটেছে, কারণ শত শত বছরের নির্যাতন ফরাসী কৃষক-সমাজকে অপ-মানবে (sub-human) পরিণত করেছিল।

দুর্নীতিপরায়ণ সম্ভ্রান্ত শ্রেণী যদি কোনোরকম নতুন জীবন-ধারা অবলম্বন করতে পারত তবে বিপ্লব, কৃষক বিদ্রোহ, গিলোটিন আসত না—আর, না এলে ভালোই হত। এটা বৈপ্লবিক মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বই প্রগতির প্রধান উৎস। আর তাই যারা চাষীকে বঞ্চিত করে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়, সেই সম্ভ্রান্তশ্রেণী ততটা অপরিহার্য-ভূমিকাই গ্রহণ করে থাকে—সম্ভ্রান্তব্যক্তিদের গিলোটিনে হত্যা করে জ্যাকবিনরা যতটা করেছে। ডিকেন্স কখনো কোথাও এমন একটি লাইন লেখেননি যার এরকম অর্থ হতে পারে। তাঁর চোখে বিপ্লব হল একটি দানবযান্ত্র, অত্যাচারে যার উদ্ভব এবং নিজের সাধন যন্ত্রগুলোকে নিঃশেষে গ্রাস করে যার অবসান। গিলোটিনের পাদদেশে সিডনি কার্টন (Sidney Carton) স্বপ্নে পূর্বেই দেখতে পেলেন ত্বফার্জ (Defarge) ও বিভীষিকার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ঐ একই ছোরার ঘায়ে ধ্বংস হচ্ছেন—বস্তুত প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল।

আর, ডিকেন্সের নিশ্চিত ধারণা যে বিপ্লব একটি দানব। সেই কারণেই প্রত্যেকে 'অ্যা টেল অব টু সিটিজ'-এর বৈপ্লবিক দৃশ্যগুলো মনে রাখে; সেগুলোর মধ্যে নৈশাতঙ্কের গুণ রয়েছে, আর সেটা ডিকেন্সের নিজস্ব নৈশাতঙ্ক। বারবারই তিনি বিপ্লবের অর্থহীন ভয়াবহতার উল্লেখ করেছেন—গণহত্যা, অন্যায় বা অবিচার, সদাবর্তমান গোয়েন্দা-ভীতি, উচ্ছৃঙ্খল জনতার ভয়াবহ শোণিত-পিপাসা। প্যারির জনতার বর্ণনা—যেমন, সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডে কয়েদিদের হত্যা করার আগে হাতিয়ার ধার দেবার পাথরটিকে ঘিরে দ্বন্দ্বরত হত্যাকারী দলের বর্ণনা—বার্নাবি রাজ-এ (Barnaby Rudge) যে কোনো বর্ণনাকে ম্লান করে দেয়। বিপ্লবীরা তাঁর কাছে শুধুই অধঃপতিত অসভ্য মানব—বস্তুত উন্মাদরূপে প্রতিভাত। অদ্ভুত কল্পনার তীব্রতা নিয়ে তাদের উন্মত্ত উল্লাসের কথা ডিকেন্স তন্ময় হয়ে চিন্তা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কার্ম্যানিয়োল (carmagnole) নাচে মত্ত তারা—এই বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

"পাঁচশো লোকের কম হবে না, আর তারা নৃত্য করছিল পাঁচ হাজার দানবের মতো.....দন্ত কড়মড়ির মতো হিংস্র তাল দিয়ে জনপ্রিয় বিপ্লব-সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য করছিল তারা..... ...এগিয়ে পিছিয়ে পরস্পরের হাতে ঘা দিয়ে, একে অন্যের মাথা চেপে ধরে, একলাটি ঘুরে ঘুরে, পরস্পরকে ধরে, যুগল-নৃত্যে পাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত অনেকেই পড়ে গেল.....আবার হঠাৎ করে থেমে গেল, স্থির হল, সদর রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে সারি বেঁধে নতুন করে তাল দিতে শুরু করল, এবং মাথা নিচু করে হাত ওপরে তুলে চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনো লড়াই এই নাচের অর্ধেক ভয়াবহও হতে পারত না। এ এক নিতান্ত হীন —ক্রীড়ারঙ্গ একটা এমন কিছু যা এককালে ছিল নির্দোষ, আজ শয়তানির কাছে আত্ম-সমর্পিত।"

এই দুবৃত্তদের কারো কারো শিশুদের গিলোটিন করার রুচির কথা তিনি বলেছেন। ওপরে যে রচনাংশের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়েছি তার পুরোটাই পড়া উচিত। বৈপ্লবিক উন্মত্ততা সম্বন্ধে ডিকেন্সের কী প্রবল আতঙ্ক ছিল এই রচনা এবং অনুরূপ অন্যান্য রচনাংশ থেকে তা বোঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মাথা নীচু করে এবং হাত ওপরে তুলে' ইত্যাদির বর্ণনা-ভঙ্গিটুকু এবং এতে প্রকটিত পাপচ্ছবির প্রতি লক্ষ্য করুন। মাদাম ত্বফার্জ (Madame Defarge) সত্যই একটি ভয়াবহ চরিত্র—তীব্র বিদ্বেষের চরিত্র-চিত্রণে ডিকেন্সের একটি সার্থক প্রচেষ্টা। ত্বফার্জ এবং অন্যান্য চরিত্র "পুরোনোর ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ভূত নতুন অত্যাচারীর দল," বৈপ্লবিক বিচারশালাগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করছে "হীনতম, নিষ্ঠুরতম, জঘন্যতম জনগণ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিপ্লব-কালের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার কথা ডিকেন্স আগাগোড়া উল্লেখ করে গেছেন, আর এতে তিনি প্রচুর ভবিষ্যদ্ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। "সাক্ষ্যপ্রমাণহীন সন্দেহভিত্তিক আইন —যা স্বাধীনতা ও জীবনের নিরাপত্তার উচ্ছেদসাধন করেছে এবং সৎ ও নিরপরাধ লোককে মন্দস্বভাব ও অপরাধীর হাতে সমর্পণ করেছে; যারা অপরাধ করেনি, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়নি এমন লোকে ভর্তি কারাগার"—এই বর্ণনা আজ বেশ কয়েকটি দেশের বেলা অনেকটা নিখুঁত ভাবেই খাটে।

বিপ্লব সমর্থকরা সাধারণত এর ভয়াবহতাকে হাল্কা করে দেখান; ডিকেন্সের ঝোঁক হল তাকে অতিরঞ্জিত করার দিকে—আর ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি করেছেন। বিভীষিকার রাজত্বকে (The Reign of Terror) তিনি যেমন দেখিয়েছেন তার তুলনায় ওটা অনেক তুচ্ছ ব্যাপার। সংখ্যার উল্লেখ না করলেও তিনি এমন ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে এই উদ্দাম হত্যালীলা বছরের পর বছর ধরে চলেছিল। কিন্তু মৃতের সংখ্যা বিচারে দেখা যায় যে, সমস্ত বিভীষিকার ব্যাপারটা নেপোলিয়নের একটিমাত্র লড়াইয়ের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ—ছেলেখেলা। কিন্তু রক্তাক্ত ছোরা এবং টামরিল গাড়ির ইতস্ততঃ গতায়াত তাঁর মনে একটা বিশেষ অমঙ্গলের চিত্র এঁকে দিয়েছিল, অথচ পুরুষানুক্রমে পাঠকদের তা তিনি দান করে গেছেন। ডিকেন্সকে ধন্যবাদ, টাম্‌রিল (tumbril) শব্দটাতেই যেন হত্যার ধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে; সবাই ভুলে যায় যে টামরিল হচ্ছে খামারে ব্যবহৃত এক রকমের গাড়ি। আজও যে কোনো সাধারণ ইংরাজের কাছে ফরাসী বিপ্লবের ছিন্নমুণ্ডের পিরামিডের ছাড়া আর কোনো মানে নেই। আশ্চর্যের বিষয় যে, ডিকেন্স তাঁর কালের অধিকাংশ ইংরেজের চেয়ে বিপ্লবের আদর্শের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল হয়েও এইরূপ ধারণা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হিংসার প্রতি যদি ঘৃণা থাকে, রাজনীতিতেও যদি বিশ্বাস না করেন তবে একমাত্র প্রধান প্রতিকার অবশিষ্ট থাকে—শিক্ষা। সমাজের বেলা প্রার্থনায় হয়ত আর কাজ হবে না, কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায়—যদি কচি বয়সে তাকে ধরতে পারেন। শিশুরাই যে ডিকেন্সের মনটাকে সর্বাগ্রে অধিকার করে রেখেছিল তার জন্য এই বিশ্বাসই অংশত দায়ী।

কোনো লেখক, অন্তত ইংরেজ লেখক, শিশুদের সম্পর্কে ডিকেন্সের চেয়ে ভালো লেখেন নি। সেদিন থেকে অনেক জ্ঞানই সঞ্চিত হয়েছে, শিশুদের প্রতি আজ অপেক্ষাকৃত সুস্থ ব্যবহারও করা হচ্ছে, তবু শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি ডিকেন্সের সমান আর কারো মধ্যেই দেখা যায় না। ডেভিড কপারফিল্ড্ যখন প্রথম পড়ি তখন আমার বয়স নিশ্চয়ই নয় বছরের মতো ছিল। প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলোর মানসিক পরিমণ্ডল এমন অবিলম্বে আমার বোধগম্য হয়েছিল যে আমি অস্পষ্ট ভাবেও কল্পনা করেছিলাম যে ওগুলো কোনো শিশুরই লেখা। সাবালক অবস্থায় বইখানা যদি আবার পড়া যায় এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্ডস্টোনজকে (The Murdstones) অতিকায় কালান্তক মূর্তি থেকে ক্রমে ক্ষীণ হয়েও আধা কমিক দানবে পর্যবসিত হতে দেখা যায়, তাতেও এই রচনাংশগুলোর কিছুমাত্র হানি হবে না। ডিকেন্স শিশুমনের ভেতরে ও বাইরে এমনভাবে অবস্থিতি করছেন যে একই দৃশ্য পাঠকের বয়স অনুযায়ী অদ্ভুত মজাদার অনুকৃতি বা বিদ্বেষপূর্ণ বাস্তবে পরিণত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সেই দৃশ্যটার দিকে নজর দিন, যেখানে ডেভিড কপারফিল্ড্ মটন চপ খাচ্ছে এই অন্যায় সন্দেহ করা হচ্ছে অথবা 'গ্রেট এক্‌স্‌পেক্‌টেশানজ'-এর (Great Expectations) সেই

দৃশ্যটা দেখুন, যেখানে পিপ (Pip) মিস হ্যাভিশ্যাম-এর (Miss Havisham) বাড়ি থেকে ফিরে এল এবং যা দেখেছে তার কিছুই বলতে পারবে না বুঝে একরাশ জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিল আর সেই মিথ্যা সাগ্রহে সবাই বিশ্বাস করল। শৈশবের সমস্ত নিঃসঙ্গতা সেখানে বর্তমান। আর কী আশ্চর্য নিখুঁতভাবে ডিকেন্স লিপিবদ্ধ করেছেন শিশুমনের কল-কৌশল, তার মানস-চিত্র রচনার প্রবৃত্তি বা ঝোঁক, আর বিশেষ কতকগুলো প্রভাবের প্রতি তার সংবেদনশীলতা। পিপ বর্ণনা করছে কেমন করে তার মৃত মাতাপিতার ধারণা তাদের সমাধিফলক থেকে সে আহরণ করেছিল :

"বাবার (সমাধিফলকের) অক্ষরগুলোর আকার আমার মনে এই অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি ছিলেন চৌকো ধরণের শক্তপোক্ত কালো রঙের মানুষ, তার চুল ছিল কালো ও কোঁকড়ানো। 'ALSO GEORGIANA, WIFE OF THE ABOVE' (আর উল্লিখিত ব্যক্তির স্ত্রী জর্জিয়ানা) এই উৎকীর্ণ লিপির গড়ন ও লিখনভঙ্গি থেকে এই ছেলেমানুষী ধারণা আমার হয়েছিল যে, আমার মা ছিলেন রোগাটে আর তাঁর গায়ে ছিল ছিট্ ছিট্ দাগ।..."

অনুরূপ রচনাংশ ডেভিড কপারফিল্ড্-এও আছে। মিঃ মার্ডস্টোন-এর হাত কামড়ে দেবার পর ডেভিডকে ইস্কুলে পাঠানো হল আর পিঠে বইতে হল এই ঘোষণা-পত্র—"সাবধান, ও কামড়ায়"। সে খেলার মাঠের দরজায় তাকিয়ে দেখে ছেলেরা সেখানে নিজেদের নাম খোদাই করে রেখেছে, আর প্রত্যেক নামের চেহারা থেকে সে যেন বুঝতে পারে সেই নামধারী ছেলেটি ঠিক কোন্ সুরে ঘোষণা-পত্রটি পড়বে :

"একটি ছেলে ছিল, নাম জে. স্টিয়ারফোর্থ (J. Steerforth)। সে প্রায়ই গম্ভীর করে তার নামটি খোদাই করত, আমার মনে হত সে জোর গলায় নামটি পড়বে, তারপর আমার চুল ধরে টানবে। আরেকটি ছেলে ছিল —কে এক টমি ট্র্যাডল্স্ (Tommy Traddles)—আমার ভয় হত সে ওটা নিয়ে রঙ্গ করবে এবং আমাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে এমন ভাণ করছে। তিন নম্বর ছিল জর্জ ডেম্পল্ (George Demple—আমি কল্পনা করতাম সে ওটা নিয়ে গান গাইবে।

বালক-কালে আমি যখন এই অংশটুকু পড়েছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল যে ঐ বিশেষ নামগুলো হুবহু ঐ সব ছবিই আমার মনে জাগিয়ে তুলবে। এর কারণ অবশ্য শব্দগুলোর ধ্বনিগত অনুষঙ্গ (ডেম্পল্—টেম্পল্ : Demple-"Temple"; ট্র্যাডল্স্—সম্ভবত "ফিড্ড্যাডল্স্" : Traddles-Probably "Seedaddles")। কিন্তু ডিকেন্সের আগে ক'জন-ই বা এসব বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন? ছোটদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব আজকের তুলনায় ডিকেন্সের কালে নিতান্ত বিরল ছিল। নাবালক হবার পক্ষে ঊনবিংশ-শতকের প্রথম ভাগটাকে সু-সময় বলা চলে না। ডিকেন্সের যৌবন-কালেও অপরাধের জন্য আদালতে বিধিসম্মতভাবে ছোটদের বিচার চলছিল, সবাই যাতে দেখতে পায় এমন ক'রে সেখানে তাদের ধরে রাখা হত; আর সামান্য চুরির জন্য তের বছরের ছেলেদের যে ফাঁসি দেওয়া সে তো বেশী দিনের কথা নয়। "ছেলের তেজ মেরে দেবার" মতবাদটা জোর চলছিল, আর 'দ্য ফেয়ারচাইল্ড্ ফ্যামিলি' (The Fairchild Family) শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ছেলেদের মান-সই বই ছিল। এই ক্ষতিকর বইয়ের ছাটকাট করা শোভন সংস্করণ এখন বের হয় কিন্তু মূল বইটা পড়াই ফলদায়ক। পড়লে কতকটা ধারণা হয় শিশুদের শাসন-শৃঙ্খলা কতদূর পর্যন্ত গড়াত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঝগড়ার মাঝে ছেলেদের যখন ধরতেন তখন ফেয়ারচাইল্ড্ আচ্ছা করে তাদের ঠেঙাতেন, আর বেতমারার ফাঁকে ফাঁকে ডঃ ওয়াটস্-এর (Doctor Watts) ছড়া আওড়াতেন—কুত্তাগুলো চেঁচিয়ে

আর কামড়ে আনন্দ পাক ; তারপর বিকেলটা কাটাবার জন্তে তাদের ধরে নিয়ে যেতেন ফাঁসিকাঠের তলায় যাতে খুনেদের গলিত শব ঝুলত। হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে (কখনো মাত্র ছ'বছরের) খনিতে বা কাপড়কলে খাটিয়ে সত্যি মেরে ফেলা হত। আর সেখিন পাবলিক ইস্কুলগুলোতেও ছেলে-দের বেতমারা হত যতক্ষণ না তারা ল্যাটিন পদ্যে একটি মাত্র ভুল করার জন্ত রক্তাক্ত দেহে ছুটে পালাত। একটা বিষয় তাঁর সম-সাময়িকরা না বুঝলেও ডিকেন্স নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। সেটা হল, ঐ বেত-মারার মধ্যে ধর্ষ-কামের উপাদান বর্তমান। আমার মনে হয় ডেভিড কপারফিল্ড্ ও নিকোলাস নিক্‌লবি (Nicholas Nickleby) থেকে তা অনুমান করা যায়। কিন্তু শিশুর প্রতি দৈহিক নিষ্ঠুরতার ন্যায় মানসিক নিষ্ঠুরতাও তাঁকে সমান ক্ষিপ্ত করে তুলত। আর বেশ কতকগুলি ব্যতিক্রম থাকলেও ইস্কুল-মাস্টাররা সাধারণত বদলোক ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় পাবলিক ইস্কুল বাদে ইংলণ্ডে সেদিন যত রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সবই ডিকেন্সের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। 'ডক্টর ব্লিম্বারস্ এ্যাকাডেমিতে' (Doctor Blimber's Academy) ছোট ছেলেদের মগজে ফেটে না পড়া পর্যন্ত গ্রীক ঠাসা হত আর সেকালের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে যে-সব ছাত্র তৈরি হত তাদের নমুনা হল নোয়া ক্লেপোল (Noah Claypole) ও য়ুরিয়া হীপ (Uria Heep)। আর ছিল সালেম হাউস (Salem House), ডোথবয়জ হল (Dotheboys Hall) এবং মহিলা-পরিচালিত ছোট প্রাথমিক বিদ্যালয়। চালাতেন (Mr. Wopsle) মিঃ ওয়প্‌সল্-এর বড়ো পিসি। ডিকেন্স যা বলেছেন তার খানিকটা আজও সত্য। সালেম হাউস আধুনিক 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' ("Prep. School") পূর্বপুরুষ, সালেম হাউসের সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে। আর মিঃ ওয়প্‌সল্ এর বড়ো পিসি সম্বন্ধে বলা যায় যে ঐ একই রকমের পুরোনো জোচ্চুরি কিছুটা আজও ইংলণ্ডের প্রায় প্রতিটি ছোট শহরে চলছে। কিন্তু সাধারণত ডিকেন্সের সমালোচনা না স্থলনমুখী না ধ্বংসাত্মক। গ্রীক শব্দকোষ ও বেতের ওপর যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত তার নির্বুদ্ধিতা তিনি দেখতে পেয়েছেন ; অপর পক্ষে ১৮৫০/'৬০-এ যে নতুন ধরণের ইস্কুল অর্থাৎ "আধুনিক" ইস্কুল গজাচ্ছে তার কোনো সার্থকতা বা প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। তথ্য দিয়ে মগজ ভর্তি করানোর ওপরই এই ইস্কুলের না-ছোড় জেদ। তবে তিনি কী চান ? মনে হয়, চিরদিন যা চেয়ে এসেছেন সেই বর্তমান চলতি ইস্কুলেরই নীতিসিদ্ধ রকম-ফের—অর্থাৎ সেই পুরোনো ধাঁচের ইস্কুলই তিনি চান ; কিন্তু এতে থাকবে না বেতমারা, শাসানি বা আধপেটা খাওয়ানো, এবং গ্রীক ভাষার অতটা বাড়াবাড়ি। মার্ডস্টোন এ্যাণ্ড গ্রিনবি থেকে পালিয়ে ডেভিড কপারফিল্ড্ গেল ডক্টর ষ্ট্রঙ্-এর ইস্কুলে। ওটা নিছক সালেম হাউস (Salem House), তবে তার দোষগুলো ঝেড়ে ফেলা হয়েছে, আর তাতে আমদানি করা হয়েছে পুরোনো পাথুরে আবহাওয়া '(Gold grey stones' atmosphere) :

ডক্টর ষ্ট্রঙ্-এর ইস্কুলটি চমৎকার, ভালো ও মন্দর যতটা তফাৎ মিঃ ক্রীকল-এর ইস্কুল এবং এটার মধ্যে ততটা পার্থক্য। ইস্কুলটা বেশ সংযত সুন্দরভাবে সাজানো-গুছোনো, আর সুস্থ পদ্ধতিতে পরিচালিত, সকল ব্যাপারে ছাত্রদের মর্যাদা ও সবল বিশ্বাসের প্রতি এর একটা আবেদন আছে··· তার ফল হয়েছে অত্যাশ্চর্য। আমরা সবাই অনুভব করতাম ভবনটির ব্যবস্থাপনায় এবং মান-মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষায় আমাদের একটা অংশ আছে। কাজেই অচিরে আমরা এই ইস্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। —আমার কথা তো নিশ্চয় করেই বলতে পারি, আর আমি যতদিন ছাত্র ছিলাম ততদিন একটি ছেলের কথাও জানতে পাইনি, যার বেলা এর অন্যথা হয়েছিল। আর এই প্রতিষ্ঠানটির সুনাম রক্ষার জন্ত

আমরা এখানে সাগ্রহে লেখাপড়া শিখতাম। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে আমরা উঁচুদরের খেলাধুলা এবং প্রচুর স্বাধীনতা উপভোগ করতে পেতাম, তৎসত্ত্বেও, যতটা মনে পড়ে, শহরে সবাই আমাদের ভালোই বলত। আমরাও আচারে-ব্যবহারে, চাল-চলনে, ডঃ ষ্ট্রঙ্-এর এবং তাঁর ছাত্রদের সুনাম নষ্ট হবার মতো প্রায় কিছুই করিনি।

উদ্ধৃতাংশের আবছা-ভাবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, শিক্ষানীতি সম্বন্ধে ডিকেন্সের কোনো ধারণা ছিল না। তিনি ভালো ইস্কুলের নৈতিক আবহাওয়ার কল্পনামাত্র করতে পারতেন কিন্তু তার বাইরে আর কিছুই পারতেন না। ছেলেরা 'স্বেচ্ছায় লেখাপড়া শিখত' কিন্তু কী শিখত? নিঃসন্দেহে শিক্ষনীয় ছিল ডঃ ব্লিম্বার-এরই পাঠক্রম, তার একটু হাল্‌কা ধরনের। ডিকেন্সের উপন্যাসে সর্বত্রই সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিবেচনা করলে মনে খটকা লাগে যখন জানা যায় যে তিনি তাঁর বড়ো ছেলেকে ইটন-এ (Eton) পাঠিয়েছিলেন এবং সব ছেলেকেই সাধারণ শিক্ষা-কারখানার সামিল করেছিলেন। ডিকেন্স নিজে স্বল্প-শিক্ষিত ছিলেন, এই বেদনা-বোধ থেকেই তিনি হয়ত এব্যবস্থা করেছিলেন। গিসিং (Gissing) যেন তাই মনে করেন। এবিষয়ে গিসিং হয়ত তাঁর নিজের ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার প্রতি অনুরাগ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিধিবদ্ধ শিক্ষা ডিকেন্সের সামান্যই ছিল, অথবা আদৌ ছিল না। কিন্তু ছিলনা বলে তাঁর কিছুই ক্ষতি হয়নি। আর মোটের ওপর এবিষয়ে তিনি বেশ সজাগ ছিলেন বলেই মনে হয়। ডঃ ষ্ট্রঙ্-এর ইস্কুলের চেয়ে অথবা বাস্তব জীবনে ইটন-এর চেয়ে ভালো ইস্কুলের কল্পনা যদি তিনি না-ই করতে পেরে থাকেন, তবে তার কারণ সম্ভবত ডিকেন্সের বুদ্ধির দৈন্য, আর সে দৈন্য গিসিং যা বলতে চান তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

(ক্রমশঃ)

অনিল রায়ের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০

(তৃতীয় সংস্করণ)

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

In any language, it's sweet

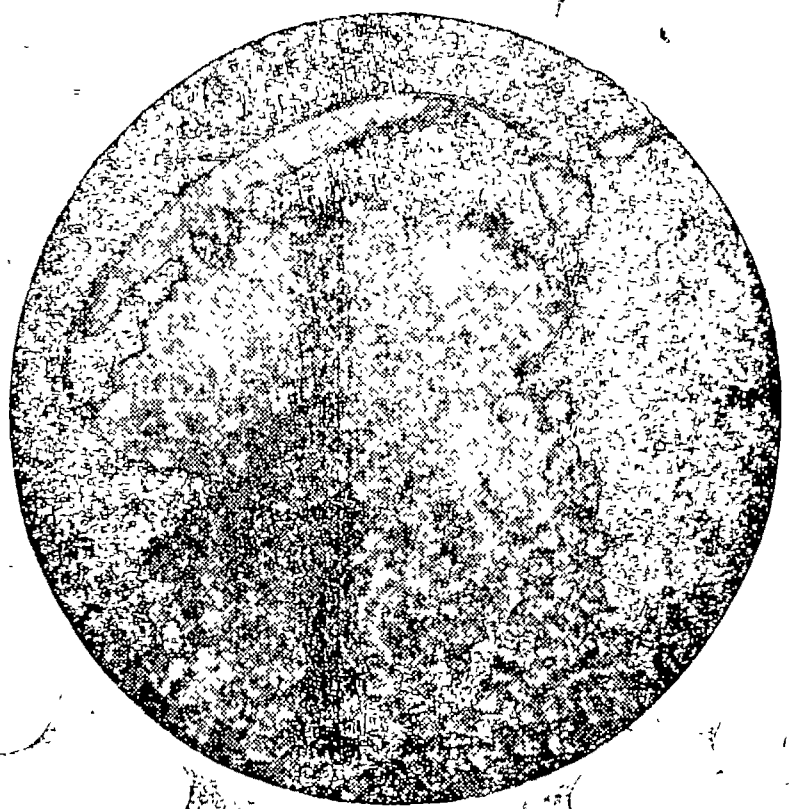

In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek.

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

মানুষের চন্দ্রাভিযান

শঙ্কর

কত অমাবস্যায়, কত পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের চাঁদের দিকে কত হাজার বছর ধরেই না মানুষ অনন্ত বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছে, চাঁদের নানারূপ নিয়ে কত কল্পকাহিনীই না রচনা করেছে। কিন্তু এই কল্পলোকের চাঁদে মানুষ কোনদিন সত্যি সত্যি সশরীরে যে হাজির হবে, সেখান থেকে মাটি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে আসবে তা পৃথিবীর মানুষের ভাবনার অতীত ছিল। মাত্র ১২ বছর আগে মহাকাশ যুগ সুরু হয়েছিল। এই এক যুগের মধ্যেই মানুষ গ্রহান্তরে উপস্থিত হয়েছে। এই অসাধ্যসাধন করে গত ২১শে জুলাই ১৯৬৯ সালে দুজন মার্কিন মহাকাশযাত্রী চন্দ্রলোকে পদার্পণ করেছেন। আর তাঁরা যে উপলখণ্ড ও মাটি চাঁদ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন তা হয়তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্যের নূতন দিগন্তের সন্ধান দেবে।

এই দুইজন মহাকাশযাত্রী ছোট একটি মহাকাশযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছেন। তার নাম 'ঈগল'। ২১ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ চন্দ্রপৃষ্ঠে অতিবাহিত করে মূল অ্যাপোলো ১১ নামে যে মহাকাশযানে ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে যাত্রা করে তাঁরা চন্দ্রলোকে পৌঁচেছেন, সেই যানেই আবার উঠে গিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। এই মূল যানটির নাম 'কলাম্বিয়া', যাতায়াতে লেগেছে আটদিন। নীল এ আর্মষ্ট্রং. এডুইন ই অ্যালড্রিন তাদের 'ঈগল'-এ চেপে চাঁদের বুকে নেমে সেখানে প্রায় ২২ ঘণ্টা কাটিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। আর মাইকেল কলিন্স অ্যাপোলো ১১ মহাকাশযানটি—'কলাম্বিয়া'—চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। যে কয় ঘণ্টা 'ঈগল' চাঁদের বুকে নেমে 'কলাম্বিয়া' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, কলিন্স সে-সময় চাঁদের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরেছেন।

২১শে জুলাই ভারতীয় সময় ভোর রাত্রি ১টা ৪৮ মিনিটে 'ঈগল' নামক ভেলায় আরোহণ করে মূল মহাকাশ-যান 'কলাম্বিয়া' থেকে নীল আর্মষ্ট্রং ও এডউইন ই আলড্রিন চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করলেন এবং সেদিন রাত্রি ১১টা ২৩ মিনিটে 'ঈগল-এ' চেপে 'কলাম্বিয়া'র সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চাঁদের বুক থেকে রওয়ানা হন। মাঝখানে ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ২৬ মিঃ-এ সেই মুহূর্ত উপস্থিত হল, যে মুহূর্তে পৃথিবীর মানুষ প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে তার পদচিহ্ন এঁকে দিল। আর্মষ্ট্রং চাঁদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে একাকী কুড়ি মিনিট বিচরণের পর সহযাত্রী অ্যালড্রিন ভেলা থেকে নেমে এলেন। চাঁদের মাটিতে নেমেই আর্মষ্ট্রং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত মানুষের উদ্দেশ্যে বললেন: "One small step for man, one giant leap for mankind."

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বিগত ১৬ই জুলাই বিরাটকায় স্যাটার্ন পাঁচ রকেটের সাহায্যে অ্যাপোলো ১১-র তিনজন নভোচারীর অনন্তশূন্যের পথে চন্দ্রাভিমুখী অভিযান শুরু হয়েছিল। দু লক্ষ মাইলের বেশী পথ পাড়ি দিয়ে চাঁদের কাছাকাছি এসে তাঁরা পৌঁছে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের উপযোগী অ্যাপোলো ১১র সঙ্গে আর একটি ছোট

যান ঈগল-এর সাহায্যেই চন্দ্রের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ রত অ্যাপোলো ১১ থেকে মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে নামা ওঠা করবেন, এই ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পূর্বে আর্মষ্ট্রং ১৫ ঘণ্টা বিশ্রাম নেবেন এবং তার জন্য তৈরী হবেন। এই পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে তিনিই প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের জন্য চিহ্নিত হয়েছিলেন। আর্মষ্ট্রং এর পদার্পণের কিছুক্ষণ পরেই অ্যালড্রিনও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। চন্দ্রলোকে তারা হবেন সবচেয়ে নিঃসঙ্গ। তাহলেও তাদের কথা যত মানুষ শুনেছে, টেলিভিশনের পর্দায় তাদের দেখেছে—এত অধিক সংখ্যক মানুষ আর কোন দিন কাউকে দেখেনি বা তাদের কথা শোনেনি। তাদের মুখোসে লাগানো ছিল মাইক্রোফোন। তাদের পিঠেও চন্দ্রযানে বেতার বার্তা প্রচারের যে যন্ত্রপাতি ছিল তাদের সঙ্গে এই মাইক্রোফোনের যোগ ছিল। ফলে তারা যা কিছু বলেছেন বা কিছু করেছেন তা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে এবং চন্দ্রযানে যে টেলিভিশন ক্যামেরাটি ছিল তার সাহায্যে চাঁদে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ছবি তোলা হতে থাকলো, তেমনি তা পৃথিবীতেও চলে এলে, যাতে পৃথিবীর মানুষও তা দেখতে পায়। এছাড়া চাঁদের বাতাস না থাকার জন্য সূর্য থেকে যে সকল কণিকা চন্দ্রপৃষ্ঠে এসে পড়ছে তাদের ধরবার একটি যন্ত্র, চাঁদে ভূকম্প সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের ফল এবং দূরত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র লেসার মিররও সঙ্গে ছিল। এসকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান লাভ হচ্ছে উপরি পাওনা। মানুষ যে গ্রহান্তরে যেতে পারে, অন্য গ্রহে হেঁটে বেড়াতে পারে এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে তা প্রমাণ করাই হচ্ছে এই পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য।

এপোলো-১১ উৎক্ষেপণের ১২ মিনিটের মধ্যে মহাকাশ-যানটি ঘণ্টায় ১৭,৪২৭ মাইল বেগে পৃথিবীর ১১৯ মাইল বৃত্তাকার কক্ষে স্থাপিত হয় এবং উৎক্ষেপণের আড়াই ঘণ্টার মধ্যে চন্দ্রাভিমুখে রওয়ানা হবার নির্দেশ পায় ('tanslunar insertion')। সে-সময় এপোলোর গতিবেগ ঘণ্টায় ২৪,২৪৫ মাইল, যা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বন্ধন ছিন্ন করে চাঁদের দিকে ধাবিত হতে সাহায্য করবে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠবার সময় একটি গাড়ীর গতিবেগ যেমন হ্রাস পায়, তেমনি মহাকাশযানটি যতই চাঁদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে তার গতিবেগ হ্রাস পেতে থাকলো। তারপর এমন স্থানে এসে মহাকাশযানটি পৌঁছাল যেখানে চাঁদের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর আকর্ষণ সমান। এই সীমারেখা অতিক্রান্ত হবার পর চাঁদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলো এবং সেই সঙ্গে মহাকাশযানের গতিবেগও। এ-যেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অবরোহণের পালা শুরু হল। শনিবার ১৯শে জুলাই চাঁদের কক্ষে এপোলো প্রবেশ করলো চাঁদের ৭০ মাইল উর্ধে।

আট বছর আগে, ১৯৬১ সালের মে মাসে পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই দশকের মধ্যেই যাতে চন্দ্রলোকে মানুষ পদার্পণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য, এবং এই লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য আমেরিকার কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন। কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য যে পরিমাণ ধন-জন উপকরণ সংগ্রহ ও কাজে লাগাতে হয়েছে সামরিক ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই তা করতে হয়নি। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, পরিচালক, শ্রমিক ও করণিক, চার লাখেরও বেশী লোক এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য খেটেছে। আর অ্যাপোলো ১১ মহাকাশযান ও স্যাটা ৫ রকেটটিতে ত্রিশ লাখের ও বেশী যন্ত্রাংশ রয়েছে। ঐ সকল যন্ত্রপাতির কাজকর্ম শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হলেই চাঁদে পদার্পণ সম্ভব। "কিন্তু পদার্থ বিদ্যায় নোবেল

পুরস্কারপ্রাপ্ত স্টানফোর্ড ফেলিক্স ব্লক এই অভিযান মূল্যায়ন করে বলেছেন: "Progress in Science cannot be measured in dollars. The benefits of the expedition are so likely to surpass any thing we can expect that the cost will seem a trifle once the resultso ome in".

গত আড়াই হাজার বছর ধরে মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় যা কিছু উদ্ভাবিত হয়েছে এই বিরাট পরিকল্পনার রূপায়নে তার সকল কিছুই কাজে লেগেছে। মার্কিন মহাকাশ পরিকল্পনা রচয়িতারা এজন্য নূতন নূতন সাজ সরঞ্জামও তৈরী করেছেন।

এই পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ সফলতার জন্য ২৪,০০০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। এই বিপুল ব্যয়ের যাথার্থ নিয়ে খাস মার্কিন দেশে মতবিরোধ রয়েছে এবং এদের মধ্যে আমেরিকার কৃষ্ণকায়দের সংখ্যাই বেশী। এদেরই একজন বলছেন: "There is poverty all over the place and yet we spend millions of dollars for going to the moon. Let's take care of the. U. S. before the moon."

মহাকাশ যুগ আরম্ভ হবার ১১ বছর ৯ মাস ১৬ দিন পর এই ঐতিহাসিক চন্দ্রাবতরণ অনুষ্ঠিত হল। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত রুশ স্পুটনিক-১ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করলে এই যুগ সুরু হয় এবং ১৯৬১র ১২ই এপ্রিল ইউরী গ্যাগারীন সর্বপ্রথম পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করে প্রথম মহাকাশচারীর গৌরব অর্জন করেন।

তবে এই পরিকল্পনার রচয়িতারা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছেন। ১৯৬১ সালে মহাকাশচারীরা মহাকাশ পর্যন্ত গিয়ে, সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। এ পর্যন্ত এপোলো-১১র মহাকাশচারীরা এবং এপোলো ৮ ও ১০ এর মহাকাশচারীরা ছাড়া পৃথিবীর ১০,০০০ মাইলের পরিধি অতিক্রম করে কেউ যান নাই। ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে গৃহীত হয় মার্কারী পরিকল্পনা। ঐ সময়ে একজন-যাত্রীবাহী ছোট মহাকাশযানে পৃথিবী থেকে চার বার যাত্রা করে অপেক্ষাকৃত অতি অল্পসময়ের জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে পৃথিবী পরিক্রমার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে ২০ মাসের মধ্যে দুজনযাত্রীবাহী জেমিনি মহাকাশযানে মহাকাশচারীরা দশবার মহাকাশ সফর করেন। এরই মধ্যে একবার মহাকাশচারীদ্বয় প্রায় দু সপ্তাহ মহাকাশে কাটিয়েছেন।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী যাত্রীবিহীন মহাকাশযানও মহাশূন্যে ছেড়েছেন। ঐ সময়ে ঐ ধরণের ২১টি যান চন্দ্রাভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এদের কতক গিয়েছে চাঁদে, কতক তার আশে পাশে। এদের মধ্যে ১৩টি মহাকাশযান চাঁদের খুব কাছে যেমন চাঁদের কক্ষপথ বা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। চন্দ্রপৃষ্ঠের এই সকল আলোকচিত্রের সংখ্যা এক লাখেরও বেশী। রেঞ্জার, সার্ভেয়ার, অরবিটার প্রভৃতি যাত্রীবিহীন মহাকাশযান থেকে এই সকল চিত্র পাওয়া গিয়েছে। এই সকল চিত্রের সাহায্যে চন্দ্র পৃষ্ঠের নিখুঁত মানচিত্র রচনা সম্ভব হয়েছে।

চন্দ্রাভিযানের জন্য অ্যাপোলো জাতীয় যে সকল মহাকাশযান নির্মিত হয়েছে ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অ্যাপোলো ৭ নামে তিনজন যাত্রীবাহী যানটিকে পৃথিবীর কক্ষ পথে প্রেরণ করা হয়। এগার দিন মহাকাশ সফর করে মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন। যাত্রীবাহী এই অ্যাপোলো ৭ নামে মহাকাশযানটি মহাকাশে প্রেরণের আগে যাত্রীবিহীন ঐ জাতীয় আরও ৬টি মহাকাশযান মহাকাশে প্রেরণ করে এর খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।

এর পরেই ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম চন্দ্রাভিযান শুরু হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠের ৭০ মাইল উর্ধ্বে থেকে অ্যাপোলো ৮ মহাকাশযানেয় তিন জন চাঁদের কক্ষ পথে থেকে দশবার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। আর ১৯৬৯ সালের গত মার্চ মাসে সম্পন্ন হয় চন্দ্রে পদার্পণের মহড়া। সে মহড়ায় ছিল একটি ক্ষুদ্র ও আর একটি বৃহৎ মহাকাশযানের পৃথিবীর কক্ষপথে মিলনের ব্যবস্থা। মহাকাশচারীরা দশ দিনের এই মহাকাশ সফরে দুটি মহাকাশযানের মিলন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কারণ চাঁদে ছোট মহাকাশযানের সাহায্যেই মহাকাশচারীরা পদার্পণ করবেন। যে বৃহৎ অ্যাপোলোযানের সাহায্যে তারা চন্দ্রলোকে গিয়ে উপস্থিত হবেন সেটি চাঁদের কক্ষপথে থেকে চাঁদকে পরিক্রমা করতে থাকবে। তার সঙ্গেই থাকবে ছোট যানটি। সেটিকে পৃথক করে নিয়ে তারই সাহায্যে তারা চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণ করবেন—পুনরায় ঐ ক্ষুদ্রযানে করেই তারা মূলযানে ফিরে আসবেন—এই ছিল পরিকল্পনা।

অ্যাপোলো ১০ মহাকাশযানের যাত্রীরা গত মে মাসে ১৯৬৯ এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেন। ঐ যানের যাত্রীরা চন্দ্রের কক্ষপথে থেকে ৩০ বার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন এবং দুজন যাত্রী মূল অ্যাপোলো ১০ যান থেকে ছোটযানে চন্দ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি নেমে আসেন। এই দুজন যাত্রী চন্দ্রপৃষ্ঠের ৯ মাইল উঁচুতে থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে আবার মূল যানে ফিরে যান। তারপর তিনজনে মিলে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

এবার চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণের, চন্দ্রে পদার্পণের পালা ছিল। এই হচ্ছে অ্যাপোলো পরিকল্পনার চরম পর্যায়। এ পর্যন্ত এই বিরাট পরিকল্পনা রূপায়নের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, যে সকল সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে তাতে কি মানুষের নিরাপদে চন্দ্রে অবতরণ এবং চন্দ্রলোক থেকে ফিরে আসা সম্ভব হবে? এপোলো ১১ এই সংশয়ের সমাধান দিয়েছে।

এই পরিকল্পনা যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তারই জন্য টেক্সাসের হিউসটনের মনুষ্যবাহী মহাকাশযান কেন্দ্রে যে ৫২ জন মহাকাশচারীকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে থেকেই তিনজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অ্যাপোলো ১১ মহাকাশযানের এই তিনজন যাত্রীর মধ্যে দুজনকে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিনজন মহাকাশচারীই বিবাহিত ও প্রত্যেকটির ছেলে মেয়ে আছে এবং এরা সকলেই খ্যাতনামা বৈমানিক, মহাকাশ সফরের অভিজ্ঞতা ও এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে। এর মধ্যেই রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর।

মানুষ যে দিন পৃথিবীতে এসেছে সেদিন থেকেই তার মনে যে অভীপ্সা অঙ্কুরিত হয়েছিল তাই এযুগে সত্যে পরিণত হোলো। এছিল তার স্বপ্নাতীত। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাস। চারটি সরু পায়ার উপর ভর করে মহাকাশ যানটি ধীরে ধীরে নামছে চন্দ্রপৃষ্ঠে। পৃথিবীর যে দুজন মানুষ মহাকাশযানটির অভ্যন্তরে রয়েছেন তারা এইবার বের হয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

প্রথমতঃ নামার পরেই নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হওয়াও তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সময় যানটির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের একমাত্র বাহন এই যানটিই। তাই যানটির সমস্ত যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন। চাঁদে তারা থাকবেন যতটুকু সময়, ততক্ষণ এই যানটিই তাদের কালকর্মের ঘাঁটি ও আশ্রয়।

তাদের এই অভিযানের পরিকল্পনা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরি হয়েছে। পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে তাদের মেনে চলতে হয়েছে। তাই খাওয়াদাওয়া শেষ করে পুরো আট ঘণ্টা তারা ঘুমিয়ে নিলেন। ফলে, তাদের সামনে যে

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট সঙ্কুল কাজকর্ম ছিল সেসব সম্পাদনের পক্ষে তারা বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। ছোটযান থেকে চাঁদে নামা এবং চাঁদের বুকে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজকর্ম সেরে সেই ছোটযানে ফিরে আশার মহড়া বহুবার হাউসটন মহাকাশযান কেন্দ্রে এই মহাকাশচারীরা ইতিপূর্বে দিয়ে তৈরী হয়েছেন।

গবাক্ষ পথে সামান্য দৃষ্টি দিতেই চোখের সামনে তাদের প্রায় এক অপার্থিব দৃশ্য ফুটে উঠল। অন্য এক জগতের নির্জন মহিমা তাদের সামনে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে অদূরবর্তী দিগন্তে, গহ্বর সমন্বিত, উপলখণ্ড বিক্ষিপ্ত এক মরুভূমি। এখানকার প্রকৃতি মহাজাগতিক রশ্মিসঞ্জাত আলোড়ন ছাড়া অন্য কোন স্পর্শ লাভ করেনি। মহাকাশে ইতস্ততঃ ধাবমান পদার্থের বিকট সংঘর্ষের ফলেই গহ্বরগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এইখানে এই "শান্তির সমুদ্রে" (Sea of Tranquility) শুধু ছোট ছোট গহ্বরই আছে। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অপেক্ষাকৃত মসৃণ সমতল। তাই এই শুষ্ক স্থানটি চাঁদে প্রথম অবতরণের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এপোলো ১২ নামবে ঝড়ের সমুদ্রে (Sea of Storm).

এইবার মহাকাশচারীদ্বয় মহাকাশের উপযোগী বিরাট পোষাক পরে নিলেন। যানটি থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার চূড়ান্ত নির্দেশ আসবে পৃথিবীস্থিত এই অভিযানের প্রধান কর্মকর্তার কাছ থেকে। তারই প্রতীক্ষায় তাঁরা রয়েছেন।

উপরের দিগন্তে এখন দেখা যাচ্ছে মূল মহাকাশযানটি। ৭০ মাইল উঁচু দিয়ে সেটি এখন চন্দ্রের কক্ষপথে পরিক্রমা করছে। পৃথিবীস্থিত কেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার বাহন হল এই অ্যাপোলো ১১ মূল মহাকাশযানটি। অবশ্য অভিযাত্রী দুজন এখন চাঁদে অবস্থিত যানটি থেকেও সরাসরি পৃথিবীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে পারেন।

অভিযাত্রীরা মূল মহাকাশযানের সহকর্মীর সঙ্গে কথা বললেন। আবার তাদের পৃথিবীস্থিত কেন্দ্রের সংযোগ রক্ষাকারী দলের সঙ্গেও বার্তা বিনিময় হল। নির্দেশ এল "যাও"।

এইবার এল সেই শুভলগ্ন। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যে কল্পনা করে এসেছে তা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলল।

ধীরে ধীরে অভিযাত্রীরা তাদের যানটির দরজা খুলল।

বিরাট পোশাকের জন্য মন্থরগতি, অভিযাত্রী আর্মষ্ট্রং ছোট্ট দরজা দিয়ে বের হয়ে একটি সরু মঞ্চের উপর প্রথমে একটি পা ও পরে অন্য পা রাখলেন। সরু মঞ্চটির নাম দেওয়া হয়েছে পর্চ। এই পর্চের উপর থেকেই এক ক্ষণ মুহূর্তে তার নীচের এই সত্যিকার অপার্থিব দৃশ্য সে পর্যবেক্ষণ করল। সেখান থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি সরু মই লাগানো রয়েছে। সেই মইটির প্রথম ধাপে সে পা রাখল।

তারপর সেই অচিন দেশে অভিযাত্রীটি নামতে লাগল, তার মোটা জুতো চন্দ্রতল স্পর্শ করল। আরেকটি পা নামানোর পর পৃথিবীর প্রথম মানুষ চাঁদের বুকে এসে দাঁড়াল।

উপরের খোলা দরজায় তার আর একজন সঙ্গী। সে ঘুরে তার দিকে চাইল। তারপর দুজনেই উপর দিকে তাকাল। কুড়ি মিনিট পর অ্যালড্রিন নেমে এসে আর্মষ্ট্রং-এর সঙ্গে যোগ দিল।

সে কি অপূর্ব দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখবার মত, আর সেই মুহূর্তটিও স্মরণীয়।

বিরাট সূর্যমণ্ডল একেবারে কোণাকুণি রয়েছে। সূর্যের অস্বস্তিকর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়ছে চন্দ্রমণ্ডলে। নভোমণ্ডলে সূর্যের এই রকম অবস্থিতির সঙ্গে তাল রেখেই চাঁদে নামার সময়টি ইচ্ছাকৃতভাবে স্থির করা হয়েছে। এইভাবে সূর্যের ছায়া সুস্পষ্টভাবে পড়বে চাঁদের উপর। তাতেই অভিযাত্রীরা পাহাড়-পর্বত বিপদসঙ্কুল গহ্বর আর

সম্ভাব্য সমস্ত বাধা স্পষ্ট দেখতে পাবে, আর নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে পারে।

এইবার অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং প্রথম পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু সে ইতস্তত: করছে। চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটা যে পৃথিবীতে হাঁটার মত নয়। কারণ চন্দ্রের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের ছয় ভাগের একভাগ মাত্র। অভিযাত্রীর মহাকাশঅভিযানের পোশাকের ওজনই ৫৪ পাউণ্ড আর তার পিঠে যে অক্সিজেনের আধারটি আছে তার ওজন ১২০ পাউণ্ড। কিন্তু এই চাঁদে গিয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর মাত্র ৫৫ পাউণ্ডের মত। সুতরাং সেখানে সাধারণভাবে হাঁটতে গেলে সে পড়ে যেতে পারে। পৃথিবীতেই এবিষয়ে তারা সুদীর্ঘকাল শিক্ষা লাভ করেছে।

এ সমস্যার মুখোমুখি হবার জন্যও সে তৈরি। তাই চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ ঠিক পদক্ষেপ নয়। অভিযাত্রী প্রথমে একটি লাফ দিল, তারপর আর একটি আবার আর একটি। এইভাবে ছোট এক একটি লাফ দিয়ে সে এগোতে লাগল।

এবার পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য উপলখণ্ড সংগ্রহ করল। এতে তার সহকর্মী অ্যালড্রিন ও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। এবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য তারা দুজনে যন্ত্রপাতি স্থাপন করল। তারা স্থির ও চলচ্চিত্র তুলল, একটি টেলিভিসন ক্যামেরাও চালু করল। এই ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীর বহু মানুষ তাদের এই অভাবিতপূর্ব অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছে। তারা যা দেখছে তাবৎ মানুষকেই সেই সব দেখতে দেওয়া হয়েছে। তারা যা জ্ঞানলাভ করবে সমস্ত মানুষকেই তা জানানো হবে।

পরে আরও অভিযান হবে এবং অন্যান্য মানুষও চাঁদে গিয়ে নামবে। এই সব পরবর্তী অভিযাত্রীরা দীর্ঘতর সময় চাঁদে কাটাবে। আরও বেশী উপলখণ্ড সংগ্রহ করবে, আরও ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাবে, আর চাঁদের আরও বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়ে দেখবে।

পরবর্তী মানুষ চাঁদ সম্পর্কে আরও কৃতিত্ব অর্জন করবে। কিন্তু তাদের সমস্ত কীর্তির প্রারম্ভে থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসে এ্যাপোলো ১১ এর অভিযাত্রীদের এই অনন্য সম্মান—যে প্রথম তারাই চাঁদে নেমেছিল।

এপোলো ১১-র তিন বীর মহাকাশচারী ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ৯ ৫০ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরে নির্দিষ্ট অবতরণ স্থানের মাত্র ৪০০ কিলোমিটার দূরে নিরাপদে নেমে এসে তাদের আট দিনের ঐতিহাসিক অভিযান সম্পন্ন করেন।

এই বিস্ময়কর অভিযান মানবমনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে কিনা সেটাই অনেকের কাছে জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে দেখা দিয়েছে। কেউ বলছেন এই ঘটনা চলমান ইতিহাসে প্রক্ষিপ্তমাত্র; কারো কাছে হাজার বছরের মধ্যে মানুষের বিস্মৃতির অতলে যা তলিয়ে যাবে না, এই চন্দ্রাভিযান তার অন্যতম। কেউ মনে করেন এই অভিযান মানুষকে তার অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করাবে। তাকে আরও বিনয়নম্র হোতে সহায়তা করবে: "It will teach us to be humble. The earth is a small body a tiny thing lost in a vast universe." এ কথা বলেছেন বিখ্যাত জৈবরাসায়নিক আইজাক এসিমভ। কিন্তু বিজ্ঞানের এই নূতন দিগন্তের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মানুষকে মনীষী এইচ, জি, ওয়েলস-এর ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করিয়ে দেবে বিজ্ঞানের সীমান্ত আরও দূরে, বহুদূরে, চরৈবেতি, চরৈবেতি। ওয়েলস্ তাই বলেছেন দেশকালের সকল বিস্ময় মানুষের কাছে অনাবৃত হলেও তাকে আবার সুরু করতে হবে: "When man has conquered all the depths of space and the mysteries of time, then will he be but still beginning."

অনন্তের অভিসারী মানুষ সবেমাত্র চাঁদে পৌঁছালো, প্রকৃতির অজস্র বিস্ময় এখনো তার কাছে অনাবৃত!

নীল এ আর্মস্ট্রং

মহাকাশচারী নীল এ আর্মস্ট্রং এর উপরের চন্দ্রলোকগামী অ্যাপোলো ১১ মহাকাশযান পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ছিল।

মিঃ ও মিসেস ষ্টিফেন আর্মস্ট্রং এর পুত্র নীল এ আর্মস্ট্রং ১৯৩০ সালের ৫ই আগস্ট ওহায়োর ওয়াপাকোনেটাতে জন্মগ্রহণ করেন। ওহায়োর ওয়াপাকোনেটার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন এবং ১৯৫৫ সালে পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যারোনোটিক্যাল ইনজিনিয়ারিং এ বি এস সি উপাধি লাভ করেন।

ক্যালিফোর্ণিয়ার পাসাডেনার মিসেস লুই শীরন্ এর কন্যা ইলিনয়ের ইভান্‌স্টনের প্রাক্তন জেনেট শীরনের সঙ্গে মিঃ আর্মস্ট্রং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। আর্মস্ট্রং দম্পতির দুটি সন্তান এরিক (জন্ম ১৯৫৭, ৩০শে জুন) ও মার্ক (১৯৬৩, ৮ই এপ্রিল)।

আর্মস্ট্রং ইনস্ট্রীট্যুট অব এরোস্পেস সায়েন্সের অকুটেভ শ্যানুট ও জন জে মনটগোমারী পুরস্কার ছাড়াও বহু পুরস্কার পেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থাও ১৯৬১ সালে তাঁকে একটি বিশেষ পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত আর্মস্ট্রং ছিলেন বিমান-বাহিনীর বৈজ্ঞানিক। ১৯৫৫ সালে তিনি লিউইস গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দেন। তারপর তাকে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ক্যালিফোর্ণিয়ার এডোয়ার্ডস বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত ফ্লাইট রিসার্চ সেন্টার বা বিমান উড্ডয়ন সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রে বদলী করা হয়। অতি দ্রুতগামী বিমান চালনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা তাকে মহাকাশচারী হিসাবে নির্বাচিত করেন।

জেমিনি ৫ এর অভিযানে তিনি সহকারী চালক। ১৯৬৬ সালের ১৬ই মার্চ জেমিনি-৮ মহাকাশযানটি মহাশূন্যে প্রেরিত হয়। তিনি ছিলেন ঐ যানের চালক এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডেভিড আর স্কট। আর্মস্ট্রংই প্রথম মহাশূন্যে সাফল্যের সঙ্গে দুটি যানের মিলন ঘটিয়েছিলেন। মহাকাশে তাদের তিন দিন সফর করার কথা ছিল। কিন্তু যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তাদের পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। মহাশূন্যে তারা এজন্য যে সমস্যায় পড়েছিলেন মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং তা অতি সহজেই সমাধান করেন এবং মহাকাশযানটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই অ্যাপোলো ১১ মহাকাশযানের মিঃ আর্মস্ট্রং দুজন সহযোগী সহ চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেন।

মাইকেল কলিন্স

মাইকেল কলিন্স এর উপরে চন্দ্রলোকগামী অ্যাপোলো ১১ যানটিকে মহাকাশে চালিয়ে যাবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯৩০ সালের ৩১শে অক্টোবর ইতালীর রোম সহরে মাইকেল কলিন্স জন্মগ্রহণ করেন। তার মা মিসেস জেমস এল কলিনস রাজধানী ওয়াশিংটনের বাসিন্দা। ওয়াশিংটনের সেন্ট অ্যালব্যান্স স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন এবং ১৯৫২ সালে নিউইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্টস্থিত মিলিটারী একাডেমী থেকে বি এস সি উপাধি লাভ করেন।

বস্টনের প্রাক্তন প্যাট্রিশিয়া এম ফিনিগ্যানের সঙ্গে তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। কলিনস দম্পতির ক্যাথলিন

(জন্ম ১৯৫৯, ৬ই মে,) অ্যান (জন্ম ১৯৬১ ৩১শে অক্টোবর) ও মাইকেল (জন্ম ১৯৬৩, ২৩শে ফেব্রুয়ারী) এই তিনটি সন্তান।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বিশেষ পদক দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন। এছাড়া তিনি বিমান বাহিনীর ফ্লাইংক্রস এবং অ্যাসট্রনট উইংসও পেয়েছেন।

ওয়েষ্ট পয়েণ্ট থেকে স্নাতক হবার পর তিনি মার্কিন বিমানবাহিনীতে লেঃ কর্ণেল হিসাবে যোগদান করেন। মিঃ কলিনস কিছুকাল ক্যালিফোর্ণিয়ার এডোয়ার্ডস বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত বিমানবাহিনীর ফ্লাইট টেষ্ট সেণ্টারেও ফ্লাইট টেষ্ট অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে মহাকাশচারীদের যে তৃতীয় দলটিকে নির্বাচিত করেন, তাদের মধ্যে কলিন্স ছিলেন অন্যতম। জেমিনি-৭ এর মহাকাশ সফরে তিনি ছিলেন প্রধান চালকের সহকারী। ১৯৬৬ সালের ১৮ই জুলাই জেমিনি-১০ মহাকাশযানটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। তিনদিনের ঐ অভিযানে জেমিনি ১০ ৪৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। জেমিনি ১০ এর চালক জন ইয়ং তখন মহাকাশে প্রেরিত এজেনা রকেটের সঙ্গে মিলন সাধন এবং এজেনার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মহাকাশে আর একটি রকেটের কাছে মহাকাশযানটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন মিঃ কলিনসও ছিলেন তার অংশীদার। তিনিই তখন মহাশূন্যে পদচারণা করেন ও ঐ রকেটে রক্ষিত একটি আধার সঙ্গে নিয়ে আসেন।

এডুইন ই অ্যালড্রিন (জুনিয়ার)

মহাকাশচারী এডুইন ই অ্যালড্রিনের উপরে চন্দ্রযানটিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়। ঐ যানটি দুজন মহাকাশচারী আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিনকে নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। তারপর ঐ যানের সাহায্যেই মহাকাশ-চারীদ্বয় অ্যাপোলো-১১তে ফিরে আসেন। অ্যাপোলো-১১ সেই অবসরে চাঁদ পরিক্রমা করতে থাকে। এরই সংলগ্ন চন্দ্রযানটিকে অ্যালড্রিন পৃথক করে নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন এবং চন্দ্রলোক সফরের শেষে এটি আবার মূলযান অ্যাপোলো ১১ এর সঙ্গে এসে মিলিত হয়।

কর্ণেল এডুইন ঐ অ্যালড্রিন এবং পরলোকগত মিসেস মেরিয়ান মুন অ্যালড্রিনের পুত্র মহাকাশচারী এডুইন ই অ্যালড্রিন (জুনিয়ার) ১৯৩০ সালের ২০শে জানুয়ারী নিউজার্সির মণ্টক্লেয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণেল অ্যালড্রিন নিউজার্সির ম্যিরেলে বাস করেন।

নিউ জার্সির মণ্টক্লেয়ারস্থিত হাই স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন এবং ১৯৫৯ সালে নিউ ইয়র্কের ওয়েষ্ট পয়েণ্টস্থিত মিলিটারী একাডেমী বা সামরিক বিদ্যালয় থেকে বি, এস, সি উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৬০ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিট্যুট অব টেকনোলোজী থেকে অ্যাস্ট্রনটিকস এ ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে মিনেসোটার গুস্টাভাস অ্যাডলফাস কলেজ তাঁকে অনারেরী ডক্টরেট অব সায়েন্স উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে।

মিঃ ও মিসেস মাইকেল আর্চারের কন্যা জোয়ান এ আর্চারের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। অ্যালড্রিন দম্পত্তির মাইকেল, (জন্ম ১৯৫৫ ২রা সেপ্টেম্বর) জেনিস (জন্ম ১৯৫৭, ১৬ই আগষ্ট) এবং অ্যানড্রু (জন্ম ১৯৫৮, ১৭ই জুন) এই তিনটি সন্তান।

কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা একটি পদক দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন। মার্কিন বিমানবাহিনী থেকেও তিনি বহু সম্মান ও পদক লাভ করেছেন।

[শেষাংশ ১৯৫ পৃঃ]

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

জাপানের দিনগুলি

বারীন বর্দ্ধন

কিছুদিন আগে "গাইগো"র চারজন হিন্দী শিক্ষার্থী ছেলেমেয়ে ছাত্রাবাসে এসেছিল 'ওচার' বদলে 'কোচা' খেতে—ব্ল্যাক্‌টিকে জাপানীরা বলে কোচা। ওচা অর্থাৎ সবুজ চায়ের চেয়ে বহুগুণে সুস্বাদু এবং রেষ্টুরেন্টে প্রতি কাপ্ একটাকা পাঁচশিকে দিয়ে কিনে তবে খেতে হত। এই কোচায় নিমন্ত্রণে এসেছিল সবাই এবং প্রচলিত সামাজিক পদ্ধতি অনুযায়ী সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এক বাক্স কেক্। সেই দলের একটি ছেলের নাম ছিল মোরী। বেঁটে, ছোটখাট এবং প্রতি কথাতেই ছিল ছেলেবয়সের উৎসাহ। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল ভারত সম্পর্কিত কথাবার্ত্তা। আমার জাপানী ভাল আসেনা। আবার অতিথিদের ইংরেজী জ্ঞানও ছিল পরিমিত। কাজেই দুই ভাষা মিলিয়ে কথা চলছিল ভারতীয় বিষয় নিয়ে। সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ—বহু বিষয় নিয়েই কথা চলল অনেকক্ষণ।

বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার অপরিমিত ছিলনা। তাই জবাবগুলি হয়ত বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে একেবারে নির্ভুল নয়। তবু জবাব খুঁজে পেতে দেরী হয়নি এবং অঙ্ক বা পরিসংখ্যান সম্পর্কিত প্রশ্ন হলেই হিন্দুস্থান ইয়ারবুকের শরণাপন্ন হতাম। সেদিন কতক্ষণ কাটল এদের সঙ্গে এই করে।

হেমন্তের সুরুতে এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তারপরেও প্রায় মাস তিনেক কেটে গিয়েছে। এদের চারজনের সঙ্গে একত্রে দেখা না হলেও 'গাইগো'র বারান্দাতে এদের দু'একজনকে দেখতাম এদিক সেদিক ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে এদের সবাই মুছে গিয়েছিল মন থেকে। শুধু রয়ে গিয়েছিল ঐ দিনের চায়ের বৈঠক।

অল্পবয়সী ছেলের দল শুধু বই পড়ে বা মাষ্টারমশাইর মুখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়নি। আরও জানার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে গিয়ে নিজেদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। দেখা হলেই জাপানী কায়দায় অভিবাদন করত এবং মুচ্‌কি হেসে চলে যেত। তারপরেও দু'একদিন এমন হয়েছে যে হিন্দী ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে এসেছে তারা ডাক্তার আপয়ওয়ালের কাছে।

অদর্শনে দু'পক্ষেরই আকর্ষণ কমে গিয়েছিল খানিকটা। সেদিন সকালের ক্লাশ শেষ হবার আগেই হিন্দী শিক্ষার্থী মোরীসান্ এসে দাঁড়াল আমাদের কামরার সামনে এবং ক্লাশ শেষ হবার সাথে সাথেই ঘরে ঢুকে চিরাচরিত জাপানী ভদ্রতা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আপনার একটু সময় হবে কি?

ক্লাশ শেষ হওয়া মানেই "আড্ডা ক্লাশের" সুরু। অফুরন্ত তার বিষয়বস্তু এবং ক্ষেত্র তার সীমাহীন।

তাই মাথা দুলিয়ে বললাম—নিশ্চয়ই সময় আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বিনীতভাবে

জিজ্ঞাসা করল—ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মানেটা যদি ইংরেজীতে লিখে দেন।

—নিশ্চয়ই। এ আর বেশী কি। বলেই বসে পড়লাম 'জনগণমনের' অনুবাদ করতে।

মোরীসান্ বসে রইল যতক্ষণ না অনুবাদ শেষ হয় এবং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে নিল সমস্ত ইংরেজী লেখাটা। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল নানা জায়গার মর্মার্থ। বলে যাচ্ছি অনেক কথা। হঠাৎ খেয়াল হল—তাই তো। ভারতের জাতীয়সঙ্গীত নিয়ে মোরীসানের এত মাথাব্যথা কেন?

জিজ্ঞাসা করলাম—'জনগণমন' কি আপনাদের শেখান হচ্ছে?

একটু অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতেই মোরীসান্ বলল—আজ্ঞে তা নয়। তবে এক দেশের ভাষা শিখছি। আর তাদের জাতীয়সঙ্গীত জানবনা?

কথাটা যেন আমাদেরই লক্ষ্য করে বলা। এ চিন্তাধারা তো আমরা তিনটি বৃত্তিধারী প্রাণীর কারুর মাথায়ই এ পর্য্যন্ত আসেনি।

লজ্জার মাথা খেয়েই প্রশ্ন করলাম—আপনাদের জাতীয়-সঙ্গীত তো এখনও শোনার অবসর হয়নি। যদি জাপানী এবং তার ইংরেজী সংস্করণটা যোগাড় করে দেন তবে খুবই উপকৃত হব।

—এই তো সঙ্গেই আছে। বলে পকেট থেকে মোরীসান একটুকরা কাগজ বার করল। এক দিকে রয়েছে জাপানের জাতীয় সঙ্গীত আর অন্যদিকে তার ইংরেজী তর্জমা। বোধহয় আমার প্রশ্নের জন্যই তৈরী হয়ে এসেছিল মোরীসান্।

হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিয়ে এক মুহূর্ত্তে পড়ে নিলাম জাপানী এবং ইংরেজী, দুই ভাষায় লেখা জাপানের জাতীয় সঙ্গীত। সঙ্গীতটি এই রকমের—

"কিমি গা ইও ওরা,
চিয়োনি ইরা চিয়োনি,
সাজারে ইশি নো ইওয়াও তো নারীতে
কোকে নো মুসুমাদে।

বাংলায় তর্জ্জমা করলে দাঁড়ায় এই রকম—

"সুখময় জীবনের ধারা
বয়ে যাক হাজার বছর আরো।
যেদিন বালুকাকণা,
কালের বন্ধন ভোরে,
আপনারে মুক্ত করি,
রূপায়িবে বিরাট প্রস্তরে।
মহিমামণ্ডিত ধার
ঢাকি দিবে শৈবালের ভার।
দেবতা মোদের; জীবন প্রবাহ তব,
ততদিন বয়ে যাক্ আরো।

ডিসেম্বরে শীতের প্রচণ্ডতা ততটা না থাকলেও ভাবনায় পড়েছিলাম জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারীর তুষারপাতের দিনগুলি নিয়ে। নবেম্বর থেকেই ছাত্রাবাসের ঘরগুলি সব দিনেরাতে মিলে প্রায় পাঁচ ছ বার গরম করা হচ্ছিল। মরুভূমির মরুদ্যানের মতই পরম ঘরগুলি ছিল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছাত্রদের একমাত্র ভরসা।

সেদিন ঘরে বসে উপভোগ করছি সান্ধ্য চার সঙ্গে সদ্যোত্তপ্ত তাপযন্ত্রের সান্নিধ্য। এমনি সময় সমস্ত আমেজ ছুটিয়ে দিয়ে কাংস্যকণ্ঠে বেজে উঠল দরজার উপরকার মাইক্রোফোন।—ভারতের বর্দ্ধন মশায়, আপনার টেলিফোন এসেছে।

বাইরে তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। ঐ আমেজ ছেড়ে উঠতে হবে ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুলাম অফিস ঘরে। মেজাজটা তখনও বিগড়ে আছে। কাজেই

কণ্ঠস্বরে প্রথমটায় বুঝতেই পারলাম না প্রতিপক্ষটি কে হতে পারে।

জিজ্ঞাসা করব ভাবছি নাম, ধাম ইত্যাদি। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না। প্রশ্ন করার আগেই প্রতিপক্ষ আত্মপরিচয় প্রকাশ করে বলল—আমার নাম মোরী। হিন্দী শিক্ষার্থী। আপনি কি ১লা জানুয়ারী ভোরে ব্যস্ত আছেন?

১লা জানুয়ারী। জানুয়ারী মাসেই শীতের চরম। প্রচণ্ডতা উগ্ররকমের। আর ব্যস্ততা মানেই লেপকম্বলের নীচে নিদ্রাদেবীর সঙ্গে একাত্মতা। তবুও সহজেই নেতিবাচক উত্তরটি না দিয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম প্রশ্নের কারণ।

—সেদিন বছরের প্রথম দিন কি না। মেইজী জিঙ্গোতে আমরা যাব পুজো দিতে। আপনি তো কোনদিন দেখেননি ১লা জানুয়ারীর উৎসব। সেদিন সঙ্গে থাকলে জাপানী সমাজের এ দিকটাও দেখতে পাবেন।

উৎসাহ দ্বিগুণতর হয়ে উঠল নববর্ষের আনন্দের ছোঁয়া পেয়ে। শীতের প্রচণ্ডতা আর মনে স্থান পেলনা। তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলাম ১লা জানুয়ারী উৎসবে অংশগ্রহণ করতে। কথা হল সেদিন রাত চারটায় আমি গিয়ে অপেক্ষা করব ওকুবো ষ্টেশনে বন্ধুর জন্য।

আমার ছিল হাতঘড়ি। এলার্মের কোনই ব্যবস্থা নেই। তবুও ৩১শে জানুয়ারী শেষ রাতে বিছানা ছেড়ে উঠতে অসুবিধা হল না। উৎসাহ যেখানে প্রবল, চিরাচরিত প্রবৃত্তি সেখানে স্তব্ধ। ঐ শীতের রাতেও তাই সাধ্যমত গরম জামা-কাপড় পরে ঠিক পনর মিনিট আগে এসে পৌছুঁলাম ওকুবো ষ্টেশনে।

পয়লা জানুয়ারী বা নববর্ষ। এ উৎসব বোধহয় পৃথিবীর সর্বত্রই পালন করা হয় নানা আচার ব্যবহারের মাধ্যমে। ইতিহাসের যুগে জাপানে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের উপর শিন্তো এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ভীষণ অত্যাচার করে। সে অত্যাচারের পরবর্তী যুগে জাপানের ভাবধারায় এমন কোন আমূল পরিবর্তন হয়নি যে বলতে পারি সারা জাপান ইউরোপীয় কায়দা মক্স করতে গিয়ে নিজেদের নববর্ষের দিনটিও গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে। সম্রাট এখনও সূর্যোবংশোদ্ভূত এবং তাঁর অভিষেক থেকে সুরু করে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই সম্রাটের যুগ। যেমন উনিশ সাতান্ন সালটা ছিল 'শোওয়া বত্রিশের' যুগ। অর্থাৎ শোওয়া বংশ বা বর্ত্তমান রাজার বংশ—যার অভিষেক হয়েছিল বত্রিশ বছর আগে। কনসায়ভেটিজম্ যখন এই পথে চালু তখন বছরের প্রথম দিনটি এরা হিসেব করল পয়লা জানুয়ারী দিয়ে। কি করে গ্রেগরীয়ন ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে তাল রেখে এবং সম্রাটের জন্ম বা মৃত্যু দিয়ে এরা ঠিক করল তারিখ বিচারের প্রক্রিয়া তা এখনও বুঝতে পারিনি। সে যাই হোক। এ হেন আধা ঐতিহ্যপন্থী দেশ যে পয়লা জানুয়ারী নিয়ে এত মত্ত হয়ে উঠবে ভাবতেই পারিনি।

ওশোগাৎসু বা নববর্ষের তাড়না জাপানীজীবনে সুরু হয় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে। হালখাতার মহরৎ চলে কি না জানি না। কিন্তু তার চেয়ে বড় মহরৎ চলে কেনাকাটার। দেপাতোগুলি বড় বড় রেলষ্টেশনের মতই মুখর। বিরাট জনতা এ দরজা দিয়ে ঢুকছে আর ও দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে। এ জনতা দর্শকের পর্য্যায়ে পড়ে না। হাতে প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগ্। একটা কিছু কিনে বেরোচ্ছে। খবরের কাগজে দেখেছিলাম বড়দিন থেকে সুরু করে পয়লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাত দিনে একটা দেপাতোর বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় পনর লক্ষ টাকা। যে দোকানে সাত দিনের বিক্রীর পরিমাণ পনর লক্ষ টাকা তার জিনিষের পরিমাণই বা কি রকম আর কেনাকাটাই বা হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি! কিন্তু হৈ হুল্লোড় বা চেঁচামেচির একান্তই অভাব। এই সাতদিন সব ছুটি। স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েরা এই সাতদিনের জন্য কাজ খুঁজে নেয় বড় বড় দোকানে। প্রয়োজনটা উভয়ত! অর্থাৎ কাজের চাপে

দেপাতোর বিক্রয়কারিণীরা বিপর্য্যস্ত। কুলিয়ে উঠতে পারে না। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন টাকার। উৎসবকে তারা দিতে চায় পূর্ণাঙ্গ রূপ।

একই সঙ্গে এরা পালন করে দুটো পরস্পরবিরোধী উৎসব। ওশোগাৎসু আর বোনেনকাই। প্রথমটা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়টায় আছে ফেলে আসা বছরের প্রতি অনুকম্পার আকর্ষণ। বসন্ত আর পুরবীর সমন্বয় একই মুহূর্ত্তে। কিন্তু উৎসবের আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে চাই টাকা এবং তারই তাগিদে ছেলেমেয়েরা এসে যায় দেপাতোর কাউন্টারে। স্কুল কলেজের গলাবন্ধ কাল কোট আর নীল স্কার্ট—কাউন্টারে দেখতে পেলেই মনে হবে এরা সাধারণ বিক্রয়কারিণীদের দলে পড়ে না। ছেলে-মেয়েরা যেমন আনন্দ লুঠছে একদিকে, তেমনি অন্যদিকে বাড়ীর মালিকরা আদায় করছে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে অগ্রিম ভাড়া। এই দেওয়া নেওয়াতে নেই মনকষাকষি। একে অন্যের প্রয়োজন বুঝতে পারে বলেই দাবীও করে মিটবার আশায়।

প্রতি বাড়ীর সামনে লাগান হয় পাইন গাছের ডাল। পাইনের অভাবে বাঁশগাছও দেখেছি। শীতের মধ্যাহ্নে এই দুই জাতীয় গাছ ছাড়া আর সবই হয়ে পড়েছে পত্রবিবর্জিত। আত্মরক্ষার খাতিরে হয়ে পড়েছে শীর্ণ। পাইন এবং বাঁশগাছ শীতের আক্রমণকে উপেক্ষা করে টিকে থাকে বলেই শীতে জর্জ্জরিত জাপানীদের কাছে এদের বড় আদর।

রাত বারটার কিছু আগেই সমস্ত মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং। ছাত্রাবাসের কাছেই ছিল মেইজীজিঙ্গো। কাছে বলছি কারণ কার্য্যত মাইল পাঁচেক দূরে হলেও মাঝরাতে ঘণ্টার ভারী আওয়াজ খুব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। ঘণ্টা বাজবে একশ আট বার। বৌদ্ধমতে আছে একশ আট রকমের পার্থিব আধি। তাই একশ আটবার ঘণ্টাধ্বনি করে সেই আধিকে দূর করা হয় যাতে নূতন বছর তাদের ছোঁয়া পেয়ে বিষাক্ত হয়ে না উঠে। ঘণ্টা বেজেই চলেছে। যেন সারা টোকিওতে হচ্ছে শেষরাতে আরতি-নৃত্য। তালে তালে বাজছে ঘণ্টা। আধঘণ্টার মধ্যেই আবার সব নিঝুম হয়ে পড়ল।

৩১শে ডিসেম্বর নববর্ষ উপলক্ষে সারা রাত ছিল ট্রেন চলাচল অব্যাহত। কলিকাতার ট্রাম কি বাস্ যেমন দু'এক মিনিটের মধ্যেই পাওয়া যায়, সেই-রকম করে চলছিল আট বগীওয়ালা ইলেকট্রিক ট্রেন। প্রতি ট্রেনেই যে কি রকম ভীড় তা বলে বোঝান যায় না। কলিকাতার আফিসগামী ট্রাম কি বাসের সঙ্গেই এর একমাত্র তুলনা সম্ভব।

ঐ রকম একটা ট্রেন থেকে বন্ধু নামল ওকুবো ষ্টেশনে। পাঁচ সেকেণ্ডের মত গাড়ী দাঁড়ায়। আমাকে সামনে পেয়ে বন্ধু এক রকম টেনেই সঙ্গে করে উঠল ঐ ট্রেনে। শিন্‌জুকুর এক ষ্টেশন পরেই হারাজুকু এবং এই হারাজুকুতে নেমেই পায়ে হেঁটে যেতে হবে মেইজীজিঙ্গোতে।

রাত তখন সাড়ে চারটা। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যত রকমের সম্ভাব্য পরম জামা পরেও শীতকে বাগে আনতে পারছিলাম না। তবু ঐ রকম প্রচণ্ড শীতের দমকও লোকের উৎসাহে ঘুন ধরাতে পারল না। ষ্টেশনের বাতি স্তিমিত। তার চেয়েও ক্ষীণ আলো জ্বলছিল একচালা অস্থায়ী দোকান ঘরে। সুরুতেই মনে করিয়ে দিল পয়লা বৈশাখের মেলার কথা। সারি সারি চালাঘর। তাতে বিক্রী হচ্ছে খেলনা থেকে শুরু করে শিশুদের মন ভোলানো হরেকরকম সামগ্রী। হারাজুকু ষ্টেশন থেকে প্রায় আধমাইল চলার পর পাওয়া গেল মেইজী মন্দিরের প্রথম গেট্ বা দরজা। এই আধমাইল রাস্তার দু'ধারে রয়েছে ঝাউ গাছের সার। রাস্তা পাথর আর পিচ্ দিয়ে তৈরী। শীতের প্রকোপে যাতে দর্শকদের কষ্ট না হয় তার জন্য দু'তিন শ গজ পরে রয়েছে কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ড। স্কাউটের দল সারারাত জেগে ঐ আগুন জ্বালিয়ে

রেখেছে প্রভাতের অভ্যাগতের জন্য। প্রথমটায় উৎসাহ এবং উত্তেজনার মুহূর্তে ঠাণ্ডা মোটেই বোধ করছিলাম না। কিন্তু শীত তার প্রচণ্ডতা বুঝিয়ে দিল অরক্ষিত একটি অঙ্গকে আক্রমণ করে। হাতে দস্তানা থেকে শুরু করে শরীরের এমন কোন অংশ ছিল না যার উপর আচ্ছাদন দিই নি। তাই অনেকটা শীতের সঙ্গে লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে এতটা পথ এসেছি। হঠাৎ সমস্ত অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে কাণ দুটো বেজায় টন্‌টন্ করতে লাগল। কারণ খুঁজে পেতে দেরী হল না এবং পরমুহূর্তেই সামনের অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত এক একবার গরম করে নিচ্ছি আর সেই গরম হাতে তদ্বির করছি কর্ণযুগলের। মিনিট পনর ঐ করার পর কাণের নষ্ট চেতনা ফিরে এল। গলার মাফ্‌লার দিয়ে মাথা এবং কাণ দুইই জড়িয়ে নিলাম। বন্ধু ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে। 'জিগ্‌জ্যাগ্' রেসের মত শরীরটাকে এদিক ওদিক দুলিয়ে বন্ধুকে পাকড়াও করলাম মেইজীজিঙ্গোর গেটে।

বিরাট কাঠের গেট। দু'তিন তলা বাড়ীর মত উঁচু। গায়ে লাল রংএর আস্তরণ এবং কাঠামোটি ছিল সাঁচীস্তূপের গেটের মত। লাইন করে লোক গেট্ দিয়ে মন্দিরের চত্বরে ঢুকছে। দাঁড়িয়ে পড়ছে মন্দিরের সামনে এবং প্রার্থনার সুরুতে দু'হাতে তিনবার তাল ঠুকে প্রার্থনা জানাচ্ছে। আসল বিগ্রহ বা ঐ ধরণের কিছু নজরেই এল না। জনতা প্রার্থনা শেষে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে বিগ্রহের দিকে। অন্যদিন হয়ত বিশেষ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সেদিন দেখলাম মন্দিরের বারান্দায় বাইরেও অনেকখানি জায়গা কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সেখানে হচ্ছে পয়সা বৃষ্টি। ভীড়ে এগিয়ে যায় কার সাধ্য; তাই বন্ধু আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল প্রার্থনারত জনতার মধ্যে এবং প্রায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ফিরে এল।

পাশের গেট্ দিয়ে এবার বেরিয়ে এলাম মেইজীজিঙ্গোর বাগানে। বাগান মানে মন্দিরের ফুল-বাগান বা সবজী বাগান নয়। বিরাট খোলা ময়দান ঘুরে বেড়াবার জন্য। ঘাসগুলি তার কার্পেটের মতই পরিপাটি। শিশিরে ভিজে একাকার। অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা ধরে গিয়েছে। তবুও বসবার উপায় নেই। ভাবছি কখন বেরিয়ে পড়ব মন্দিরের সীমানা ছাড়িয়ে।

এমনি সময় বন্ধু বলল—চলুন, আগুনে শরীরটা কিছু সতেজ করে তারপর সূর্য্যোদয় দেখব।

আগুনে শরীরের তোয়াজ করাটা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হল। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের প্রতি আকর্ষণ যে কেন তা বুঝতে পারলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে তাই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা যে কোন জায়গা থেকেই তো সূর্য্যোদয় দেখা চলে। তবে এগিয়ে যাই না কেন?

বন্ধু দেখতে ছোটখাট হলেও রূপ বা উত্তেজনার কোন কাজ করেনা। ধীরে ধীরে আমাকে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই বলল—ঐ যে দূরে ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে উঁচু মাটির ঢিপি ঐ খানে দাঁড়িয়ে বছরের নূতন এবং প্রথম সূর্য্যকে দেখা বা আবাহন করা নববর্ষ উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। আমার বোনেরাও কাল রাতে ঘুমোবার আগে বলেছিল যে এই সূর্য্যোদয় দেখতে তারা মেইজীজিঙ্গোতে আসবে। আজ শেষরাতে ডাকতে গিয়ে দেখি সবাই ঘুমে অচেতন। ডাকাডাকি করলাম কতক্ষণ। কোনই সাড়াশব্দ পেলামনা। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত কোন বছরেই এই নূতন সূর্য্যের প্রথম আলো দেখার ব্যতিক্রম আমার ও জীবনে হয়নি। তাই বোনেদের ছেড়েই চলে এসেছি। দেখবেন সূর্য্যের নূতন চেহারা আর মনে পাবেন নূতন উন্মাদনা। সারা বছর এই উন্মাদনাই আপনাকে

বাঁচিয়ে রাখবে সমস্ত নিরাশার হাত থেকে।—গম্ভীর হয়েই বন্ধু বলে গেল কথাগুলি।

হঠাৎ একসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—চলুন, সময় হয়ে এসেছে। সূর্য্যোদয়ের দেশে নূতন সূর্য্য দেখবেন। নববর্ষের সঙ্গে 'হিমোদে' দেখাও আমাদের একটা কর্ত্তব্য।

ঝোপঝাড় আর আগাছার বেষ্টনীকে দু'হাতে সরিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা দু'জন ঐ ঢিপির কাছে। ঢিপিটা আর কিছুই নয়। কোন টিলা কেটে তৈরী করা হয়েছে।

কিন্তু কি অসম্ভব ভীড় ঐ ঢিপির উপর। সার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে এর মাথায়। সঙ্গে রয়েছে ছোট ছেলেমেয়ের দল। এক একবার ঘড়ি দেখে পাশের লোককে বলছে—আর মাত্র আধঘণ্টা বাকী।

অনেকে আবার ক্যামেরা কাঁধে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে একটু উঁচু পছন্দসই জায়গার লোভে। ক্যামেরাতে নূতন সূর্য্যের আগমনীছবি ধরে বাঁধিয়ে রাখবে সারা বছরের জন্য।

আমি আর বন্ধু বেশ একটা উঁচু জায়গা পেয়ে গেলাম হাতের কাছে। দাঁড়িয়ে আছি আমরা দু'জন আর নবীন প্রত্যাশায় উন্মুখ এক বিরাট জনতা। বছরের পয়লা দিনটিতে নূতন সূর্য্য কি বার্ত্তা বহন করে আনবে তাই জানবার জন্য।

ধীরে ধীরে পূর্বাকাশ রক্তাভ হয়ে উঠল নবারুণের ছোঁয়া পেয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য অনুভব করলাম আমার আশেপাশে জনতার মধ্যে। যার চোখে ছিল চশমা রুমাল বের করে সে বার দুই কাঁচটা পরিষ্কার করে নিল। ক্যামেরাবাহক তৈরী হয়ে গেল সূর্য্যের দিকে তাক করে। এক মুহূর্তের জন্য। আবার সমস্ত জায়গাটা হয়ে পড়ল স্তব্ধ।

সূর্য্যোদয়ের দেশে উনিশ' আটান্ন সালের পৃথিবীর প্রথম সূর্য্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এই ভাবে।—ল্যাণ্ড্ অব্ দি রাইজিং সান্—পুরোপুরি মর্মটা ফুটে উঠল ঐ উদয়াচলের সূর্য্যের মতই।

(ক্রমশঃ)

কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

এখন ভীষণ সময়

এখন ভীষণ সময়। চতুর্দিকে কাঁটাতারের বেড়া।
লাফিয়ে পার হয়ে পালাতে গেলেই
পেছন থেকে গুলি কিংবা ছুরিকাঘাত।
আমি জানতে পারছিনা কে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে,
পেছন ফিরে তাকাতে পারছি না
কেননা সামনেই ইতস্তত অজস্র পরিখা
কারা যেন আগে থেকেই খনন ক'রে রেখেছে,
আমি উর্দ্ধশ্বাস দৌড়াবার চেষ্টা করলেই
হোঁচট খেয়ে গর্তের নীচে তলিয়ে যাবো।
কে যেন পেছনে, তার দীর্ঘ ছায়া
আমার সামনে, ছায়া কী ভীষণ দীর্ঘ,
ক্রমশই দীর্ঘতর, যেন ঝড়ের দারুণ মেঘের মতো
এখনই ছড়িয়ে পড়বে, তারপর
শুরু হবে আদিগন্ত ঝড়ের প্লাবন।

এখন কেবলই হারাবার ভয়, বিচ্ছিন্ন হবার
অশান্ত হবার শ্রান্ত হবার ভয়, যেন
কোথাও পদতলে স্থিরতা নেই, যেন ঘূর্ণায়মান
গোলাকার বলের ওপর পা রেখে
সামনের দিকে প্রতি নিমেষে এগিয়ে যাবার চেষ্টা,
হারিয়ে যাবার বিলুপ্ত হবার আগে
পুরাতন শপথ কিংবা অঙ্গীকারগুলোকে
খেলনার মতো নাড়াচাড়া করতে সাধ হয়॥

হৈ চৈ আর্তনাদের মধ্যে

চলো হে তাহলে দক্ষিণ থেকে বামে,
বেশ রোদ রাস্তায় ভিড় চতুর্দিকে,
দিনের মুখে অ্যাটমের দীপ্তি ;
ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে
ঘটনার, যে-কোনো উদ্যোগ যেন জেলেডিঙ্গি
থরথরিয়ে কাঁপছে
ঘুমড়িখাওয়া ঘটনাবলীর আবর্তে।
চলো হে ওদিকেই যাই
যেখানে অজস্র লোক শহর মিছিলে
উচ্চগ্রামে গলা বেঁধেছে ;
যেখানে আজ আত্মগোপন সহজ,
যেখানে চড়া গলায় কথা বললে
আমার অতীত নিয়ে
আর কেউ ঘাটাঘাটি করবে না।
ভিড়ের মধ্যে খুন সহজ নয়,
কিন্তু একবার খুন করতে পারলে,
ধরা পড়বার সম্ভাবনা অল্প।
চলো হে এগিয়ে যাই ভিড়ের কোলাহলে,
মনে হচ্ছে—হৈ চৈ হট্টগোল
আর্তনাদের মধ্যে এইবার
প্রকৃত স্বভাব গোপন করতে পারবো॥

যে-ভূমিকায় প্রতিদিন

ইচ্ছা হয় চীৎকার করে বলি 'সাট অপ ষ্টুপিড'।
ইচ্ছা হয় ঘাড় ধরে ল্যাম্পপোষ্টের কাছে নিয়ে যাই,
দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধি। তারপর
চাবুক এনে কষে মারতে থাকি যতোক্ষণ না
জ্ঞান হারায়। কিংবা ধাক্কা দিয়েই
মাটিতে ফেলে দিয়ে
জুতো দিয়ে মুখ থেতলে দিই
যতোক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
তারপর সবাইকে এনে দেখাই
নরকের কীটদের শাস্তি
কী রকম শক্ত হ'তে পারে।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে
না-দেখি না-দেখি ক'রে
পালিয়ে এলাম। যা ঘটছে ঘটুক না,
আমার নাক গলাবার
কী দরকার। বাড়িতে ফিরে এসে
বারান্দার অন্ধকারে
পায়চারি করতে থাকি॥

সাড়া

আমি বসন্তের জন্যে অপেক্ষা করি না আর,
বসন্ত আমার জন্যে অপেক্ষায়।
কচি কচি সবুজ পাতা পল্লবিত ডালাপালা
লাল টকটকে ফুল

মায়াবী গোলাপের নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষা,
হাওয়ায় উড়ছে তিনটি প্রজাপতি।
আমি এখন বিষাদে অভিভূত,
এক একটা আর্তনাদ তুলে দ্রুতপায়ে
অন্ধকারের দিকে ছুটে যাচ্ছে দিনগুলো,
এত দ্রুত যে তাদের ছায়ায়
মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াতে পারছি না।
একবারও ভাবতে পারছি না এখন বসন্ত,
মাঝে মাঝে হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের নতুন সংকেত, আমার অগোচরে
চারদিকের পরিবেশ লতাপাতার ফুলে
ছেয়ে গেছে।
আমি বসন্তের জন্যে অপেক্ষা করছি না,
বসন্ত ঋতু আমার জন্যে অপেক্ষায়;
ক্ষোভ তিক্ততা গ্লানির ছোপ সর্বাঙ্গে,
আমি সাড়া দিতে পারছিনা কিছুতেই,
উচ্ছ্বসিত হতে পারছি না।

কিছুকাল বাদেই বৈশাখী রৌদ্রে
উত্তপ্ত হয়ে উঠবে চারিদিক,
গাছপালা মাঠ পর্বতকন্দর;
শুকিয়ে যাবে জলাধার, বিশুষ্ক নদী;
হয়তো তখন, শুধু তখনই
আমি সাড়া দিতে পারবো॥

অন্বেষণ

প্রথম যৌবনে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ পথ অন্ধকার রাত
পার হবার প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারে
কাছে পেতে চেয়েছিলাম।
তারুণ্যের সংকল্প সাহস উদ্যোগ
একটি প্রবাহিত দুর্বার জলধারার মতো
হৃদয়কে আর্দ্র করে রেখেছিল ;
যেন অফুরন্ত আকাঙ্খার বীজগুলো এইবার
মাঠে মাঠে আনবে
নতুন সম্ভাবনার আশ্চর্য ফসল।

যৌবনের দিনগুলো দেখতে দেখতে
কতো পেছনে রেখে এলাম। এখন
তুমি শুধুমাত্র প্রত্যাশা নও কামনামাত্র নও
যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দেশবিভাগ দাঙ্গার
অমসৃণ রক্তক্ষরা পথ পেছনে ফেলে
পদতলে সন্দেহ অবিশ্বাস হিংসার
ছাপ মাড়িয়ে
তুমি অনেকখানি শরীরী রূপ নিয়েছো,
যেন দর্পণের খুব কাছে
একটু হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি।
কিন্তু না, তোমার চেহারায় অনেক পরিবর্তন,
তোমাকেই কি আমি যৌবনে চেয়েছিলাম ?
তবু আমি অপেক্ষা করবো ; অক্লান্ত অন্বেষণে
তোমার স্বরূপ আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে॥

: উপন্যাস

উত্তরখণ্ড

কঙ্কভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

আট

—বাবা, রামধন, এমন কাঁচা কাঠ দিয়েছ বাপু, ফুঁ দিতে দিতে যে প্রাণ বেরিয়ে গেল, ও রামধন—কোন সাড়াশব্দ নেই। সন্ধ্যা উতরে গেছে অনেকক্ষণ। রামধন বোধহয় সাধুবাবার পায়ের কাছে গাঁজা টিপছে। রামেশ্বর মুখুজ্জের বাড়ির বাইরের দিকে অতিথিশালার একপাশে কাঠের উনুনে রান্না চাপিয়েছে ভারতচন্দ্র। মাঘমাসের মাঝামাঝি। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে।

গেল অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে রামেশ্বর মুখুজ্জের অতিথিশালায় উঠেছে ভারত। শিবদাসই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভারতও স্বস্তিবোধ করেছে। কৃপণ-স্বভাব শিবদাসের গলগ্রহ হয়ে বেশীদিন থাকাটা উচিত হতনা। যমুনা যদিও খুব আপত্তি করেছিল, চোখের জল ফেলেছিল। তাকে শান্তভাবে বুঝিয়েছিল ভারতচন্দ্র। নম্র হাসিমুখে সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিল। রামেশ্বর মুখুজ্জের কাছাকাছি থাকলে কাজকর্মের একটা সুরাহা হতে পারে, এমন যুক্তি দিয়েছিল। আপাতত একটা ব্যবস্থাও হয়েছে। পাঁচ-ছয়টি ছেলে তার কাছে সকাল বিকেল সংস্কৃত পড়ে, ফারসী শেখে। সকালে সংস্কৃত, বিকেলে ফারসী। ওদের মধ্যে দু'টি রামেশ্বরের দৌহিত্র, একটি সম্পর্কে ভাগনে। আর দু'তিনটি সেরেস্তার আমলা-কর্মচারীর ছেলে। দুই মহলা, চকমিলানো বাড়ি রামেশ্বর মুখুজ্জের। বাইরের মহলে দোতলা সমান উঁচু চণ্ডীমণ্ডপ। সামনে নাটমন্দির। চণ্ডীদালানের একপাশে গৃহদেবতা রাধামাধবের মন্দির। আরেকপাশে পরপর সাত আটটা খুপরি। সামনে টানা রোয়াক। এখানে অতিথি-অভ্যাগতরা থাকেন। দেয়াল, মেঝে পাকা। পাতলা ইটের গাঁথুনি। কিন্তু উপরে খড়ের ছাউনি। এই অতিথিশালার পাশেই একটা চালাঘর। সেখানে চার পাঁচটা উনুন খোঁড়া রয়েছে। অতিথি যারা স্বপাকে খাবেন, তারা এখানে রান্না করে খান। এই অতিথিশালা দেখাশোনার ভার দু'জনের উপর। রামধন প্রামাণিক আর ভগীরথ দাস।

ভগীরথ মানুষটা নিরীহ। বয়স বেশী, গলায় তুলসী কাঠের মালা। পরম বৈষ্ণব।

সত্যিকারের সেবাপরায়ণ। ঘরঝাট দেওয়া, জলতোলা, মসলা বাটা, উনুন তৈরী করা—সব ভগীরথের কাজ। সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা বামুন পণ্ডিতদের এঁটোপাতা ফেলতেও তার আপত্তি নেই। আর রামধন হ'ল মহামাতব্বর। বয়সে ভগীরথের ছোট বটে কিন্তু এখানে কাজ করছে অনেকদিন। অন্দরের ভাঁড়ার থেকে অতিথিদের জন্য চাল-ডাল, আনাজ-তরকারী তেলনুন মশলার সিধে বার করে আনার দায়িত্ব রামধনের হাতে। জ্বালানী কাঠের যোগাড়ও সে করবে। কিংবা তার হুকুম মত ভগীরথ এনে দেবে। রামধনের আবার আত্মসম্মানটি টনটনে।

সে নিজে কখনো ঘরঝাট দেবে না, কাঠের বোঝা বইবে না। শুধু ভাঁড়ার থেকে হিসেব করে চালডালের সিধে আনবে। জলখাবারের মুড়ি-মুড়কি বাতাসা এনে দেবে। কেউ যদি ভুল করে তাকে পরামাণিক বলে ডাকে, খুব চটে যায় রামধন।

ভরতের কাছে অনুযোগ করে—বলুন দেখি পণ্ডিতমশাই, আমাকে বলে পরামাণিক, আমি কি শালা তোদের মত নাপিত, শালাদের চোদ্দপুরুষ নাপিত—

—আহা গাল দাও কেন রামধন, নতুন মানুষ বুঝতে পারেনি আর অতিথি হ'ল, নারায়ণ—

ওহ্, কতবড় নারায়ণ জানা আছে আমার, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, চালচুলো নেই, জানে গোন্দলপাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্জের বাড়ির দরজাতো খোলাই রয়েছে, একবার গিয়ে পড়তে পারলেই হল, আর অদ্দে যদি গেরুয়া থাকে, মাথায় যদি জটা থাকে তা'হলে তো কথাই নেই, তোফা আরামে খাও-দাও আর নাক ডাকাও—বলতে বলতে নাক ডাকার ভঙ্গিটি নকল করে দেখায় রামধন। তারপর আবার বলে—আচ্ছা, আপনিই বলুন পণ্ডিতমশাই, রাগ হবে না, আমরা হলুম মেদিনীপুরের মাহিষ্য, প্রামাণিক, আর আমাকে বলে কিনা পরামাণিক, আমি কি নাপিত নাকিরে শালা তোদের মত, তোদের চোদ্দপুরুষ—বলতে বলতে নাটমন্দিরের দিকে চোক পাকায় রামধন।

—আহা রামধন যেতে দাও—হয়তো নিজের ঘরে পুঁথিপত্তর খুলে বসেছে ভারত, কথা ঘোরাবার জন্য বলে—তোমার দেশ মেদিনীপুরের কোথায়, গাঁয়ের নাম কি—

—আজ্ঞে, গাঁয়ের নাম নলপোতা, দরজার সামনে উঁচু হয়ে বসেছে রামধন—দাঁতনের নাম শুনেছেন তো, সেই দাঁতনের তিনকোশ পশ্চিমে—

—দেশে কে আছে তোমার?

—ছিলতো পণ্ডিতমশাই, সবাই ছিল, জাজ্বল্যমান সংসার ছিল—কঠিন শব্দটি বলে গর্বের সঙ্গে তাকায় রামধন। এটি রামধনের মুদ্রাদোষ। কথার মধ্যে হুট করে এক-আধটি গুরু গম্ভীর শব্দ ব্যবহার করে বসবে। তারপর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে—এখন কেউ নেই, মরে হেজে শুদ্ধি হয়ে গেছে।

—আহা কিসে মরলো?

—ওলাউঠো হয়েছিল, সাত-আট বছর আগের কথা, আমাদের গাঁয়ে সেবার মড়ক লেগেছিল, বহুলোক মারা গিয়েছিল, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের বাড়িতেই তের তিরে আটজন মরেছে, গাঁয়ের অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল, আমিও। সে সময় এখানে চলে এসেছিলুম, যে কয়েকঘর ছিল, শুনিচি গেলবছর নাকি বর্গীরা সব জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে, সে গাঁয়ের আর চিহ্নমাত্র নেই, আমাদের গাঁয়ের সাধুচরণকে তো দেখেছেন আপনি, ওই শুধু তিনটে মেয়ে আর বউ নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে আসতে পেরেছে—

—কে সাধুচরণ?—ভারতের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিল রামধন—ওই যে ফরাসডাঙার দেওয়ানজীর সেরেস্তায় কাজ করে, হুকো বরদার— তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নিচু করে গোপন খবর দেবার সুরে বলেছিল—আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে পণ্ডিতমশাই, একটা বুদ্ধি দিতে হবে—

—তা'দেব, কিন্তু তার আগে আমায় একটা জবাব দাও তো—ভারত জিজ্ঞেস করছে—তোমরা আমাকে পণ্ডিতমশাই বলো কেন—

—আজ্ঞে আপনি যে পাঠশালা খুলেছেন, এখানে আপনার নামই হয়ে গেছে ভারত-পণ্ডিত। যাই আবার ওদিকে ডাকাডাকি শুরু হয়েছে, দেখুন না, রামধন ছাড়া কারো একদণ্ড চলে না—অতিথিশালায় তখন জমজমাট ভীড়। পৌষের প্রথম থেকেই নানাজাতের সাধুসন্ন্যাসী, বাউল ভিখারীর আনাগোনা শুরু হয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, অঘোরপন্থী, বামাচারী, তান্ত্রিক, কাপালিক।

গেলবছর নাকি একদল নাগাসন্ন্যাসী এসেছিল। এরা সব গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রী।

পৌষের প্রথম থেকে মাঘমাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদের আনাগোনা চলে।

এই একমাস-দেড়মাস প্রতিদিন গড়ে দশবারোজন করে আসে। দু'তিনদিন থাকে। তারপর পঁচিশ-তিরিশজনের দল জমলে একসঙ্গে রওনা হয়।

এসময়টা রামধন আর ভগীরথের দম ফেলারও ফুরসৎ থাকে না। সাধুবাবাদের হরেকরকম ফৈজৎ। একএকজনের একএকরকম ফরমাস। কেউ ফলাহারী, শুধু ফল খেয়ে থাকেন। কেউ শাকাহারী, নিরামিষ ছাড়া খাবেন না। কারো আবার দুধ না হলে চলবে না। কারো চাই খাঁটি গব্যঘৃত। কেউ অহোরাত্র ধুনী জ্বালিয়ে রাখবেন, তার জন্য অঢেল কাঠ চাই। কোন কোন তান্ত্রিকের জন্য মদ্যমাংসের বিশেষ ব্যবস্থাও রাখতে হয়। তান্ত্রিক সাধুবাবাজীরা আবার বদরাগী। সেবা-যত্নের সামান্য ত্রুটি হলে শাপ-শাপান্ত করবেন। শাপ-মন্যির খুব ভয় রামধনের। তার ধারণা সাধুবাবাদের সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হয়েছে বলেই তার জাজ্বল্যমান সংসার শুষ্কি হয়ে গেছে। নয় তো এখানকার চাকরিতে বহাল হবার পর একটা বছর না ঘুরতেই তার এমন সর্বনাশ হবে কেন। ভগীরথ একবার চুপিচুপি বলেছিল—হবে না কেন পণ্ডিতমশাই ও সাধুবাবাদের ভাগের দুধ চুরি করে খায় আর জল মিশিয়ে রাখে—

সারাটা পৌষমাস অতিথিশালার সব কটি খুপরি বোঝাই হয়ে থাকে। নাটমন্দিরেও পা ফেলার জায়গা থাকে না। এক একদল সাধু একএকটা অংশ জুড়ে বসেন। নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে অন্য কাউকে ঢুকতে দেন না। শুধু রামধন আর ভগীরথ সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে খাতির রাখে ফাই ফরমাশ খাটে। একএকদিন একএকদলের সঙ্গে আরেক-দলের ঝগরা-ঝাঁটি মারামারিও বেঁধে যায়। বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্তর, শৈবর সঙ্গে সহজিয়া বাউলের গালাগালি বকাবকির চূড়ান্ত হয়। তখন আর রামধন সামাল দিতে পারে না। দেউড়ি থেকে ভোজপুরি পালোয়ানেরা ছুটে আসে। কাছারীঘর থেকে নায়েব শিবদাস মুখুজ্জে, খাজাঞ্চী হরকালি সরকার বেরিয়ে আসেন।

তখন হয় তো ঘরের সামনে রোয়াকে বসে ছাত্রদের শব্দরূপ শেখাচ্ছে ভারতচন্দ্র।

—সাধু শব্দের কোথায় কোথায় দীর্ঘ-ঊকার হয় লক্ষ্য করো, প্রথমবার দ্বিবচন, দ্বিতীয়বার দ্বিবচন, বহুবচন আর ষষ্ঠীর, এই বাপু, ওদিকে তাকাচ্ছিস কেন—

—মারামারি লেগে গেছে—একগাল হাসল বাসুদেব—ওই দেখুন—

হরকালী সরকারের ছেলে গৌরপদ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তখন এক ধমক দিতে হয়—এই গোরা বোস্, কান টেনে ছিঁড়ে দেব—

—ওদিকে দেখুন পণ্ডিত মশাই, বাবাও বেরিয়ে এসেছে—গৌরপদ ভয়ানক উত্তেজিত। নাটমন্দিরের ভেতরে এক সাধুবাবা তখন মস্ত একটা চিমটে তুলে, জটাজুট খুলে তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়েছেন। নেড়ামাথা বোষ্টমের দলকে তিনি একাই শায়েস্তা করবেন।

শিবদাস মুখুজ্জে, হরকালী সরকার, রামধন, ভগীরথ—সবাই মিলেও সামাল দিতে পারছে না।

এমন অবস্থায় কি আর কোন ছেলেকে পুঁথির সামনে আটকে রাখা যায়, না আটকে রাখা সম্ভব। দীর্ঘাকার সাধুবাবার আস্ফালনের সামনে সাধুশব্দের দীর্ঘঊকার রহস্যের আকর্ষণ হারিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভারতকেও ওদিকে তাকাতে হয়। ছেলেরা এক পা, দুপা করে রোয়াক থেকে নেমে নাটমন্দিরের দিকে এগোয়। শুধু মহাদেব নির্বিকার। নিজের আসনে বসে একমনে সাধু শব্দ কণ্ঠস্থ করে। বাসুদেবের বড়ভাই মহাদেব। ছাত্রদের মধ্যে সকলের বড়। বছর চৌদ্দ পনেরো বয়স। মহাদেবের মেধা কম, কিন্তু আগ্রহ অধিক। স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর নয়। তথাপি বুদ্ধি চর্চার চেয়ে মুখস্থ করার দিকেই ঝোঁকটা বেশী। একটু বেশী বয়সে পড়াশোনা

শুরু করেছে মহাদেব। ছোটভাইএর সঙ্গে, ছোটভাইএর সমবয়সীদের সঙ্গে পড়তে হচ্ছে বলে মনে মনে কিছুটা সঙ্কুচিত সে।

বয়সের অনুপাতে যতটা সে পিছিয়ে আছে, সেটুকু পরিশ্রম করে পুষিয়ে নিতে চায়।

ওর এই সঙ্কোচের কারণ বুঝতে পেরেছে ভারতচন্দ্র। দুর্বলতার দিকটা ধরে ফেলেছে, তাই উৎসাহ দিয়ে বলে—পড়ো বাবা, ভাল করে পড়ো, বুঝে মুখস্থ করা সবচেয়ে ভাল, কিন্তু সবটা না বুঝলেও ক্ষতি নেই, বারবার পড়ো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ো, জোরে জোরে আবৃত্তি করো, আবৃত্তি সর্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী—

তখন মাঘ মাসের মধ্যভাগ। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সাধু-বাবাদের ভীড়, ভীড়ের গোলমাল কমে গেছে। এখন গঙ্গা-সাগর থেকে ফেরার পথে দু'চারজন এসে দু'একরাত্রি কাটিয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় দলগুলির প্রায় সবাই মাঘমাসের প্রথম দিনদশেকের মধ্যে ফিরে গেছে। তবে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অতিথিশালায় এখনো বেশ ভীড়। সেখানে প্রায় বারো মাসই বহুজনের সমাগম। চৌধুরীমশাইর অতিথিশালা আরো বড়, তার আয়োজনও বিপুল। রামেশ্বর মুখুজ্জের নাটমন্দির প্রায় ফাঁকা। এধারের খুপরিগুলিও খালি।

শুধু ওদিকের একটা ঘরে একজন অতিথি আছেন। বেণীমাধব সিংহ। ডাচকুঠির দালাল। দালালীর ধান্দায় আজ চুঁচড়া, কাল হুগলী পরশু কলকাতা করে বেড়ান।

প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার দু'তিন দিনের জন্য গোন্দলপাড়া আসেন।

আর এক সাধুবাবা আছেন। মাঘ মাসের প্রথম থেকেই এসে জাঁকিয়ে বসেছেন। অতিথি দালানের ঘরে থাকেন না, নাটমন্দিরেও নয়। দেউড়ির বাইরে বড় পুকুরের পাড়ে যে ঝাকড়া বেলগাছটা আছে, তার নিচে আসন পেতেছেন। সাধুবাবা শিবের চেলা। চেহারাখানিও শিবঠাকুরের মতন। বিশাল লম্বা-চওড়া। ধপধপে রঙ, নেয়াপাতি ভুড়ি। পিঙ্গল জটাভার, নাভিমূল পর্য্যন্ত লম্বা দাড়ি।

ভীমাকৃতি একটি ত্রিশূল পাশে পুতে রেখেছেন। ত্রিশূলের সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে। বাবা নাকি মাঘ-ফাল্গুন দুটি মাস এখানে থাকবেন। চৈত্রমাসে যাবেন তারকেশ্বর। অসম্ভব গাঁজা খান বাবাজী। সন্ধ্যের পর থেকেই গাঁজার গন্ধে আর পুকুরঘাটের কাছাকাছি যাবার উপায় নেই। প্রসাদ পাবার আশায় রামধন বাবার পদসেবা করে, গাঁজার কলকি সেজে দেয়, সিদ্ধির সরবৎ বানায়। সন্ধ্যের পর আর রামধনকে এধারে পাবার উপায় নেই। ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল ভারতচন্দ্রের। উনুনে ভাতের হাড়ি চাপানো রয়েছে, দিকে কাঠ ধরছে না। কাঁচা কাঠ এক একবার জ্বলছে আর নিবে নিবে যাচ্ছে।

ফুঁ দিতে দিতে দম ফুরিয়ে গেল, নাকের জলে চোখের জলে একাকার।

ডাকাডাকি শুনে ভগীরথ এল—কি হয়েছে পণ্ডিতমশাই?

—এই ছাখোনা, কাঁচা কাঠ ধরছে না, খালি ধোঁয়া, চোখ-মুখ জ্বলে যাচ্ছে—ভারতের জবাব শুনে আপন মনেই খানিক-ক্ষণ গজগজ করলো ভগীরথ—শুকনো কাঠ যা ছিল, সব সাধুবাবাদের সেবায় গেছে, আজ সকালে একগাড়ি কাঠ এল, সব কাঁচা, তখুনি বলেছিলুম, তিনটে রোদ খাবে, তবে একাঠ উনুনে চড়বে, দাঁড়ান আমি দেখছি—

একটু পরে একবোঝা পাটকাঠি নিয়ে এল ভগীরথ। এরপর আর তেমন অসুবিধে হল না। রান্নার উপকরণও সামান্য। কুমড়ো সেদ্ধ, মানকচু সেদ্ধ আর বেগুন পোড়া।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে চারদিক চুপচাপ হয়ে এল। শীতের রাত। নাটমন্দির প্রায় ফাঁকা। শুধু একপাশে জনা তিনেক বোষ্টম মালসার মধ্যে কাঠকয়লার আগুন জেলে গুটিগুটি মেরে বসে আছে। ভারতের এটোপাতা ভগীরথ

তুলে নিয়ে গেল। জায়গাটাও লেপে পুছে দিল। মাটির হাড়িটা নিজের ঘরে এনে রাখল ভারত। মুখে একটুকরো হরিতকী দিয়ে পুঁথিপত্তরের পুটুলি নিয়ে বসল। বরাবরের অভ্যাস। রোজ এই সময় কিছুক্ষণ পুঁথিপত্তর নাড়াচাড়া করে। প্রদীপের আলোটা উসকে দিল। পাশের খুপরিতে বেণীমাধব সিংহ মশাইর নাসিকাগর্জন। অল্প অল্প শোনা যাচ্ছে। জ্বালানী কাঠের টানাটানি বলে এবেলা আর রান্না করেনি বেণীমাধব। দইচিড়ের ফলার করে কাটিয়ে দিয়েছে।

দূরে একপাল শেয়াল প্রহর ঘোষণা করল। বাইরে রোয়াকের পাশে দাঁড়িয়ে রামধনের পোষা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে জবাব দিল।

তারপর আবার চতুর্দিক নিঃশব্দ। আবার চরাচরব্যাপী শীতরাত্রির গভীর স্তব্ধতা। ভারত নিবিষ্ট মনে পুঁথি পড়ছিল। কয়েকদিন আগে একখানা ছেঁড়া মেঘদূতের পুঁথি হাতে এসেছে। রামেশ্বর মুখুজ্জের বাড়িতে রামায়ণ, পুরাণ কাব্যের কিছু সংগ্রহ আছে। তার মধ্যে ছিল মেঘদূতখানা। অনেকগুলি পৃষ্ঠা ছেঁড়া-ছেঁড়া। হাতের লেখাও ভাল নয়। ভারতের ইচ্ছে পুঁথিখানি নকল করে রাখে। সেই বর্ধমান থাকতে মেঘদূত পড়েছিল। তখন নকল করা হয়নি। সময় পায়নি। বাইরে দরজার ওপাশে রামধনের ডাকাডাকি শোনা গেল—ও পণ্ডিতমশাই, ঘুমিয়েছেন নাকি, ও পণ্ডিতমশাই—

এত রাত্রে, কি আশ্চর্য! কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠল ভারতচন্দ্র। সারা সন্ধ্যাবেলা দরকারের সময় পাত্তা পাওয়া যায়নি। এখন এসেছে বোধ হয় তোয়াজ করতে। দরজা খুলতেই একঝলক কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল।

দরজার মুখে সামান্য একটা ফতুয়া গায়ে দাঁড়িয়ে আছে রামধন। সর্বাঙ্গ থেকে ভকভক করে গাঁজার গন্ধ বেরোচ্ছে। একগাল হেসে বললো—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি—

—না, কি দরকার—

—একবার আসবেন আমার সঙ্গে—

—কোথায় যাব—

—সাধুবাবার কাছে—

কেন কি জন্য?

—বাবাজী, আপনার কপালে কি লেখা আছে, সব বলে দেবেন, এই সময়টা বলেন উনি, আমাকে এমন সব কথা বলেছেন যা, আমি তো শুনে থ, কালরাত্তিরে আমাদের খাজাঞ্চী মশাইকে বলেছেন, তোর বউ আর বেশীদিন বাঁচবে না, ওর যক্ষ্মা হয়েছে—

চমকে উঠল ভারত। আহা, খাজাঞ্চী হরকালী সরকারের ফুটফুটে ছেলে গৌরপদ তার ছাত্র।

ওর মায়ের এই অবস্থা। জিজ্ঞেস করল—সরকারমশাইর স্ত্রী অসুস্থ নাকি—

—ভুগছেতো অনেকদিন, ঘুসঘুসে জ্বর, কাশ, দু'দিন ভাল থাকে, আবার ভোগে, ভুগে ভুগে এ-ই হয়ে গেছে—ডান হাতের তর্জনী তুলে রোগা হবার ভাবটা দেখাল রামধন, তারপর বললো—আপনিও চলুন, আর দেরি করবেন না, অমাবস্যা থাকতে থাকতে জেনে আসবেন চলুন—

আজ অমাবস্যা। খেয়াল হল ভারতের। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

একটু ইতস্তত করে মোটা সুতির চাদরখানা গায়ে জড়াল। প্রদীপ নেবাল।

তারপর দরজায় শেকল তুলে রামধনের পেছন পেছন যেতে যেতে বললো—তোমার শীত করছে না, রামধন—

—হেঁ হেঁ, বাবার প্রেসাদ পেয়েছি কিনা, শীত উড়ে গেছে—

(ক্রমশঃ)

[মানুষের চন্দ্রাভিযান—১১৮ পৃষ্ঠার পর]

১৯৫১ সালে ওয়েষ্ট পয়েন্টের মিলিটারী একাডেমী থেকে স্নাতক হবার পর তিনি বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং কর্ণেল পদে উন্নীত হন।

জেমিনি-৯ মহাকাশযানে তিনি ছিলেন প্রধান চালকের সহকারী। অ্যালড্রিনই ছিলেন জেমিনি-১২ মহাকাশযানের প্রধান চালক। তখন তার সহকারী ছিলেন জেমস লোভেল। ১৯৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর তাঁরা চার দিনের জন্য মহাকাশ সফরে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে তাঁরা ৫৯ বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন। মহাকাশে পদচারণার ক্ষেত্রে তিনি রেকর্ড স্থাপন করেন। এজন্য ১২০ মিনিট তিনি মহাকাশ-যানের সম্পূর্ণ বাইরে কাটান, আর মহাকাশযানের জানালা দিয়ে দেহের অর্ধাংশ বাইরে রেখে কাটান ২০৮ মিনিট। মহাকাশ থেকে সূর্য গ্রহণের বহু আলোকচিত্রও তিনি তখন গ্রহণ করেন।

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৪৭

পুস্তক পরিচয়

কাব্য গ্রন্থ

১। **সত্য ফোটা** : বীরেন্দ্র মজুমদার : বাক সাহিত্য : মূল্য তিন টাকা।

২। **যাত্রী** : বীরেন্দ্র মজুমদার : বাক সাহিত্য : মূল্য পাঁচ টাকা।

৩। **নদীবহে খরধারে** : অমল মিত্র : "বিশ্বমিত্র" : মূল্য পাঁচ টাকা।

বীরেন্দ্র মজুমদার লিখিত দুটি কবিতাগ্রন্থ যে পরিমাণে এক উচ্ছ্বসিত কবিমন প্রকাশিত করেছে, সে পরিমাণে কবিতাকর্মে সিদ্ধি উন্মোচিত করেনি। বিভিন্ন ভাবনাকে বীরেন্দ্র মজুমদার কবিতার আধারে সজ্জিত করেছেন। কিন্তু কবিতার আধার ও তার সজ্জা সর্বত্র শিল্পসম্মত হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি, যদিও কবির বক্তব্যের মধ্যে আন্তরিকতা আছে যথেষ্ট। "সত্য ফোটা" কবিতাগ্রন্থে তার প্রচুর উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। "কয়োনা ক্ষমা", "পরশপাথর" প্রভৃতি কবিতায় শ্রীমজুমদার ঐতিহ্যগত ভাবনাকে প্রকাশিত করেছেন—প্রথমটিতে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন ও দ্বিতীয়টিতে জীবনে বহু কথিত স্পর্শমণির প্রভাব অন্তর্মুখী ভাবনায় বিবৃত করা হয়েছে। "আমার এ-পাগলামিতে পৃথিবীতে পরশপাথর আছে"—এ ভাবনা আমাদের দেশের কাব্য-সাধনায় কোনক্রমেই অভিনব নয়। বীরেন্দ্র মজুমদার সেই বহুশ্রুত কথাটাই শুনিয়েছেন, তাতে আপত্তির কারণ দেখি না, কিন্তু বক্তব্যের ভঙ্গিমা অভিনব না হলে তা মনে দাগ কাটে না। কিন্তু গদ্যভঙ্গীতে লেখা "বৈদান্তিক" কবিতাটির ঘোষণাসম্মত বক্তব্য আমাদের ভালো লেগেছে—"আমি বৈদান্তিক। বুদ্ধের শরণাগত, পথ মাধ্যমিক," কিন্তু এখানেও বক্তব্যকে ছাড়িয়ে কবিতা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করার দিকে কবি দৃষ্টি দেননি। এই গ্রন্থের সেরা কবিতা "মধুর" আমার বক্তব্যকে প্রমাণিত করে—এ বিশ্ব মধুময়, এই সহজ নিরাবরণ তত্ত্বটি কবিতার আলোয় ছড়িয়ে গিয়েছে, "একি মধুর একি মধুর মধুই শুধু মধুময়। মধুর আমি মধুর আমি মধুর আমি জ্যোতির্ময়।"

তুলনায় "যাত্রী" কবিতাগ্রন্থটি বক্তব্যে ও সিদ্ধিতে অনেক সংহত। বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততায়, স্পষ্টতায় এবং দার্শনিক চেতনায় যাত্রী কবিতাটি চিরকালীন ভাবনার প্রতি অনুরাগী পাঠককে আকৃষ্ট করবে,—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদাহরণ দেওয়া যাক :—

"যাত্রী, আছে কতদূর? আকাশের ওই পারে। তোর অন্তঃপুর। যাত্রী, ধরা কিরে যায়? নিষ্ফল সকল শক্তি। শুধুই কৃপায়।" জীবন থেকে মৃত্যুতে, অপ্রেম থেকে প্রেমে। নাস্তি থেকে অস্তিতে মানুষের যে চিরকালীন যাত্রা, তাকেই নানা প্রশ্নে শ্রী মজুমদার মেলে ধরেছেন—

"যাত্রী, সে কি রে অজানা? যদিও দেখিতে তারে—। নাই কোন মানা! যাত্রী, জানো সে কি চায়?। চিন্তায় রহিবে তোর চির অজানায়।"

সংসারের অজস্র চাওয়া, ও পাওয়া, কর্মের বন্ধন, ভক্তি আর ভালোবাসা, বিরহের আগুন দিয়ে জ্বালা চিতার উত্তাপ, কিংবা মুক্তির আশ্বাস—এই অজস্র আশা আর আশাভঙ্গের মনস্তাপের স্তর পেরিয়ে যাত্রী চলে যায় মহাকালের স্রোতের বিচিত্র উপলখণ্ডে। তাই কবি বলেন, "যাত্রী, দক্ষিণা

কেমন? তুই নেই শুধু এক আত্মসমর্পণ।" শেষপর্যন্ত কবিকণ্ঠে বেজে ওঠে, "যাত্রী, বিচিত্র বিস্ময়।। বিস্ময়ের বিস্ময় এযে আত্মপরিচয়।"

দুটি গ্রন্থেরই ছাপা, প্রচ্ছদ ও কাগজ আশ্চর্য রমণীয়।

* * *

অমল মিত্র রচিত "নদী বহে খরধারে" কবিতা গ্রন্থটির ভাষা, আঙ্গিক ও ভাব পুরনো দিনের তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও পূর্বেকার। বাংলা দেশ যে গত ২৫।৩০ বছর ধরে একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে ও তার ফলে ব্যক্তি-মানসে প্রচণ্ড আলোড়ন ও সংঘাত এনেছে এই কবিতাগ্রন্থে তার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কবির ভাবনা চিন্তা কালিদাস রায়—কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির ভাবনাকেও অতিক্রম করে যেতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের কবিতায় যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল, শ্রীঅমল মিত্র, পরিশ্রমী কবি হিসেবে তাও লক্ষ্য করেন নি বলে মনে হ'ল।

এ ছাড়া অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল ১৯৫৪ বা ১৯৫৫ সাল—প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ১৩৭৫ সালে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে। আমার মনে হয় সাম্প্রতিক কবিতা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হলে আলোচকের পক্ষে তাঁর কবিতাবিচার অনেক সহজ ও উপযুক্ত হত।

প্রথম দিকের অধিকাংশ রচনাই বর্ণনাত্মক ও পদ্যধর্মী। কবিতা বলতে যা বোঝায়,—যার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ আছে, তা তেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাতে অনেক ভাবনার সমাহার আছে, কিন্তু সৃষ্টিধর্মিতার স্বাক্ষর নেই। অবশ্যই এই মন্তব্য সর্বাত্মক নয়। "বন্ধ্যা সন্ধ্যা", "হে বৈজ্ঞানিক" প্রভৃতি কবিতা সুলিখিত। বিশেষ করে "নবজাতক" কবিতাটি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে—"আমি হতে চাই যেমন হয়েছে পাখী। আপন খেয়ালে উড়িয়া ফিরিছে। আপন খেয়ালে ডাকি।..... আমি হতে চাই প্রকৃতির হাতে প্রকৃতির কারুকার্য্য। শুধু তারই হাতে মোর লিপি হোক ধার্য।" শ্রী অমল মিত্র তাঁর কবিতায় প্রকৃতির এই কারুকার্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি বলে আলোচক হিসেবে আমি দুঃখিত।

বিজয় কুমার দত্ত

দুর্গত ভারত: শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী: প্রকাশক: শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী —মূল্য ১৲ মাত্র

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত এই গ্রন্থটি মূলতঃ ধর্মভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। গীতা ও উপনিষদের নানা শ্লোকের উল্লেখ লেখকের চিন্তাধারার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার পটভূমি খুব ব্যাপক আকার লাভ করেনি এই গ্রন্থে। লেখক ভূমিকায় বলেছেন "এই পুস্তকে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ আলোকপাত আছে"—দুঃখের বিষয় উদ্দেশ্যকর্মের স্পষ্টতা এবং কৃত্যকর্মের পথ-অনুসন্ধানে, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য যতটা নিরাবরণ সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত, সেই আলো এই গ্রন্থে তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে লেখকের কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে আমরা একমত, যেমন তিনি বলেছেন বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যখন সকলেই ত্যাগ করতে শিক্ষা করে, তখন সমাজ-ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য সম্ভব। কিন্তু এই স্বার্থত্যাগ মানুষের ক্ষুধা-নিদ্রা প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতিদত্ত গুণ নয়। সুতরাং স্বার্থত্যাগ যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে পথ কি? অথবা উপায় কি? এ বিষয়ে লেখক নীরব। অন্যত্র লেখক বলেছেন, "রাজনীতি পালন ধর্মের মূলতত্ত্বকে লইয়াই হইবে। ইহা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য নিরপেক্ষ পালন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।"

ভারতের মত বহুধর্ম ও মতবিশিষ্ট দেশে, লেখক কথিত এই ধর্মের স্বরূপ কি? এবং কিভাবে সে ধর্ম সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় হবে? লেখক সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের তথা মানবজাতির কল্যাণের কথা বলেছেন; প্রসঙ্গান্তরে তিনি কার্ল মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন, বলেছেন যে ব্যবহারিক জগতে সমদর্শন হচ্ছে কার্ল মার্কসের দর্শন। মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে এ মন্তব্য শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, সে দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়কও বটে। তবে এ প্রসঙ্গে মার্কসের একটি উক্তি উল্লেখ করছি—"The philosophers have only interpreted the world in various ways, the point however is to change it." এই পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতান্তর থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থে তার কোনো রেখাপাত নেই।

[সম্পাদকীয়—১৪২ পৃষ্ঠার পর]

লাভ করেছে। প্রথম প্রেফারেন্সে যদি কোনো প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান—অথবা কোটা না পান সেক্ষেত্রে সব চাইতে কম ভোট যে প্রার্থী পেয়েছেন, তার নাম বাতিল হয়ে যাবে তাকে প্রদত্ত সেকেণ্ড প্রেফারেন্সগুলি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রথম প্রেফারেন্সরূপে পরিগণিত হবে। তাই এবার সেকেণ্ড প্রেফারেন্স ভোটও প্রথম প্রেফারেন্সের মতই মূল্যবান হয়ে উঠেছে। 'কোটা' পেতে হলে, কোনো প্রার্থীকে প্রদত্ত ভোট মূল্যকে দুই দিয়ে ভাগ করে সেই ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করলে যে যোগফল হবে। তা পেতে হবে এই যোগফলকে 'কোটা' বলা হয়।

যিনিই নির্বাচিত হউন না কেন, নির্বাচনের পর কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়ে সারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। রেড্ডীর জয় কংগ্রেস সংগঠনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়রূপে চিহ্নিত হবে। গিরির জয় সিণ্ডিকেটের পরাজয়রূপে গণ্য হবে শুধু নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তি সমাবেশে ভারতবর্ষের শক্তিকেন্দ্রে মস্কোর প্রভাব বৃদ্ধি ঘটবে কিনা তা লক্ষ্যণীয়। দেশমুখের জয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে দেশমুখকে কেন্দ্র করে জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদী শক্তিগুলির সংহত হবার সুযোগ ছিল। কিন্তু জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্রের অর্থনৈতিক গোঁড়ামী এবং বিশেষভাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিরোধী অভিযান সে-পথে কণ্টক সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রের রাজনৈতিক অস্থৈর্যে দেশের অর্থনীতিতে অস্থৈর্য ও অনিশ্চিতি সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের পর ভারতবর্ষে প্রবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূকম্পন হবে কিনা সেই উদ্বেগ ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

১৯শে জুলাই ক্যাবিনেটের সর্বসম্মতিক্রমে একটি অর্ডিন্যান্স বলে ১৪টি বাণিজ্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাবটি পুরাতন। পনের বছরেও বেশী পূর্বে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রয়োগের পরিস্থিতির চটক ও আকস্মিকতা এবং বিশেষভাবে এই প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট রাজনীতি জাতীয়করণের মূল্যায়নে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করেছে। এই চৌদ্দটি ব্যাঙ্কের মোট আমানত ২,৭৪১·৭৬ কোটি টাকা এবং মোট দাদন ১৭৪৩·৬৬ কোটি টাকা। বৈদেশিক ব্যাঙ্ক, যে সব ব্যাঙ্ক ভারতের বাহিরে রেজিষ্ট্রিকৃত তাদের ভারতীয় শাখা এবং ৫০ কোটি টাকার নীচে যে সকল ভারতীয় সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের আমানত তাদের জাতীয়করণের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। জাতীয়করণের পর তাদের সংখ্যা ৪৪। ১৯৬৮ সালের শেষে মোট ৫৮টি সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের আমানত ছিল ৩৭৯২ কোটি টাকা এবং দাদন ছিল ২৭৮৩ কোটি টাকা। সুতরাং বড় ১৪টি ব্যাঙ্কে শতকরা ৭২ ভাগ আমানত ও শতকরা ৬৫ ভাগ দাদনের ব্যবসা ছিল। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ১৯৫৪ সালে জাতীয়করণ হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের আমানত বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ১৪টি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হলে শতকরা ৮৫ ভাগ আমানতই জাতীয়করণের সীমানায় সংহত হবে। ষ্টেট ব্যাঙ্কের প্রশাসন সম্পর্কে অভিযোগ থাকলেও ১৯৬৮ সালে এই ব্যাঙ্কের দাদন ও আমানতের অনুপাত শতকরা ৬১·২ ভাগে বৃদ্ধি পায় এবং প্রাইভেট সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিতে এই অনুপাত শতকরা ৬৬·১ ভাগ থেকে ৬৩·৫ ভাগে হ্রাস পায়। অর্থাৎ যে সময় শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দাদন বৃদ্ধির উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, সে-সময় প্রাইভেট সেকটরের ব্যাঙ্কগুলি দাদন নেবার লোক খুঁজে বার করতে পারছেন না। অর্থাৎ এই বর্ধিত আমানত ব্যাঙ্ক পরিচালক শিল্পপতিদের কুক্ষিগত হয়ে তাদের শিল্পগত সাম্রাজ্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্কপরিচালক-শিল্পপতিদের এই সুযোগ বন্ধ হবে। এ-ছাড়া, ফাটকা এবং অন্যান্য অনুৎপাদক খাতে ব্যাঙ্কের আমানত ব্যবহারের সুযোগও বন্ধ হবে।

জাতীয়করণের ফলে পাবলিক সেকটরের আওতায় অধিকতর অর্থসংস্থান হয়ে প্লানের ঘাটতি মেটাতে নিঃসন্দেহে সহায়তা করবে। তবে জাতীয়করণের ফলে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে কৃষি ক্ষেত্রে দাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার দায়িত্ব নিতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সাহায্য এ-যাবৎ কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প বেশী পায় নাই বলা যায়। শিল্পে অনুন্নত রাজ্যগুলির বেলায়ও তাই।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পাশাপাশি জাতীয়কৃত ক্ষেত্র এবং বে-সরকারী ক্ষেত্র, পরিণামে আমানত বে-সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির দিকে ঠেলে দিয়ে জাতীয়করণের সার্থকতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং, অন্যান্য ব্যাঙ্ক এবং বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলিরও জাতীয়-করণের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। জাতীয়-করণ একটি অন্তিম লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। এই উপলক্ষ্যের উদ্যোগে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কায়েমী স্বার্থের কঠোর নিয়ন্ত্রণ চূর্ণ করে জাতীয় সম্পদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ মুষ্টিমেয়ের হাত থেকে বৃহত্তর জনসমাজের স্বার্থে প্রয়োগ করতে হবে। জাতীয়করণের পরও যদি মুষ্টিমেয়ের শোষণই অব্যাহত থাকে, তবে সরকারী পোষকতায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া অধিকার স্থায়িত্ব পাবে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অমায়িক অধ্যাপক, সুপণ্ডিত, ভাষাবিদ এবং পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার নূতন ভগীরথ, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা গত ১২ই জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগে পরলোকগমন করেছেন।

ডঃ শহীদুল্লা ১৯১০ সংস্কৃতে বি, এ, অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন; কারণ ইতিপূর্বে কোনো মুসলীম ছাত্র সংস্কৃতে অনার্স পরীক্ষা দেন নাই। কিন্তু সংস্কৃতে এম, এ পড়বার পথে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের একটি মুসলীম ছাত্রকে বেদপাঠে অধিকার দিতে অনিচ্ছা, বাদ সাধলো। এই ঘটনা সেদিন তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলো। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এই মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাকে 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' নিয়ে এম, এ পড়তে হয়। অপার ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ডঃ শহীদুল্লা বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, পালি, প্রাকৃত, উর্দু, হিন্দি, পার্শী, আরবী, অসমীয়, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিব্রু, গ্রীক, পুস্তু, পুরাতন সিংহলী, তিব্বতী এবং আবেস্তান ভাষা জানতেন। বাংলা, ইংরাজী, ফরাসী, উর্দুতে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও. বাংলাভাষার প্রতি প্রীতি তাঁর জীবনব্যাপী জ্ঞান-সাধনায় উৎসারিত হয়েছে।

২৪ পরগণার জেলার পিয়ারা গ্রামে ১৮৮৫ সালে ডঃ শহীদুল্লা জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে বৃত্তি নিয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে তিনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন পরীক্ষায়ও সফল হন। অতঃপর একটি সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গবেষণার সুযোগ পেলেও, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে সে-সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ১৯১৯ সালে স্যার আশুতোষ তাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গবেষকরূপে নিযুক্ত করেন এবং তার দুই বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃতের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগেও শিক্ষকতা করেন।

১৯২৩ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে ডক্টরেট উপাধিলাভের পর আরবী ও সংস্কৃত পাঠের জন্য ডঃ শহীদুল্লা ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯৩৭ সালে ডঃ শহীদুল্লা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হয়ে বহু ছাত্রকে মৌলিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেও দেশ-বিভাগের পর উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব অনুভূত হওয়ায় আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ৭৩ বছর বয়সে ১৯৫৫ সালে ডঃ শহীদুল্লা শিক্ষকতা থেকে স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ করেন।

ডঃ শহীদুল্লা বাংলায় ইসলাম সম্পর্কে একটি এনসাইক্লো-পেডিয়া রচনার কাজ সুরু করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পর্কিত প্রামাণিক পুস্তক রচনা করেন। তিনি কোরান এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর বাংলা অনুবাদ ছাড়াও অনেক উর্দু সাহিত্যের অনুবাদ রেখে গেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলীম কবি আলোয়ালের গীতি-নাট্য 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা ডঃ শহীদুল্লার একটি অক্ষয় কীর্তি। বাংলা ভাষায় অগণিত পুস্তক রচনা এবং বাংলা ব্যাকরণ রচনায় কৃতিত্বের জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তাকে ১৯৫৮ সালে ১০,০০০ টাকার পুরস্কার দেন। এ-ছাড়া "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" এবং "বঙ্গ-ভূমি" পত্রিকার সম্পাদনায় ডঃ শহীদুল্লার কৃতী সম্পাদনার স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

উভয় বাংলার এই কৃতী সন্তানের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

৩১.৭.৬৯

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

23 AUG 1969

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাধনা ঔষধালয় চাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 0,80. with Postage Rs. 1·55
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road, Calcutta-47

১৬৭৬
জয়

সম্পাদিকা :
লীলা রায়

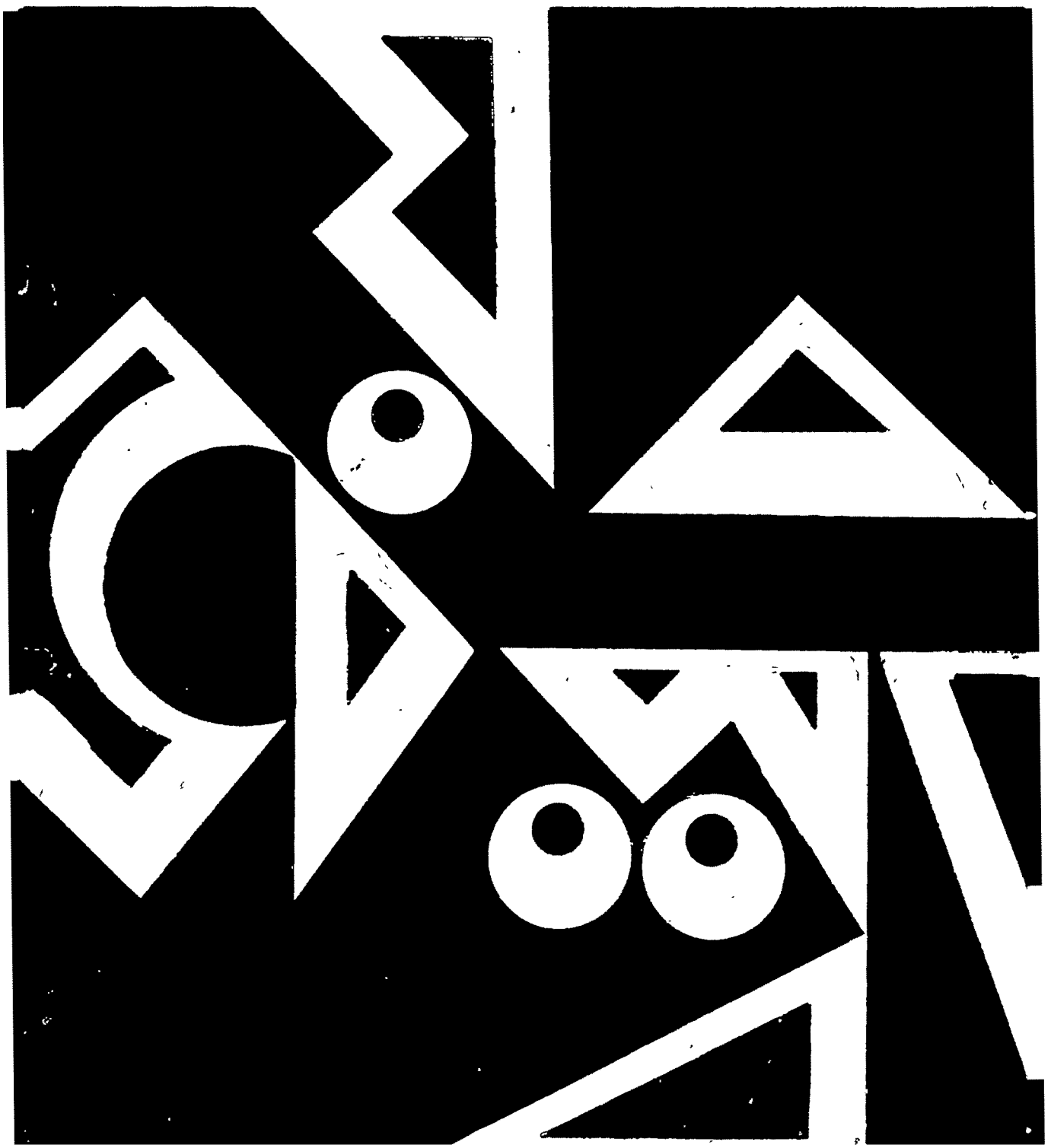

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

ভাদ্র : জয়শ্রী : ১৩৭৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুভাষ বাণী		২৬১
সম্পাদকীয়		২৬২
বাঙ্গলার জাগরণ (রাজনৈতিক প্রবন্ধ)	কালীচরণ ঘোষ	২৬৭
চার্লস ডিকেন্স (সাহিত্য আলোচনা : অনুবাদ)	পথচারী	২৭৭
বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র (ধারাবাহিক আলোচনা)	সুরজিৎ দাশগুপ্ত	২৮৮
জাপানের দিনগুলি (ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী)	বারীন বর্ধন	২৯৭
কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৩০২
পুস্তক পরিচয়		৩০৮

সম্পাদনা : সুনীল দাস
সহযোগী সম্পাদক

দেশনেত্রী লীলা রায়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব

আগামী ২রা অক্টোবর দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের সপ্ততিতম জন্মদিন। গত বিশ মাস যাবৎ তিনি সুখলাল কারনানী হাসপাতালে হার্ট ইউনিটের ক্যাবিনে রোগ শয্যায় শায়িতা। তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্ম জীবনে যে সংগ্রাম তাঁর নিত্যসহচর ছিল, মৃত্যুর সঙ্গে গত বিশ মাসের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম সেই বৈপ্লবিক জীবনের আর এক অলৌকিক অধ্যায় রচনা করে চলেছে।

চিরসংগ্রামী বিপ্লবী দেশনেত্রীর সপ্ততিতম জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আগামী ২রা অক্টোবর, '৬৯ বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায় ১।১ হরিশ মুখার্জ্জি রোডে সরলা রায় মেমোরিয়াল কম্যুনিটি হলে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে।

এই সভায় পৌরোহিত্য করবেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়শ্রী কার্যালয়
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭
ফোন ৪৬-৪১১৬
২০.৯.৬৯.

পরিচালকমণ্ডলী
জয়শ্রী

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

'...আমার মতে, প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত এবং স্কুল কলেজে সুভাষের মহান জীবন জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত।'

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু

...'সুভাষচন্দ্র' প্রথম খণ্ড পাঠের ফলশ্রুতি কেবল সমুদ্র স্নানের চরিতার্থতার সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। সমুদ্র সন্তরণ নিছক শারীরিক ব্যায়াম নয়, মানসিক সাহস ও বীর্যেরও উদ্দীপক। পবিত্রকুমারের সাধনার মধ্যে যে-কোনো পাঠক যুগপৎ সে ব্যায়াম ও বীর্যে নিষ্ণাত হতে পারার সঞ্জীবতাটুকু সংগ্রহ করতে পারবেন'—

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

'... এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।' —যুগান্তর

...'বিস্মিত হয়েছি লেখকের গভীর গবেষণায় আর অনুভূতির তীব্র মাধুর্যে, তাঁর ঐতিহাসিক সমীক্ষায় আর রাজনীতিক দূরাবগাহনে, পুলকিত হয়েছি তাঁর প্রসাদ-গুণসমৃদ্ধ ভাষার সাবলীল শ্রীমণ্ডিত ব্যবহারে, গভীর শ্রদ্ধার অকৃত্রিম আন্তরিকতায়।'

—যুগবাণী

দাম : নয় টাকা

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন : ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক। জয়শ্রী প্রকাশন : ২৫১-এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭

জয়ন্তী

৩৪ বর্ষ ০ পঞ্চম সংখ্যা ০ ভাদ্র ১৩৭৬

সুভাষ-বাণী

…"পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে।…… তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত-সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে একবাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের ব্রত হইবে—দেশমাতৃকার চরণে সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব।…"

[নূতনের সন্ধান : অভিভাষণ, ১লা পৌষ, ১৩৩৪]

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্তা লীলা রায় আজ ৫৯৭ দিন যাবৎ পি জি হাসপাতালের হার্ট ইউনিটে রোগশয্যায় শায়িতা রয়েছেন। আজও তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসে নি। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে convulsion হয়ে সাময়িকভাবে অবস্থার অবনতি ঘটায়। গত ৮ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ তাঁর হাসপাতালে অবস্থানের ৫৮৬ দিনের দিন বিকাল ৩টায় পাঁচ মিনিট ব্যাপী convulsion হলে তাঁর অবস্থার কিছু অবনতি ঘটে। সে সময় থেকে সারারাত অক্সিজেন দিলে তার পর দিন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হন। বিধাতার কাছে আমরা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা জানচ্ছি।

১৯শে সেপ্টেম্বর, '৬৯

পরিচালকমণ্ডলী

জয়শ্রী

হো-চি-মিন

ভিয়েৎনামের জাতীয় সংগ্রামের মহান নায়ক হো-চি-মিনের দেহান্তরে সমগ্র বিশ্ব অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন এই মহান বিপ্লবী নেতাকে। হো-চি-মিন এশিয়ার জনজীবনে জাতীয় সংগ্রামে এক, আদর্শোজ্জ্বল প্রতিভূরূপে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আজকের জগতে জীবন ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি খুব কম রাজনৈতিক নেতার মধ্যেই পাওয়া যায়। হো-চি-মিন ভিয়েৎনামের শ্রেষ্ঠতম নায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন ছিল সরলতা, নিরহঙ্কার এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধের মহত্বে সুদীপ্তমান। তাই ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ হো-চি-মিনকে একান্তভাবেই আপন করে নিয়েছিল। মহান বিপ্লবী হো-চি-মিনের জীবন ও আদর্শের এমন নৈতিক সঙ্গতি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সামনে এক সাগ্রহ আহ্বানরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিণতির সঙ্গে হো-চি-মিন এক বিশেষ আদর্শবাদেরই অনুসরণ এবং বিশেষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহযোগী হতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি সর্বাগ্রে এবং সর্বান্তে ছিলেন একজন অবিমিশ্রিত জাতীয়তাবাদী। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের যুগ থেকে যুদ্ধান্তিক মুক্তি সংগ্রামের যুগেও তিনি কঠোরভাবে জাতীয়-স্বাতন্ত্র ও জাতীয় আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। চীনের সঙ্গে ভিয়েৎনামের ছিল প্রায় এক হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন বৈরিতা। রুশ-চীনের প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়েও তিনি রাশিয়া বা চীনের সৈনিকদের ভিয়েৎনামের ভূমিতে প্রবেশ করতে দেন নি। অত্যন্ত সীমিত জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও বিপুল চীনা জনপ্লাবনের একটি ঢেউকেও 'মুক্তি সংগ্রাম,' 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব সংগ্রাম' ইত্যাদি সদা সোচ্চারিত কম্যুনিষ্ট শ্লোগানের প্রভাবে কখনো তিনি চীনের একটি বাহিনীকেও

ভিয়েৎনামের মাটিতে পা বাড়াতে দেন নি। টিটো নিজের চেষ্টায় এবং নিজস্ব জাতীয় জন-শক্তির সম্বলে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আজও তিনি যুগোশ্লাভিয়ায় নিজের স্বাতন্ত্র রক্ষায় সক্ষম হয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি নামে মাত্র 'স্বাধীন' হলেও, একমাত্র বিচ্ছিন্ন কিউবা ছাড়া শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়া বা চীনের রাজনৈতিক তাবেদারে পরিণত হয়েছে। তাই, ভিয়েৎনামে পাঁচ লক্ষ মার্কিন-ফৌজের প্রবল চাপ সত্বেও এবং চীনের বিপুল সামরিক বাহিনীর সুযোগ গ্রহণের আহ্বান সত্বেও চীনা বাহিনীকে ভিয়েৎনাম-ভূমিতে প্রবেশ করতে দেন নি। হো-চি-মিনের এই অখণ্ড, একনিষ্ঠ ও প্রগাঢ় জাতীয়তাবাদই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ ও জাতীয় সংগ্রামের মূল বৈশিষ্ট্য, সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদের উর্দ্ধে ছিলেন তিনি সচেতন, সক্রিয় ও আপোষহীন জাতীয়তাবাদী, ভারতীয় জনতার কাছে এটাই হো-চি-মিনের জীবনের প্রধান শিক্ষা। এই মহান জাতীয়তাবাদী বা এশিয়ার মহান বিপ্লবীর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

নেতাজী রহস্য তদন্তে ভারত সরকারের অস্বীকৃতি

ভারতীয় পার্লামেণ্টের প্রায় চারশত সদস্য অর্থাৎ প্রায় পয়ত্রিশ কোটি ভারতীয় জনতার প্রতিনিধি নেতাজী রহস্য উদ্ধারে এক স্মারক-লিপিতে দাবী জানিয়েছেন ভারত সরকারকে। এই স্মারক-লিপি পেশ হওয়ার পরে প্রথম দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় পুনরায় প্রায় পঞ্চাশজন লোকসভার সদস্য প্রধান মন্ত্রীকে তদন্তের অনিবার্যতা সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই পুনঃস্মরণ লিপিতে বলা হয়েছে যে গান্ধী হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হওয়া সত্বেও বিশ বছর পরে গান্ধী হত্যার পৃষ্ঠভূমি অনুসন্ধানে এক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জনসংঘ নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কোর্টের বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সত্বেও দিল্লী সরকার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। অথচ এযুগের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর জীবন রহস্যাবৃত থাকা সত্বেও সরকার এখনও নেতাজী সম্বন্ধে তদন্ত করতে রাজী হচ্ছেন না।

নেতাজী সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধানের মূল বক্তব্য হলো; প্রথমত, শাহ নওয়াজ কমিটির যা যে স্তরের ছিল সেরূপ একটি কমিটির পক্ষে জটিল আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে নেতাজী রহস্য উদ্ধারের যোগ্যতা প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না; দ্বিতীয়তঃ ফরমোজার যে তাইহোকো বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনা হয় বলে বলা হয়েছে তদন্ত কমিশন সেই অকুস্থলে তদন্তের জন্য যায়নি বা ফরমোজা সরকারের সাহায্য নেওয়া হয়নি, তৃতীয়তঃ নেতাজী সম্বন্ধে বৃটেন ও আমেরিকা কর্তৃক তদন্ত হওয়া সত্বেও এবং নেতাজীর রাশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা থাকা সত্বেও শাহ্ নওয়াজ কমিশন তদন্তের সময়ে এই সব সরকারের দলিল পত্রগুলি অনুসন্ধান এবং মতামত গ্রহণ করেনি; চতুর্থত শাহ্ নাওয়াজ কমিশন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দলিলের যথোপযুক্ত সন্ধান ও ব্যবহার করেনি এবং পঞ্চমতঃ কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার পরে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে যা কথিত বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে নতুন সন্ধান দিতে পারে। এরূপ সবল ও অকাট্য যুক্তি সত্বেও ভারত সরকার এখনও নতুন তদন্তে রাজী হয়নি।

সম্প্রতি, সরকারী পক্ষ থেকে জানান হয়েছিল যে নেতাজী সম্বন্ধে পুনরায় তদন্ত করা হবে। কয়েকজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে জানান যে নতুন তদন্ত সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীও জাতীয় নেতাজী কমিটির আহ্বায়ককে জানান যে তিনি নতুন তদন্তের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করবেন। এই সমস্ত বিষয় নেতাজী কমিটির

আহ্বায়ক ১১ই সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন। কিন্তু এরূপ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পার্লামেণ্টের সংখ্যাধিক্য সদস্যদের দাবী অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন ভারত সরকার।

নেতাজী সম্বন্ধে পুনঃ তদন্ত না হলে ভারত সরকার ভারতের বর্তমান ও ভাবী বংশধরদের কাছে এক অপরিহার্য্য জাতীয় কর্তব্য পালনে উপেক্ষা, অবহেলা ও অনিচ্ছার অপরাধে অপরাধী হবেন। ভারতের যুবক সম্প্রদায়কে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করে নেতাজী রহস্য উদ্ধারে পুনঃ তদন্ত করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে বলেআমরা মনে করি।

দিল্লীর রবীন্দ্র রঙ্গশালার ঘটনায় তদন্ত চাই

এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মহান নামের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলঙ্কিত করার জন্য যেন ঘৃণিতভাবে উদ্যত হয়ে উঠেছে! রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার ছয় মাস পরে ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর রবীন্দ্র রঙ্গশালায় আরেকটি অতি লজ্জাকর ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা আরও বিশেষভাবে গ্লানিকর এজন্য যে এই অনুষ্ঠানে বহু বিদেশী যুবক ও যুবতী উপস্থিত ছিল। এই ঘটনায় শুধু দেশবাসীর কাছে নয় বিদেশের কাছেও ভারতের জাতীয় মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ দিল্লীর কাগজগুলি এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং একমাত্র প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দল এই ঘটনা সম্বন্ধে নিন্দা-করেনি এবং তদন্তের দাবী জানায় নি। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার ন্যায় আমরা রবীন্দ্র রঙ্গশালায় অনুষ্ঠিত ঘটনারও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করি।

কেন্দ্র সরকারের একজন উপমন্ত্রী, শ্রীমতী সরোজিনী মহিষী, এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন, অথচ তিনি আজ পর্যন্ত কোন বিবৃতি দিয়ে এই ঘটনার বিবরণ প্রকাশ এবং নিন্দা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি, একজন কেন্দ্রমন্ত্রীর পক্ষে এরূপ আচরণ অমার্জনীয় বলেই আমরা মনে করি।

দুর্বৃত্তের দুরাচার, বিশেষ করে যে ঘটনায় মহিলাদের মর্য্যাদা জড়িত থাকে, তা' যেখানেই ঘটুক না কেন, মানবতা ও জাতীয় নৈতিকতার দাবীতে তার প্রবল নিন্দা এবং এরূপ দুরাচারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী তোলা আমরা এক অলঙ্ঘনীয় জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি।

ঘোষ কমিশনকে প্রহসনে পরিণত করার চক্রান্ত

যুক্তফ্রন্টের সরকারের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবলতর জনমতের চাপে পঃবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা সম্বন্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা এই কমিশনের কাজকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই ঘটনার ভুক্ত-ভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা যাতে কমিশনে সাক্ষ্য না দেয় তার জন্য কলকাতায় এক সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বর্তমানে পঃবঙ্গে আইন, শাসন বা পুলিশের সাহায্য লাভ এরূপ অনিশ্চিত হয়ে গেছে যে নিজেদের ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে কমিশনের কাজকে সফল করার জন্য খুব কম ব্যক্তিই সাহসী হয়েছেন। তার ফলে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা সম্বন্ধে যারা প্রত্যক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে পারেন এরূপ খুব কম সাক্ষীই নির্ভয়ে কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে এসেছেন।

তবুও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে জন কয়েক নির্ভীক নাগরিক একটি কমিটি গঠন করে সাধ্যমত ঘোষ কমিশনের কার্যে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর

হন। এই কমিটির সদস্যরা শুরু থেকেই একটি দলের সমর্থকদের কাছ থেকে বিরূপ সমালোচনা, হুমকি ও সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। সম্ভাব্য সাক্ষীদের বাড়ি গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার আগে ও পড়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এক শ্রেণীর দর্শক প্রতিদিন কমিশন গৃহে উপস্থিত হয়ে নাগরিক কমিটি এবং অন্যান্য বেসরকারী কমিটির কৌসুলী এবং কর্মীদের প্রতি দিনের পর দিন কটূক্তি প্রয়োগ ও পরোক্ষ ভীতি প্রদর্শন করার কাজ সুপরিকল্পিতভাবে করে যায়।

পুলিশের সাক্ষ্যদানের সময়ে এই শ্রেণীর দর্শকেরা নাগরিক কমিটি ও অন্যান্য বেসরকারী কমিটির কর্মী ও কৌসুলীদের উপরে সুপরিকল্পিতভাবে হিংস্র আচরণ করে কমিশনের কাজকে বানচাল করে দেওয়ার চক্রান্ত এক চরম পর্য্যায়ে নিয়ে যায়। নাগরিক কমিটির সম্মানীয় ব্যক্তিদের শুধু দৈহিক ভাবেই লাঞ্ছিত করা হয় নি, তাদের অকল্পনীয় কুৎসিত ভাষায় অপমানিত করা হয়েছে। মহিলা কর্মীরা পর্য্যন্ত রেহাই পায় নি।

১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর ঘোষ কমিশনের গৃহে যে বর্বর ঘটনা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া ও কোর্টের নিরাপত্তা স্বাধীনতা রক্ষার পরিবর্তে সরকার দুষ্কৃতিকারীদের কাজের সাফাই দিয়ে একটি অসত্য ও অ-তাথ্যিক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। এমন কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কমিশনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বিধান সভায় আগেই গেয়ে রেখেছেন যে কমিশন নাকি গুরুতর কোন ঘটনার সন্ধান পান নি।

ঘোষ কমিশনে অনুষ্ঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাড়া ভারতের বিশিষ্ট নেতারা নিন্দাত্মক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই কমিশনের কার্যকলাপ বানচাল করার এই অপচেষ্টার পশ্চাতে সরকারের পরোক্ষ সমর্থনের প্রতিবাদে এবং আইনজীবি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মর্যাদা রক্ষার ও নিরাপত্তার দাবীতে নাগরিক কমিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কমিশনের কাজে সহায়তাদান থেকে বিরত হয়ে যথার্থ কাজ করেছেন।

বিজন সেনগুপ্তের প্রয়াণ

আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের প্রাক্তন সহ-সম্পাদক শ্রীবিজন সেনগুপ্তের প্রয়াণে আমরা গভীর শোক অনুভব করছি, শ্রীসেনগুপ্ত ৺অনিল রায় ও শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের সহকর্মীরূপে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং তিনি হিজলী ও দেউলী জেলে দীর্ঘদিন অন্তরীণ ছিলেন। তিনি নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং নেতাজীর ফরোয়ার্ড ব্লক সাপ্তাহিক পরিচালনায় বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'ম্যান অব ডেষ্টিনি' নামে তিনি নেতাজীর একটি জীবনী রচনা করেন। তিনি বন্ধু মহলে অমায়িক ও হৃদয়বান সহযোগীরূপে সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমাদের এই বিপ্লবী সহযোগীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পরলোকে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

পঃবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে বাংলার বিপ্লবী মহল একজন প্রাক্তন সহকর্মীকে হারালো। নিরঞ্জন বাবু অনুশীলন সমিতির একজন সভ্যরূপে বিপ্লবী আন্দোলনে বিশেষ কৃতিত্বের ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন। তিনি সারা জীবন নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে এক বিপ্লবীর জীবন যাপন করেন। একজন মন্ত্রীর চেয়েও তার জীবনের বৈপ্লবিক অবদান বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে গৌরবের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়ে থাকবে। নিরঞ্জন বাবুর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক সহানুভূতি।

উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন

কম্যুনিষ্ট পার্টিদ্বয় শ্রীমতী ইন্দিরা অনুরাগ এবং নেতাজী বিদ্বেষে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হলে নেতাজীর সহকর্মী শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ যে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতেন তাঁর প্রাপ্ত ভোটেই তা' সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কম্যুনিষ্টরা তৃতীয় প্রার্থী পিল্লেকে খাড়া করে এবং তাঁকে নাম প্রত্যাহারে বাধা দিয়েই শুধু শ্রীকামাথের নির্বাচনী সম্ভাবনা ব্যাহত করেনি—ভোট গণনা, ভোট দানের রীতি এবং বিভিন্ন ভোটারদের কাছে কম্যুনিষ্ট নেতাদের বক্তব্য থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ইন্দিরা মনোনীত শ্রীপাঠককে প্রথম ও শ্রীপিল্লাইকে দ্বিতীয় ভোট দিয়েছে। পার্লামেণ্ট সদস্যেরা এক বাক্যে শ্রীকামাথকে যোগ্যতম প্রার্থীরূপে বর্ণনা করেও কম্যুনিষ্টদের ইন্দিরা অনুরাগীর চক্রান্ত ও সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির মধুলিমাই গোষ্ঠির অন্ধ পি, এস পি বিরোধিতার ফলে এই যোগ্যতম প্রার্থী, সংগ্রামী, বিপ্লবী, সুদক্ষ পার্লামেণ্টারিয়ান ও নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর পক্ষে জয় লাভ করা সম্ভব হয়নি।

খান আবদুল গফ্‌ফর খানের ভারত সফর

সীমান্ত গান্ধী ভারত সফরে আসছেন ১লা অক্টোবর। তাঁর সহকর্মী কংগ্রেস নেতারা যে ভাবে সীমান্তবাসী জাতীয় সংগ্রামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন কোন জাতির ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সীমান্তবাসী পাঠানেরা পাকিস্তানের হাতে চরমভাবে নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হয়ে পুনরায় পরাধীন হয়েছে এবং খান আবদুল গফ্‌ফরখান ১৬ বছর পাক-কারাগারে নিজের জীবন ক্ষয় করতে বাধ্য হয়েছেন।

সীমান্ত গান্ধীর ভারত সফরকে আমরা স্বাগত জানাই। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান নায়ক—যার অপূর্ব নির্ভীক চরিত্রের তুলনা খুব কমই আছে—তাঁকে সর্বভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আমরা দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি। সীমান্তবাসীদের সংগ্রামে ভারতবাসীরা এগিয়ে আসবে বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। মহান নেতা সীমান্ত গান্ধীর প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আন্দামানের নামান্তর

পার্লামেণ্টের সদস্যদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে স্থানীয় জনসাধারণের বিরোধিতার ফলে আন্দামানের নাম পরিবর্তন করে নেতাজীর দেওয়া 'শহীদ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ' নাম রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুত আন্দামান ও নিকোবর নাম 'ইরোরোপীয়ানদের দেওয়া এবং এই নাম দুইটি এই দ্বীপের আদিবাসীদের প্রতি সম্মান নয় বরং অমর্য্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। আন্দামানের জনসাধারণদের যদি পুরানো নামের কদর্যতা এবং নেতাজী দেওয়া নামের স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তা' হলে এই দ্বীপবাসীরা আজাদ-হিন্দ সরকার প্রদত্ত নাম গ্রহণে রাজী হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। লোকসভার বর্তমান কংগ্রেস কিন্তু অতীতের এক কম্যুনিষ্ট সদস্য শ্রী কে, আর, গণেশ আজাদ হিন্দ ও নেতাজীর প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য স্বাক্ষরিত নাম দুটি গ্রহণে কৃত্রিমভাবে আদিবাসীদের মধ্যে বিরূপ সমালোচনা সুরু করেছে। যথার্থভাবে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা হলে দ্বীপবাসীরা শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ নামে দুটি গৌরবের সঙ্গে গ্রহণ করতে অগ্রসর হবে বলে আমাদের ধারণা।

উত্তর বঙ্গে বন্যার প্লাবন

ভয়াবহ বন্যার প্লাবনে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার কতগুলি অঞ্চল এবছরে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু ঘরবাড়ি ও পশু এবং

শেষাংশ ৩১০ পৃষ্ঠায়

বাঙ্গলার জাতীয়তা

কালীচরণ ঘোষ

(৩)

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

দূরদর্শী বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকে শীঘ্রই ইংরেজি শিক্ষার সুফল লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন। ভারতে অবস্থিত বিদেশীর সহযোগিতায় এবং সরকারী সমর্থনে শক্তি লাভ করে বাঙ্গলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের একটা বিরাট প্রচেষ্টা হয়েছিল। এখানে সিপাহী সংগ্রাম ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে যে সকল শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলার নানাস্থানে গড়ে ওঠে তার কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। তাই থেকেই সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হ'তে পারবে।

এই যুগে জাতীয়তাভাব প্রসার চেষ্টা শিক্ষিত, তন্মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ, লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলি প্রতিবৎসরই নতুন ছাত্রদের শিক্ষাদান করেছে এবং জাতীয় আন্দোলনও পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সে যুগে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অবশ্য তার অনেকগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে নূতন স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ছাপ পেয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। এ ঘটনার আগে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, হয়ত স্কুল থেকে কলেজে পরিণত হয়ে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের কথা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য ঐকালেও বহু বেসরকারী পাঠশালা প্রভৃতি অবস্থিত ছিল।

স্মরণ রাখতে হবে (১৮৩৫ ফেব্রুয়ারী ২-রা) সেকেলের শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে মন্তব্য ইংরেজি শিক্ষা সুগম করেছিল।

স্কুল কলেজ ও 'সোসায়েটি'

একেবারে গোড়ার দিকে ১৭৮১-তে হেষ্টিংস কর্তৃক ক্যালকাটা মাদ্রাসা (Calcutta Madrasa) প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য : "enabling the Mohamedans of Bengal to acquire such knowledge of Arabic literature and Sciences as would qualify them for public service."—সরকারী কাজের জন্য লোক পাবার আশায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত হ'লো।

বাঙ্গলার বাইরে হলেও ইংরেজি শিক্ষার আদিযুগে বেনারস সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ১৭৯২-তে। উদ্দশ্য, "cultivation of language, literature and the religion of the Hindus,"—হিন্দুদের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে চর্চা। ১৮৩০-তে একটি স্বতন্ত্র ইংরেজি স্কুল জন্মে ; ১৮৫৩-তে পূর্ব্বেকার "কলেজ"-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

এশিয়াটিক সোসায়েটি

স্কুল বা কলেজ না হলেও বাঙ্গলার শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও ধারাবাহিকতা রাখবার জন্য এর উল্লেখ করতে হচ্ছে।

বাঙ্গলা দেশে তথা সারা ভারতবর্ষে, এশিয়াটিক সোসায়েটির দান অতুলনীয় ; আর এটির নিজস্ব গুণ ও

প্রয়োজনীয়তার জন্য আজও সগৌরবে টিকে আছে। (William Jones) জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (Charles Wilkins) উইলকিন্স, (William Chambers) চেম্বার্স, (John Shore) শোর, (Francis Gladwin) গ্ল্যাডউইন, (John Carnac) কারনাক, (Jonathan Duncan) ডানকান প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ভারতকে তার লুপ্তপ্রায় প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার জনসাধারণের গোচর করে গেলেন, চক্ষু খুলে দিয়ে নূতন প্রাণের স্পন্দন দান করলেন।

জোন্স ১৭৮৪(জানুয়ারী ১৫-ই) এশিয়াটিক সোসায়েটির পত্তন করেন। মুখপত্র (Asiatic Researches) এশিয়াটিক রিসার্চেস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ জানুয়ারীতে। দেশ ও বিদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম্ম, দর্শন, কলা, সাহিত্য, প্রাচীন লিপির কোষ্ঠী বিচার, মুদ্রাতত্ত্ব, প্রকৃতি পরিচয়, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের চতুঃসীমার মধ্যে সমিতির অনুসন্ধানে গবেষণার দ্বারা মানুষ ও প্রকৃতি যা দান করেছে সে সকল জ্ঞান সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা।

যাঁরা এ সকল দুষ্প্রাপ্য আয়াসলভ্য প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীকে দান করে গেছেন, তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, জ্ঞানানুসন্ধিৎসা, নিঃস্বার্থ কর্ম্মানুরক্তি এবং ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতির কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। আজ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের 'মরা সুসাইটি' অর্থাৎ মিউজিয়াম, ভূতত্ত্ববিভাগ, আবহ-নির্ণয় বিভাগ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান কয়টি এশিয়াটিক সোসায়েটির প্রেরণায় সৃষ্ট হয়েছে।

'সোসায়েটি' একটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান। ১৮২৯ পর্য্যন্ত এখানে কোনো ভারতবাসী সমিতির সভ্য মনোনীত না হলেও বিদ্বান বিচক্ষণ ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজ পণ্ডিতদিগের সংযোগ ঘটিয়ে ভারতের মহদুপকার সাধন করেছে। এই সম্পর্কে জোন্স ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও দুই দেশের অপরাপর বহু কৃতবিদ্যরা মিলিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধার বাঁধনে পরস্পরে বাঁধা পড়ার নূতন সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সুবিধা হয়েছিল। দুই দেশের যা মহৎ তা উভয় পক্ষই গ্রহণ করার এক অপূর্ব্ব স্পৃহণীয় সমন্বয় ঘটেছিল। এখানে ইংরেজ জাতির অপগুণ চাপা পড়ে যেটা ভারতের কল্যাণকর এবং তার পক্ষে অনুকরণীয় সেটাই বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল।

দ্রুত ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরক্তি পুষ্টিলাভ করার পক্ষে এশিয়াটিক সোসায়েটিকে অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্কুল কলেজের শিক্ষা না হলেও এশিয়াটিক সোসায়েটির অতুলনীয় দানের কথা স্মরণে রাখবার জন্য এর পরিচয় একটু বিস্তৃতভাবে লেখা হ'লো।

এবার স্কুল কলেজের বাকী কথাগুলি শেষ করা যাক। নানা রকম স্কুল, গুরুমশায়ের পাঠশালা থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত, বাঙ্গলাদেশে একই সঙ্গে চলছিল। সরকারী বড় বড় স্কুলে ইংরেজ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিলেন অনেক। বাঙ্গালী শিক্ষক ত থাকবারই কথা। এঁদের একসঙ্গে শিক্ষা কেন্দ্রে মিলিত হয়ে থাকায় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল প্রচুর। আর সেটা ছাত্রদের মধ্য দিয়ে সমাজের সর্ব্বস্তরে গিয়ে পৌঁচেছিল।

বহু স্কুল কলেজের মধ্যে যেগুলি কিছু বিশেষত্ব লাভ করেছিল, তার কয়েকটির উদ্ভবের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

ক্যালকাটা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত স্কুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরই (Fort William) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কথা আসে। ১৮০০ সালে নভেম্বর মাসে ওয়েলেসলির (Lord Wellesley) উৎসাহে কলেজটি

স্থাপিত হয় "for the training of young civilians in Calcutta" কলকেতায় স্বল্প বয়সী বড় সরকারী কর্মচারী (যেমন আই-সি-এস্)- দের শিক্ষার কেন্দ্র। এটি অপর এক বড় উদ্দেশ্য সাধন করে "paved the way for English education by bringing officers and Indian scholars together so that they can learn each others language." Hundred years of the University of Calcutta, Vol. I. p. 5) তাঁরা পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ পাবেন। এখানে মহামতি কেরী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু মনীষীর সংযোগ ঘটেছিল।

কলেজ কিছুদিন চলবার পরে ভারতবাসীদের মধ্যে প্রাচ্যের বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য এরই অপর একটি বিভাগ খোলা হয়।

বর্দ্ধমানরাজের দানে পুষ্ট হয়ে ১৮১৭-তে (Anglo-Vernacular) ইংরেজি-বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বহু বৎসর পর ১৮৮৬-তে একে দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্টস কলেজে উন্নীত করা হয়েছিল।

১৮১৭ (জানুয়ারী ২০-এ) হিন্দু কলেজ (১৮২৫ পর্য্যন্ত কেবল 'বিদ্যালয়') স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজ ও বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায়। যদিও রামমোহনের আদর্শগত কলেজ রূপ গ্রহণ করে, গোঁড়া হিন্দুদের আপত্তি হতে পারে বলে প্রত্যক্ষ ভাবে এর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বাঙ্গলার প্রথম জাগরণের যুগে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ক্রিয়াকাণ্ড সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড ছাপ রেখে গেছে। পরে ১৮৫৩-তে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার নিলে বিদ্যালয়টি প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচয় লাভ করে।

স্কুল কলেজ না হলেও বাঙ্গলার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শিক্ষা সুগম করেছে ১৮১৭ (জুলাই ৪-ঠা) প্রতিষ্ঠিত স্কুল বুক সোসায়েটি ও ১৮১৮ (সেপ্টেম্বর ১-লা) উদ্ভূত কলিকাতা স্কুল সোসায়েটি। প্রথমটি বাঙ্গলার বিভিন্ন স্তরের স্কুলের পাঠ্য পুস্তক লিখতো ও সরবরাহ করতো, আর দ্বিতীয়টি পুরাতন স্কুলের সংস্কার ও নতুন স্কুল স্থাপন করবার ভার নিয়েছিল। পরে ১৮২৩ (জুলাই ১৭ ই) বাঙ্গলার শিক্ষার ওপর তদারকী করবার জন্য ('as the sole organ of the Government in matters that concerned education" (General Committee of Public Instruction) সাধারণ শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এ তিনটি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যকারিতায় সমস্ত স্কুলের প্রভূত উপকার সাধন করেছে।

হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কর্ত্তৃক ১৮১৮তে শ্রীরামপুর কলেজ জন্মলাভ করে। অন্যান্য নানা জনহিতকর কাজের মধ্যে এই কলেজ তাঁদের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি।

খুব গোড়ার দিকে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হয়েছিল। বলা বাহুল্য এর প্রায় সবটাই ক্রীশ্চান মহিলাদের উদ্যমের ফল। ১৮১৯-তে অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের শিক্ষা-দানের প্রতিষ্ঠান (Female Juvenile Society) গঠিত হয়েছিল। এর সভ্য তালিকায় একটিও ভারতীয় মহিলা ছিলেন না। দরিদ্র পরিবারের বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ইহাদের লক্ষ্য। পাদ্রী সম্প্রদায় (Baptist Mission) ছিল এদের পৃষ্ঠপোষক। রাধাকান্ত দেবও ইহার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছিলেন। কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নি।

আবার ১৮২৪-তে এক নারী সমিতি (Ladies' Society) দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা দিবার জন্য গঠিত হয়। কিন্তু গুজব রটে যায় যে এদের উদ্দেশ্য ঐ সব ছাত্রীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা। শেষ পর্য্যন্ত বড়লাট আতঙ্কিত হয়ে অর্থ সাহায্য বন্ধ করেন এবং এ প্রতিষ্ঠান উঠে যায়।

কলকাতার প্রথম 'লাট' বা শ্রেষ্ঠ পাদ্রী (Bishop) মিডল্টন্ কর্তৃক ১৮২০-তে কলকেতায় (Bishop's College) বিশপ্‌স্ কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮২৯ পর্য্যন্ত এখানে অ-খৃষ্টীয় ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না।

এ দেশীয় আর্ম্মেনিয়ানরা পিছিয়ে ছিলেন না। ১৮২১ (এপ্রিল ২-রা) আর্ম্মেনিয়ান কলেজ সৃষ্ট হয়। পরে (Armenian Philanthropic Academy) আর্ম্মেনিয়ান ফিলানথ্রপিক এ্যাকাডেমির সঙ্গে আবাসিক (boarding) স্কুলে পরিণত হয়।

হিন্দু স্কুল গঠিত হবার সময় রামমোহন সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ১৮২২-তে তিনি এ্যাংলো হিন্দুস্কুল নামে এক স্বতন্ত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮২৩-তে স্কুল সোসায়েটি এক ইংরেজি স্কুল (English School) স্থাপিত করে। হেয়ার সাহেবের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকায় এইটি হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রসিদ্ধ 'আড়পুলি পাঠশালা পরে ইহার সহিত যুক্ত হয়।

ছাত্রাবাস সমন্বিত স্কুল (Parental Academic Institution) পেরেন্টাল এ্যাকাডেমিক ইনষ্টিটিউসন ১৮২৩ (মার্চ্চ ১-লা) স্থাপিত হয়। ১৮৫৫-তে নাম পরিবর্ত্তন করে (Doveton) ডভ্‌টন কলেজ করা হয়।

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ১৮২৪-তে। উদ্দেশ্য "cultivation of Sanskritic learning in all its branches." এখানে ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ পর্য্যন্ত ইংরেজি শিক্ষাদান চলতো। তার পর থেকে বন্ধ হ'য়ে আবার ১৮৪৪ থেকে চালু হয়।

রাজসাহীর বাউলিয়া হাইস্কুল ১৮২৮-তে গ্রামবাসীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ১৮৩৬-তে গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে জেলাস্কুল এবং ১৮৭৩-তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়।

বে-সরকারী প্রচেষ্টায় বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (Oriental Seminary)-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ (মার্চ্চ ১-লা) গৌর মোহন আঢ্য কর্তৃক নিজ ব্যয়ে এটি স্থাপিত হয়। সে যুগে বিদ্যালয়টি প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল এবং এর বহু ছাত্র উত্তরকালে যশস্বী হয়েছিলেন। কলকেতার সে যুগে যত সব নাম করা স্কুল ছিল তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গৌর মোহনের 'সেমিনারীর' নাম সসম্মানে উচ্চারিত হতো।

১৮৩০-তে (Alexander Duff) ডাফ্ কর্তৃক জেনারেল এ্যাসেমব্লিস ইনস্‌ষ্টিটিউসন নামে এক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৪৩-তে এর নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে (Free Church Institution) ফ্রী চার্চ্চ ইনস্‌ষ্টিটিউসন হয়। শেষ পর্যন্ত ডফ্ কলেজ নামেই চলে।

ওদিকে ১৮৩০-তে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ (জেনারেল এ্যসমব্লিস্ ইনষ্টিটিউশন) স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৩৯-তে কলেজটি নিজ ভবনে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার (আজাদ হিন্দ বাগ) স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৭-তে দুই কলেজ মিলে প্রথমে ক্রীশ্চান কলেজ এবং ১৯০৮-তে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ নাম গ্রহণ করে।

মেদিনীপুরে ১৮৩৪-তে বেসরকারী এক স্কুল স্থাপিত হয়। দুই বছরের মধ্যে তাকে "জিলা" স্কুল ও ১৮৭৩-তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হয়।

বিপক্ষ দলের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে (Governor General) বড়লাটের আদেশে ১৮৩৫ (ফেব্রুয়ারী ২০-তে) মেডিকেল কলেজ খোলা হয়। প্রারম্ভে (Petty Court Jail) ছোট আদালতের অবস্থান ভূমিতে হিন্দু কলেজের পিছন দিকে কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথম সংশ্লিষ্ট হাঁসপাতাল খোলা হয়েছিল ১৮৩৮ এপ্রিলে। বর্ত্তমান হাঁসপাতাল রোগী ভর্ত্তি আরম্ভ করে ১৮৫২ (ডিসেম্বর ১-লা) থেকে।

এরও একটু আগের খবর দেওয়া যেতে পারে। ১৮২২

(জুন) চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থার সরকারী হুকুম হয় (School of Native Doctors) "for the instruction of Natives in Medicine with a view to civil and military service." ডঃ টিটলার (Tytler) এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত (১৯২৮) হলে "টিট্‌লারের স্কুল" বলে বহুদিন এটি পরিচিত ছিল। ১৮২৮ সালে ছাত্ররা ঘৃণা সঙ্কোচবর্জিত প্রফুল্ল মনে শব-ব্যবচ্ছেদ করে।

এ স্কুল চলারকালে ১৮৩৫ (জানুয়ারী ২৮-এ) বিস্তৃত ভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়।

ঢাকা কলেজে ১৮৩৫-তে জন-শিক্ষা কমিটির নির্দ্দেশে স্থাপিত হয়; সরকারী অর্থানুকুল্য ছিল ইহার প্রধান সহায়।

চট্টগ্রাম জিলা স্কুলের আবির্ভাব ১৮৩৬-তে, পরে তাকে কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

ফরাসীদেশীয় (Claude Martin) মার্টিন ১৮৩৬ (La Martinere) লা মার্টিনিয়ার কলেজ কলকাতার খৃশ্চান নাগরিকদের শিক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন।

হাজি মোহম্মদ মহ্‌সীনের দানে পুষ্ট হুগলী কলেজ ১৮৩৬-তে স্থাপিত হয়। হাজি সাহেবের উইলে ছিল ভগবানের সেবায় ("in the Service of God") অর্থ ব্যয়িত হবে।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি (London Missionary Society) ১৮৩৮-তে ভবানীপুরে তাঁদের 'ইন্‌ষ্টিটিউশন' (L. M. S. Institution) পত্তন করে। ১৮৫৮-তে প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি বিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত হয়েছিল।

কারিগরী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়েছিল এ সময়। ক্যালকাটা মেকানিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট (Calcutta Mechanical Institute) নামে এক শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৮৩৯-তে স্থাপিত হয়েছিল। এর বিবরণ আর কিছু পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বল্পকালের মধ্যে উঠে যায়।

১৮৪২-তে (Loreto Sisters) লোরেটো সিষ্টার্সদের নির্দেশে 'লরেটো হাউস' স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ থেকে এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন লাভ করেছে এবং নারীদিগের উচ্চশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে পরিগণিত হয়ে আছে।

শিক্ষাকেন্দ্রে বৈদেশিক প্রভাব খুব বেশী কাজ করছে এবং সরকারী বা সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয় দেশীয় ভাবধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে ১৮৪৩ (মার্চ্চ ১-লা) দানবীর মতিলাল শীলের বদান্যতায় অবৈতনিক, সীলস্ ফ্রী কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজ রিচার্ডসনকে অধ্যক্ষ করে ১৮৪৬-তে কার্য্যারম্ভ করে। দু বছর পরে শিক্ষা সমিতি (Council of Education) এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করে।

গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় ১৮৪৬-তে উত্তরপাড়া স্কুল স্থাপিত হয়ে ১৮৮৯-তে কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সেণ্ট যোসেফ্‌স্ হাই স্কুল (St. Joseph's High School বা St. Joseph's College) ১৮৪৮-তে সেণ্ট জেভিয়ার স্কুল (St. Xavier's School) নামে ক্যারিউ (Mgr. Carew) কর্তৃক সৃষ্ট হয়। উচ্চস্তরের শিক্ষা দানের জন্য তিনি আয়র্লণ্ড থেকে শিক্ষক আনিয়েছিলেন। বর্ত্তমানের সেণ্ট জেভিয়ারস্ (St. Xavier's) কলেজ যীশু সোসায়েটি (Society of Jesus) কর্তৃক ১৮৬০ সালে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পরে স্থাপিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান তালিকায় তাহার নাম অবান্তর বলে মনে হবার কথা।

বাঙলার নারী শিক্ষা প্রসারের অন্যতম ঋত্বিক মহামতি বেথুন বালিকাদের জন্য ১৮৪৯-তে বেথুন স্কুল স্থাপিত করেন এবং আ-মৃত্যু তার ব্যয়ভার বহন করে গেছেন। ১৮৭৮-তে কলেজ আরম্ভ হয়।

বহরমপুরে ইংরেজি অবলম্বন করে ১৮২৬ তে এক কলেজ কার্য্যারম্ভ করে। তার অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যায়। ১৮৫৩-তে কৃষ্ণনাথ কলেজ নামে নতুন কলেজটি জন্ম লাভ করে। পুরাতনের সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নাই।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এক কোণে ১৮৫৬-তে (Civil Engineering College) সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। ১৮৬৫-তে একে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৮০-তে শিবপুরে নূতন বাড়ী তৈরী হলে এটি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়।

যে স্কুল কলেজগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে, ১৮৫৭ পর্য্যন্ত তাদেরই নাম এখানে প্রকাশ করা হ'লো। এ ছাড়া যে বহু বে-সরকারী এবং খৃস্টান পাদ্রীদের অর্থসাহায্য লাভ করে তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৮১৭ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত এই বিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গলার প্রায় সব বড় বড় জেলায় গভর্ণমেণ্ট সাহায্য-পুষ্ট বহু সংখ্যক স্কুল চালু ছিল। তন্মধ্যে ত্রিবেণী, উমেরপুর (হুগলী), বাঁকুড়া, যশোহর, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে এই শ্রেণীর স্কুলের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

১৮৫৭-তে ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে জাতীয় বিপ্লবের তাণ্ডব যখন ঘটে গেল তখন ভারতবাসীর এক শ্রেণীর মনে প্রকাশ্য সংগ্রামের কথা বড় হয়ে উঠেছিল। স্কুল সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সকল স্কুল থেকে বিদ্যালাভ করে ছাত্ররা বেরিয়ে যখন সংবাদপত্র পড়ার উপযুক্ত হয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে ইংরেজ শাসনের দোষ ত্রুটি বিচার করতে সক্ষম হয়েছে, তখনই ব্যাপক বিপ্লবের বীজ উপ্ত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

পত্র পত্রিকা

"ইয়ং বেঙ্গল"-এর দল নিজেদের ভাবধারা প্রচার করবার জন্য সাময়িক পত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত পত্রিকা শিক্ষিতদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বাঙ্গলাভাষার জ্ঞান তখন খুব ব্যাপক হয় নি, আর ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিতদের নতুন জ্ঞানার্জ্জনের যে স্পৃহা গজিয়ে উঠেছিল বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ লোকের আকুল আগ্রহ তার তুলনায় কিছুই ছিল না বলা চলে।

ইংরেজি ও বাঙ্গলা কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার পরিচয় রেখে না দিলে তখনকার রাজনৈতিক চিত্রের খুব স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে আলোড়ন-ধর্মী পত্রিকার প্রসঙ্গে প্রথমেই ডিরোজিওর কথা উত্থাপন করতে হয়। তাঁর আবির্ভাবের আগে উল্লেখ-যোগ্য পত্রিকার মধ্যে ১৮৬৮ সালে প্রচারিত শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সমাচার দর্পণ, দিগ্দর্শন, ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়াকে দেখতে পাওয়া যায়। অপরাপর সমসাময়িক পত্রিকার মধ্যে সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যর বাঙ্গলা গেজেটি (১৮১৮), রামমোহনের ব্রাহ্মণ সেবক ও মিশনারী সংবাদ (১৮২১), ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য ও তারাচাঁদ দত্তর সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১) ও প্রতিপক্ষ ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), একক ভবানী ভট্টাচার্য পরিচালিত সমাচার দর্পণ (১৮২২) এবং নীলরতন হালদারের বেঙ্গল গেজেট বা ঊইক্‌লি ইণ্টেলিজেন্সর (Intelligencer) বিশেষ পরিচয় লাভ করে।

বিদেশী পাদ্রীরা ছাড়া অপর দুটি ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকার নাম বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার তালিকায় উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে।

(Calcutta Gazette) ক্যালকাটা গেজেট ও (Morning Post) মর্নিং পোষ্ট এর স্থান গ্রহণ করে বাকিংহাম (James Silk Buckingham)-এর পরিচালনায় ১৮১৮ অক্টোবর ২-রা তারিখে (Calcutta

Journal) ক্যালকাটা জর্নাল সপ্তাহে দু সংখ্যায় আত্ম-প্রকাশ করে। ১৮১৯ (মে ১লা) থেকে পত্রিকা দৈনিকে পরিণত হয়। এতে ভারতের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষতঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত সকল সংবাদের চুম্বক প্রকাশিত হ'তো। তাছাড়া অন্যান্য ইংরেজি পত্রিকায় মুদ্রিত ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধাদি ক্যালকাটা জর্নালে পুর্নমুদ্রিত হওয়ায় সে সকল প্রবন্ধের বহুল প্রচার হতে থাকে। বাকিংহাম রামমোহনের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন এবং রাজা তাঁর অনেক রাজনৈতিক মতবাদ এই বন্ধুকে লিখে জানাতেন। ভারত প্রীতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাকিংহাম এ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হন। ইংলণ্ডে বসে তিনি (Oriental Herald) ওরিয়েণ্টাল হেরাল্ড নামে পত্রিকা প্রচার করে ভারতবর্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নশীল ছিলেন।

সেকালে বেঙ্গল হরকরা (Bengal Hurkaru) বিশেষ নাম করেছিল; গোড়ার দিকে নীলকরদের সহায়তা করেছে। ১৭৯৮ থেকে (Charles Maclean) ম্যাক্‌লিন এর সম্পাদনায় এটি পরিচালিত হয়। ১৭৯৫ জানুয়ারী ২০-শে থেকে Bengal Hirourrah (Oriental Star Office) নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, ম্যাকলিনের পত্রিকার সঙ্গে সম্ভবতঃ তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। ১৮১৯ থেকে বেঙ্গল হরকরা দৈনিকে পরিণত হয়। ভারতের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ায় ম্যাকলিন নানা নির্য্যাতন ভোগ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারত থেকে নির্ব্বাসিত হন।

আবার নীলকরদের হাঙ্গামার সময় (১৮৫৯-১৯৬১) ফরবেস (Alexander Forbes)-এর সম্পাদনায় রায়তের বিপক্ষে কলম চালিয়েছে। এর সঙ্গে ছিল ইংলিশম্যান।

১৮৩০ (ফেব্রুয়ারী ১৫-ই) ডিরোজিওর ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিকের পরিচালনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক (Parthenon) পার্থেনন প্রকাশিত হয়। মাত্র এক সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার পর নানা বাধা সৃষ্টি হওয়ায় দ্বিতীয় সংখ্যা আর প্রকাশিত হতে পারে নি।

এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (নিউ এজ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃঃ ৮৭) পুস্তকে লিখেছেন যে "ডিরোজিওর শিষ্যগণ (Athenaeum) নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লিখিলেন—"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism"—'যদি হৃদয়ের অন্তস্তমতল হইতে কিছুকে ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম্ম'। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ পত্রিকার দুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন।"

সম্ভবতঃ এথিনিয়ম ও পার্থেনন একই পত্রিকা; প্রথম নামটি ভুলও হতে পারে।

১৮৩১ সালে ডিরোজিও East India নামে আর এক পত্রিকা প্রকাশ করেন; তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেখানি বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩১ মে মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত (Inquirer) ইনকোয়েরার পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বিদ্বন্মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়। স্বাধীন মতবাদে পত্রিকা সকলকে চমৎকৃত করেছিল। প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা সে কালের প্রগতিশীলদের নিকটও নূতনতর লেগেছিল।

পার্থেননের তিরোভাবের পর রসিক কৃষ্ণ মল্লিক দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১৮৩১ থেকে ১৮৪৪ পর্য্যন্ত চলেছিল। সঙ্গে জড়িত ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ বসু, দক্ষিণারঞ্জন ত

ছিলেনই। ১৮৩৩ সালের সনদের প্রতিবাদে রসিককৃষ্ণ পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

নিবিড়ভাবে বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের শিক্ষা আসতে থাকে ১৮৩১ (জানুয়ারী ২৮-এ) প্রকাশিত সাপ্তাহিক সম্বাদ প্রভাকর থেকে। সম্পাদক স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, প্রকৃতি, পূজা পার্ব্বণ, ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক আচার, আদব কায়দা, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, অতি সাধারণ ভোজ্যদ্রব্য সবই আলোচিত হতো। হাস্য-কৌতুক, বিদ্রূপ একেবারে কষাঘাতের মত কঠিন ছিল। গুপ্ত কবির হাতে পড়ে দেশ অপরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করেছিল। দেশের পরস্পরের প্রতি "ভ্রাতৃ ভাব" মনে রাখতে হবে; দেশের কুকুরটাও বিদেশীর "ঠাকুর" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৮৩৯ জুন ১৪-ই শিবনাথ শাস্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে পত্রিকা দৈনিকে পরিণত করেছিলেন।

১৮৩২-এ রসিক কৃষ্ণ মল্লিক "জ্ঞান সিন্ধু তরঙ্গ" নামে একখানি স্বল্প কালস্থায়ী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

(India Gazette) ইণ্ডিয়া গেজেট ১৭৮০ নভেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্থাপয়িতা ছিলেন মেসিনুক (E. Messink) ও রীড (Peter Reed). এই পত্রিকাই বরাবর চলেছিল কি না বলা কঠিন। ১৮৩২ থেকে পত্রিকা দৈনিকে পরিণত হয়। বিতণ্ডামূলক প্রবন্ধ মুদ্রিত করে পত্রিকাখানি নব্য দলের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। বিশেষ করে ইংরেজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৪৩ ফেব্রুয়ারী ৮ই কলকাতায় যে বক্তৃতা দেন সেটি মার্চ্চ মাসের দুই সংখ্যায় মুদ্রিত করে পত্রিকাখানি বিশেষ সাহসের পরিচয় দেয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে ঠিক নব্য বাঙ্গলার দলভুক্ত করা যায় না; কিন্তু তিনি যে বিশেষ প্রগতিবাদী ছিলেন তাতে কোনো ভুল নেই। তাঁর সম্পাদনায় (Indian Reformer) ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার পত্রিকা ১৮৩১ সালে আবির্ভূত হয়। নব্য বাঙ্গলার মতবাদ এই পত্রিকায় বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁদেরই অন্যতম মুখপত্র বলে বিবেচিত হয়েছে।

রামগোপাল ঘোষ কেবল বক্তৃতা দ্বারা নয়, কার্য্যতঃ ১৮৪২-তে প্রচারিত বেঙ্গল রেকর্ডার (Bengal Recorder) সাহায্যে তাঁর যুক্তি জাল বিস্তার করে গেছেন। এপ্রিল থেকে প্রতিমাসে এক সংখ্যা, সেপ্টেম্বর হ'তে পাক্ষিক ও ১৮৪৩ থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। বলা-বাহুল্য সে যুগে এ পত্রিকার মতামত জানবার জন্য সকল শ্রেণী আগ্রহান্বিত হয়ে থাকতো।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক পত্রিকা (Hindu Intelligencer) হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার পত্রিকাখানি স্বনামধন্য কাশীপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাবলী পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। তা ছাড়া তাৎকালিক ঘটনা সমূহের পরিচয় এবং দেশের কল্যাণকর প্রবন্ধাদি সুধীমহলে পত্রিকার সমাদর বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

নব্য বাঙ্গলার উন্মাদনার কিছু ভাঁটা পড়লেও যখন আবহাওয়া নতুন ভাবে বিশেষ রকম প্রভাবিত হয়ে রয়েছে, সেই সময় ১৮৪৯-তে (Bengal Recorder) বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রিকাখানি গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীনাথ ও ক্ষেত্র চন্দ্রের, সাহায্যে প্রকাশ করেন। ৬ই জানুয়ারী ১৮৫৩ থেকে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে নাম বদল হ'য়ে Hindoo Patriot (হিন্দু পেট্রিয়ট) হয়—প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ৬-ই।

হাঁস বা ময়ূরের পালকের কলম (quill) ছিল প্রাচীন ভারতে লিখন-যন্ত্র। মহাভারত লিখতে হয়ত স্বয়ং শ্রীগণেশ এই লেখনী ব্যবহার করে থাকবেন। খাগড়া বা সর-এর কলম তত কর্মকুশল ও জনপ্রিয় ছিল না। ধাতবনিব্-এর চলন হয়েছে যন্ত্রযুগে, মানব সভ্যতার নব অভিযানের কয়েক

সহস্র বৎসর পরে। এই (Quill) কুইল নাম গ্রহণ করে ১৮৪২ সালে স্বয়ং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় পত্রিকা আবির্ভূত হয়। দলের মধ্যে তারাচাঁদের যে উচ্চ স্থান ছিল তাতে তাঁর নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশে এত বিলম্ব হওয়ায় একটু বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু স্বমত প্রচারে তাঁর কোনো অসুবিধা ছিল না। গোষ্ঠীর যে কোনো পত্রিকা তাঁর প্রবন্ধ বক্তৃতা ছাপিয়ে দিতে গৌরব বোধ করতো।

পত্রিকার প্রবাহ চলেছে এবং নানা ক্ষেত্রে দেশ প্রেম প্রকাশ করা শুরু হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের পক্ষে এতগুলি পত্রিকার আবির্ভাব এখন বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

১৮৪২ এপ্রিল মাসে দ্বিভাষিক (ইংরাজি ও বাঙ্গলা) মাসিক পত্রিকা হিসাবে (Bengal Spectater) বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রকাশিত হয়। সেই কয়টি পরিচিত নাম—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে রামগোপাল ঘোষ পত্রিকা পরিচালনা করেন। সেপ্টেম্বর থেকে পাক্ষিক ও ১৮৪৩ থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এ সকল ছাড়া আরও কয়েকখানি পত্রিকার উদ্ভব এসময়ে ঘটেছিল যাতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবহমান ছিল। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, বিশেষত: সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সদাচার, কদভ্যাস পরিবর্জ্জন প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ বহন করে পত্রিকা চলেছে। নীল চাষীদের দুর্দ্দশা প্রকাশ করা ছিল অন্যতম কাজ; একালের উল্লেখযোগ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩ আগষ্ট ১৬-ই আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠাতা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর সম্পাদক অক্ষয় কুমারদত্ত—মণিকাঞ্চন সংযোগ। সমাচার সুধাবর্ষণ (১৮৫৪) এর কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। ১৮৫৫-তে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার আবির্ভাব হয়।

ইয়ং বেঙ্গল দল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে প্রবল সুর তরঙ্গ তুলেছিল তার প্রতিধ্বনি প্রায় সকল পত্রিকায় ঝঙ্কৃত হয়। তখনকার চিন্তাশীল লোকরা প্রচারের মর্ম্ম বেশ বুঝতে পেরেছেন, সাধারণের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সুফল হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। সেকারণে কেবল ১৮৩১ সালে —চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শনের প্রতিপত্তির যুগে অপরাপর যে সকল পত্রিকা জন্মলাভ করে তার কয়েকটির উল্লেখ করলে বোঝা যাবে তরঙ্গের রেশ কতদূর ছড়িয়েছিল। সকলগুলিই যে রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করতো, তা নয়, কিন্তু তৎকালিক চিন্তাশীল বিদ্বান্ লোকের মন কতদিকে প্রধাবিত হয়েছিল তার অন্ততঃ কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। এ সময় প্রতিবৎসরই নূতন নূতন পত্রিকা বেরিয়েছে; বাহুল্য ভয়ে তার উল্লেখ করা যুক্তি-যুক্ত হবে না।

কয়েকটি পত্রিকার নাম দিতে চেষ্টা করছি (১৮৩১):

সম্বাদ ময়ুখ, সাপ্তাহিক পত্রিকা, সম্পাদক: ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়;

সম্বাদ সৌদামিনী, সাপ্তাহিক: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত;

জ্ঞানোদয়, মাসিক, সম্পাদক: রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র;

সম্বাদ রত্নাকর, সাপ্তাহিক, মধুসূদন দাস;

অনুবাদিকা, মাসিক; সম্পাদক: ভোলানাথ সেন;

সম্বাদ সুধাকর, মাসিক; সম্পাদক: প্রেম চাঁদ রায়;

সমাচার সভারাজেন্দ্র, বাঙ্গলা ও ফার্সী মাসিক; সম্পাদক: সেখ আলিমুল্লা;

নিত্য প্রকাশ, দৈনিক; সম্পাদক, দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়;

সম্বাদসার সংগ্রহ, সাপ্তাহিক।

এছাড়া আরও পাঁচখানি ইংরেজি পত্রিকা ঐ ১৮৩১ সালেই প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল না।

সিপাহী যুদ্ধের পরে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে স্থান গ্রহণের কথা, তথাপি বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে এর বড়

অবদান আছে বলে এই সঙ্গে উল্লেখ করা হ'লো। সোম প্রকাশ আবির্ভাবের কাল ১৮৫৮ (নভেম্বর ১৫-ই)। সরকারী কার্য্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হ'তো এবং শোনা যায় সরকারী দপ্তরে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবার আদেশ ছিল। ১৮৭৮-তে দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন (Vernacular Press Act) পাশ হ'লে দ্বারকানাথ পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেন।

ঐ ১৮৫৮-তে প্রকাশিত আর এক পত্রিকার নাম লোকে প্রায় উচ্চারণ করে না। কিশোরী চাঁদ মিত্রের সম্পাদনায়, জেম্‌স্ হিউম প্রতিষ্ঠিত (Indian Field) ইণ্ডিয়ান ফিল্ড দেশীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ নির্ভয়তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। নীল রায়তদের দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অভিযোগ ও প্রতিকারে চেষ্টায় এ পত্রিকা হিন্দু পেট্রিয়টের সমগোত্র হয়ে উঠেছিল।

বাঙলার বিভিন্ন পত্রিকা জনসাধারণের মধ্যে নানারকম তথ্য পরিবেশন করেছে। পাঠকের মনে সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গলের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। সতর্ক গভর্ণমেণ্ট খুব ভাল চোখে এদের দেখেনি এবং সুবিধামত আইন করে এদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করেছে।

ভারতের বড়লাট ১৭৯৭-১৮০৫) (Richard Colley Wellesley) ওয়েলেস্‌লি ১৭৯৯ মে ১৩-ই মুদ্রাযন্ত্রের ওপর বাধা নিষেধ অর্পণ করেন। প্রায় বিশ বৎসর চলবার পর লাট হেষ্টিংস (Francis Rawdon Hastings: 1813-21) হেষ্টিংস্ ১৮১৮ আগষ্ট ১৯-এ নিয়ন্ত্রণ আইন রহিত করেন। অস্থায়ী লাট (John Adam) এ্যাডাম ১৮২৩ মার্চ্চ ১৪-ই নিয়ন্ত্রণ আইনের পুনঃ প্রয়োগ করেন। এরই তোড়জোরের মুখে (James Silk Buckingham) বাকিংহামকে ঐ সঙ্গেই ফেব্রুয়ারী ১২-ই ভারতবর্ষ ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়। আত্মসম্মানসমৃদ্ধ রামমোহন এই আইন রদ করবার জন্য বহু চেষ্টা করে বিফল হন। প্রতিবাদে তার ফার্সী পত্রিকা মিরাৎ-উল্-আখ্‌বর বন্ধ করে দেন ১৮২৩ এপ্রিল ৪-ঠা।

পরে আবার লাট (Charles Theophidus Metcalf) মেট্‌কাফ ১৮৩৫ সেপ্টেম্বর ১৫-ই ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করেন।

সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলছিল। পরে লাট (Charles John Canning: ক্যানিং ১৮৫৬-১৮৬২) আবার ১৮৫৭ জুন ১৩-ই নিয়ন্ত্রণ আইন পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাঙলার সংবাদপত্র ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। বলা বাহুল্য যথাকালে অগ্নি লেখনীমুখে অগ্নি ছড়িয়ে পত্রিকারাই ভারতে সপক্ষ বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করেছিল।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ : অনুবাদ

চার্লস ডিকেন্স

পথচারী

যৌনব্যাপারের সঙ্গে শ্রেণীর যখন সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন ঔপন্যাসিক যে দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন তাতেই শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাবের সন্ধান-সূত্রটি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কাজেই যে-সব প্রশ্নে 'আমি সব নই' ভঙ্গিটি ভেঙে পড়তে চায় শ্রেণী হচ্ছে তাদের অন্যতম।

দেখা যায় যে, নগ্নতমরূপে শ্রেণী-বৈষম্য বর্ণ-বৈষম্যও বটে। আর নিখিল শ্বেত-সমাজে ঔপনিবেশিক মনোভাবের অনুরূপ একটা কিছু প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্তমান। কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের নিয়ে লীলা-খেলা নির্দোষ, শ্বেতাঙ্গিনী অলঙ্ঘনীয়া এতে উভয় পক্ষের মনেই তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই প্রশ্ন উপস্থিত হলে ঔপন্যাসিকদের মন স্থূল শ্রেণীবোধের দিকে ফিরে যায়, কিন্তু অন্য সময়ে এটা তারা অস্বীকার করতে পারে। 'শ্রেণী-সচেতন' প্রতিক্রিয়ার একটি সেরা দৃষ্টান্ত হল এ্যানড্রু বার্টন-এর (Andrew Burton) লেখা বিস্মৃত-প্রায় উপন্যাস, দ্য পিপ্‌ল্ অব ক্লপটন (The people of Clopton)। গ্রন্থকারের নীতিশাস্ত্র শ্রেণী-বিদ্বেষের সঙ্গে অতি স্পষ্টভাবেই জড়িত। তিনি মনে করেন, বড়লোকের গরীব মেয়েকে ফুসলে নেওয়া একটা নিতান্ত গর্হিত কর্ম—পাপাচার, এক প্রকার শুচিতা-নাশ,—মেয়েটির সম-শ্রেণীর কোনো পুরুষের পক্ষে সে কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। ট্রোলোপ (Trollope) দুবার এ বিষয়ের অবতারণা করেছেন (দ থ্রী ক্ল্যার্কস : The Three Clerks ও দ স্মল হাউস এ্যাট এ্যালিংটন : The Small House at Allington) আর করেছেন সম্পূর্ণ উচ্চ-শ্রেণীর দৃষ্টি-কোণ থেকে—যা সবাই আশা করে থাকে। তাঁর চোখে, সুরা-সাকী বা বাড়িওয়ালীর মেয়ের সঙ্গে প্রণয়-লীলা শুধুই জালে জড়ানো—যার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ট্রোলোপ এর নৈতিক মান কঠোর ; তিনি মেয়েছেলে নিয়ে উধাও হবার ব্যাপার ঘটতেই দেন না, কিন্তু এ-ইঙ্গিতটা সর্বদাই আছে যে, শ্রমিক মেয়েদের আসক্তিতে বিশেষ এসে যায় না। দ থ্রী গার্লস্-এ (The Three Girls) মেয়েটির গায়ের গন্ধের উল্লেখ করে তিনি বিশেষ করে শ্রেণী প্রতিক্রিয়ারই পরিচয় দিয়েছেন। মেরেডিথ (Meredith) তাঁর রডা ফ্লেমিং-এ (Rhod Fleming) আরো স্পষ্ট শ্রেণী-সচেতন দৃষ্টি ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। থ্যাকারে-ও (Thackeray) প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হয়। পেণ্ডেনিস ও ফ্যানি বোল্‌টন-এ (Pendennis & Fanny Bolton) তাঁর মনোভাব অনেকটা ট্রোলোপ-এরই অনুরূপ। অ্যা শ্যাবি জেন্‌টীল স্টোরি-তে (A Shabby Genteel Story) মেরিডিথ-এর কাছাকাছি।

শ্রেণী ও যৌন ব্যাপার নিয়ে যে-ভাবে তাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন তাতেই ট্রোলোপ বা মেরিডিথ বা বার্টন-এর সামাজিক বংশ পরিচয় অনেকটা অনুমান করা যায়।

ডিকেন্সের বেলাও সে প্রচেষ্টা করা যায়। কিন্তু ফলে দেখা যায়, বিত্তহীনদের চেয়ে মধ্যবিত্তদের সঙ্গে তাঁর মেল-বন্ধনের ঝোঁকটা বেশী। একটা ঘটনা কিন্তু এর বিরোধী বলে মনে হয়। সেটা হল, 'অ্যা টেল অব্ টু সিটিজ'-এ ডঃ ম্যানেট-এর (Dr. Manette) পাণ্ডুলিপিতে একটি চাষী তরুণীর কাহিনী। এটা অবশ্য মাদাম ডাফার্জ-এর (Madam Defarge) অনমনীয় বিদ্বেষভাবটিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যই costume-piece হিসেবে এখানে ঢুকিয়েছেন। ডিকেন্স অবশ্য ওটা অনুমোদনের ভাণ করেন নি। ডেভিড কপারফিল্ড্-এ (ডিকেন্স) ঊনবিংশ শতকের সতীত্ব-হরণের অবতারণা করেছেন, কিন্তু শ্রেণী সমস্যা সেখানে তাঁর কাছে প্রাধান্য লাভ করে নি বলেই মনে হয়। ভিকটোরীয় উপন্যাসের একটা নীতি এই যে, যৌন অনাচার দণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পাবেই না। কাজেই ইয়ার-মাউথ-এর (Yarmouth) বেলাভূমিতে স্টিয়ারমাউথকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু না ডিকেন্স, না বুড়ো পেগটি (Peggotty), না হ্যাম (Ham)—কেউ-ই যেন অনুভব করল না যে, বড়মানুষের ছেলে হয়ে স্টিয়ারফোর্থ-এর (Steerforth) অপরাধের মাত্রাটা বেড়ে গেছে। স্টিয়ার-ফোর্থ-রা শ্রেণীগত উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে, কিন্তু পেগটিরা নয়—এমন কি মিসিস স্টিয়ারফোর্থ ও বুড়ো পেগটিকে নিয়ে যে দৃশ্য তাতেও নয়। যদি তারা চালিত হত তবে তারা ডেভিড এবং স্টীয়ারফোর্থ-এর বিরুদ্ধেই দাঁড়াত।

আওয়ার মিউচ্যুয়াল ফ্রেণ্ড-এ (In our Mutual Friend) ডিকেন্স ইউজেন রেবার্ন (Eugene Wray-burn) ও লিজি হেক্সামাক (Lizzie Hoxam) বাস্তবতার-রসে রসিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শ্রেণীগত ঝোঁকের (bias) কোনো লক্ষণ তাতে নেই। 'ছেড়ে দে, পাষণ্ড' (Unhand me, Monster) জাতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী লিজির উচিত ইউজিনকে হয় প্রত্যাখ্যান করা নয় তার হাতে উচ্ছন্নে যাওয়া এবং ওয়াটারলু পুল থেকে লাফিয়ে পড়া। ইউজিন-এর উচিত, হয় হৃদয়হীন বিশ্বাসহন্তা হওয়া নয় সমাজকে অগ্রাহ্য করার কৃতসংকল্প নায়ক হওয়া। কিন্তু দুজনের একজনও আদৌ ওরকম আচরণ করল না। ইউজিন-এর প্রেম করার চেষ্টায় লিজি ভয়ই পেল এবং সত্যি ওসব গায়েই মাখল না, কিন্তু ও-সব সে ভাল না লাগার ভাণও করল না। ইউজিন তার প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু এমনি তার শালীনতা-বোধ যে তাকে নষ্ট করার কোনো চেষ্টাই সে করল না এবং তার পরিবারের জন্য তাকে বিয়ে করতেও সাহস করল না। শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে অবশ্য হল এবং সম্ভবত মি. টোয়েমলো (Mr. Twemlow) ছাড়া কারো কিছু খারাপও হল না; টোয়েমলোর কয়েকটি নৈশ-ভোজে যাওয়া মাটি হল। সত্যিকার জীবনে যা ঘটতে পারত, এ অনেকটা সেইরকমই হল। কিন্তু 'শ্রেণী চেতন' ঔপন্যাসিক তাকে ব্র্যাডলি হেডস্টোন-এর (Bradly Headstone) হাতেই সমর্পণ করত।

কিন্তু ব্যাপারটা যখন উল্টো দাঁড়ায়, গরিবের ছেলে যখন বামন হয়েও চাঁদে হাত দেবার দুরাশা করে—ডিকেন্স অমনি মধ্যবিত্ত-সুলভ মনোভাবে সরে আসেন। পুরুষের চেয়ে নারী 'উঁচুতে', নারী সম্বন্ধে এই ভিক্টোরীয় মনোভাবের প্রতিই তাঁর টান একটু বেশী। পিপ মনে করে ইস্টেলা (Estella) তাঁর চেয়ে উঁচুতে, ইস্থার সমারসন (Esther Summerson) গাপি-র (Guppy), লিট্‌ল্ ডরিট জন সিভারির (John Chivery), লুসি ম্যানেট (Lucy Manette) সিডনি কার্টন এর চেয়ে উঁচুতে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই কৌলীন্য শুধু নৈতিক মাত্র, অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক। য়ুরিয়া হীপ এ্যাগনিস উইকফিল্ড্-কে (Agnes Wick-field) বিয়ে করার ষড়যন্ত্র করছে। ডেভিড কপারফিল্ড্ যখন এটা আবিষ্কার করল, তখন শ্রেণীগত প্রতিক্রিয়া

বলে বলে বিশেষ ভুল হয় না। অসহ্য ঘুরিয়া হঠাৎ ঘোষণা করল সে অ্যাগনিস-এর প্রেমে পড়েছে :

"দেখুন কপারফিল্ড্ মশায়, যে মাটিতে অ্যাগনিস-এর পা পড়েছে সে মাটি টুকুকে আমি কতই না ভালবাসি। আর কী পবিত্র সে ভালোবাসা!"

"আমার বিশ্বাস, আগুন থেকে গণগণে লাল শলাটা তুলে নিয়ে তার গায়ে ফুটিয়ে দেবার উগ্র বাসনা আমার হয়েছিল। রাইফেলের গুলীর মতো এক ঝট্‌কায় আমার হাত থেকে ওটা ছুটে গেল : কিন্তু এই লালচে-মাথা জানোয়ারটার চিন্তায় লাঞ্ছিত অ্যাগনিস-এর মূর্তিটি আমার মানসপটে রয়ে গেল আমি যখন তার দিকে তাকালাম তখন সে বাঁকা হয়ে বসেছিল যেন তার হীন আত্মাটা তার দেহটাকে চেপে ধরেছে। আর আমার মাথা ঘুরে গেল……আমার বিশ্বাস, অ্যাগনিস উইকফিল্ড্ (Agnes Wickfield) ঐ চাঁদটার মতোই তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার বহু দূরে।"

হীপ-এর সাধারণ নীচতা—তার দাস সুলভ আচরণ ইত্যাদি যে ভাবে বইটাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বিচার করলে ডিকেন্সের অনুভূতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয়ের অবকাশ থাকে না। হীপ অবশ্য শয়তানের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, কিন্তু শয়তানেরও তো যৌন-জীবন আছে; শুদ্ধ-শীলা অ্যাগনিস এমন এক শয়তানের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছে যে তার চিন্তাই ডিকেন্সকে প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু তাঁর সাধারণ ঝোঁকটা হল উঁচু সমাজের মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের প্রেমের ব্যাপারকে রসিকতা মনে করা। ম্যালভোলিও (Malvolio) থেকে শুরু করে এটা হল ইংরেজি সাহিত্যের একটি মামুলি রসিকতা। ব্লীক হাউস-এ (Bleak House) গাপি (Guppy) এর একটি দৃষ্টান্ত, আরেকটি হল জন চিভ্যারি (Chivery); পিকউইক পেপারজ-এ স্ওয়ারি-তে ('Swarry') এ বিষয়ের বেশ বদ্-মেজাজী আলোচনা আছে। এখানে ডিকেন্স বর্ণনা করছেন: বাথ (Bath) পরিচারকরা এক প্রকারের স্বপ্ন-বিলাসীর জীবন যাপন করছে, তাদের মনিবদের অনুকরণে দিব্যি থানাপিনা চালাচ্ছে আর নিজেদের ভোলাচ্ছে যে মনিবদের তরুণী মেয়েরা তাদের প্রেমে পড়েছে। এটা তাঁর কাছে খুবই কমিক বা মজাদার বলে মনে হয়। ব্যাপারটা একটু মজাদারই বটে, যদিও তর্কের খাতিরে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ও-রকম আত্ম-প্রবঞ্চনা করার চেয়ে নিজেদের অবস্থাটা মেনে চলাই কি ভালো নয়।

চাকরদের প্রতি ডিকেন্সের দৃষ্টিভঙ্গিটা যে তাঁর যুগের তুলনায় অগ্রবর্তী, তা নয়। ১৯শ শতকে বাড়ির চাকরের কাজ করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাবটা সবে শুরু হয়েছে। বছরে পাঁচশো পাউণ্ডের ওপরে যাদের আয় তারা প্রত্যেকেই এতে বিরক্ত বোধ করত। ১৯শ শতকের কাগজে অনেক রসিকতাই ছিল চাকরদের দেমাকী ভাব নিয়ে। অনেক বছর ধরে পাঞ্চ্ পত্রিকা (Punch) 'Servant Gal isms' নাম দিয়ে একটানা রসিকতা চালিয়েছিল; তার সকল-গুলোতেই ঘুরে ফির এই আলোচনাই থাকত যে চাকর-ও মানুষ। এদোষে ডিকেন্সও মাঝে মাঝে দোষী। তাঁর বইতে সাধারণ চাকরের ছড়াছড়ি, তারা অসাধু (গ্রেট এক্স-পেক্টেশানস্), অকেজো (ডেভিড কপারফিল্ড্), ভালো খাবার পেয়েও নাসিকা কুঞ্চন করে (পিকউইক পেপারস্) ইত্যাদি ইত্যাদি—এসবই চলে একটি পদ-দলিত সর্দার পাচকের প্রতি শহরতলীর গৃহিণীর মনোভাবে। কিন্তু ১৯শ শতকের সংস্কারবাদীর মধ্যে এটাই অদ্ভুত যে দরদ দিয়ে চাকরের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই সামন্ত সমাজের আদর্শ চাকর এঁকে থাকেন। স্যাম ওয়েল্যার (Sam Weller), মার্ক ট্যাপলি (Mark Tapley), ক্ল্যারা পেগটি (Clara Peggotty)—সকলেই সামন্ত যুগের ভৃত্য-চরিত্র। তারা 'পুরাতন ভৃত্য' জাতের

অন্তর্গত ; তারা মনিবের পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, এবং যুগপৎ কুকুরের মতো বিশ্বস্ত ও সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে, মার্ক ট্যাপলি ও স্যাম ওয়েলার অনেকটা স্মলেট (Smollet), অতএব স্যারভ্যান্টিস্ (Cervantes) থেকে আমদানি হয়েছে, কিন্তু এটাই কৌতূহলের বিষয় যে, এ জাতের চাকর ডিকেন্সকে আকর্ষণ করেছিল। স্যাম ওয়েল্যার-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত মধ্যযুগীয়। মি. পিকউইক-এর সঙ্গে নৌবাহিনীতে যাবার জন্য সে নিজে গ্রেপ্তার হল এবং পরে বিয়ে করতে পররাজী হল, কারণ সে মনে করত যে মি. পিকউইক-এর তখনো তার সেবার প্রয়োজন আছে। তাদের অবলম্বন করে একটি বিশিষ্ট দৃশ্য আছে :

"বেতন পাক, আর না-ই পাক, আহার-বাসস্থান জুটুক আর না-ই জুটুক, স্যাম ওয়েলার—যাকে আপনি বরো-র পুরোনো সরাইখানা থেকে নিয়ে এসেছেন—সে আপনাকে আঁকড়ে থাকবে, যা ই ঘটুক না কেন…"

"নিজের উৎসাহে লজ্জা পেয়ে মি. স্যাম ওয়েলার যখন আবার বসে পড়ল তখন মি. পিকউইক বললেন, 'লোকটি তো তুমি ভালোই, একবার তরুণীটির কথাও তোমার ভেবে দেখা উচিত।'

'তরুণীটির কথা বিবেচনা করব, বাবু,' বলল স্যাম. 'মেয়েটির কথা তো আমি ভেবেছি। তার সঙ্গে কথাও বলেছি। আমার অবস্থাটাও তাকে বুঝিয়ে বলেছি ; আমি তৈরী না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে রাজী, আর আমার বিশ্বাস, সে অপেক্ষা করবেও। যদি সে না-ই করে, তবে সে ভালো মানুষের ঝি নয়, আর আমি স্বচ্ছন্দে তাকে ত্যাগ করব।"

বাস্তবজীবনে সেই তরুণী এর জবাবে কী বলত তা কল্পনা করা সহজ। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশটি লক্ষ্য করুন। মনিবের জন্য স্যাম ওয়েলার as a matter of course নিজের জীবনের বছরগুলো বিসর্জন দিতে রাজী, আর মনিবের সামনে বসে থাকতেও তার আপত্তি নেই। আধুনিক চাকর কস্মিনকালেও এ দু'য়ের একটাও করত না। প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরকে ভালোবাসার—ভৃত্য-সমস্যা সম্পর্কে ডিকেন্সের মনোভাব এই ইচ্ছা ডিঙিয়ে বেশী দূর যায় না। আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড-এ স্লপি-চরিত্র হিসেবে নিতান্ত নিষ্ফল, তবু সে স্যাম ওয়েলার-এর সমজাতীয়, বিশ্বস্ততার প্রতীক। অবশ্য এরকম প্রভুভক্তি স্বাভাবিক মানবোচিত এবং আদরণীয় (likeable) ; কিন্তু সামন্ততন্ত্রও ছিল তথৈবচ।

বর্তমান অবস্থার একটি আদর্শ রূপায়নের প্রচেষ্টাই যেন করে চলেছেন ডিকেন্স। আর এটাই তাঁর রীতি। যে-কালে তিনি লিখছিলেন সে কালে বাড়ির চাকরের কাজকে একান্তভাবেই অবশ্যম্ভাবী অন্যায় মনে করা হত। খাটুনির হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো কল তখন ছিল না, ছিল শুধু বিরাট ধন-বৈষম্য। মস্ত পরিবার, ষোড়শোপচারে আহার, অসুবিধাজনক ঘর-বাড়ি—এ সবেরই যুগ সেটা, তলার রান্নাঘরে একটানা ১৪ ঘণ্টা গোলামের মতো খেটে খাওয়াই ছিল তখন রীতি। আর দাসবৃত্তিকে বাস্তব তথ্য হিসেবে স্বীকার করে নিলে, সামন্ত-তান্ত্রিক সম্পর্কটাই হল একমাত্র সহনীয় সম্পর্ক। স্যাম ওয়েলার ও মার্ক ট্যাপলি হল কাল্পনিক চরিত্র চিরিবল্‌জ্-এরই অনুরূপ। মনিব আর চাকর যদি থাকতেই হয় তবে মিঃ পিকউক-এর মতো মনিব আর স্যাম ওয়েলার-এর মতো চাকর থাকাই তো কত ভালো। এর চেয়ে আরো ভালো হত যদি চাকর আদৌ না থাকত—তেমন অবস্থা ডিকেন্স হয়ত কল্পনাও করতে পারেন না। প্রচুর যান্ত্রিক উন্নতি ছাড়া মানুষে-মানুষে সমতা বাস্তবে সম্ভব নয়। ডিকেন্সও দেখিয়েছেন যে তেমনটা কল্পনা করা যায় না।

৪

ডিকেন্স যে কৃষির কথা কখনো লেখেন নি এবং খাদ্যের কথা এন্তার লিখেছেন—এটা শুধু আকস্মিক মিল নয়। তিনি ছিলেন ককনি আর যে অর্থে উদর দেহের কেন্দ্র সেই অর্থেই লণ্ডন দুনিয়ার নাভিস্থল। লণ্ডন হল ভোক্তাদের (consumers) শহর—যারা নাকি অস্থিমজ্জায় সভ্য কিন্তু মুখ্যত কোনো কাজে লাগে না। ডিকেন্সের বইগুলোকে যিনি তলিয়ে দেখেছেন তাঁর চোখে ঠেকবে যে, উনিশের শতকে ঔপন্যাসিকদের তুলনায় ডিকেন্স যেন অনেকটা অজ্ঞ। প্রথম দর্শনে এই বিবরণটাকে স্পষ্টতই অসত্য বা মিথ্যা বলে মনে হবে, তাই এর কিঞ্চিৎ সীমা নির্দেশ প্রয়োজন।

'নিম্নস্তরের জীবনের' স্পষ্ট পরিচয় ডিকেন্সের ছিল—যেমন ঘাতকের জেল-জীবন—আর তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, সাধারণ লোকের কথা লেখার সামর্থ্য তাঁর ছিল। উনিশের শতকের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সবাই তাই ছিলেন। যে সমাজে তাঁরা বাস করতেন সেখানে তাঁরা স্বচ্ছন্দবোধ করতেন, অপর পক্ষে আজকের লেখক এতই বিচ্ছিন্ন বা নির্যোগ যে, মার্কামারা (typical) আধুনিক উপন্যাস হল ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে উপন্যাস। জয়েস-এর কথাই ধরুন, 'সাধারণ লোকের' সংস্পর্শে আসার জন্য দশ বছরের মতো সময় ধৈর্য ধরে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত তাঁর 'সাধারণ লোকটি' হয়ে দাঁড়াল একজন ইহুদী; সে ইহুদীও আবার একটু উন্নাসিক। ডিকেন্স অন্তত এরকম বে-কায়দায় পড়েন নি। সাধারণ লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, লালসা, প্রতিহিংসা প্রভৃতির পরিচয় দিতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি। যা তিনি লিখেছেন বলে চোখে পড়ে নি তা হল শ্রম বা খাটুনির কথা।

ডিকেন্সের উপন্যাসে শ্রম জাতীয় যা কিছু সবই ঘটছে মঞ্চের বাইরে। তাঁর একটি মাত্র নায়কেরই (বিশ্বাস-যোগ্য) পেশা আছে বলে বিশ্বাস করা যায়। সে হল 'ডেভিড কপারফিল্ড্'। সে প্রথমে শর্টহ্যাণ্ড লেখক, পরে ডিকেন্সের মতোই ঔপন্যাসিক। অন্যান্য নায়কের অধিকাংশই যে-পথে জীবিকা অর্জন করছে তা রয়েছে অনেকটা পৃষ্ঠপটে বা আড়ালে—যেমন, পিপ ব্যবসা করছে ইজিপ্টে; কী ব্যবসা তা কিন্তু আমাদের বলা হয় নি। আর পিপ-এর কর্মজীবন সমস্ত বইটাতে মাত্র আধ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। ক্লিনাম চীনে ব্যবসা করছিল, কী ব্যবসা তার উল্লেখ নেই। পরে সে ডয়েস্-এর (Doyce) সঙ্গে আরেকটা কাজে চলে যায়; সে কাজেরও বিশেষ উল্লেখ নেই। মার্টিন চজলউইট একজন স্থপতি, কিন্তু সে-কাজ করবার মতো সময়, ঢের সময় তার নেই। কোনো ক্ষেত্রেই তাদের কাজ থেকে সরাসরি তাদের অ্যাডভেনচারের উদ্ভব হয় নি। এ বিষয়ে ডিকেন্স আর (ধরুন) ট্রোলোপ-এর পার্থক্য চমকপ্রদ। এর একটা কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, তাঁর চরিত্রগুলো কী পেশা গ্র্যাডগ্রাইণ্ড-এর (Gradgrind) কারখানায় ঠিক কী কাজ হত? পড্স্নাপ (Podsnap) কী করে টাকা করেছিল? মেরডল কী করে ঠকিয়ে খেত? সবাই জানেন পার্লামেণ্টের নির্বাচন ও ফাটকা বাজারের অসদুপায়ে টাকা করার ফন্দি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ট্রোলোপ-এর মতো ডিকেন্স দিতে পারেন নি। ব্যবসা, টাকা-কড়ি বা ফিনান্স, শিল্প বা রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই তিনি ব্যঙ্গ বা অস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আইন-ঘটিত ব্যাপারের বেলা সেই-কথা খাটে। এ সম্বন্ধে ডিকেন্স এর কিছু অনেক-কিছুই জানবার কথা। উদাহরণ-স্বরূপ, ডিকেন্স এবং অরলি-ফার্ম-এ (Orley Farm) যে কোনো মোকদ্দমার ব্যাপার তুলনা করে দেখুন।

ডিকেন্সের উপন্যাসের নিষ্প্রয়োজন শাখা বিস্তারের—উৎকট ভিক্টোরীয় প্লটের কারণ কতকাংশে এটাই। এ বিষয়ে

তাঁর সব উপন্যাসই যে একই প্রকারের এমন কথা অবশ্য সত্য নয়। 'অ্যা টেল অব টু সিটিজ' চমৎকার কাহিনী এবং মোটামুটি সবল; 'হার্ড টাইমস্' ও আরেকদিক থেকে তেমনি সবল ও চমৎকার কাহিনী। আর এই দুটোকেই "ঠিক ডিকেন্সের মতো নয়" বলে বাতিল করা হয়—আর প্রসঙ্গত ঐ দুটোই মাসিক উপন্যাসে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়নি—(প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিকে)। দুটো উত্তম-পুরুষাশ্রিত উপন্যাস ও সরেস গল্প—অবশ্য তাদের উপ-কাহিনী (sub plot) বাদ দিলে। কিন্তু খাঁটি ডিকেন্সীয় উপন্যাস—নিকোলাস নিকল্‌বি, অলিভার ট্যুইস্ট, মার্টিন চজ্‌লুবিট, আওয়ার মিউচ্যুয়াল ফ্রেণ্ড—কৌতুককর বা হাস্যরস প্রধান মিলন-নাটকের (melodrama) কাঠামো ঘিরে রয়েছে। এই বইগুলি সম্বন্ধে শেষ কথাটি, যা সবার মনে থাকে তা হল তাদের কেন্দ্রীয় কাহিনী। অপর পক্ষে বইগুলো পড়ে কোনো কোনো পৃষ্ঠার স্মৃতি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহন করেন নি এমন পাঠক নেই বলেই আমি অনুমান করি। ডিকেন্স মানুষকে অতি সুস্পষ্টভাবেই দেখেছেন, কিন্তু দেখেছেন তাদের ব্যক্তিগত জীবনে, চরিত্র হিসেবে, সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দেখেন নি; অর্থাৎ তিনি তাদের দেখেছেন স্থানু ও নিষ্ক্রিয়রূপে। ফলে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কৃতি হল দ্য পিকউইক পেপারজ: ওটা আদৌ গল্প নয়, কতকগুলো ধারাবাহিক নক্‌শা; পরিণতির প্রচেষ্টা সেখানে প্রায় নেই—চরিত্রগুলো চলছে আর চলছে, নিরবধিকালে হাবার মতো তাদের আচরণ। যখনই চরিত্রগুলোকে কাজের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন, তখনই শুরু হয়েছে হাস্যরস-প্রধান ভাবপ্রধান মিলন-নাটক (melodrama)। তাদের সাধারণ পেশাকে কেন্দ্র করে ঘটনা-প্রবাহকে আবর্তিত করতে তিনি পারেন নি: কাজেই দেখতে পাই কাকতালীয় সম্বন্ধ, ষড়যন্ত্র, খুন, ছদ্মবেশ, মাটিতে পোতা উইল, দীর্ঘকাল হারিয়ে যাওয়া ভাই ইত্যাদির ক্রশওয়ার্ড গোলোক ধাঁধাঁ। অবশেষে স্কুয়ার্স ও মিকওবার-এর মতো লোকও যেন যন্ত্রারূঢ় হয়ে পড়েছে।

অবশ্য ডিকেন্সকে আবছা ধরণের বা নিছক রোমাঞ্চক লেখক বলা হাস্যকর ও অযৌক্তিক হবে। তাঁর লিখিত বিষয়ের অধিকাংশই তথ্যগত, আর চাক্ষুষ প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলার শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই বোধ হয়। ডিকেন্স একবার কিছু বর্ণনা করলে বাকী জীবন আপনারা তা দেখতে পাবেন। কিন্তু বলতে গেলে তাঁর কল্পনার বাস্তবতা হল তিনি যা ধরতে পারেন নি তারই একটা লক্ষণ। কারণ, মোটের ওপর অসতর্ক দর্শক যা দেখে থাকেন ওটা তা-ই—বাহ্যরূপ, সবকিছুর উপরতল যার নিজস্ব কোনো কাজ নেই। পরিদৃশ্যের (landscape) সঙ্গে যে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে আছে সে কখনো পরিদৃশ্যটিকে দেখতে পায় না! বাহ্যরূপের আশ্চর্য বর্ণনা করতে পারলেও ডিকেন্স তার ক্রিয়া-প্রবাহের (process) বর্ণনা প্রায়ই করেন না। স্মৃতিপটে যে সুস্পষ্ট ছবি তিনি রেখে যেতে পারেন তা প্রায়ই অবসর মুহূর্তে ডাক গাড়ির জানালা দিয়ে অথবা গাঁয়ের কফি-ঘরে দেখা নানা জিনিসের ছবি। যে-রকম জিনিস তাঁর নজরে পড়ে তা হল সরাইখানার সাইনবোর্ড বা পরিচয় চিহ্ন, পেতলের দরজার কড়া, চিত্রিত জগ, দোকান ও বাড়ীর ভেতরের অংশ, পোষাক-আশাক, চেহারাছবি, আর সবার ওপরে, খাদ্যবস্তু। সবকিছুই ভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। তিনি যখন কোকটাউন সম্বন্ধে লেখেন তখন মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদে একটি ল্যাঙ্কাশায়ার শহরের পরিমণ্ডলটাকেই এমনভাবে জাগিয়ে তোলেন—একজন দক্ষিণী পরিদর্শক যেমনটা দেখতেন। "এর ভেতরে রয়েছে কালো খাল, দুর্গন্ধ রঙে লাল হয়ে যাওয়া নদী, বিরাট স্তূপাকার দালান; তার জানালা সারাদিন খট্ খট্ করে কাঁপছে, আর সেখানে ষ্টীম ইঞ্জিনের পিস্টন একঘেয়ে ভাবে ওঠা-নামা করছে—অবসাদ রোগগ্রস্ত হাতীর মতো।"

কারখানার যন্ত্রপাতির বর্ণনায় ডিকেন্স এর চেয়ে বেশি আর এগোতে পারেন না। কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার বা তুলার দালাল এটা অন্যভাবে দেখত; কিন্তু এদের কেউই হাতির মাথার ও-রকম যথাদৃষ্ট রূপটি ফোটাতে পারতেন না।

অন্যভাবে বলতে গেলে, জীবনের প্রতি তাঁর মনোভাব নিতান্ত দেহবোধ-বর্জিত। হাত এবং পেশীর মাধ্যমে নয়, বরং চোখ ও কান দিয়েই তিনি জীবনটাকে অনুভব করেন। এর থেকে মনে হতে পারে বসে থাকাই তাঁর অভ্যাস; প্রকৃত পক্ষে তা নয়। অপটু স্বাস্থ্য ও দেহ সত্ত্বেও তিনি এতই কর্মঠ যে তাঁকে চঞ্চল বলা যায়। তিনি ছিলেন আজীবন পায়ে-চলা লোক আর মোটের ওপর মঞ্চদৃশ্য রচনা করবার মতো ছুতোরের কাজ তিনি বেশ করতে পারতেন। হাতে কাজ করার প্রয়োজন যাঁরা অনুভব করেন, তিনি তাদের একজন ন'ন। যেমন, তাঁর সম্বন্ধে এ কল্পনা করা কষ্টসাধ্য যে তিনি বাঁধাকপির বাগানে মাটি খুঁড়ছেন। কৃষি সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না, আর স্পষ্টত খেলা-ধুলো, শিকার, আমোদপ্রমোদ কোনোটারই ধার তিনি ধারতেন না। যেমন, মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর এতটুকু আগ্রহও ছিল না। ডিকেন্সের উপন্যাসে দৈহিক পাশবতার চিত্র প্রায় নেই; যে-যুগে তিনি লিখে গেছেন, সে যুগের বিচার করলে এতে আশ্চর্য-বোধ করতে হয়। যেমন, যে আমেরিকানরা রিভল্‌ভার ও ছুরি নিয়ে সর্বদাই ভয় দেখাচ্ছেন বা শাসাচ্ছেন, তাদের প্রতি মার্টিন চজল্‌বিট ও মার্ক ট্যাপলির আচরণ নিতান্তই মৃদু। সাধারণ ইংরেজ বা আমেরিকান ঔপন্যাসিক কিন্তু দেখাতেন যে এরা চোয়ালে ঘুষি চালাচ্ছে ও চারদিকে সমানে গুলি বিনিময় করছে। তাদের তুলনায় ডিকেন্স ঢের ভদ্র; হিংসার মূঢ়তা তিনি উপলব্ধি করেন, আর তিনি সেই সাবধানী শহুরে শ্রেণীর অন্তর্গত—যারা তত্ত্বগতভাবেও চোয়ালে ঘুষি চালায় না। আর শিকার সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি সামাজিক অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। ইংল্যাণ্ডে, বিশেষ করে ভৌগোলিক কারণে, শিকার, বিশেষত মেঠো-শিকার আর উন্নাসিকতা অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত। ইংরেজ সমাজবাদীরা একথা বললে প্রায় বিশ্বাসই করতেন না যে, লেনিন গুলী চালানোর ভক্ত ছিলেন না। তাদের চোখে গুলী চালানো, শিকার-কর্ম জমিদার-তালুকদারদের উন্নাসিকতা মাত্র; তাঁরা ভুলে যান যে রাশিয়ার মতো বিরাট virgin দেশে এ সব ব্যাপার হয়তো ভিন্ন চোখেই দেখা হত। ডিকেন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায় সবরকমের বিহার-যাত্রাই বড়জোর বিদ্রূপের বিষয়। ফলে উনিশ শতকের জীবনের একটা দিক তাঁর লক্ষ্যের বাইরে। জীবনের এদিকটায় ছিল মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড়, মোরগের লড়াই, ইঁদুর ধরা—লীয়ের চিত্রে অপরূপ রঙে-রসে এটা ফোটানো হয়েছে।

এটা আরো বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে 'প্রগতিপন্থী' সংস্কারবাদী বলে যাকে মনে হয় তাঁর মনটা আদৌই যন্ত্রমুখী নয়। যন্ত্রের খুটিনাটি সম্বন্ধে বা যন্ত্রপাতি যা করতে পারে তার সম্বন্ধে কোনো আগ্রহই তাঁর দেখা যায় না। গিসিং মন্তব্য করেছেন, যে উৎসাহের সঙ্গে তিনি ডাক-গাড়িতে ভ্রমণের বর্ণনা করেছেন। তাঁর রেল-ভ্রমণে সে উৎসাহ কোথাও দেখা যায় না। তাঁর প্রায় সব বই থেকে এই ধারণাই হয় যে, আমরা যেন ১৯শ শতকের প্রথম পাদে জীবন ধারণ করছি; বস্তুত তিনি যেন সেই যুগে ফিরে যাবারই উপক্রম করছেন। লিট্‌ল ডরিট (Little Dorrit) লেখা হয়েছে ১৮৫৭-এর মাঝামাঝি সময়ে, কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তু ১৮২০-এর শেষ দিকের; গ্রেট্ এক্সপেক্টেশান্‌জ্-এর (Great Expectations) তারিখ জানা যায় না; কিন্তু '২০ এবং ৩০-এর কথাই স্পষ্টত তার উপজীব্য। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, গাদাবন্দুক, ইণ্ডিয়া-রবার, কয়লাজাত গ্যাস, কাঠের মণ্ডের কাগজ প্রভৃতি কতকগুলো

আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন আধুনিক জগতের সূচনা করেছিল। ডিকেন্সের জীবদ্দশায়ই ওগুলোর আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু তার উল্লেখ ডিকেন্সের বইতে নেই বললেই চলে। লিট্‌ল ডরিট-এ ডয়েস-এর (Doyce) উদ্ভাবন সম্বন্ধে কথাবার্তা এত অস্পষ্ট যে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। এটাকে দেখানো হয়েছে যেন কত বুদ্ধি করে তৈরী, কত বৈপ্লবিক এবং দেশ ও দেশবাসীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বইতে এটা কিন্তু গৌণ যোগসূত্র —কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। তবুও উদ্ভাবনটা যে কী সে কথা তিনি আমাদের আদৌ বলেন নি! অপর-পক্ষে ডয়েস-এর বাহ্যরূপটি ডিকেন্সের নিজস্ব ভঙ্গিতে ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে: বুড়ো আঙুল চালনার ভঙ্গিটি তার—ইঞ্জিনিয়ারের বিশিষ্ট ভঙ্গি। তারপর ডয়েস পাঠকের স্মৃতিতে শক্ত করেই আটকে যায়; কিন্তু ডিকেন্সের সাধারণ রীতি অনুসারে বহিরঙ্গের সাহায্যেই কাজটি করা হয়েছে।

এমন লোক আছেন (তার দৃষ্টান্তস্থল টেনিসন) যাঁদের যান্ত্রিকতা বোধ নেই, কিন্তু যন্ত্রের সামাজিক সম্ভাবনা তাঁরা দেখতে পান। ডিকেন্সের মন সে ছাঁচের নয়। ভবিষ্য-চেতনা তাঁর স্বল্পই আছে। মানব-প্রগতির কথা যখন তিনি বলেন, তখন সাধারণত 'নৈতিক' প্রগতির অর্থেই—মানুষ আরো ভালো হচ্ছে এই অর্থেই তা বলেন। সম্ভবত ডিকেন্স কস্মিন কালেও স্বীকার করতেন না যে টেকনিক্যাল উন্নতি যতটা ভালো হতে দেয় মানুষ ততটাই ভালো। এখানে ডিকেন্স ও তাঁর আধুনিক জুড়ি (analogue) এইচ. জি. ওয়েল্‌স্-এর (Wells) তফাৎটা সবচেয়ে বেশী। ওয়েল্‌স্ ভবিষ্যৎটাকে পাথরের হাঁসুলির মতো গলার পরে আছেন, কিন্তু ডিকেন্সের মনের অ-বৈজ্ঞানিক ছাঁচটি অন্তভাবে সমান ক্ষতিকর। এতে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ তাঁর পক্ষে আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। তিনি সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক অতীতের বিরোধী অথচ শিল্পাশ্রয়ী বর্তমানের সঙ্গেও তার সত্যকার যোগ নেই। তা হলে বাকী রইল ভবিষ্যৎটা (মানে বিজ্ঞান, প্রগতি ইত্যাদি ইত্যাদি)—তাঁর চিন্তাজগতে যার প্রবেশ নেই। সুতরাং দৃষ্টিগোচর সবকিছুই যখন তিনি আক্রমণ করছেন তখন তুলনার কোনো নির্দিষ্ট মান তাঁর নেই। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু প্রতীকার হিসেবে আরেকটু দয়ালু স্কুলমাস্টার ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না। ইস্কুল কী রকম হতে পারে তার ইঙ্গিতমাত্রও তিনি দেন নি কেন? গ্রীক-ভাষায় ঠাসা পাবলিক ইস্কুলে নিজের ছেলেদের না পাঠিয়ে নিজস্ব প্রকল্প অনুসারে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি কেন করেন নি? কারণ, তাঁর মনে সে-রকম কল্পনার অভাব ছিল। নির্ভুল নীতি-বোধ তাঁর আছে, কিন্তু বুদ্ধির ঔৎসুক্য নেই বললেই চলে। এখানেই এমন কিছুর ওপর আমাদের নজর পড়ে—যা ডিকেন্সের প্রকাণ্ড ত্রুটি; এমন কিছু যার জন্য ১৯শ শতককে আমাদের সত্যই সুদূর মনে হয়—যে শ্রমের কোনো আদর্শ তাঁর নেই।

ডেভিড কপারফিল্ড্ তো স্বয়ং ডিকেন্স। তাঁকে বাদ দিয়েও (এতেও সংশয়ের অবকাশ আছে) এমন কথা বলা যায় না যে, তাঁর একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রও নিজের নির্দিষ্ট কাজে প্রধানত আগ্রহশীল। তাঁর নায়করা জীবিকা অর্জনের ও নায়িকাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে—কোনো বিশেষ বিষয়ে তীব্র আগ্রহে নয়। উদাহরণ স্বরূপ, মার্টিন চজ্‌লুইট স্থপতি হবার উৎসাহে অধীর নয়; সে দিব্যি ডাক্তার বা ব্যারিস্টারও হতে পারত। খাঁটি ডিকেন্সীয় উপন্যাসে শেষ অধ্যায়ে সোনার থলে নিয়ে দৈবের প্রবেশ ঘটবেই এবং নায়কের দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে অব্যাহতি ঘটবেই। ভাবখানা এই, "এটা করবার জন্য আমি সংসারে এসে ছিলাম।" আর কিছুই আবর্ষণীয় নয়। এতে যদি

অনাহারেও থাকতে হয় তবু এ কাজই আমি করব। আর এতে বিভিন্ন মনোবৃত্তির লোক বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, রূপকার, পুরোহিত আবিষ্কারক ও বিপ্লবীতে পরিণত হয়—এই উপাদান বা বিষয়বস্তু ডিকেন্সের উপন্যাসে নেই বললেই চলে। তিনি নিজে যে দাসের মতোই খাটুনি করেছেন এবং নিজের কাজে বিশ্বাসও করতেন একথা সুবিদিত। কিন্তু উপন্যাস রচনা (হয়ত নাটক করা) বাদে আর কোনো নেশাই তাঁর ছিল বলে মনে হয় না—যার প্রতি এ-রকম নিষ্ঠা তিনি কল্পনা করতে পারেন। আর সমাজের প্রতি তার ঋণাত্মক মনোভাবের কথা বিবেচনা করে এটাই ঘোটের ওপর স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সর্বশেষে, সাধারণ শালীনতা ছাড়া আর কিছুরই প্রশংসা তিনি করেন নি। বিজ্ঞান তো আকর্ষণ করবার মতো বিষয়ই নয়, বস্তুপাতি নির্মম ও কুৎসিত (হস্তিমুণ্ড বিশেষ)। ব্যবসা শুধু বাউণ্ডারবির (Bounderly) মতো গুণ্ডা বদমায়েসদের জন্য। আর রাজনীতি—রেখে দিন তা টাইট বার্ণাকল্‌স এর (Tite Barnacles) জন্য। বস্তুত, নায়িকাকে বিয়ে করা, সংসারে কায়েমী হয়ে বসা ও ঘরকন্না করা, স্বচ্ছল ভাবে বসবাস করা এবং দয়ালু হওয়া—বাদে আর কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই নেই। আর সে কাজ ব্যক্তিগত জীবনেই আপনার আরো ভালো করে করতে পারেন।

এখানে ডিকেন্সের গোপন কল্পনার পটভূমির আভাস হয়ত পাওয়া যায়। তাঁর ধারণায় বেঁচে থাকার সবচেয়ে অভীপিত উপায় কী ছিল? মার্টিন চজল্‌বিট তার খুড়োর সঙ্গে বনিবনা করে ফেলল, আর নিকোলাস্ নিকল্‌বি (Nicholas Nickleby) লক্ষ্মীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল, বফিন-এর দৌলতে জন হার্মন (Harmon) যখন বিত্তবান্ হয়ে উঠল, তখন তারা কী করল?

এর স্পষ্ট উত্তর হল তারা কিচ্ছুই করেনি। নিকোলাস নিকল্‌বি তাঁর স্ত্রীর চিরিবিল্‌সুদের কাছে লগ্নী করল এবং ধনী ও বিত্তশালী বণিক হয়ে উঠল, কিন্তু যখন সে ডিভন শায়ার-এ অবসর গ্রহণ করল তখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, আর তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়নি। মিঃ ও মিসিস স্নডগ্রাস "ছোট্ট খামারি কিনে চাষবাস শুরু করল—লাভের জন্য ততটা নয় যতটা কিছু কাজ নিয়ে থাকার জন্য।" এই ভাবেই ডিকেন্সের অধিকাংশ বইয়ের পরিসমাপ্তি হয়েছে—একপ্রকার প্রোজ্জ্বল আলস্যে। নির্কর্মা তরুণদের (হার্টহাউস, হ্যারি গাউয়ান, রিচার্ড কার্সটোন সংস্কারপূর্ব রেবার্ণ) প্রতি যেখানে তাঁর মনের সায় নেই, সেখানে তার কারণ হল তারা বিশ্বনিন্দুক, দুর্নীতিপরায়ণ অথবা তারা অপরের গলগ্রহ। আপনি 'ভালো' তথা আত্মনির্ভর হলে আপনার আরো ৫০ বছর লভ্যাংশ ভোগ না করবার কোনো যুক্তি নেই। গৃহগত জীবন সর্বদাই যথেষ্ট। আর মোটের ওপর এই ছিল ডিকেন্সের যুগের সাধারণ অঙ্গীকার (assumption) 'ভদ্রোচিত পর্যাপ্ত আয়,' 'সাধারণ কর্মযোগ্যতা,' 'স্বাধীন জীবনোপায়ী' (বা স্বচ্ছল সহজ অবস্থার) ভদ্রলোক—এই বাক্যাংশগুলোই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদের অদ্ভুত শূন্যগর্ভ স্বপ্নের যাবতীয় কথা বলে দেয়। এ স্বপ্ন একান্ত আলস্য বা কর্মহীনতারই স্বপ্ন। হার্ড ক্যাশ-এর (Hard Cash) সমাপ্তিতে চার্লস রীড (Charles Read) নিখুঁত-ভাবে এর ভাবটি ব্যক্ত করেছেন। হার্ড ক্যাশ-এর নায়ক অ্যালফ্রেড হার্ডি ১৯শ শতকের typical উপন্যাস-নায়ক (পাবলিক স্কুল স্টাইলের) এমন সব গুণে গুণী যাকে রীড প্রতিভাকল্প বলে মনে করেন। সে একজন সেকেলে ইটনীয়ান (Etonian), অক্‌স্ ফোর্ডের পণ্ডিত, গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিক্‌স্ প্রায় সবই তার কণ্ঠস্থ, সে prize-fighters-দের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ করতে পারে এবং হেনলী-তে (Henley) ডায়মণ্ড স্কাল্‌স্ (Diamond Sculls) জিততে পারে। সে অবিশ্বাস্য রকমের দুঃসাহসিক কাজে

লিপ্ত হয়ে ত্রুটিহীন বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং তারপর ২৫ বছর বয়সে বিপুল বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে জুলিয়া ডড্‌কে (Julia Dodd) বিয়ে করে লিভারপুলের শহরতলীতে যে বাড়িতে শ্বশুরকুল বাস করত সেই বাড়িতেই ঘরকন্না করতে থাকে :

"অ্যালফ্রেডকে ধন্যবাদ, তারা সবাই অ্যালবিয়ন ভিলাতে (Albion Villa) বাস করত। আঃ কী সুখের ছোট্ট ভিলাটি তুমি! স্বর্গোপম মর্ত্যাবাস ছিলে তুমি। এমন দিন এল যখন সমস্ত আবাসিকের আর স্থান সংকুলান হল না সেখানে। জুলিয়া অ্যালাফ্রেডকে একটি সুন্দর ছেলে উপহার দিল, প্রবেশ ঘটল দুটি ধাত্রীর, আর এমন লক্ষণ দেখা গেল যেন ভিলাটি ফেটে পড়ছে। আরো দু মাস গেল, অ্যালফ্রেড ও তার স্ত্রী পাশের ভিলায় উপচে পড়ল। ওটা ছিল মাত্র ২০ গজ দূরে। এই নতুন বসতি স্থাপনের ডবল কারণ ছিল। বিধাতা কাপ্তেন ও শ্রীমতী ডড্‌-এর কোলে দিলেন আরেকটি শিশু সন্তান: কালে-কালে এরকমই হয়ে থাকে! ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এই হল ভিক্টোরীয় সুখ-সমৃদ্ধ পরিসমাপ্তির নমুনা তিন-চার পুরুষের প্রকাণ্ড প্রেমস্নিগ্ধ পরিবারের স্বপ্ন, একই গৃহে গাদাগাদি হয়ে বাস, ও নিয়ত বংশবিস্তার—সামুদ্রিক শামুকের খোলসের মতো। এতে যে একান্ত স্নিগ্ধ-কোমল, আশ্রিত নিশ্চেষ্ট জীবনের ইঙ্গিত নিহিত, সেটাই হলো এ বিষয়ে লক্ষণীয়। স্কুয়ার ওয়েস্টার্ণ-এর (Squire Western) আলস্যের মতো উগ্র আলস্যও এটা নয়। ডিকেন্সের শহুরে পটভূমি ও জীবনের স্থূল মৃগয়াসক্ত-সামরিক বিকের প্রতি তাঁর অনীহার তাৎপর্যতাই। তাঁর নায়করা একবার টাকা পেলে ও সংসার করতে সুরু করলে আর কোনো কাজই করবে না; এমন কি ঘোড়-দৌড় করা, শিকার করা, বন্দুক চালানো, দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, অভিনেত্রী নিয়ে ভেগে পড়া, অথবা ঘোড়-দৌড়ে টাকা-খোয়ানো—এ সবও করবে না। শুধুই পালক-শয্যার পেলব ভদ্রতা নিয়ে গৃহকোণে এবং অনুরূপ জীবন-বিলাসী কোনো শোণিত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের পাশাপাশি বাড়িতে বাস করবে :

"বিত্তশালী সমৃদ্ধ বণিক হয়ে নিকোলাস-এর প্রথম কাজ হল বাবার পুরোনো বসতবাড়িটা কিনে নেওয়া। কালক্রমে তার চারপাশে দেখা দিল একগুচ্ছের ছেলেমেয়ে। বাড়ির আদল বদলে গেল; কিন্তু পুরোনো একখানা ঘরও কখনো ভেঙে ফেলা হয় নি, পুরোনো গাছ একটাও উপড়ে ফেলা হয় নি, বিগত দিনের স্মৃতি-বিজড়িত তৃণকুটোও বদলে বা সরিয়ে ফেলা হয় নি।

"ঢিল ছুঁড়লে যতটা দূরে যায় তারই মধ্যে ছিল শিশুর কলকণ্ঠ-মুখরিত আরেকটি নিলয়; আর এখানে ছিল কেট (Kate)···বালিকা বয়সে যেমনটি ছিল তেমনি নিখাদ, শান্ত-নিরীহ জীব, তেমনি স্নেহশীলা ভগিনী আশপাসের সকলের প্রতি তেমনি মমতাময়ী।

রীড-এর বই থেকে উদ্ধৃত রচনাংশে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনি অনাচারী আবহাওয়া। আর পরিষ্কার এই হল ডিকেন্সের আদর্শ পরিসমাপ্তি। নিকোলাস নিক্‌লবি, মার্টিন চজ্‌লবিট্‌ এবং পিকউইক-এ এরই নিখুঁত সিদ্ধি এবং প্রায় আর সব উপন্যাসে কমবেশী এরই কাছাকাছি এসেছেন তিনি। ব্যতিক্রম হল হার্ড টাইম্‌জ্‌ ও গ্রেট এক্সপেক্‌টেশান্‌জ্‌; পরেরটিতে পরিণাম বস্তুত সুখকর, কিন্তু বইয়ের মূল সুরের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটেছে, আর বুল্‌বার লিট্‌ন-এর (Bulwar Lytton) অনুরোধে এ পরিণামটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

অতএব, যে-আদর্শ সাধনীয়, মনে হয় তা অনেকটা এইরকম: এক লাখ পাউণ্ড, একটি সেকেলে পুরোনো বাড়ি, তাতে অনেক আইভি লতা, লক্ষ্মীশ্রী ঘরণী, একপাল ছেলেমেয়ে, আর না-কাজ। সবকিছু নিরাপদ, কোমল,

শান্তিময় আর সবার ওপরে ঘরো পরিবেশ। পথে যেতে শেওলা-ছাওয়া গির্জার আঙিনায় আজকের এই সুখের মুখ দেখবার আগেই গতায়ু প্রিয়জনের সমাধি। চাকর-বাকর কমিক ও সামন্তযুগীয়, চারপাশে শিশুরা আধস্বরে বলছে, আগুনের কুণ্ডের পাশে পুরোনো বন্ধুরা বসে অতীত দিনের কথা বলছে, ভুরি ভোজের শেষ নেই, ঠাণ্ডা পাঞ্চ্ ও শেরি নিগাস, পালকের বিছানা ও গরম করার জন্ম কড়া, বড়দিনের উৎসব, তাতে শ্যারাড ও কানামাছি খেলা; কিন্তু বছর বছর শিশুর জন্ম ছাড়া আর কিছুই ঘটে না। তাজ্জব ব্যাপার হল—এ এক নিখাদ সুখের ছবি; অথবা ডিকেন্স এমনি করেই দেখিয়েছেন। এরকম জীবন-ভাবনা তাঁর কাছে প্রীতিজনক। ডিকেন্সের পয়লা বই লেখার পর যে ১০০ বছর গড়িয়ে গেছে—এ কথা বলার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। কোনো আধুনিক লোকই এমন উদ্দেশ্য-হীনতার সঙ্গে এতটা জীবন্তভাব ও প্রাণশক্তির মিলন ঘটাতে পারত না। *

(ক্রমশঃ)

* জর্জ অরওয়েল-এর লেখা 'চার্লস ডিকেন্স' নামক নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ [অঃ সঃ]।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৭·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

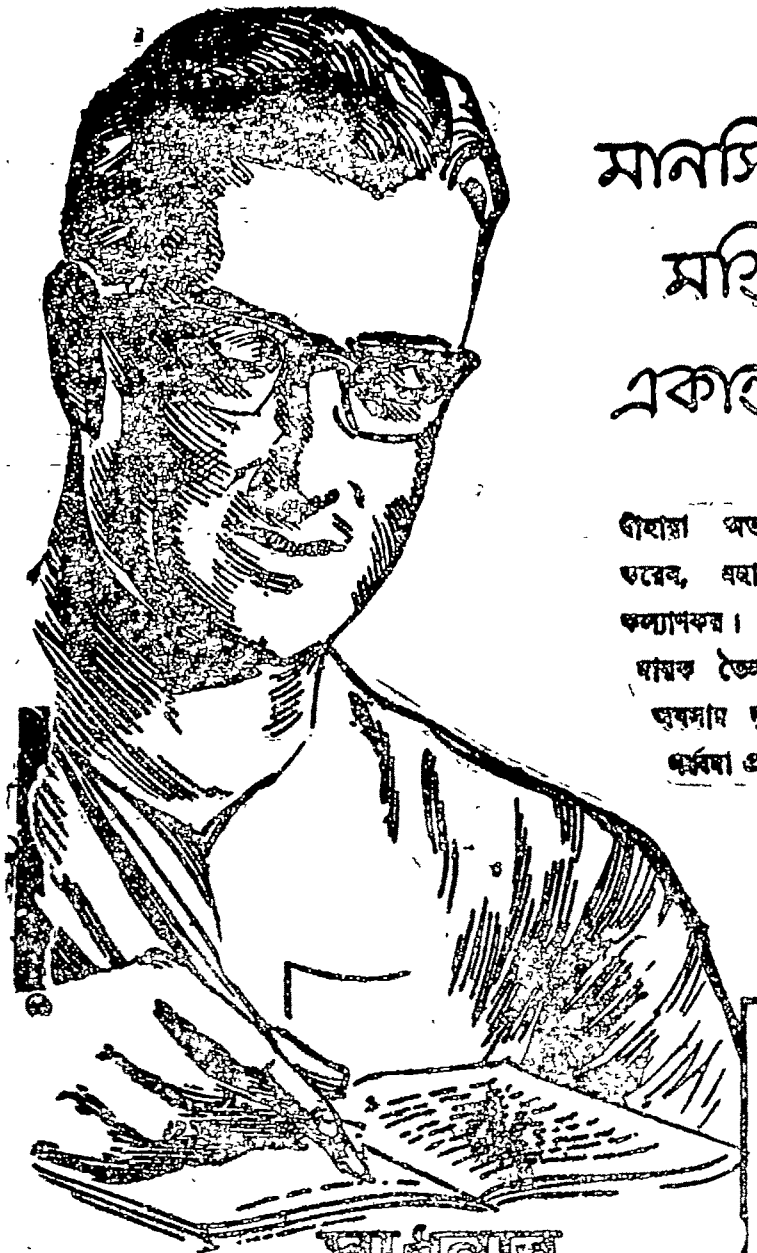

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, ব্রহ্মতৈলই তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আয়ুর্বর্দ্ধক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

সাধনার

মহা ব্রহ্মরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-চাকা

সাধনা ঔষধালয় লেন কলিকাতা- ৩৮

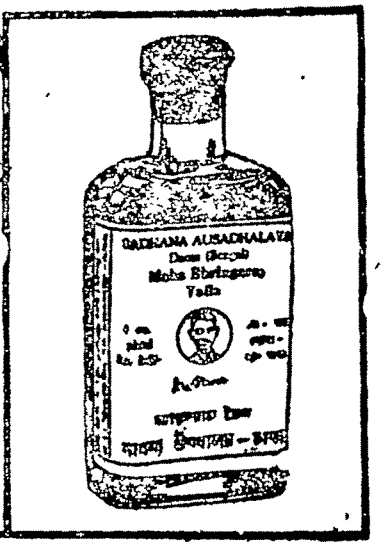

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম, বি, এস, (নওল) এম, বি, এস (আয়ুর্বেদিক)
ঢাকেশ্বরী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক

বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র : ৮

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে দেশের জনজীবনের থেকে শিথিল হয়ে গড়ে ওঠে। জাতীয় কংগ্রেসের নীতিদেহেও এই শ্রেণীরই মানসিকতা প্রতিফলিত এবং মুখ্যত এই শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থেই তার সংগ্রাম। মণীন্দ্রলাল বসুর রচনার যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা তেমনই এই শ্রেণীর কতকগুলি নিজস্ব সমস্যা পরিস্ফুট হয়েছিল। তাঁর লেখায় মধ্যবিত্ত তরুণদের ভাববিলাসিতা, চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা, লক্ষ্যহীনতা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা রূপ পেল এবং তাঁর চরিত্রগুলির নিঃসঙ্গতাবোধ যতখানি স্বাশ্রয়ী ব্যক্তিত্বের থেকে তার চাইতে অনেক বেশি দেশীয় জীবনধারার সঙ্গে বিচ্ছেদের বা ওই ধারার সঙ্গে নিজেকে সনাক্ত করতে না পারার অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত। এই বিশেষ ও ক্ষুদ্র শ্রেণীর চরিত্র রূপায়নেই মণীন্দ্রলালের সাহিত্যিক যাথার্থ্য।

মণীন্দ্রলালের বয়োজ্যেষ্ঠ সমকালীন কথাশিল্পী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রচনায় এই শ্রেণীর আর এক মানসিকতা মূর্তি ধারণ করল : সেটা হলো দেশের প্রথাসিদ্ধ মূল্যবোধকে সমালোচনার মানসিকতা। এই মূল্যবোধকে বাজিয়ে যাচিয়ে দেখার প্রবণতা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের সূচনা হয়েছিল এদেশে। কিন্তু দেশীয় মূল্যবোধের যে-সমালোচনা এতকাল হয়ে এসেছিল সেই মূল্যবোধ ছিল সমাজাশ্রয়ী অর্থাৎ প্রচলিত সামাজিক আচার বিচার বিশ্বাসকেই উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত বাঙালী সমাজ আঘাত করেছিল, এবং আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, বরং মনে করা হয়েছিল যে ব্যক্তি হলো সেই অনাদ্যন্ত সত্তারই বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি যা কলুষিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আত্মবিস্মৃত ও বিকৃত হয়ে যায়।

সমাজকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ব্যক্তিকে বিচারকের আসনে বসানোর যে ধারা চলে আসছিল তার প্রতিবাদ প্রথমে ক্ষীণ ও পরে তীব্রভাবে করলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি,' 'নষ্টনীড়,' 'যোগাযোগ' প্রভৃতি রচনায়। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, ব্যক্তির স্বকীয় সত্তাকেও যে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা দরকার এই নীতিকে সমস্ত রচনায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ বোধ করেননি, ব্যক্তি-সমালোচনার সূত্র ধরিয়ে দেওয়াই তাঁর শিল্পিসত্তার অনন্যতার পরিচায়ক। কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শুধু ওই ধরিয়ে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, মনে করেছেন যে এই সূত্রকেই সমস্ত রচনায় বিশদ ও সাধনা করতে হবে। তিনি নিজেও তাই করেছেন অর্থাৎ তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ রচনাগুলি এই একই উদ্দেশ্যে চালিত। এদিক থেকে নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরসূরী : তবে একথাও মনে রাখা কর্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অজস্র সূত্রগুলির মধ্যে নরেশচন্দ্র শুধু একটিকেই আশ্রয় করেছিলেন এবং সেই সূত্রকেও তিনি খুব শিল্পসম্মত ধারায় অনুসরণ করতে পারেননি, কেননা তাঁর শিল্পসত্তা ছিল সীমাবদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে নরেশচন্দ্রের তাৎপর্য এই যে পাশ্চাত্য

ধারায় ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে যৌনবৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশের ও পাপের প্রতি আকর্ষণে নানাবিধ জটিলতার বুদ্ধিপ্রধান বর্ণনায় তিনি এক অভিনব সাহিত্যরস পরিবেশনের পথ দেখিয়েছেন। যৌনবৃত্তি ও পাপকে বিষয়বস্তু করে মনস্তত্ত্বমূলক কথাশিল্পে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পথিকৃৎ। ব্যক্তিসত্তার যে অমল মহিমায় পূর্ববর্তী শতাব্দীর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য বিশিষ্ট তাকে নরেশচন্দ্র প্রতিস্পর্ধা জানালেন এবং দেখাতে চাইলেন যে পাপ-ও-যৌন-বৃত্তিই মনুষ্যচরিত্রের সামান্য লক্ষণ। শিল্পগুণে নরেশচন্দ্রের রচনা যে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়, সেকথা স্বীকার করাই ভালো, কিন্তু বিষয় ও বক্তব্যের অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নরেশচন্দ্রের কথাশিল্পের বিশেষ মূল্য অবশ্যই আছে।

কথাশিল্পের ক্ষেত্রে নরেশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছোটগল্পের চাইতে উপন্যাসেই বেশি স্ফূর্তি লাভ করেছিল। আর ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নরেশচন্দ্র যতখানি নতুন ভাবধারা প্রচারে তার চাইতে বেশি পাঠকের মনোরঞ্জনে আগ্রহী। তাঁর অধিকাংশ গল্পই আকারে ছোট হলেও ঘটনার আধিক্যে ও বিস্তারে যথার্থ ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি একথাও সত্য। এবং একথাও সত্য যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগৎ ছেড়ে অধীত জ্ঞানের থেকেই তিনি কথাশিল্পের উপকরণ আহরণ করেছিলেন, অন্তত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর লেখায় অস্পষ্ট। ফলে তাঁর লেখায় চরিত্রগুলি কিছুটা নীরক্ত ও ও নিরুত্তাপ, তারা যেন লেখকের তত্ত্ব প্রমাণের উপায়মাত্র। তাঁর কথাশিল্পের যে অংশ মনোরঞ্জক নয় সে অংশর আবেদন পাঠকের হৃদয়বৃত্তির কাছে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির কাছে।

নরেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিও হৃদয়াবেগের অভাবে কিছুটা নিষ্প্রাণ, কিন্তু এটাও তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং যেখানেই তিনি হৃদয়াবেগ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন, যেমন 'অভয়ের বিয়ে' উপন্যাসে, সেখানেই তাঁর রচনা তাৎপর্যহীন মনোরঞ্জনী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে গেছে। তবে হৃদয়াবেগের অভাব তাঁর ছোট গল্পগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি, বরং ওই আবেগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁর ছোট গল্পগুলি নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্ত রূপ ধরেছে এবং এই রূপ ছোটগল্পের জন্যে আবশ্যিক ব্যঞ্জনাকে ফোটাতে সাহায্য করেছে। ছোটগল্পের শেষে আকস্মিকতা যে-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তা নরেশচন্দ্রের ছোটগল্পে নেই, কিন্তু সেই ব্যঞ্জনা নরেশচন্দ্রের অনতিব্যক্ত বর্ণনায় ছোটগল্পের সমস্ত শরীরে বিকীর্ণ থাকে।

যেমন 'তাবিজ' গ্রন্থের 'শিবকালীর সংসার' ছোট গল্পটিকে নরেশচন্দ্র সাজিয়েছেন উপন্যাসের মতোই পরিচ্ছেদ ভাগ করে; পাঁচটি পরিচ্ছেদের একটিও তিন-চার পৃষ্ঠার বেশি লম্বা নয়, এবং এমন পরিচ্ছেদও আছে যা দেড় পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত। শিবকালী চক্রবর্তী প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যুর পর তৃতীয়বার পত্নী গ্রহণ করেন। কেন তিনি বার বার পত্নী গ্রহণ করেছেন তার ব্যাখ্যা না দিলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এখানে কোন্ বিশেষ বৃত্তি অধিক পরাক্রান্ত। যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত শিবকালীর জীবন-কাহিনী এ গল্পে বিবৃত হয়েছে। এই বিস্তৃত সময়কালের পরিসরে শিবকালীর জীবনের নানা দিক ও নানা ঘটনা বর্ণনার একটা প্রবণতা থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নরেশচন্দ্র এগিয়েছেন দৃঢ় পদে একটি মাত্র সূত্র ধরে, কোনও অনাবশ্যক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি, কিংবা এমন কোনও বর্ণনা যোগ করেন নি যাকে বাহুল্য মনে হতে পারে। বরং গল্পটি এত বেশি প্রতিপাদ্য সূত্রের প্রতি অনুগত ও একাগ্র যে মনে হয়, এটা একটা ছোটগল্পের কাঠামো মাত্র, এতে এখনও মাটি রং লাগানো বাকি আছে। নরেশচন্দ্রের ছোটগল্পে রক্ষিত এই অসম্পূর্ণতাই তাঁর রচনার একটি প্রধান গুণ। যথাসম্ভব কম শব্দ ব্যবহার করে একজন সংসার-

মণ্ডুকের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও অকৃতার্থতাকে লেখক উন্মোচন করেছেন অব্যর্থভাবে। এই উন্মোচনের পাশাপাশি খুব অলক্ষ্যে লেখকের অমুগ্র শ্লেষ শুরু থেকেই নেপথ্যে উপস্থিত, এবং শিবকালীর ভেঙে পড়ার প্রক্রিয়াকে যতক্ষণ বর্ণনা করেছেন ততক্ষণ এই শ্লেষকে নেপথ্যে রেখেছেন, গল্পের শেষে, যখন শিবকালীর সংসারে আসক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে শুধু তখনই তার ব্যর্থতাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্যে লেখক ওই শ্লেষকে মঞ্চের মধ্যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং এই শ্লেষ গল্পের প্রত্যাশিত ফলশ্রুতিকে অত্যন্ত সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছে।

'অসতী' গল্পে লতিকা নিশ্চয়ই লোকাচারের মানদণ্ডে ঘৃণ্য ; অতুলের সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। তার পূর্ব প্রণয়ীর কোনও উল্লেখ গল্পটিতে নেই, কেননা এ গল্পের ক্ষেত্রে সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। মূল গল্পের বাইরে কোনও ঘটনার সামান্যতম উল্লেখও এখানে অনুপস্থিত, যেটুকু না বললেই নয় শুধু সেটুকুই বলেছেন। ব্যাপারটা যখন অতুলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন কি সে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করল ? না, স্ত্রীকে নিয়ে সে দেশত্যাগ করল এবং নাগপুরে গিয়ে ওকালতীতে বেশ পসার জমাল।

[বিবাহের ছ'মাস পরে লতিকার একটি সুপুষ্ট সন্তান জন্মাল, কিন্তু দেড় বছর বাদে ছেলেটি মারা গেল। অতুল যে ছেলেটির চিকিৎসাতে কোনও অবহেলা করেছিল এমন নয়, খরচ করে বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখিয়েছিল। ডাক্তারদের বিধান মেনে নেওয়ার জন্যে নয়, পরের ছেলের জন্যে খরচে তার উদারতা দেখাবার জন্যেই ডাক্তারদের ডেকেছিল অতুল। এর পরে লতিকার দ্বিতীয় পুত্র জন্মাল। তার জন্যে বাড়িতে গরু কেনা হলো। অতুল সবাইকে বলে বেড়াতে থাকল যে প্রথম ছেলেটির কেনা দুধ খেয়ে রিকেটস হয়েছিল বলে এবার সে গরু কিনেছে। লতিকার কোনও অভাব বা কষ্টই অতুলের বাড়িতে ছিল না। তবু লতিকার মনে হতো, গরিবের ঘরে হাড়ভাঙা খেটে যদি তাকে খেতে হতো তাহলে ভালো হতো। তার এই মনে হওয়ার কারণ এই নয় যে সে অকৃতজ্ঞ ছিল। অতুলের সমস্ত আচরণে লতিকার প্রথম সন্তানের জনকের প্রতি, এবং প্রথম সন্তানের প্রতিও, একটা প্রচ্ছন্ন যৌন ঈর্ষা ফুটে উঠত ; অথচ সে বার বার লতিকাকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিত যে সে অত্যন্ত মহৎপ্রাণ এবং উচ্চতর মানুষ। নাগপুরের সমাজ লতিকার গুণমুগ্ধ ছিল, এবং অতুলের কাছে সকলে শতমুখে তার সুখ্যাতি করত। বাড়িতে এসে সে হাসিমুখে দশজনের মুখে শোনা প্রশংসা লতিকাকে জানাত, কিন্তু সকলের সব প্রশংসা শোনাবার পরে যোগ করতে ভুলত না, 'ভেবে দেখ, কি হত তোমার দশা, যদি আমি তোমাকে গ্রহণ না করতাম। এতদিন হয় তো সোনাগাছি ছেড়ে খোলার চালায় আশ্রয় নিতে হতো।'

কিন্তু সমাজে লতিকার সম্মান দিনে দিনে বেড়েই চলল, এমন কি লাটসাহেবের দরবারে তার নিমন্ত্রণও হলো। লাট দরবারে প্রবেশের জন্যে অতুলের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্ত্রীর দৌলতে যখন অতুলের সে স্বপ্ন সফল হলো তখন সে হেসে লতিকাকে অনেক সমাদর করল এবং শেষে যোগ করল, 'ভেবে দেখ কি আশ্চর্য্য ! কোথায় তুমি কলকাতার রাস্তায় পান বেচবে, না, একেবারে লাটদরবারে নেমন্তন্ন।' গল্পটিতে আগাগোড়া অতুলের জটিল মনস্তত্ত্বকে তার কথায় ও কাজে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ; তার যৌনঈর্ষার লক্ষ্য প্রথমে লতিকার পূর্বপ্রণয়ী, পরে লতিকার প্রথম সন্তান, পরে লতিকার গুণমুগ্ধ সমাজ, এবং আস্তে আস্তে অতুল নিজে যাদের কৃপাপ্রার্থী ছিল তাদের প্রতিও বিদ্বেষে জর্জরিত হয়েছে ! এই ঈর্ষাই তাকে স্বাভাবিক মানুষের স্তর থেকে নীচতার নিম্নতম স্তরে নামিয়েছে, এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টা করেছে মহত্ত্বের মুখোশটাকে রক্ষা করার।

লেখকের সমস্ত পক্ষপাত যে লতিকার উপরেই বর্ষিত হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু এই পক্ষপাতে কোনও ভাবাবেগ নেই, গল্পে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আত্মগুপ্ত থেকেছেন, পাঠকের সামনে এসে নিজের বিচার দেননি, বর্ণিত চরিত্রগুলির বিচারের পূর্ণ দায়িত্ব পাঠকের চিন্তাশক্তির উপর অর্পণ করেছেন। নরেশচন্দ্রের উৎকৃষ্ট রচনাগুলির দোষ বা গুণ এই যে পাঠকের সঙ্গে লেখক অন্তরঙ্গ সহযোগিতা করেন না, গল্পের থেকে নির্লিপ্তভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে পাঠকের কল্পনা ও বিবেচনার কাছে বড়ো বেশি দাবি করেন এবং সে-দাবি পূরণে অক্ষম পাঠকের পক্ষে তাঁর গল্পের রস গ্রহণ করা কঠিন।

কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট গল্পে নরেশচন্দ্র লোকাচারের সংস্কার ভেঙেও পাঠকের কাছে দাবিকে খাটো করেছেন ও গল্পের রসগ্রহণের পথকে পাঠকের পক্ষে সুগম করেছেন। গল্পটির নাম 'ঠানদি', প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের কালে। এগল্পর পেছনে 'নষ্টনীড়ে'র প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া—দুটোর কোনও একটি—বা দুটোই থাকা সম্ভব। গল্পের বিষয় 'নষ্টনীড়ে'র অনুরূপ: ঠানদি মানে বৌদির সঙ্গে দেওরের প্রেম, কেননা স্বামী বিত্তবান, রূপবান ও সুদরবান হলেও সর্বদা কর্মব্যস্ত। তবে স্বামী চরিত্র দুটির আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও দু বৌদির চরিত্রে কিছু বৈসাদৃশ্য আছে এবং আরও বড়ো পার্থক্য এই যে গল্প দুটতে বর্ণিত দু দেওরের চরিত্র একে অপরের বিপরীত।

অমল আসলে সরল, সৎ, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান, অংশত অপরিণত ও সম্পূর্ণত পাপবোধহীন এবং বৌদির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার অজ্ঞাতে, তাই যখনই সে-সম্পর্কের প্রকৃতি তার কাছে ধরা পড়ল তখনই সে দেশ ছেড়ে পালাল। পক্ষান্তরে 'ঠানদি'র নায়ক শচীকান্ত অভিজ্ঞতায় ও চেতনায় সুপরিণত, সে চতুর ও সুযোগসন্ধানী, পাপে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বেপরোয়া এবং কামনার বস্তুকে কেমন করে হস্তগত করতে হয় সে-কৌশলে পটু। সেজন্যে প্রচ্ছন্ন প্রেমালাপের মধ্যে অনায়াসেই শচীকান্ত সহজ ভাবে বলতে পেরেছে, 'বৌদি, খালি কি কথা খাইয়েই রাখবে নাকি? খাবার দাও।' এ উক্তির নিহিতার্থ ঠানদি বুঝতে পারল, বুঝে তার রাগ করার কথা ছিল, কিন্তু পেল লজ্জা এবং লজ্জা পেয়ে শচীকান্তের কামনাকে বাড়িয়ে তুলল, হয়তো বা আশাও দিল।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের সামাজিক মূল্যবোধে এ গল্প যে প্রচণ্ড আঘাত হেনে থাকবে তা অনুমান করা যায় এবং সেকালে মনকে চোখ ঠেরে 'ঠানদি'কে অবাস্তব বলাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাকচাতুর্য ছিল শচীকান্তের গুণ, এই গুণের সম্যক পরিস্ফুটনও গল্পে হয়েছে আর বাকচাতুর্যে বাঞ্ছিতার চিত্তহরণের এবং এসব ক্ষেত্রে সমাজ-নির্দিষ্ট সম্পর্কের ভঙ্গুরতার দৃষ্টান্ত আজকের পাঠকের সামনে প্রচুর। শরৎচন্দ্র 'দত্তা' উপন্যাসে নরেনের প্রতি বিজয়ার সবিস্ময় আকর্ষণ জাগাবার জন্যে নরেনকে দিয়ে এমন ভাবে একটা জানলা খুলিয়েছেন যা শুধু মহাবীরের পক্ষেই সাধ্য; আধুনিক কোনও কোনও লেখক ওই আকর্ষণ জাগাবার জন্যে নায়কের চরিত্রে অজস্র গুণাবলী আরোপ করে থাকেন, যেমন তাকে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের শিরোপা দিয়ে থাকেন, কিন্তু সে-পাণ্ডিত্যের কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় কাহিনীতে থাকে না। 'ঠানদি' গল্পে শচীকান্তের চরিত্রের আকর্ষণীয় দিকগুলির কথা নরেশচন্দ্র নিজে বলে দেননি, সে দিকগুলি গল্পের শরীরে আপনা থেকেই ফুটে উঠেছে, তার কথা ও কাজ থেকেই তার চরিত্র পাঠকের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু গল্পের মধ্যে ঠানদির কথা ও কাজ কম তার প্রতিভাষণ ও প্রত্যাচরণের অবকাশ স্বল্প, সেজন্যে লেখককে এগিয়ে আসতে হয়েছে তার মনের কথা বলে দেওয়ার জন্যে এবং এসূত্রে পাঠকের সঙ্গে যত কম অন্তরঙ্গ সহযোগিতা

সম্ভব সেটুকু করেছেন ; কিন্তু কম হলেও সহযোগিতা তিনি করেছেন।

নরেশচন্দ্রের এসব গল্প পড়লে বুঝতে দেরি হয় না যে আগের থেকে ছক বা পরিকল্পনা করে গল্প লিখতে তিনি বসেন না ; প্রাত্যহিকতার বাইরে কোনও সমস্যার ছায়ায় তিনি চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেন এবং সেই বিশেষ প্রদত্ত পরিস্থিতিতে তাদের মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেন আর সেই বিশ্লেষণ অনুসারে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকে চরিত্রগুলির কর্মে ও বাক্যে ফুটিয়ে তোলেন। এর ফলে অবশ্য তাঁর অধিকাংশ গল্পই উদ্দেশ্যহীন ভাবে অতিবিস্তারে দিশেহারা হয়ে গেছে, বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে পারম্পর্য ও কার্যকারণ সূত্র থাকলেও গল্প শেষ করে মনে হয় গল্পটিতে সংগতির অভাব থেকে গেছে, চরিত্র ও ঘটনার টানাপোড়েন অ্যাণ্ডারসনের গল্পে বর্ণিত সেই রাজপরিচ্ছদই তৈরি করে যার কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই এবং সমস্ত বিশ্লেষণ ও বর্ণনার কোনও প্রতিপাদ্য বস্তু বা অভিপ্রেত ফলশ্রুতি নেই। নরেশচন্দ্রের গল্পগুলির সর্বদাই কোনও একটা চূড়ান্ত রূপ থাকে : হয় তা একাগ্রতায় ও ব্যঞ্জনায় প্রকৃতই অনন্য, নতুবা উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় একেবারেই বিভ্রান্ত, নতুবা পুরোপুরি পাঠকের মনোরঞ্জক বা ভাবাবেগের সেবক। 'ঠানদি', 'অসতী', 'শিবকালীর সংসার' প্রভৃতি প্রথম জাতের অন্তর্গত ; এজাতের আর একটি গল্প 'বিচারে' তিনি পাপের বিচিত্র স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন। 'দত্তগিন্নী' বা 'যোগী' গল্পেও যৌনবৃত্তি থেকে উদ্ভূত নীতিহীনতার চিত্র এঁকেছেন কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রাঙ্কনের ঝোঁকে তিনি মাত্রা রাখতে পারেননি ; 'তাবিজ', 'চিত্রকর' প্রভৃতির মতোই তাই এ গল্প দুটি দ্বিতীয় জাতের গল্প। 'দ্বিতীয় পক্ষ,' 'পাঁকের ফুল', 'রামচরণ' প্রভৃতি তৃতীয় জাতের গল্প এবং এ ধরণের গল্পের সংখ্যাই তাঁর বেশি।

নরেশচন্দ্রের উৎকৃষ্ট ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প ; কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনায় যে-চরিত্র বৈচিত্র্য ও মানবমনের জটিল গতির পরিচয় আছে তা প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র-অনুবর্তী লেখকদের যুগে বাংলা সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিকোণ এনেছে। তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতা কম, কিন্তু সাহিত্যে নতুন চিন্তা সঞ্চারে তাঁর অবদান অসামান্য এবং সমষ্টির দিক থেকে গুরুত্ব প্রত্যাহার করে ব্যষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি আধুনিক কালের বিশিষ্ট মূল্যবোধকে বাংলা সাহিত্যে বরণ করলেন। যৌন ও পাপ-বৃত্তির কাছে মানুষের পরাভূত চিত্রকে এঁকে বাংলা সাহিত্যের একটা নিষিদ্ধ অঙ্গনে তিনি পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের প্রবেশাধিকার দিলেন এবং এসব ক্ষেত্রে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। নরেশচন্দ্র হলেন সে-ধরণের শিল্পী যাঁদের বেলায় সিদ্ধির চাইতে সাধনার, প্রকারের চাইতে প্রয়াসের তাৎপর্যই বেশি। পাপ-ও-যৌন-বৃত্তিকে এতকাল সাহিত্যে ঘৃণা বা বিরাগ জাগাবার উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু এ দুটি বৃত্তিও যে মানুষের আর দশটা বৃত্তির মতোই অদম্য ও স্বাভাবিক, এসত্য নরেশচন্দ্রের মতো স্পষ্ট করে আগে কেউ বলেন নি।

নরেশচন্দ্র যে সত্যকে ঘোষণা করলেন তাকে বরণ করে সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হলেন যুবনাশ্ব। তাঁর আসল নাম মনীশ ঘটক এবং তিনি নরেশচন্দ্রের পরবর্তীকালের লেখক। নরেশচন্দ্রের রচনা থেকে যুবনাশ্ব প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়তো পান নি, কিন্তু স্পষ্টতই নরেশচন্দ্র প্রথাসিদ্ধকে অতিক্রম করার যে পথ দেখিয়েছেন সে পথেই যুবনাশ্বের প্রবেশ ও প্রগতি। তবে নরেশচন্দ্র মনের নিষিদ্ধ জগতের দরজা ভেঙে দিয়েছেন আর যুবনাশ্ব ভেঙেছেন জীবনের নিষিদ্ধ জগতের দরজা। যুবনাশ্বের বেশির ভাগ গল্পই ১৯২৩ থেকে ১৯২৪ সময়কালে পটলডাঙার বস্তির জীবন নিয়ে লেখা, সেখানে মানুষের শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা ভব্যতা সুরুচি সুনীতি ও সুকুমার বৃত্তিগুলি কোনদিন ঢোকার পথ পায় নি, সেখানকার

ঘরে উনুনের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এলেও কুশ্রীতা যেন কিছুটা যেন কিছুক্ষণের জন্যে ঢাকা পড়ে অস্পষ্ট হয়ে যায়, সেখানকার পাঁকে ফুল ফোটার কল্পনা হাস্যকর, সে পাঁকে শুধু অপরাধ আর পাপই আশ্রয় পায়, পশুর জীবনের চাইতেও জঘন্য ধিক্কারজনক হিংস্র বীভৎস ও বিকৃত সেখানকার জীবন। পটলডাঙার জীবন দেখলে মানুষকে সভ্য পশু বলতেও জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাবে, কেননা সে-জীবন পশুর জীবনও নয়, পশুগুলোর প্রেতের জগৎ বলে কোনও জগৎ থাকলে পটলডাঙার জীবন সেই জগতের কাহিনী। এ জগৎ পাশবিক নয়, পৈশাচিক। জীবনের এমন বিকৃতি ঘটাবার ক্ষমতা ও গৌরব পশু দাবি করতে পারে না, এ দাবি বোধকরি শুধু একালের নাগরিক সভ্য মানুষই করতে পারে।

আলোর নিচেই অন্ধকার গাঢ়তম, সভ্য মানুষ যেখানে বাস করে তার কেন্দ্রস্থলে যেসব মানুষের বাস তারা স্বভাবে পশুর চাইতেও ইতর। এই ইতরতার জন্যে দায়ী কে বা কোন সমাজব্যবস্থা সেকথা যুবনাশ্ব কখনও বলেন নি, বলার জন্যে সমাজবিজ্ঞানে যতখানি আগ্রহ থাকা দরকার ততখানি আগ্রহ যুবনাশ্বের নেই, সুতরাং তাঁকে সমাজসচেতন লেখক বলা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পটলডাঙার বাসিন্দাদের প্রতি লেখকের সহানুভূতি এবং তাদের জীবন-যন্ত্রণাকে বোঝার জন্যে লেখকের আকুলতা পটলডাঙার বস্তি নিয়ে লেখা প্রত্যেকটি গল্পে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এদের এই অবস্থা চিরদিন ছিল না, এদেরও মানুষের স্বাভাবিক জীবন ছিল। দেহোপজীবিনীর জীবনও এক ধরণের স্বাভাবিক জীবন, সেটাও এক রকমের ব্যবসায়, তার মধ্যেও একটা লেনদেনের সম্পর্ক আছে। দেহোপজীবিনী হিসেবে বাতিল হয়ে কেউ এই বস্তিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, কেউবা দুর্ঘটনায় অঙ্গ হারিয়ে কাজের বার হয়ে গিয়ে, কেউ বা আর কোনও ভাগ্য বিপর্যয়ে গড়াতে গড়াতে পটলডাঙার পাঁকে আটকে গেছে। যুবনাশ্বের প্রথম গল্প 'গোষ্পদ' এমনই ভাবে এক গৃহস্থ বধূর পটলডাঙার দলে ভর্তি হওয়ার কাহিনী। মোড়লিনী খেঁদি পিসীর নেতৃত্বে এই দল বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়ায়, তারা কোথাও ভিক্ষে পায়, কোথাও বা গলাধাক্কা খায়। খেঁদি পিসীর শরীরে দয়ামায়ার ছিঁটেফোটা অবশিষ্ট আছে এমন বদনাম তাকে কেউ দিতে পারবে না। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র অতীব জটিল! খেঁদি পিসী সেই গৃহস্থ বধূকে দু হাতে আগলে রাখার পণ করে।

পরের গল্পর নাম 'পটলডাঙার পাঁচালী'। গল্প শুরু হয়েছে ভিখিরী পাড়ার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায়। নরক যদি কোথাও থাকে তবে সে এই ভিখিরীদের আস্তানা। পরিবেশের বর্ণনার পর চার নম্বর ঘরের বাসিন্দাদের বর্ণনা: 'ধনুকের মতো বেঁকে দেয়ালের ধারে মুলো হাঁ করে ঘুমোচ্চে, তারই পাশে কুঠে বুড়ি। ঘায়ের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সে উসখুস করচে। তার পাশে খানিকটা জায়গা খালি। সেটা সদির গের্দ। তার এধারে কানা শুবরে কানাচোখটা মেলে নাক ডাকাচ্ছে! মাঝে বাকি জায়গাটুকু খালি। এধারের বেড়ার গায়ে খালি ভুঁয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নফর কি একটা কুৎসিত রোগের যন্ত্রণায় কাৎরাচ্চে।' পটলডাঙার এসব চরিত্রের কোনও মানবিক বৈশিষ্টের ক্ষীণতম রেশ থাকার কথা নয় এবং নেইও। পরস্পরের প্রতি এদের নিষ্ঠুরতা, বিদ্বেষ, হিংস্রতার কোনও পরিসীমা নেই, স্বার্থের জন্যে হীনতম কাজেও এদের অপ্রবৃত্তি নেই। কিন্তু ঘটনা ও সংলাপের নিজস্ব গতিতেই বুদ্ধুদের মতো এদেরও চরিত্রের এক একটা মানবিক দিক এক এক সময় ভেসে ওঠে এবং সেসব বিরল মুহূর্তে সভ্য সমাজেও দুর্লভ মনুষ্যত্বের আলোকে পটলডাঙার এক একটি চরিত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। লেখক কিন্তু ওদের চরিত্রের মানবিকতাকে আদর্শায়িত বা গৌরবান্বিত করেন নি, এর মধ্যে তিনি শ্রদ্ধাপ্লুত বা বিস্মিত

হওয়ার কিছু দেখেননি বা পাঠককে দেখাতে চাননি। তাদের কোনও আচরণ পশুর চাইতে ইতর প্রাণীর উপযুক্ত, কোনও আচরণ সভ্য মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় মহত্ত্বে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু এই দু রকম আচরণই তাদের জীবনে দিন ও রাত্রির মতোই স্বাভাবিক।

'মন্বশেষ' গল্পের নায়িকা বিন্দীকে সবাই দাঁতী বলে ডাকত, কেননা তার হাতুড়ি-পেটা নাকটার তলা দিয়ে হার্মিনয়মের চাবির মতো একসার দাঁত বেরিয়ে থাকত, সে শুধু কুৎসিত নয়, তার চেহারা ভয়ঙ্কর। বাঞ্ছার চুরি করে আনা ফুটফুটে ছেলেটির উপর সে বাটপারি করে তাকে ফেরৎ দিতে গিয়ে পুলিশে চালান হলো। সবাই আতঙ্কিত। এবার গোটা দল ফাঁসবে। একগাল হেসে বাঞ্ছা বলল, 'কচু! তু ঘাবড়াসনি পিসী, মাগী বোকার হদ্দ। আমি খবর নে এনু, ও দলের কতা কিছুই ফাঁস করেনি।' শুনে কেউ বিন্দীর প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতাও বোধ করল না, বরং হুল্লোড় করে হেসে উঠল। এটাই মানুষের প্রকৃতি। এই স্বাভাবিকতাতেই দলের সবচেয়ে স্যায়না ঘাগী চঞ্চু—নিষ্ঠুরতায় সবচাইতে দড় ছিল বলে দলের লোকেরা যাকে গুরু মানত—এক নোংরা, সুঁটকে ও বোবা ছুঁড়ির জন্যে একবারটিও পেছনে না ফিরে দল ছেড়ে চলে যায়। পটলডাঙার চরিত্রগুলির এই স্বাভাবিকতাই তাদের মানুষ হিসেবে, সভ্য সমাজের মানুষের চাইতে পূর্ণতর মানুষ হিসেবে, গড়ে তুলেছে।

কিন্তু ছোটগল্পের রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে, তার কৌশল ও প্রকরণ সম্বন্ধে যুবনাশ্ব সচেতন নন। পটলডাঙার জীবনের সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে যেমন, ছোটগল্পের যথার্থতা সম্বন্ধেও তেমনই লেখকের কোনও জিজ্ঞাসা নেই। ফলে যুবনাশ্বের গল্পগুলি কোনও সময়ই ছোটগল্পের শিল্প-সম্মত রূপ পায় না, ঘটনার যথাযথ বর্ণনা মাত্র হয়ে থাকে, নকশার বেশি রূপ পাওয়ার ঝোঁক সেগুলোর মধ্যে নেই। নরেশচন্দ্রের সঙ্গে রচনাপদ্ধতিতে যুবনাশ্বের এটুকু মিল যে ঘটনার বর্ণনায় নিজেকে গোপন রাখার নীতিতে দুজনেই বিশ্বাসী এবং এই নীতিকে রচনায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। কিন্তু নরেশচন্দ্রের মুষ্টিমেয় সার্থক ছোট-গল্পগুলিতে ঘটনার নির্বাচনে ও বিন্যাসে, বর্ণনার সংযমে ও ব্যঞ্জনায়, বিষয়ের প্রতি দৃষ্টির অভিনবত্বে ও একাগ্রতার লেখকের প্রয়াস যে-যাথার্থ্য লাভ করেছে তার থেকে যুবনাশ্বের গল্পগুলি বঞ্চিত। এজন্যে যুবনাশ্বের গল্পগুলির মুখ্য মূল্য বর্ণিত জীবন ও বিষয়ের অভিনবত্বে, সমাজে যারা প্রত্যাখ্যাত তাদের স্বীকৃতিতে। যেখানে যুবনাশ্ব দেখা-জানা জগতের অথবা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ জীবনের ছবি আঁকতে গেছেন, যেমন 'ভুখাভগবান' ও 'স্বাহা' গল্পে, সেখানে রচনাকৌশলের প্রতি লেখকের অমনোযোগ সমস্ত বাক্যব্যয়কে অলীক প্রতিপন্ন করেছে।

কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে আধুনিক বাংলা ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে নরেশচন্দ্র ও যুবনাশ্বের তাৎপর্য অসীম; মন বা যাকে বলা হয় অবচেতনা আর জীবন বা বাস্তব সম্বন্ধে সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে তাঁরা বহুদূর প্রসারিত করলেন, মনুষ্যচরিত্রের এমন এক স্বরূপ উন্মোচন করলেন যা দেশীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য এখানেই এই দুজন লেখকের সীমাবদ্ধতা। নরেশচন্দ্রের ছোটগল্প পরিকল্পনাহীনভাবে শুরু হয়, বুদ্ধি ও বিদ্যা প্রসূত বিশ্লেষণে তাঁর ছোটগল্প গড়ে ওঠে এবং গল্পগঠনের এই প্রক্রিয়াতে লেখকের অভিজ্ঞতার কোনও ভূমিকা আছে মনে হয় না; পক্ষান্তরে যুবনাশ্বের গল্পে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই গল্পের সর্বস্ব এবং সেজন্যে চোর, বাটপার, জোচ্চর, খুনে পকেটমারদের চারিত্রিক নূতনত্বই এ রচনাগুলির মুখ্য আকর্ষণ অর্থাৎ ছোটগল্পের স্বাশ্রয়ী সিদ্ধির মানদণ্ডে তাঁর গল্পগুলি অকৃতার্থই থেকে যায়। দুজনের কারও গল্পই অস্তিত্বের গভীরতর স্তর থেকেই উঠে আসেনি, এবং দুজনের কারও গল্পই পাঠকের হৃদয়ে কোনও প্রগাঢ় অনুভব জাগায় না. কিন্তু তাঁরা সে পথটি তৈরি করে দিলেন যেটি ধরে পরবর্তী কালের লেখকদের পক্ষে ওই অভিপ্রেত অভিঘাত জাগানো সম্ভব হলো।

In any language, it's sweet

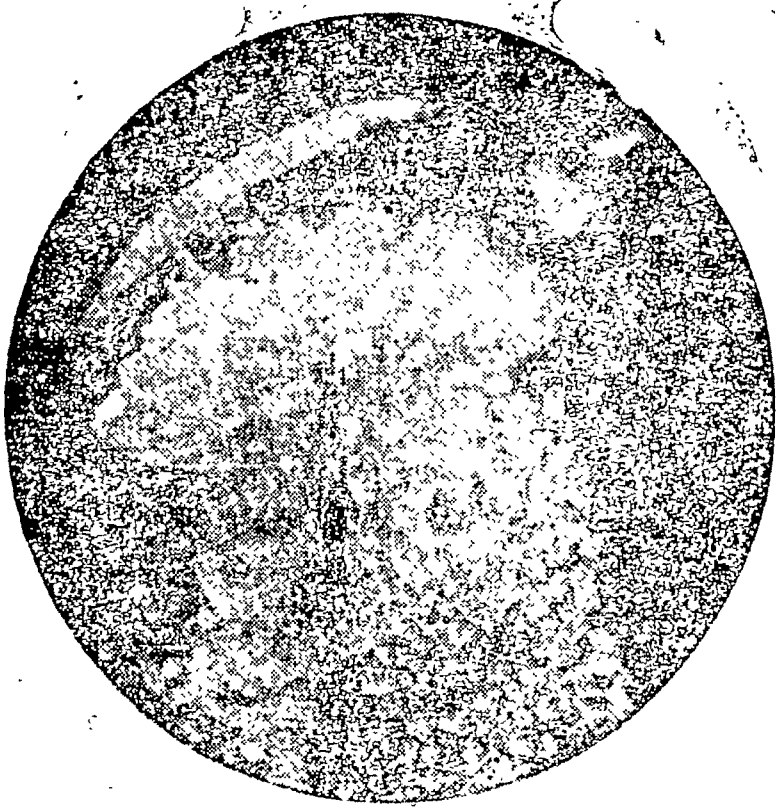

In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek.

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

ASP/BA-1/67

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

জাপানের দিনগুলি

বারীন বর্দ্ধন

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। আমিও ভাবছি এবার রওয়ানা হব ছাত্রাবাসের দিকে। এমনি সময় আবার সেই অভিনব কলিং বেল্ বেজে উঠল। বন্ধুর ছোট ভাই তক্ষুণি ছুটে গেল আগন্তুকের অভ্যর্থনায়। একটু পরেই দেরী হওয়ার দরুণ ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গী করে এসে ঢুকল 'গাইগোর' হিন্দী বিভাগের একটি মেয়ে। ঘরে ঢুকবার আগে চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসল। পরক্ষণেই উর্দ্ধাঙ্গ আনত করে সবাইকে অভিবাদন করে নিল আর বসতে বসতে ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে বার করে বন্ধুর মার হাতে দিল কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট্।

এ মেয়েটি একেবারে অপরিচিত ছিল না। বিশেষ করে নামটা ছিল একটু অদ্ভুত। মোরীসানের সঙ্গে সেদিন দু'টি মেয়েই এসেছিল ছাত্রাবাসে। উদ্দেশ্য ছিল ভারত সম্পর্কে আরও জানবার। বহুদিন পর তাদের আসল নাম দুটো ভুলে গিয়েছি। তবে হিন্দী প্রফেসরের দেওয়া নাম দুটো এখনও মনে আছে। এ মেয়েটির নাম ছিল গঙ্গা আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল সরস্বতী। হিন্দী ক্লাশেও নাকি এদের ডাকা হত গঙ্গামাঈ আর সরস্বতীমাঈ বলে। হিন্দীর অধ্যাপক অনেকদিন এলাহাবাদে থেকে হিন্দী শিখেছিলেন এবং ক্লাশে ভারতীয় আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই বোধ করি মেয়ে দু'টির ঐ নামাকরণ হয়েছিল। গঙ্গামাঈর দিকে আগিও অভিবাদনের পালা শেষ করে আবার সুরু করলাম দক্ষিণ হাতের ব্যাপার।

একটু পরেই আমাদের মত গঙ্গামাঈর জন্যও এল এক ট্রে ভর্ত্তি নানা রকমের খাবার, সুপ্ ইত্যাদি আর অন্য পাত্রে গঙ্গামাঈর বাড়ীতে তৈরী সন্দেশ। সেই একই প্রথার পুনরাবৃত্তি। কারো বাড়ী যেতে হলে খালি হাতে যাওয়া নিষেধ। কাজেই গঙ্গামাঈর মা মেয়ের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাড়ীর তৈরী সন্দেশ।

কয়দিন আগেই আমরা বিজয়ার উৎসব করেছিলাম ভারতীয় দূতাবাসের এক ভদ্রলোকের বাড়ী। দেশে যদিও বিজয়ার উৎসব মানে আগে পিছে থাকে রসগোল্লার হাঁড়ি, জাপানী বিজয়াতে সে ব্যবস্থা ছিল না। তবে তার বদলে ছিল দেশীয় খানার রকমারী ফর্দ যার অন্তিমে ছিল রসগোল্লা পানতুয়ার ব্যবস্থা। একেই জাপানে খাওয়ায় অসুবিধার দরুণ অনেকদিন প্রচণ্ড ক্ষিদের তাড়না বন্ধ করতে হয়েছে শুধু একটা ওম্লেট এবং এক থালা ভাত দিয়ে। সে অবস্থায় খাঁটি বাঙ্গালী ধরণের ডাল চচ্চড়ি থেকে সুরু করে পোলাও কোর্মা কাবাব্ এবং পরিশেষে ঐ রসগোল্লা পানতুয়ার থালা —সব মিলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল বাইরে এবং ভিতরে যে চোখ বন্ধ করে এখনও তা প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং করে আনন্দ পাই।

তাই সন্দেশের থালা হাতে বন্ধুর মা এসে যখন

প্রত্যেকের প্লেটে এক একটি সন্দেশ রেখে গেলেন মনে পড়ে গেল বিজয়ার রাতে দূতাবাসের ভদ্রলোকের বাড়ীর কথা। বিজয়া আর ওশোগাৎসু—ভারতীয় আর জাপানী প্রথা—মিষ্টিমুখ করতে গিয়ে দুয়ের তফাৎ হারিয়ে ফেললাম।

খাওয়ার শেষে সবাই ভাবতে বসল অতঃপর কি করা যায়। আর আমি ভাবছি এবার উঠে রওয়ানা হব ছাত্রাবাসের দিকে। অমনি বন্ধুর মা জানিয়ে গেলেন যেন দুপুরটাও তাঁদের বাড়ীতে কাটিয়ে যাই। কোন তাড়া নেই বলে অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। ইতিমধ্যে বন্ধুর বোন নিয়ে এল কোত্থেকে এক প্যাকেট্ তাস। 'কারুতা' বা তাস খেলাও নববর্ষ উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। তবে সাধারণ হরতন্ বা রুহিতনের ঝাড় নয়। তাসের ধরণ এবং খেলা দুইই আলাদা। এক পিঠে রয়েছে সাধারণ তাসের ছাপ যাতে একে অন্যের সঙ্গে মিশে থাকে। অন্যদিকে আছে সব জন্তু জানোয়ারের ছবি। পুরো জানোয়ারের ছবি নয়। কোনটার লেজ। কোনটার পা। পাশে লেখা আছে জানোয়ারের নাম। বাহান্নটি তাসে জানোয়ারদের বাহান্নটি অঙ্গ আঁকা রয়েছে। তাস তুলেই দেখতে হবে কার কয়টি পুরো জানোয়ারের চেহারা হয়ে আছে। সেগুলো সামনে ফেলে দিতে হবে। এবার সুরু হবে আসল খেলা। একজন আরেকজনকে বলবে আমার কুকুরের লেজটা দাও তো?

যদি লেজ থাকে তবে তক্ষুণি তা দিয়ে দিতে হবে। আর না থাকলে বলতে হবে নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষের জিজ্ঞাসার পালা শেষ হয়ে যাবে। এই করে খেলা চলবে। যে সবার আগে মুণ্ডহীন জানোয়ারের মুণ্ড বা পুচ্ছবিহীনের লেজ খুঁজে এনে জানোয়ারের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারবে সেই জিতবে।

কতক্ষণ ধরে চলল এই অভিনব তাসের খেলা। কথায় বলে চা সহযোগে না হলে আড্ডা জমে না। তাই বন্ধুর মা পাঠিয়ে দিলেন এক কেটলি সবুজ চা আর এক প্লেট্ করে খাবার। ওমোচি আর গন্ধামাঈর আনা সন্দেশ। নূতনের মধ্যে ছিল কমলা আর আপেল।

এবার সুরু হল আরেক ধরণের খেলা। একটা বোর্ডের উপর মানুষের কাঠামোটি শুধু আঁকা আছে। নাক চোখ ইত্যাদি সব আলাদা কাগজে টুকরো করে কাটা রয়েছে। এবার একজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হল। তাকেই সাদা কাঠামোর উপর প্রতিটি অঙ্গ বসিয়ে দিতে হবে। তাই করতে গিয়ে মানুষের ঠোঁট চলে গেল দু'পায়ের মাঝে আর হাত চলে গেল মাথার উপরে। বন্ধু ছিল এ খেলাটায় খুবই অভ্যস্ত। তবুও ঠোঁট নাক আর কান ঠিক করে সাজিয়ে পায়ের আকারকে হাত বলে ভুল করে সোজা জুড়ে দিল বাঁ কানের কাছাকাছি। হাসির হররা চলল কতক্ষণ।

খাওয়া পর্ব শেষ করতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। কি একটা ইঙ্গিতে বন্ধুর বোন পাশের ঘর থেকে একটা কাগজের প্যাকেটটি নিয়ে এল। আগেই বন্ধুকে বলেছিলাম যে সবার একটা ফটো তুলব। কিন্তু কোথায় ব্যবস্থা করব? অপচয় করবার মত পতিত জমি কারো বাড়ীতে নেই। টোকিওর মত সহরে তা আশা করা যায় না; শুধু আছে সবজীবাগান। কিন্তু ফটো তোলার পক্ষে সে স্থান উপযুক্ত বলে মনে হলনা। অনন্যোপায় হয়ে তাই খোলা রাস্তাকে করলাম ষ্টুডিও এবং ক্ষীয়মান পথচারীদের নিয়ে বন্ধু পরিবারের একটা ছবি তুলে নিলাম।

এখানেও সেই সাইওনারা। ওশোগাৎসুর সাথে বিদেশী আগন্তুকের ফিরে যাওয়ার মুহূর্ত। নীচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছি। হঠাৎ বন্ধু নিয়ে এল সেই প্যাকেট্টি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এ আবার কি ব্যাপার? বাক্স কেন?

—নববর্ষের দিনে আমাদের রেওয়াজ আছে কাঠের

র‍্যাকেট দিয়ে ব্যাডমিন্টন্ খেলা। হানেৎসুকি নিয়ে ছুটোছুটি। আমাদের বাড়ীতে আসতে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখেছেন ছেলেরা খেলছে এক ধরণের র‍্যাকেট দিয়ে।

—দেখে তো মনে হয়েছিল এ ছোট ছেলেমেয়েদেরই খেলা। সে বয়স যে পেরিয়ে এসেছি অনেক কাল।

—তবুও জাপানের ওশোগাৎসুর কথা মনে থাকবে তো। বলেই বন্ধুর বোন কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সুন্দর কাগজে মোড়া প্যাকেটটি আমার হাতে গুঁজে দিল।

গেট অবধি আসতে আসতে বন্ধুর মা বারবার বললেন যেন আরেকদিন তাঁদের বাড়ীতে যাই। তবে তা আর হয়ে উঠেনি। কারণ এর ঠিক চব্বিশ দিন পরেই রওয়ানা হয়েছিলাম দেশের পথে।

দিনের শেষে ফিরে এলাম ছাত্রাবাসে ক্লান্ত হয়ে। তবে তার বদলে জেনে এলাম অনেক কিছু। জাপানীরা ইওয়োপীয়; কাজে কর্মে তারা আমেরিকানদের সমগোত্রীয়। কর্মমুখর জীবনে এশিয়ার কোন ছাপ নেই তাদের সমাজে। তবু তার ধর্ম মনে হল প্রাচ্যের ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই পুষ্ট। সে প্রভাব দেখলাম তার ঘরের কোনে। ওশোগাৎসু আর তানাবাতার মরশুমে। আত্মিক উন্নতির পথ খুঁজতে যে সাহায্য করে অন্ধকারে বাতির আলোর মত তাইই ধর্ম। সেজন্য এদেশে ধর্মের জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে চারখিলান-ওয়ালা গৃহকোণে; উঁচু বেদীর উপর। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এর কোনই প্রভাব নেই কারণ যে উৎস বা প্রয়োজন থেকে ধর্মের সুরু তা হয়ে গিয়েছে অতি প্রাচীন। বর্তমানের সঙ্গে তার মিল কোথায়? তাই ধর্মটা এদেশে প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাসের উপর তৈরী। কেউ কারোর জন্য মাথা ঘামায় না। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী পরিবারের ছেলে হয়ে গিয়েছে খ্রীষ্টান। অধ্যাপক কুরাতা ছিলেন এর উদাহরণ। কিন্তু ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী বলে বাড়ীর আর কেউ ক্ষুণ্ণ হয়নি বা ছেলেকে করতে হয়নি আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা। কথায় বলে ধর্ম সম্পর্কে জাপানীরা বড় উদার। যৌবনে এরা আরাধনা করে শিন্তো প্রথায় যার প্রথম এবং প্রধান কথা হল পূর্বপুরুষের প্রতি অবিচল আস্থা; প্রতিটি কার্য্যকলাপে তাঁরই প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছুলেই এরা হয় কনফুশিয়ান এবং জরাবার্দ্ধক্য দেখা দিলে এরা হয়ে পড়ে পুরোপুরি বৌদ্ধ।

ডাক্তার আগরওয়ালের পাশের ঘরেই থাকত আরেক জাপানী মহিলা। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। বেশভূষা চালচলনে আর পাঁচটা জাপানী মেয়ের মতই। কোথাও এতটুকু প্রভেদ নজরে পড়েনি কোনদিন। অবাক হলাম একদিন আগরওয়াল গৃহিণীর কাছে শুনে—ভদ্রমহিলা খ্রীষ্টান।

অধ্যাপক কুরাতাকেও দেখেছি। চালচলনে পুরোপুরি বৌদ্ধ কুবোতা বা আরীমা সেন্‌সেইর চেয়ে ভিন্ন মনে হত না। তাই আগরওয়ালগৃহিণীর কাছে কথাটা শুনেও কৌতূহল হল না। আগে পরে সব সময়েই জেনে এসেছিলাম ধর্মটা এদের একেবারেই ব্যক্তিগত। একই বাড়ীতে একই পরিবারে দশজন যদি দশ রকম ধর্মে বিশ্বাসী হয় তবেও বোধ হয় বাড়ীর একাত্মতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বাবা ছেলেকে করেন না ত্যাজ্যপুত্র কিংবা তৃষ্ণার্ত্ত মা মেয়ের হাতের জল ছুঁড়ে ফেলে দেন না জাত যাবার ভয়ে। বাহ্যিক পরিবেশে দৈনন্দিন আর পাঁচটা কাজে ধর্মের ছোঁয়া নেই জাপানী জীবনে। তবুও বংশপরম্পরায় খ্রীষ্টান হয়ে যন্ত্রজগতের তালগোলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে অতি সাধারণ কুসংস্কার, যার উৎস দেশের ইতিহাসের মতই প্রাচীন, ছাড়তে পারেনি আগরওয়ালের প্রতিবেশী। একটু বুঝিয়ে বলছি।

ভদ্রমহিলার মেয়ের জন্ম হয়েছে কয়দিন আগে। মেয়ের নাম রাখলেন নানা। স্বামী তখন সেখানে ছিলেন না। মেয়ের নাম এবং জন্মের খবরটা চিঠি লিখে স্বামীকে জানাবার ভার পড়ল ডাক্তার আগরওয়ালের উপর।

জাপানী ভাষার আশ্রয় নিয়েই চিঠি তৈরী করল ডাক্তার আগরওয়াল। কিন্তু গোল বাঁধল মেয়ের নামটা লিখতে। চিরাচরিত প্রথায় ডাক্তার আগরওয়াল জাপানী হিরাগনা অক্ষরে 'না' কথাটা দু'বার লিখল চিঠি লিখে নিয়ে গেল মহিলাকে পড়ে শোনাতে। মহিলা সবই বুঝলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন প্রচুর। কিন্তু খটকা লাগল ঐ 'না' কথাটা একই হরফে দু'বার লিখবার জন্য।

বললেন—না কথাটা একই হরফে দু'বার না লিখে চীনদেশীয় দু'রকম কান্‌জী হরফে লিখে দিন।

চীন দেশীয় হরফগুলির জন্ম ধ্বনিগত নয়। এবং এক-একটি হরফ এক একটি প্রতিকৃতিসূচক। ধ্বনির সঙ্গে প্রতিকৃতিসূচক হরফের কোনই মিল না থাকার দরুণ একই উচ্চারণযুক্ত বহু প্রতিকৃতিসূচক হরফের ব্যবহার আছে। কাজেই মহিলা চাইছেন ধ্বনিযুক্ত দুটো ভিন্ন প্রতিকৃতিসূচক হরফ যেন ডাক্তার আগরওয়াল ব্যবহার করে।

ডাক্তার আগরওয়াল অবাক হয়ে তাকাতেই মহিলা আবার বললেন—প্রথম নাম লিখে পাঠাচ্ছি। হরফ দুটো একই-ধরণের হলে যে মেয়ের পরমায়ু শীগ্‌গীর ফুরিয়ে যাবে।

শতকরা নিরানব্বই জন যে দেশে শিক্ষিত সেখানেও রাজত্ব করছে এই অদ্ভুত সংস্কার। অবাক হবারই কথা। অগত্যা দু'ধরণের দুটো চীনা হরফে ভদ্রমহিলা নিজেই লিখলেন মেয়ের নাম।

ডাক্তার আগরওয়ালের মুখে ঘটনাটা শুনে আমারও মনে পড়ে গেল ঐ রকম একটা ব্যাপার। অধ্যাপক কুরাইয়ানাগী একবার নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন। অভ্যাসমত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি ক্যামেরা। খাওয়াদাওয়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে তিনজন মিলে ফটো তুলব ঠিক করলাম। আমি, অধ্যাপক এবং অধ্যাপকগৃহিণী। ক্যামেরাতে 'ত্রিপদ' লাগিয়ে তৈরী হচ্ছি। এমনি সময় একটু ইতস্তত করে অধ্যাপকমশাই বললেন—আপনারা দু'জন দাঁড়ান। আমি তুলে দিচ্ছি।

তোড়জোড় করে যে ফটো তুলছি তা নয়। অনেকটা স্মারক হিসাবেই এই ফটো তোলা। তার মধ্যে একজন আবার বাদ পড়বে। বিশেষ করে যখন ক্যামেরাতে সেলফের ব্যবস্থা রয়েছে। কথাটা পছন্দ হল না।

বললাম—কেন সেল্‌ফেই। সবাই একসঙ্গে দাঁড়ালেই তো ভাল।

বক্তব্য আর চাপতে না পেরে অধ্যাপকমশাই বললেন—আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে তিনজন একসঙ্গে ফটো তুললে মাঝের জনের পরমায়ু কমে যায়। তাই গিন্নী আপত্তি করছিলেন।

—কিন্তু আরেকজনকেই বা পাচ্ছি কোথায়? ভাবছি, হঠাৎ নজরে পড়ল অধ্যাপকের তিন বছরের ছেলে পাশের বাড়ীতে সঙ্গীদের সাথে খেলছে। সে যাত্রা ওকে দিয়েই পাদপূরণ করে ফটো তোলা পর্ব শেষ করলাম।

এ জাতীয় বহু বিশ্বাসই এদের জীবনে আর পাঁচটা দেশের লোকদের মত গেঁথে রয়েছে। বই-এ পড়েছিলাম জাপানী মেয়েদের কেশসজ্জার সম্বন্ধে। রাতে ঘুমোতে গিয়েও নাকি তারা কাঠের ফ্রেমে মাথা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ে যদি কেশদামের কোন বিঘ্ন ঘটে। জাপানের মাটিতে নেমেও যে সমস্ত ছবি বা ডল্ দেখেছি সবার মাথার উপর রয়েছে ঐ চুলের বোঝা। অথচ রাস্তায় একটি মেয়েও নজরে পড়েনি যে বয়ে বেড়াচ্ছে ঐ বোঝা। জাপানের কিমোনো পৃথিবীখ্যাত। ভারতীয় সাড়ীর মতই তার আদর। কিন্তু রাস্তায়, স্কুল কলেজে বা অফিসে ঐ কিমোনোধারীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। সবাই ইউরোপীয় কায়দায় গাউন বা স্কার্ট পরে চলেছে রাস্তার দু'ধার ঘেঁসে। পোষাক পরিচ্ছদের উপর ঝড়টা আমাদের দেশেও এসেছিল বিলেতী যুগে। কাজেই ঘাবড়াবার কিছুই ছিল না জাপানের মাটিতে কিমোনোধারীর স্বল্পতা দেখে।

কিন্তু বড় অদ্ভুত লেগেছিল বব্ করে চুল ছাঁটা মেয়েদের

দেখে। যে দেশে চুলের এত জাঁক এবং সারা পৃথিবীর কাছে যা নিয়ে দেমাক সেই কেশবতীরা গেলেন কোথায়?

সেদিন আমি আর চৌধুরী ফিরছি শিনাগোমাচি ষ্টেশনের দিকে ট্রামে করে। পথেই একটা মন্দির। এ দিকটা চৌধুরীর বেশ চেনাজানা।

বলল—চলুন। আজ রবিবার। মন্দিরে নিশ্চয়ই দু' একটা বিয়ের উৎসব হচ্ছে। বর বধূর একটা ছবি তুলে নেব।

গিয়ে ঢুকলাম মন্দিরের ঘরে। সামনেই রিসেপসনিষ্ট্। আগমনের কারণটা শুনে একটু হেসে মেয়েটি বিবাহবাসর দেখিয়ে দেবার জন্য একজনকে ডেকে বলে দিল।

সেদিন বরবধূর সংখ্যা বেশী ছিল না। মন্দিরের পিছনে ছিল ময়দান। সেখানে দাঁড়িয়ে নানা ভঙ্গীতে আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে ফটো তুলতে ব্যস্ত ব বধূর দল। মন্দিরের একদিকে রয়েছে চেয়ার টেবিল বর বেয়ারা। "হোলসেল" বা পাইকারী বিয়ের উৎসব চলছে ঐ মন্দিরে। যন্ত্রযুগে সবই সংক্ষেপিত। বিবাহভোজটাও অনেকে সেরে নিচ্ছে ঐ মন্দিরে যাতে বাড়ীতে নূতন করে আবার ঝামেলা পোয়াতে না হয়। ঘুরতে ঘুরতে ভোজনরত দু একটা দলকেও দেখলাম।

হঠাৎ নজর গিয়ে পড়ল দূরে যেখানে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বর আর কনে। কনের মাথাভরা সেই অস্বাভাবিক রকমের চুলের বোঝা। পরনে ফুল লতাপাতা আঁকা বেশমী কিমোনো। কেশদাম আবদ্ধ। কিন্তু তার ভারে বোধকরি স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত কনেও নুয়ে পড়েছে। ক্যামেরা তাক করে দু'জনে সেদিকে রওয়ানা হলাম।

দেখতে ভুল হয়নি। রঙীন সাজে সেজে তদোধিক রাঙা মন নিয়ে আর চুলের বিরাট বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে কনে। আর তার পাশেই বিলাতী পোষাক পরে অপেক্ষা করছে বর ক্যামেরাবাহকের নির্দেশের জন্য। ক্যামেরাবাহকের কাজ শেষ হতেই মঞ্চে গিয়ে ঢুকল চৌধুরী এবং পরক্ষণেই তুলে নিল অজানা অচেনা বরকনের যুগল ছবি। সবই খুঁটিয়ে দেখছি। কিন্তু ভাবনা পেয়ে বসল ঐ অসম্ভাব্য চুল দেখে।

জিজ্ঞাসা করলাম কনেরই এক আত্মীয়কে—ঐ চুল কি নিজের?

বিদেশীদের জাপানে বড় প্রতাপ। সবজায়গাতেই সমান আদর। বিমুখ হতে হয়না কোথায়। আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। পরক্ষণেই বললেন—এ আসল চুল নয়। এ যুগের মেয়েরা সব 'হেপবার্ণ' স্টাইলে চুল রাখে। অড্রে হেপ্‌বার্ণ সিনেমাতে নাম করেছে কি না। তাই চুল ছেটে ফেলে ঘাড় অবধি। তবে সামাজিক ব্যাপারে পুরণো ঐতিহ্য বজায় রাখতে হয় বই কি! তাই কনে পরে এসেছে পরচুলো শুধু পুরোণো প্রথার সঙ্গতি রাখবার জন্য।

জাপান ইওরোপীয়। জাপান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমের উপনিবেশ। তার ভাবধারা পশ্চিমকেই লক্ষ্য করে বয়ে চলে। দৈনন্দিন জীবন বা কর্মমুখর দিনগুলি নিয়ে বিচার করলে হয়ত একথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে কোনই অবকাশ থাকবে না। তবু সবার পিছনে, অলক্ষ্যে বয়ে চলেছে পুরোণো প্রথার ধারা। যেখানে সে ধারা ব্যাহত করতে চেয়েছে বাস্তব জীবন সেখানেই সে নিজের বুকে হেনেছে মৃত্যুবাণ। সেখানেই তার পরিসমাপ্তি। ঐতিহ্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিচার—দুটো মিলে যেখানে নিয়ন্ত্রণ করছে জীবনের ধারা, 'পুরাণম ইত্যেব ন সাধু সর্বম্' যেখানে প্রকাশ পেয়েছে পূর্ণতার, সে জাপান এগিয়ে যাবে আর সবাইকে ফেলে—এতে অবাক হবার অবসর কোথায়?

(ক্রমশঃ)

: উপন্যাস

কইতরা ঝিষ

উত্তরখণ্ড

মিহির মুখোপাধ্যায়

দশ

আবার নাকি বর্গী আসবে। বাতাসের আগে বার্তা ছোটে। লোকের মুখে মুখে খবর ছড়ায়, গুজব রটে। রামধন জিজ্ঞেস করছিল—আচ্ছা, পণ্ডিত মশাই, বলতে পারেন এই শালারা কোন দেশের লোক, কোন দিক থেকে আসে বছর বছর—

সকাল বেলা। ঘরের সামনে বোরাকে বসে লেখার কালি বানাচ্ছিল ভারতচন্দ্র।

হরতুকী আর বয়ড়ার রস প্রদীপের ভুষোয় মিলিয়ে কালি তৈরী হয়।

আজ শুক্রবার। আজ পাঠশালা ছুটি। সপ্তাহে এই একদিন সারা সপ্তাহের লেখা-পড়ার সরঞ্জাম সব যোগার করে রাখতে হয়। তালপাতা, খাগের কলম, ন্যাকড়ার পুটুলিতে মিহি ছাই-এর শুষনি। মাটির দোয়াতে হরতুকী আর বয়ড়ার রসের কালি আর তুলোট কাগজ। তবে তুলোট কাগজের দাম বেশী। পাঠশালার ছেলেরা সে কাগজ কিনতে পারে না। তারা খাগের কলমে তালপাতায় লেখে কিংবা কালো পাথরে খড়িমাটি দিয়ে অঙ্ক কষে। ফরাসী কুঠি, ডাচ কুঠির সেরেস্তায় দলিলপত্তর লেখার জন্য তুলোট কাগজের ব্যবহার হয়। যারা এই কাগজ বানায় তাদের বলে কাগজী। সুলেমান কাগজী মাসে একবার কাগজের বস্তা নিয়ে বিক্রি করতে আসে। এতদিন কাগজ কেনেনি ভারতচন্দ্র। টাকাকড়ির টানাটানি আর সুলেমান অসম্ভব দাম চায়। এক দিস্তা এক টাকা। ভারতের হাতে সম্প্রতি কয়েকটি টাকা এসেছে। রামেশ্বর মুখুজ্জের দুই ভাগনে আর দৌহিত্র গুরুপ্রণামী হিসেবে তিনজনে তিনটি টাকা দিয়েছে। অন্য ছাত্ররা গরীব। পুরো টাকা দেবার ক্ষমতা নেই কারো। চালডালের সিধে দিয়েছে। কয়েকটি করে কড়ি দিয়েছে। এছাড়া রামেশ্বর মুখুজ্জের সেরেস্তায় নকল-নবীশের কাজ করে, দলিল দরখাস্তের মুশাবিদা লিখে আরো দু'তিনটি টাকা এই দু'মাসে উপায় করেছে ভারতচন্দ্র। এবার সুলেমান এলে অন্ততঃ দু'দিস্তা কাগজ কিনবে। মেঘদূত-এর পুঁথিখানা নকল করে রাখবে। বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ-এর পুঁথিখানা পুরোপুরি নকল করে রাখা হয়নি। তেমন সুযোগ পায়নি। বর্ধমান রাজের কয়েদখানায় বসে আধাআধি নকল করে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ পালাতে হল সেখান থেকে। নন্দলাল চক্রবর্ত্তীর পুঁথিখানা বিদ্যাধরের কাছে রেখে এসেছিল। সে পুঁথিখানা আবার যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে এবার বাকিটুকু নকল করে নেবে। ভারী প্রয়োজনীয় পুঁথি। চমৎকার আলোচনা। জগদ্ধাত্রীর পুজার সময় দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের গৃহে অনেক জ্ঞানী গুণী, অনেক পণ্ডিতজনের সমাগম হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। আলাপ হয়েছিল ভারতচন্দ্রের সঙ্গে। কথায় কথায় বলেছিলেন বিদ্যালঙ্কার মশাই, তার কাছে সাহিত্য দর্পণ-এর পুঁথি আছে। ভারতচন্দ্র যদি কখনো নবদ্বীপে আসে, তবে পুঁথিখানা নকল করে নেবার সুযোগ পাবে।

এরকম কথা কেউ বলেন না। কোন পণ্ডিতই নিজের পুঁথির খবর অন্যকে জানাতে চান না। নকল করে নিতে দেওয়াতো

দূরের কথা। বিদ্যালঙ্কার মশাই আশ্চর্য মানুষ। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি সারল্য। তেমনি বিনয় আর নম্রতা। গেল কার্তিক মাসের কথা। তারপর অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ মাস গেছে। এখন ফাল্গুনের শুরু। মিষ্টি রোদ ফুরফুরে দক্ষিণের হাওয়া। গঙ্গার জলে, আকাশে বাতাসে বসন্তের সূচনায়। মাটির ভাঁড়ে কালি গুলছিল ভারতচন্দ্র আর সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবছিল। এমন সময় রামধন এসে উবু হয়ে সামনে বসল। বর্গীদের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করতে লাগল।

ক'দিন ধরেই ফরাসডাঙ্গার পথেঘাটে, বাজারে বন্দরে জোর গুজব, আবার নাকি আসছে বর্গীরা।

রামধন জিজ্ঞেস করলো—কোনদিক থেকে আসে ব্যাটারা একটু বুঝিয়ে বলুন তো পণ্ডিত মশাই—

—ওরা হ'ল মারাঠা বর্গী, মহারাষ্ট্রদেশের লোক, পশ্চিম দিক থেকে আসে—

—মহারাষ্ট্র দেশ, সেটা কোথায়, আমাদের মেদিনীপুর ছাড়িয়ে কতদূর—রামধনের কথা শুনে অল্প হাসল ভারতচন্দ্র—মেদিনীপুর কি বলছ, রামধন, বিহার উড়িষ্যা ছাড়িয়ে, সম্বলপুরের জঙ্গল পেরিয়ে আরো অনেক দূর, এখান থেকে দিল্লী আগ্রা যতদূর, তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়, তবে রঘুজী ভোঁসলার রাজধানী নাগপুর অতটা দূরে নয় শুনেছি, পেশবা বালাজীরাও পুণায় থাকেন, হিন্দুস্থানের পশ্চিম প্রান্তে আর আমরা আছি পূর্বপ্রান্তে, বুঝলে কিছু—

কিছুই বুঝতে পারল না রামধন। কিন্তু মুখচোখের ভাবখানা এমন করল যেন সব বুঝতে পেরেছে, সব বুঝে শুনে গালে হাত দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ ভাবছে, শেষে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো—তা'হলে এরা সুবে বাংলা মুলুকের বাইরে থেকে আসে, সেই জন্যিই নবাব বাহাদুরকে মানে না—

—নবাব বাহাদুর কি বলছ তুমি, এরা দিল্লীর বাদশাহকেই গ্রাহ্য করে না, অযোধ্যার নবাব বল, নিজামবাহাদুর বল, সবাই মারাঠাদের ভয়ে থরহরি কম্পমান, আমি দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র দত্তমুন্সীমশাইর মুখে মারাঠাদের অনেক ইতিহাস শুনছি, আরো বড় বড় সর্দার আছে এদের, বরোদার গায়কোয়াড় আছেন, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া আছেন, ইন্দোরের হোলকার আছেন, এদের একেকজনের শক্তিই নবাব আলিবর্দীর চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়, এরা একত্র হলেতো তামাম হিন্দুস্থান দখল করে নিতে পারে, আমি কটকে মারাঠা সর্দার শিবভট্টের শিবিরে ছিলুম কয়েকদিন, তখন কিছু কিছু দেখেছি এদের আশ্চর্য নিয়মশৃঙ্খলাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা, কষ্টসহিষ্ণুতা, অদ্ভুত দ্রুতগামিতা, বললে বিশ্বাস করবে না, ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এরা রাতারাতি বিশপঁচিশ ক্রোশ পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে—

—আপনি বর্গীদের শিবিরে ছিলেন পণ্ডিত মশাই, তাদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেছেন, বলেন কি—

রামধন খুব অবাক হয়ে গেল।

—ওদের সর্দার শিবভট্টর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম, সে সব পুরনো কথা বাদ দাও—প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিল ভারতচন্দ্র।

মুখ নিচু করে মাটির ভাড়ে কালি গুলতে লাগল।

আবার কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভাবল রামধন। আরেকবার নিশ্বাস ফেলে বললো—তা'হলে কি উপায় হবে, পণ্ডিতমশাই, শুনছি আবার নাকি বর্গীরা আসবে—

—উপায় আর কি হবে, তোমার-আমার মত গরীব গেরস্থরা মারা পরবে, সেই যে কথায় আছে, রাজায় রাজায় লড়াই করে, উলুখড় প্রাণে মরে, তবে একটা কথা কি জানো—একটু থেমে হাতের কাজ গুছিয়ে রাখতে রাখতে আবার বললো ভারতচন্দ্র—আমার মনে হয় ফরাসী এলাকায় ওরা হাঙ্গামা করতে সাহস পাবে না, ফরাসীদের ভাল গোলন্দাজ আছে, ভাল পল্টন আছে, এখানে লড়াই করে সুবিধে হবে না, বর্গীরা মুখে হম্বি-তম্বি করবে, ভয় দেখাবে, তারপর

কিছু টাকা পেলেই সুড়সুড় করে চলে যাবে, ফরাসডাঙ্গায়, গোন্দলপাড়ায় খুব একটা ভয় নেই—

—ভরসাইবা কোথায় বলুন, ভগীরথ খুব ভয় পেয়েছে, খালি ভয়ের কথা বলছে —

ভগীরথ যাই বলুক, আমি বলছি ডচকুঠি, ফরাসী কুঠির এলাকায় আমরা অনেকটা নিরাপদ—

—তাই বলুন পণ্ডিত-মশাই, আপনার মত মানুষের মুখে দুটো কথা শুনলে ভরসা হয়, মনে জোর আসে, ভগীরথ শালা বরাবর আমাকে উল্টো পাল্টা বোঝায়, আবার আমার নামে পাঁচজনের কাছে পাঁচরকম করে লাগায়, সব মিথ্যে কথা, আপনার কাছে আমার নামে কিছু বলতে এলে ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না—হঠাৎ দেশের সমস্যা থেকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে চলে এল রামধন। ভালমন্দ কিছু বললো না ভারতচন্দ্র। কিছু বলা উচিত হবে না। কারণ' এবেলা রামধন বলছে ভগীরথের নামে, ওবেলা ভগীরথ এসে বলবে রামধনের নামে। তারপর সন্ধ্যে নাগাদ দেখা যাবে দু'জনেই একসঙ্গে সাধুবাবার আড্ডায় বসে গাঁজা টিপছে সিদ্ধি ঘুটছে, গুলগুল ফুসফুস করছে।

আবার বললো রামধন—আমার বয়েসটা কি খুব বেশী মনে হয়—

আচমকা বয়সের প্রসঙ্গ শুনে মুখ তুলে তাকাল ভারতচন্দ্র, অল্প হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ বয়সের কথা তুলছ কেন কি ব্যাপার।

—আপনি বলুন না, আমাকে কি খুব বুড়ো দেখায়—

—কত বয়স হ'ল তোমার?

—এই দু'কুড়ির দু'এক বছর বেশী হবে—

—তা এমন আর বেশী বয়স কি তোমার—

—সেই কথাই তো বলছি, পণ্ডিত-মশাই, আপনি যদি ভরসা দেন—বলতে বলতে থেমে গেল রামধন, তারপর গলা খাকরি দিয়ে—আমার অবস্থাটা একটু বিবেচনা করে দেখুন, একটা সংসার না হয় ভগমান শূন্যি করে দিয়েছেন, তাই বলে চিরটা কাল কি আমার এইভাবে কাটবে, তারপর ধরুন, বুড়ো বয়সে আমাকে দেখাশোনা সেবা যত্ন কে করবে—

রামধনের কথার ধরণ শুনে মোটামুটি আন্দাজ করল ভারত—তা, তুমি কি আবার বিয়ে করতে চাও নাকি—

হেহে করে সামান্য হেসে মাথা চুলকে জবাব দিল রামধন—আজ্ঞে সেই কথাই তো ভাবছি একা একা আপনাদের দয়ায় পড়ে থাকি, সারাদিন ভূতের বেগার খাটি, কার জন্য করি বলুন, আমার তো সখ-আহ্লাদ বলে একটা জিনিস আছে।

—তা' বেশ তো বিয়েটা করে ফেলো—ভারতের অনুমোদন শুনে বললো রামধন—ভরসা পাচ্ছি না পণ্ডিতমশাই, ওই শালা ভগীরথ খালি ভয় দেখাচ্ছে, আবার নাকি বর্গীরা এসে সব ছারখার করে দেবে, বর্গীরা নাকি মেয়েদের ধরে নিয়ে খুব অত্যাচার করে, ধর্ম নষ্ট করে, এখন বিবেচনা করুন, বউ বলে কথা, এতে আর টাকাকড়ি, সোনাদানা নয় যে, মাটির নিচে পুতে লুকিয়ে রাখবো, একটা বউ ওলাউঠায় নিয়েছে আরেকটা বউ যদি বর্গীরা নিয়ে যায়, তখন আমার কি উপায় হবে বলুন—রামধনের দুশ্চিন্তার কথা শুনে হেসে ফেলল ভারতচন্দ্র, হাসিমুখে বললো—তোমাকে তো বললুম রামধন, আমাদের এখানে কোন ভয় নেই, ইংরেজ, ফরাসী, ডাচকুঠির যেসব এলাকা, যেমন ধরো ক'লকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, এসব জায়গায় বর্গীর হাঙ্গামা হবে বলে আমার মনে হয় না, তবে দেশের যা অবস্থা হুলোড় দিয়ে কিছুই বলা যায় না, বছর বছর বর্গীরা আসছে, লুটপাট খুনজখম করছে, আর কতদিন যে এরকম চলবে, কে জানে—এ বর্গীর হাঙ্গামা আর কতদিন চলবে জানে না ভারতচন্দ্র। বাংলাদেশের কোন মানুষই তখন পর্যন্ত জানতো না, রাজনীতির উপরতলায় তাদের ভাগ্য নিয়ে কেমন ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছে।

দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব-গেরস্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত। যারা মান্যগণ্য, সম্ভ্রান্ত, সম্পদশালী, সেই রাজা-মহারাজা, জমিদার-মহাজনরা আপনাপন ধনপ্রাণ বাঁচাতেই ব্যতিব্যস্ত। দেশের সাধারণ গরীব মানুষ তাঁতি-চাষী-কামার-কুমোর-মাঝি-মাল্লারা মরুক বাঁচুক, তাদের কথা কে ভাবে। আর বিদেশী বেনিয়া যারা রয়েছে, তারা নিজেদের বাণিজ্যের অধিকার, স্বার্থের সীমানা সুরক্ষিত থাকলেই নিশ্চিন্ত। সারা বাংলাদেশের মরণ-বাঁচন নিয়ে তাদের কোন ভাবনা নেই, কোন দায়িত্ব নেই। এক আছেন নবাব বাহাদুর। এই দেশব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যে একা, নিঃসঙ্গ সত্তর বছরের বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী খাঁন শাসন-শৃঙ্খলা আর শান্তি রক্ষার চেষ্টায় অবিশ্রাম পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কখনো সম্মুখ সংগ্রাম, কখনো কূটকৌশল। বর্গীর হাঙ্গামা দমনের জন্য যখন যেমন প্রয়োজন, যে সুবিধে সেই পথেই যাচ্ছেন আলীবর্দী খাঁন। কূটনীতির নিয়ম শত্রুর শত্রুকে মিত্র করো। সেইজন্য পেশবা বালাজীরাওকে ডেকে এনেছিলেন নবাববাহাদুর। পেশবার সঙ্গে ভোঁসলার অহি-নকুল সম্পর্ক। কিন্তু শেষ রক্ষা হল কই? নগদ বাইশ লক্ষ টাকা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পেশবা।

রঘুজী ভোঁসলাকে সুবে বাংলা মুলুক থেকে তাড়িয়ে দেবেন। পেশবা আর নবাববাহাদুরের মিলিত শক্তির সামনে পালিয়ে গেলেন বটে রঘুজী। কিন্তু সহজে শায়েস্তা হবার পাত্র নন তিনি। শিবাজী মহারাজের পৌত্র রাজা সাহুর কাছে নালিশ করলেন রঘুজী। নামমাত্র রাজা হলেও সমস্ত মারাঠা সর্দাররা রাজা সাহুকে সম্মান করেন, নজরানা দেন।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রঘুজী বাংলামুলুক থেকে পালালেন। তারপর ভাদ্রমাসের মধ্যভাগে রাজা সাহু মধ্যস্থ হয়ে দুই সর্দারের গোলযাল মিটিয়ে দিলেন। সুবে বাংলার চৌথ আদায়ের বাঁটোয়ারা হ'ল।

বিহারের পশ্চিমভাগ পড়ল পেশবার অংশে, আর বাংলা, উড়িষ্যা এবং পূর্ববিহার রইল রঘুজীর অধিকারে। স্থির হ'ল, যে যার নিজের এলাকা ইচ্ছেমত লুটতরাজ করবেন। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবেন না। কেউ কারো এলাকায় ঢুকবেন না, ঢুকতে পারবেন না।

অর্থাৎ নবাববাহাদুর যে বাইশ লক্ষ টাকা পেশবাকে দিয়েছিলেন, যে টাকা উশুল করার জন্য জমিদার মহাজনদের উপর জোরজবরদস্তি চলছে, যে টাকার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্মানিত মানুষকেও কয়েদ থাকতে হচ্ছে, সে টাকাটা স্রেফ জলে গেল। এই ভাগবাঁটোয়ারার খবর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ জানতে পারল না। তারা শুধু শুনল, আবার বর্গী আসছে। আবার নাকি ভাস্করপণ্ডিত তাঁর বর্গীবাহিনী নিয়ে মেদিনীপুরের সীমান্তে হাজির হয়েছেন।

তাই রামধন জিজ্ঞেস করছিল—আচ্ছা, পণ্ডিতমশাই, শুনেছি বর্গীরা নাকি টাকার জন্য ভীষণ মারধোর করে, মেয়েপুরুষ কচিবুড়ো কাউকে রেহাই দেয় না, সেদিন একটা লোককে দেখলুম, তার সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ, গরম লোহার ছেঁকা দিয়েছে লুকুনো টাকা বার করে দেবার জন্য, আপনি এরকম দেখেছেন—

—এ আর কি, এর চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার দেখেছি—জবাব দিল ভারত—গেল আশ্বিনের আগের আশ্বিন মাসে আমি মেদিনীপুরের এক গাঁয়ে ছিলুম কিছুদিন, গাঁয়ের নাম বীরভদ্রপুর, যার বাড়িতে ছিলুম, তার নাম ভূপতি আনা, সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ, তার ছেলের নাম শ্রীপতি, তার মেয়ের নাম যমুনা, জামাই এর নাম সুবল, আহা তাদের ছবির মত সাজানো সংসার আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেল ভারতচন্দ্র একটু সময় চুপচাপ সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললো —না, ওসব কথা আর আমাকে জিজ্ঞেস করো না, রামধন

আমি কিছু বলতে পারবো না, তার চেয়ে বরং তোমার কথা শুনি, তোমার বিয়ের কথা বলো, মেয়েটেয়ে কিছু দেখেছ নাকি—

—আজ্ঞে সেই কথাই তো বলতে এলুম—সলজ্জভাবে সামান্য হাসল রামধন—আপনি যদি অনুমতি করেন—

—আমার অনুমতি কি জন্য ?

—আজ্ঞে মেয়ের বাপ আপনাকে খুব মান্যগণ্য করে কিনা, আপনি যদি একটু বলে দেন—

—কার কথা বলছ, কে আবার আমাকে খুব মান্যগণ্য করে বেশ অবাক হয়েছে ভারত।

—আজ্ঞে ওই সাধুচরণ, তাকে তো চেনেন আপনি, চৌধুরী মশাইর সেরেস্তার হুঁকোবরদার—

—সাধুচরণের বয়স্কা মেয়ে কি আছে, দুই মেয়ের তো বিয়ে হয়ে গেছে, শুনেছি—

—আজ্ঞে ছোটমেয়ে হরিমতী বেশ বড়সড় হয়েছে—

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ভারত—হরিমতী, তার বয়স কত ?

—আজ্ঞে ওর বাপ কমিয়ে বলে আট, তবে দশ-এগারোর কম নয়, গড়ন পেটন ভাল—রামধনের আগ্রহ ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল ভারতচন্দ্র—এ তুমি বলছ কি রামধন, দশবছরের মেয়ে—

—কেন, এই বয়সেই তো বিয়ে হয় মেয়েদের—

—তা হোক, তোমার বয়েসটা তো দেখতে হবে—

—কেন, আপনিই তো বললেন, আমার বয়স এমন কিছু বেশী হয়নি—রামধনের পালটা যুক্তি শুনে হাসিও পেল আবার বিরক্তও বোধ করল ভারতচন্দ্র—তাই বলে দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে কি মানায়, তোমার বয়স বলছ বিয়াল্লিশ, ওই মেয়ে বড় হতে হতে তুমি তো বুড়ো হয়ে যাবে, তারপর ভগবান না করুন, মরেও যেতে পারো, তখন, ওই কচি মেয়েটার কি উপায় হবে—

—দেখুন পণ্ডিতমশাই, বাঁচামরা ভগমানের হাত, কিন্তু বুড়ো হব কেন, আমি এখনো যা খাটতে পারি, পাঁচটা জোয়ান তা' পারবে না, আর সাধুবাবা বলেছেন রোজ একটা করে আমলকী সেদ্ধ খেতে, রোজ আমলকী খেলে সহজে কেউ বুড়ো হয় না, অনেক দিন যৌবন ধরে রাখা যায়—

—তা' তোমার যৌবন তুমি ধরে রাখো কিংবা ছেড়ে দাও, সেটা তোমার নিজের ব্যাপার, কিন্তু ওইটুকু মেয়ের জন্য তোমার কথা আমি সাধুচরণকে বলতে পারবো না—

ভারতচন্দ্রের স্পষ্ট জবাব শুনে ক্রুদ্ধ উত্তেজিত রামধন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে শিবদাস মুখুজ্জেকে আসতে দেখে থেমে গেল।

শিবদাস বললো—ওহে ভারত-ভায়া, বড় বউ তোমাকে তলব করেছে, কাল অনেক রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিশ্বনাথ এসেছে, তোমার গিন্নীর নাকি শরীর খারাপ, তাড়াতাড়ি যাও,—বলে আর দাঁড়াল না শিবদাস, সোজা সেরেস্তাঘরের দিকে চলে গেল।

রাধার শরীর খারাপ। বিশ্বনাথ খবর নিয়ে এসেছে। কি হ'ল রাধার।

উদ্বিগ্ন ভারতচন্দ্র মাটির দোয়াত, খাগের কলমগুলি গুছিয়ে রেখে রেড়ির তেল আর সাজিমাটি দিয়ে হাতের কালি ধুয়ে নিল। তারপর ব্যস্তভাবেই—আচ্ছা রামধন পরে কথা হবে—বলে শিবদাসের বাড়ির দিকে রওনা হল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

বাংলা উপন্যাস

The Bengali Novel by Humayun Kabir. Firma K. L. Mukhopadhyaya, Calcutta 1968 Pp 128, Price Rs. 10·00

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের রচিত এই বইখানি আমেরিকার ম্যাডিসন উইসকোনসিন বিদ্যালয়ের ১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র-স্মৃতি বক্তৃতা, মূলত সেখানকার বিদেশি পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত। সেদিক থেকে বইখানি ইংরেজ-ভাষাভাষী জগতের কাছে বাঙলা উপন্যাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচায়িকাও বটে। লেখক নিজেই বলেছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে বাঙলা কবিতার যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি উপার্জিত হয়েছে সেই তুলনায় বাংলা উপন্যাস দেশের বাইরে খুবই অপরিচিত। বাঙলা কবিতার তুলনায় বিদেশী ভাষায় বাঙলা উপন্যাস যে খুব কম অনূদিত হয়েছে তা হয়তো নয়। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, বাঙলা ভাষায় উপন্যাস ঘটিত অবদানের বিষয়ে বাইরে খুব একটা জানাশোনা নেই। অতএব এই পর্যালোচনার পিছনে তেমন একটি দায়িত্ববোধও অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

অধ্যাপক কবীরের বইটির প্রথম উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এটি আদ্যন্ত সুলিখিত। বাঙলা উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর একটু-খানি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মতামতও আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর সেই আলোচনাটি বাঙলা উপন্যাস-প্রসঙ্গে অন্যতম মূল্যবান আলোচনা। এই বইয়ের মধ্যে লেখক তাঁর ঐ পূর্ব-নিবন্ধটিকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রায় নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখানে লেখকের লক্ষ্য, অনেকখানি পরিবর্তিত। ব্যক্তি নয়, এখানে তাঁর প্রতিপাদ্য ইতিহাস, বাঙলা উপন্যাসের আদ্যোপান্ত ইতিহাস। সেক্ষেত্রেও কিন্তু প্রথমে মনে হয়, লেখক তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিকের আলোচনাটির আগে-পরে সন্নিবেশ ক'রে নিয়েছেন প্রাসঙ্গিক ও প্রার্থিত তথ্যাদি, এবং তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তকে আরো বিশদ ও অবিচলিত করে তুলেছেন।

এই বইয়ের আলোচনাটি চারটি সুস্পষ্ট অধ্যায়ে বিন্যস্ত। ১ বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙলা উপন্যাসের জন্ম, ২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাস্তবতাবাদী উপন্যাস, এবং ৪ সাম্প্রতিক বাঙাদেশের উপন্যাস—এই চারটি ঐতিহাসিক স্তরক্রমে বিষয়টিকে স্থাপন করে তিনি তাঁর আলোচনার শৈলিটিকে সুমিত ও প্রসংশনীয় সহজগম্যতা দান করেছেন। শুধু বিদেশিদের কাছে নয়, বাঙলা উপন্যাসের আঞ্চলিক পাঠকের কাছেও বইটি রচনাগুণে সসম্ভ্রমে পঠনীয় হয়ে উঠেছে, বলতে পারা যায়।

অবশ্য বাঙালি পাঠকের কাছে এই বইয়ের হানির দিকটিও খুব সুস্পষ্ট। আয়তনের সংক্ষিপ্ততা-হেতু লেখকই প্রথমেই অবশ্য নানা অনুল্লেখের জন্য কৈফিয়ৎ জানিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কারণটি কেবলমাত্র অনুল্লেখঘটিত হলে সেদিক থেকে অনায়াসেই দৃষ্টি সংবরণ করে নেওয়া যেত। যেমন উপন্যাসের সূচনা-পরিচ্ছেদে তিনি হানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স বা কালীপ্রসন্ন সিংহকে নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ অনুচ্ছেদ ব্যয়

করেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নাম-মাত্র উল্লেখ করেন নি। অথবা অন্ত্য-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন নি জগদীশচন্দ্র গুপ্তের নাম, যদিও এমন অনেকের কথা সোচ্ছ্বাসে বলেছেন যারা ঐতিহাসিক ভাবে অতখানি দাবি করবেন বলে অনেকেরই মনে হবে না। উপন্যাস না লিখলেও রাজশেখর বসু নিশ্চয় বাঙলা উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর বিশেষ দৃষ্টিকোণটির কারণে অপ্রতিকার্য. কিন্তু অধ্যাপক কবিরের

Humorists who achieved wide popularity generally made their effect by resorting to the unusual and the bizarre and at times even the vulgar. An important exception is Rajsekhar Bose whose major contribution to Bengali fiction lies in the discovery of humour in every-day Bengali life.

৯৮ পৃষ্ঠার এই মন্তব্য হয়তো অনেকেই সঙ্গত বলে মেনে নিতে দ্বিধা করবেন।

এগুলিকে অবশ্যই খুব উল্লেখযোগ্য হানি বলে আমরা প্রমাণ করতে চাই না। আগেই বলেছি তাঁর রচনার সর্বত্রব্যাপ্ত প্রসাদগুণের কথা। তারও মধ্যে এই বইয়ের সুলিখিততম অধ্যায়টি হলো শরৎচন্দ্র বিষয়ক, এবং আগেই বলেছি ঐ অধ্যায়ে লেখক তাঁর আগের পর্যালোচনাটি সবিস্তারে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তাঁর লেখা উজ্জ্বল, যদিও সর্বত্র সমান বিশদ নয়। আর শেষ পরিচ্ছেদটির অসম্পূর্ণতাই বেশি চোখে পড়ে বলে অন্য মন্তব্যাদি তেমন গুরুতর হয়ে ওঠেনি। প্রথম পরিচ্ছেদটিকেও এই ভাবেই অনুমোদন করতে পারলে আমাদের ভালো লাগতো। কিন্তু বলতে বাধ্য হই, সূচনার ঐ পরিচ্ছেদটি নিঃসন্দেহেই অতৃপ্তিকর। আরো স্পষ্টভাবেই বলা ভালো, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লেখকের মূল্যায়ন আরেকটু বিবেচনাবহ হলে আমাদের ভালো লাগতো। কোনো মন্তব্য না করে আমরা লেখকের কয়েকটি মন্তব্য-মাত্র এই সূত্রে সরাসরি তুলে দিচ্ছি।

১. He [প্যারীচাঁদ মিত্র] was in this respect [ভাষা-ব্যবহারে] far in advance of his times and excelled all his contemporaries including Bankimchandra Chatterji.

২. Bankim regarded history as a back-ground against which he could paint the story of men and women. but did not find in history itself the inner conflict which is of primary interest to the novelist. Because he tends to forget that history is a record of human action, the living breath of history escaped his grasp. More concerned with the romance of events than the inner conflicts which decide the course of historic action, he did not realise that to revive the past is almost miraculous as to revive the dead. With this backgrounds, it is not surprising that Bankim's attempts to revive the past leave us cold.

৩. He had no clear idea of the distinctive character of ancient or medieval India and had to depend on externals like dress or clothes or food to distinguish the one from the other.

৪. Nor did Bankim have any clear image of the differentiation among different social classes.....it leaves Bankim no option except to identify a period or a character by reference to the ruler of the day.

৫. He unquestionally accepted many things which even school boy of today reject.

৬. His historical novels are in fact romances where imagination runs wild.

৭. Bankim's characterisation is not sufficiently clear and even the language spoken by the different characters is not always opposite.

৮. Bish Briksha and Krishna Kanta··· failed to achieve world standards because Bankim was not able to give up conventional ways of thinking.

৯. .....nationalistic fervour clouded Bankim's vision and his social preoccupations warped human sympathies.

উদ্ধৃতির সংখ্যা দ্বিগুণিত হতে পারে; কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কিন্তু এছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত অনুধাবনযোগ্য বিবেচনায় সংক্ষেপে উল্লেখ করি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসকে তিনি জাতীয়তাবাদের নয়, ঔপন্যাসিক গঠনপ্রকরণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেছেন। (পৃঃ ১৪) তাঁর শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্য 'ফুলজানি' ইত্যাদি উপন্যাসের তুলনায় তাঁকে সার্থকতর বিবেচনা করেছেন। (পৃঃ ১৯) রবীন্দ্রনাথের সংগে তুলনায় ঊণ প্রতিপন্ন করবার জন্যে তাঁকে লিখতে হয়েছে—'He (বঙ্কিমচন্দ্র) often neglected developments in the mind and ignored naunces of feeling. (পৃঃ ৪৭) কিন্তু এসব উক্তিই ম্লান হয়ে গেছে তাঁর শেষ পরিচ্ছেদের মন্তব্যটির কাছে, যেখানে তিনি লিখেছেন—in fact in some ways Bankim retarded the progress of the renaissance···(পৃঃ ৯৪)।

অনভিশিক্ষিত পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের যে আপত্তিক চেহারাই ফুটে উঠুক না কেন, অভিনিবেশী বিশেষজ্ঞের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের আসল ভূমিকাটি কোনোক্রমেই অস্পষ্ট বা ভ্রমোদ্রেকী থাকতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। যিনি সমকালীন ইতিহাসের সামান্য বিবরণও জানেন, তাঁরও কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যাবার নয়। আমরা বিশ্বাস করি না সেই পশ্চাৎপটের একটি রেখাও অধ্যাপক কবীরের অজানা। এবং তৎসত্ত্বেও তাঁর এই মন্তব্যগুলি একটু অধিক পরিমাণে নির্মম, এবং অসঙ্গত বলেও আমাদের মনে হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাঙলা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা নন, তাঁরই রচনা প্রথম বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে বাঙলা উপন্যাস-জাতীয় রচনার জন্য বাইরের পরিচিতি ও যশ আহরণ করে এনেছিল। কিন্তু সে কথা থাক। এই পুস্তকের বিশেষ উদ্দিষ্ট পাঠকসমাজটির কথা যদি আমাদের স্মরণে না থাকতো, তাহলেও এই উক্তিগুলিকে আমরা কঠোর আত্মসমীক্ষা বলে মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু যে দায়িত্বের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, এবং অধ্যাপক কবীরও আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তারই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে আরেকটু সঙ্গতভাবে পরিচিত করতে পারলে বাঙলা উপন্যাসের ঐ পিতৃস্থানীয়ের কাছে আমাদের ঋণ ঈষৎপরিমাণে স্বীকৃত হতে পারতো।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সম্পাদকীয়—২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

শস্য-হানিই ঘটে নি,—অনেক ব্যক্তির শোচনীয় জীবননাশও হয়েছে। সমালোচনা উঠেছে যে ফারাক্কা ব্যারেজের জন্য এই বন্যা হয়েছে,—এই অভিযোগের যথার্থ অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বন্যার্ত ব্যক্তিদের রিলিফের সুব্যবস্থা যুক্তফ্রন্ট সরকার করতে পারেনি বলে সর্বত্র অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি আন্তর্জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপ মনোভাবের ফলে তাদের সাহায্যও বন্যার্ত এলাকায় পাওয়া যায়নি, কিন্তু গতবারের বন্যায় এদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। সরকারের সাহায্যে উত্তর বঙ্গের স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নিত্য হত্যার নির্ঘণ্ট

যুক্ত ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই প্রতিদিন সংবাদপত্রে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সংঘাত ও হত্যার সংবাদ বেরুচ্ছে। এমন একটি দিন যায়না যেদিন সংবাদ-পত্রে একটি দু' টি কি তারও বেশি রাজনৈতিক হত্যার, সংবাদ বেড়োয় না। যুক্ত ফ্রন্ট বহির্ভূত দলগুলিই শুধু নৃশংস হিংস্রতার শিকার নয়,—যুক্ত ফ্রন্ট দলভুক্ত ব্যক্তিদের রক্তের স্বাক্ষরেই যুক্ত ফ্রন্টের বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়ে রয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও হিংস্র রাজনৈতিক সংঘাতের মিছিল আর কোন সময়ে এবং কোন রাজ্যেই ঘটেনি। তবু কী বিচিত্র যে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার যুক্ত হয়েও সগৌরবে সরকারী তকতে বসে গণতন্ত্রের জয়-জয়কার ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস মথিত করে তুলছে!

১৭. ৯. ৬৯

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অবার্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 0.80. with Postage Rs. 1.55
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

কার্তিক

জয়শ্রী

সম্পাদিকা :
লীলা রায়

সূচীপত্র

কার্ত্তিক : জয়শ্রী : ১৩৭৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৪৮৫	আয়ুরেখা (গল্প)	বিজনকুমার ঘোষ	৫১৫
সভাসমিতি (প্রবন্ধ)	কালীচরণ ঘোষ	৪৯৩	শ্রদ্ধার্পণ	বিজয়কুমার দাস	৫১৯
চার্লস ডিকেন্স (সাহিত্য আলোচনা : অনুবাদ)	পথচারী	৪৯৭	কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৫২৫
কবিপত্রে কাব্যচিন্তা (পত্রাবলী)	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫১০	জাপানের দিনগুলি (ধারাবাহিক-ভ্রমণ কাহিনী)	বারীন বর্ধণ	৫৩১

বিজ্ঞপ্তি

পূজা সংখ্যা জয়শ্রী সকল গ্রাহকদেরই পূজার পূর্বেই পাঠানো হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে পূজা সংখ্যা কেউ কেউ পান নাই। অন্যান্য সংখ্যাও কোনো কোনো গ্রাহক সময়মত পান না, কিম্বা আদৌ পান না এরকম মৌখিক অভিযোগ আমাদের কাছে মাঝে মাঝে নানা-সূত্রে এসে পৌঁছায়। গ্রাহকদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট মাসের জয়শ্রী তাঁদের হাতে না পৌঁছায়, তবে অবিলম্বে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে জয়শ্রীর দপ্তরে তা জানিয়ে দেন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে ডাকের গোলোযোগে তাঁদের কাছে জয়শ্রী পৌঁছালো না।

এ-মাসের জয়শ্রী নানা কারণে বিলম্বে প্রকাশিত হল, সে-জন্য আমরা দুঃখিত।

কার্যাধ্যক্ষ

জয়শ্রী

অনিল রায়ের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০

(তৃতীয় সংস্করণ)

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ-যোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী

২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড

কলিকাতা-৪৭

জয়শ্রী

৩৪ বর্ষ ০ সপ্তম সংখ্যা ০ কার্তিক ১৩৭৬

সুভাষ-বাণী

"প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভ যদি কাম্য হয় তবে গোলাপের কাঁটাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। যদি সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের স্নিগ্ধ মাধুর্য কাম্য হয় তবে অমানিশার অন্ধকার অতিক্রম করতে হবে। যদি স্বাধীনতার আনন্দ ও প্রশান্তি উপভোগ করতে হয় তবে তার মূল্য দিতে হবে এবং স্বাধীনতার মূল্য হচ্ছে ত্যাগ ও ক্লেশবরণ।"

[বোম্বাই : ১১-১২-৩১]

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

গত ৪ঠা নভেম্বর পি. জি হাসপাতালে শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের একুশ মাস কেটে গেছে। তাঁর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে convulsion দেখা দিলে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে। সম্প্রতি দুইদিন এ রকম convulsion হয়েছিল। গত ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে এবং ২৪শে অক্টোবর হাসপাতালে ৬৩২ দিন অবস্থানের দিন বিকেল ৬.২৫মি দুই মিনিটের জন্য convulsion হলে অবস্থার সাময়িক অবনতি ঘটে। অক্সিজেন ও ইনজেকসান দিলে সেটা সামলে ওঠেন। বিধাতার কাছে আমরা প্রতিনিয়তই প্রার্থনা জানাই।

পরিচালকমণ্ডলী

১৭ই নভেম্বর. ১৯৬৯ জয়শ্রী

কংগ্রেসে ভাঙন

কংগ্রেসের বহু প্রত্যাশিত ভাঙন অবশেষে বাস্তবে পরিণত হল। গত ১২ই নভেম্বর কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্ত ওয়ার্কিং কমিটির ১১ জন সদস্য প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাকে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। গত ১লা নভেম্বরের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পূর্বে কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙগাপ্পা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকে ফকরুদ্দিন আলী আহেমদকে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য এবং তামিল নাড়ু কংগ্রেসের সভাপতিত্বের পদাধিকার হারাবার ফলে সি সুব্রহ্মনিয়মকে বাতিল করে দিলে প্রধানমন্ত্রীর গোষ্ঠি ১লা নভেম্বরের ওয়ার্কিং কমিটি বর্জন করে প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসায় এবং ৪০৫ জন এ, আই, সি, সি সদস্যের স্বাক্ষরিত তলবী সভা আহ্বানের দাবী নিজলিঙ্গাপ্পার বৈঠক খারিজ করে দিলে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ২২শে ও ২৩শে নভেম্বর দিল্লীতে এ, আই, সি, সির বিশেষ তলবী সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিপূর্বে ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রধান মন্ত্রীর নিকট লিখিত এক পত্রে নিজলিঙগাপ্পা তাকে কঠিনতম ভাষায় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রী প্রত্যুত্তরে নিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অনুশাসন ও নীতিবিরোধী কার্যকলাপের জন্য গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পূর্বে ওরা নভেম্বর তারিখে নিজলিঙগাপ্পার পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে পাল্টা ওয়ার্কিং কমিটি গঠন এবং এ, আই, সি, সির তলবী সভা আহ্বানের জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করে চার্জ-সীট দেবার পর ১১ই নভেম্বরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জুলাই মাসে বাঙ্গালোরে এ, আই, সি, সি সম্মেলনে কংগ্রেসের এই অন্তিম পরিণতির উপান্ত-অধ্যায় তৈরী হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই এবং যে বিরোধ

এ, আই, সি, সির সভায় ব্যক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতির মনোনয়নের পর তীব্রতর হয়েছিলো, গত ২৩শে আগষ্টের ওয়ার্কিং কমিটির ঐক্য প্রস্তাবে সেটা আপাতত চাপা পড়লেও আবার সাংগঠনিক ক্ষমতার উত্তপ্ত টানা-পোড়েনে নিম্নভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। এই ভাঙনের মুখে আদর্শের তাড়না প্রবল হয়ে উঠেছিল বলে যাদের দাবী, ঘটনা পরম্পরার এই তথ্যগত বাস্তব ভিত্তিগুলি তাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। সমাজপরিবর্ত্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ব্যাকুলতার পথে সিণ্ডিকেটপন্থীদের বিরুদ্ধে অচলায়তন সৃষ্টির অভিযোগ প্রতিপক্ষকে আঘাত করার পক্ষে সময়োপযোগী হাতিয়ার বটে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা দীর্ঘকাল সুপ্ত থেকে, এমন কি বাঙ্গালোর অধিবেশনেও আপসকামী থেকে, অকস্মাৎ রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়নে পরাস্ত হয়ে দুরন্ত গতিবেগে সঞ্চারিত হল কেন সে প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়?

এই ভাঙন পার্লামেণ্টারী দলকে স্বভাবতই বিভক্ত করেছে এবং সর্বস্তরে অল্পকাল মধ্যেই পরিব্যপ্ত হবে। ভাঙনের পর সংসদ থেকে সুরু করে কংগ্রেসের নিম্নতম সাংগঠনিক স্তর পর্যন্ত দুই পক্ষই মাথাগুণতিতে মত্ত হয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী নিঃসংশয়ে সংসদে মাথাগুণতিতে গরিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শিবিরে সংহত হয়েছেন, এবং এই সাতটি রাজ্যের বিধান সভারও তার সমর্থকেরা গরিষ্ঠ হবেন। এ-ছাড়া উত্তর প্রদেশের ও আসামের মন্ত্রীসভা অনিশ্চিতির সম্মুখীন হবে, মহীশূরেও কংগ্রেস সভাপতির গোষ্ঠির স্থিতি বিঘ্নিত হবে। একমাত্র গুজরাত প্রধানমন্ত্রীর কক্ষপথ পরিহার করে চলবার সামর্থ রাখে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর গোষ্ঠির আদর্শগত লক্ষ্য এবং কর্মসূচীগত ক্রম সম্পর্কে অবিলম্বে মনস্থির করে একাগ্রতার সঙ্গে সে পথে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হন, তার দলে আরও ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়। গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদে প্রত্যয়নিষ্ঠ রাজনীতির আশু রূপরেখা ভারতবর্ষের জনমানসে সঞ্চারনে প্রধানমন্ত্রী যদি অক্ষম হন, তিনি দেশে অনিশ্চিতি, অস্থিরতা, অরাজকতা এবং ধ্বংসের ভগীরথরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। অপরপক্ষে কংগ্রেসের ভাঙনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির সংহতিসাধনের বিরল-সুযোগ প্রধানমন্ত্রী বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অর্থনৈতিক এবং মানবিক মুক্তির পথ অবারিত করে ইতিহাসে কীর্তিত হয়ে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রীর এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী শক্তিগুলির সম্মুখে সেই পরীক্ষা দেখা দিয়েছে।

সংসদে শক্তি-বিন্যাস

কংগ্রেসের সংসদ দলও বিভক্ত হয়ে ডাঃ রামসুভাগ সিং-এর নেতৃত্বে এই প্রথম লোকসভায় একটি বিরোধী দলরূপে স্বীকৃতি পেলো। ৬৫ জন কংগ্রেসী সদস্য নিয়ে লোকসভার এই দল গঠিত হয়েছে এবং রাজ্যসভায় এস, এন, মিশ্র-এর নেতৃত্বে ৪৬ জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেসের বিরোধী দল গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দলে রয়েছেন ২১০ জন লোকসভার সদস্য—এদের মধ্যে পাঁচজন স্বতন্ত্র দল ও নির্দলভুক্ত ছিলেন—এবং রাজ্যসভায় ১০৪ জন রয়েছেন। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোপ পেয়েছে। লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫১৯, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর গোষ্ঠীর ২৬০ জন সদস্য প্রয়োজন। তাই তার দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ৫০ জন সদস্যের ঘাটতি রয়েছে। দুই সভা মিলে তার দলে ৩১৪ জন সদস্য আছেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে অন্য দলের উপর নির্ভর করতে হবে। ভাঙনের পূর্বে লোকসভায় বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা ছিল; কংগ্রেস ২৮২, স্বতন্ত্র ৪২, জনসংঘ ৩১, ডি, এম, কে ২৫, সি, পি, আই

২৪, সি, পি, আই (এম) ১৯, পি, এস, পি ১৭, এস, এস, পি ১৭, বি, কে, ডি ১১, অন্যান্য, দল ও নির্দল ৫০, আসন খালি ৪টি। রাজ্যসভায় বিভিন্ন দলের সংখ্যা ছিল কংগ্রেস ১৪৭, স্বতন্ত্র ১৩, জনসঙ্ঘ ১০, এস, এস, পি ৯, সি, পি, আই ৯, সি. পি, আই (এম) ৬, পি, এস, পি ৫, ডি, এম, কে, ৫, মুসলীম লীগ ৩, বি, কে, ডি ৩, আকালী দল ৩, রিপাবলিকান ২ অন্যান্য দল ৬, নির্দল ৬, মনোনীত ১১, খালি ১।

প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন সমস্যার ওপর বিভিন্ন দলের সমর্থন যে পাবেন, রাবাত সম্পর্কিত মুলতুবী প্রস্তাবে গত ১৭ই নভেম্বর তা সপ্রমাণ হয়ে গেছে। সেদিন ডি, এম, কে ; দুই কম্যুনিষ্ট দল, ও অন্যান্য কোনো কোনো দলের ও নির্দলের অধিকাংশের সমর্থন তিনি পেয়েছেন। অপরপক্ষে বিরোধী-কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসংঘ, এস, এস, পি ও পি, এস, পির কিছু সদস্যের সমর্থন ছিল মুলতবী প্রস্তাবে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী কোনো কোনো দলের সমর্থন পেলেও অন্যান্য বিষয়ে কোন্ দল কতটা সমর্থন দেবে এবং সেই সমর্থনের জন্য কি মূল্য তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নেবে, সে-সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর গোষ্ঠির মনে গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে। কম্যুনিষ্টদের পক্ষ থেকে ডাঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে অগ্রিম নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে বিবর্তনমূলক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তারা ভোট দেবেন। এই আইন ৩১শে ডিসেম্বর বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তার পূর্বেই মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। তাই বিরোধী-দলগুলির মধ্যে কোনো কোনো দলের সঙ্গে পূর্বেই একটা বোঝা-পড়ায় না এলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সরকার পরিচালনা সম্ভব হবে না। কারণ, আশু লোকসভা ভেঙ্গে আর একটি নির্বাচনে নামতে তাঁর গোষ্ঠির সদস্যরা সম্মত নন। প্রসঙ্গ শুধু একটিই নয়, আরও অনেক বিষয় আছে, যা নিয়ে বিরোধীদের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ থাকবে। আজ এ-দল, কাল সে-দলের সমর্থন কুড়িয়ে মন্ত্রীসভা চালানো কিছুদিন সম্ভব হলেও, বেশীদিন সম্ভব হবে না। ডাঃ রামসুভাগ সিং-এর দল থেকে দলছুট সংগ্রহের দিকে প্রধানমন্ত্রীর নজর পড়বে। যেমন ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র দলে প্রধানমন্ত্রী ভাঙন ধরিয়েছেন। তাই কেন্দ্রে এক দফা দলছুটের রাজনীতির প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি ক্ষমতা রক্ষার তাগিদে নানারকম সুবিধাবাদী সমঝৌতা দেখা দেবে। দলছুটের এবং সুবিধাবাদের রাজনীতি অনিবার্য-ভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা টেনে আনবে এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে যদি পশ্চিমবঙ্গের মত যুক্তফ্রন্টের পত্তন হয় সারা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টির সূচনা হবে। সুতরাং এ-পথ বর্জন করতে হলে, প্রধানমন্ত্রীকে দৃঢ়ভাবে আদর্শ-নৈতিক রাজনীতিতে সংহত হতে হবে, অন্যথায় অল্পকালের মধ্যেই আর একটি নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হবে।

কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রীসভার পতন

গত ২৪ অক্টোবর ৩১ মাস শাসনের পর কেরলের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। দুইজন সি, পি, এম ও একজন কেরলা সোস্যালিষ্ট দলের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবীতে বিধান সভায় ৬৯-৬০ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হবার এক ঘণ্টার মধ্যেই নাম্বুদ্রিপাদ পদত্যাগ করেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের পক্ষ নিয়েছিলেন এস, এস, পি'র ছয়জন ; কে, টি, পি এবং কে, এস, পির দুইজন, আই, এস, পি'র একজন, নির্দলীয় একজন এবং মার্কসবাদীদের পঞ্চাশ জন। মনোনীত একজন এবং উগ্রপন্থী দুইজন মার্কসবাদী ভোটে অংশ গ্রহণে বিরত থাকে। অ-মার্কসবাদীদের মধ্যে ছিল সি, পি, আই ২১, ভারতীয় সোস্যালিষ্ট পার্টি ১১, আর, এস, পি ৯, মুসলীম লীগ ১৪, এ-ছাড়া কংগ্রেসের ৯, কেরালা কংগ্রেসের ৫, কর্নাটক সমিতির ২ এবং বিদ্রোহী কে, টি,

পির ১ : সর্বসমেত ৬৯। কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদসহ সকল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তীব্রভাবে উত্থাপিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ৯ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই তদন্তের নির্দেশ হয়েছে। কেরলায় সাত পার্টির যুক্তফ্রন্ট—পরে এস, এস, পি ভেঙে আই, এস, পি হলে আট পার্টি—গঠিত হবার অল্পকালের মধ্যে মন্ত্রীসভায় পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলে মন্ত্রীসভার ও যুক্তফ্রন্টের ঐক্য ভেঙে যায়। ফলে গত মে মাসে আই, এস, পি ভুক্ত অর্থমন্ত্রী কুঞ্জুর বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যবস্থা হয়। অতঃপর কে, টি, পি দলভুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ মার্কসবাদীরা অগ্রাহ্য করার ফলে গত ৩রা অক্টোবর বিধান সভায় ওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায়ে তদন্তের প্রস্তাব পাশ করা হয়। নাম্বুদ্রিপাদ পূর্ব জার্মানী থেকে ফিরে এসে বিধান সভার নির্দিষ্ট সময়সীমা ১৭ই অক্টোবরের মধ্যে শুধু ওয়েলিংডন-এর বিরুদ্ধেই নয় সি, পি, আই-এর দুইজন এবং আই, এস, পির একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণতার পরিচয় দেন তার পরিণতিতেই কেরালার বর্তমান সঙ্কট। এই ঘটনার পরই মুসলীম লীগের দুই জন এবং আর, এস, পির একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন।

মার্কসবাদীরা নাম্বুদ্রিপাদের মন্ত্রীসভা বিদায় নিলে কেরালা অচল করবার হুমকি দিয়েছিল। তাদের সে হুমকি ব্যর্থ করে কেরালায় সি, পি, আই এম, পি অচ্যুত মেননের নেতৃত্বে একটি আট-সদস্য বিশিষ্ট বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। এতে রয়েছে সি, পি, আই; আই এস, পি, মুসলীম লীগ এবং বিদ্রোহী কেরল কংগ্রেস। আর, এস, পি ক্যাবিনেটের বাইরে থেকে এই মন্ত্রীসভা সমর্থন করছে। মুসলীম লীগ স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব পাওয়ায় মার্কসবাদীরা এই সরকারকে সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচকরূপে বর্ণনা করেছেন। অথচ মুসলীম লীগ তোষণের জন্য মালাবারে পৃথক মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা গঠনে এরাই অগ্রসর হয়েছিলেন। পাঁচমেশালী আদর্শগত ঐক্যবিহীন সরকার যে অল্পকালের মধ্যেই অচল হতে বাধ্য এবং মার্কসবাদীদের হাতে সরকারী যন্ত্র যে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে একদলীয় শাসনের দিকে অগ্রসর হয়, কেরলার কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে দুই দফা মন্ত্রীসভার শাসনে সে-আশঙ্কা সপ্রমাণ হয়ে গেলো। এই মন্ত্রীসভারও সেই গলদ রয়েছে, এদের স্থিতিও অনিশ্চিত। তবুও মার্কসবাদীদের দৌরাত্ম্য থেকে কিছুকালের জন্য কেরলার গণতান্ত্রিক মানুষ মুক্তি পেয়েছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করবার দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করতে হবে।

সর্দার ফেরুমানের দেহাবসান

চণ্ডীগড় পূর্ব পাঞ্জাবে অন্তর্ভুক্তির দাবীতে ৮৩ বছর বয়স্ক স্বাধীনতার যোদ্ধা সর্দার দরশন সিং ফেরুমান ৭৪ দিন আমরণ অনশনের পর ২৭শে অক্টোবর লোকান্তরিত হয়েছেন। গত ১৫ই আগষ্ট এই অনশন শুরু হলে সর্দার ফেরুমান একপক্ষকালের বেশী মৃত্যুর পঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবেন না বলে চিকিৎসকেরা অনুমান করেছিলেন। কারণ সর্দার ফেরুমান বৃদ্ধ, হৃদরোগে ও বহুমূত্র রোগে জীর্ণ ছিলেন, প্রায় ১৪ বছর তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করে তরল খাদ্য গ্রহণ করতেন। এই অবস্থায় কেবলমাত্র মানসিক শক্তির বলে প্রতিশ্রুতি পূরণের—'অর্দাশ'—অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে এই যোদ্ধা ৭৪ দিন এগিয়ে গেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী যোদ্ধা টেরেন্স ম্যাকসুইনি ১৯২০ সালে ৭৪ দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন, বিপ্লবী যতীন দাস ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকারের দাবীতে ৬৩ দিন অনশনের পর শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সর্দার ফেরুমানের শবদেহের রাজকীয়

মর্যাদাসহকারে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত কালহরণ, সর্দার ফেরুমানের জীবননাশের জন্য নিঃসংশয়ে দায়ী। চণ্ডীগড় সমস্যা জিইয়ে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরও পরিকল্পনা তহবিল বাড়লো না

অবশেষে অর্থমন্ত্রণালয় স্বীকার করেছেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য নতুন কোনো সম্পদ পাওয়া গেল না। অক্টোবর মাসের শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ২৬০৯·৩ কোটি টাকায় পৌঁচেছে। কিন্তু বর্তমানে যে সব খাতে লগ্নী রয়েছে, তা থেকে সম্পদ অন্য খাতে বিনিয়োগ করলে সমগ্র আর্থিক পরিস্থিতির ক্ষতি হতে পারে এই কারণে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য এ-দিক থেকে অধিকতর সম্পদ সংগৃহীত হোলো না। সরকারী ঋণপত্রে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ শতকরা পাঁচভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাবও মুলতবী রাখা হয়েছে। এ-দিক থেকেও পরিকল্পনার জন্য আরও অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা কমে গেলো। তাই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে পরিকল্পনার জন্য অধিক সম্পদ সংগ্রহের ঢাক-ঢোল আপাতত চাপা পড়লো। অতঃপর সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে পরিকল্পনার সম্পদ সংগ্রহের দিক থেকে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্বকরণ কোনো বৃহৎ পদক্ষেপ নয়, মাত্র একটি প্রান্তিক পদক্ষেপ (marginal step)। সুতরাং পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের ফলে সম্পদের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছে, চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য, সেই পরিবর্তনটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এদিকে রাজ্য সরকারগুলির নিকট কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা টাকার টানা পোড়েনে কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধের সময় সূচীর পুনর্বিন্যাসের দাবী রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। রাজ্যগুলির কাছে কেন্দ্র প্রায় ৭০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ বাবদ পায় এবং তার অধিকাংশই কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গের কাছে পাওনা। কাশ্মীর কিছু সময় চেয়ে নিয়েছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের কাছে পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য কেন্দ্র চাপ দিচ্ছে। অবশ্য গতবছরের ঋণ ও তার সুদ পরিশোধের জন্য কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গকে সম্প্রতি ২২ কোটি টাকা অগ্রিম দিয়েছে এবং দামোদর ভ্যালী করপোরেশনে মূলধনী খাতে লগ্নীর জন্য রাজ্য সরকারকে দেওয়া কেন্দ্রীয় ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গকে আরও ৭.৩৬ কোটি টাকা অগ্রিম দিতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু এভাবে 'মাছের তেলে মাছ ভেজে' রাজ্য সরকারের অর্থ সম্পদের অন্তিম উন্নতি তো দূরের কথা আরও অবনতি হবে। পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের ফলে কোনো কোনো রাজ্যের অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও পশ্চিম বঙ্গ এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের পক্ষে সে কথা খাটে না।

রাজ্যবাজেটগুলির ঘাটতি পূরণ না হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে রাজ্যগুলির হিসাবে ওভারড্রাফটের মাত্রা বাড়বে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ঢালাও ওভারড্রাফটের ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী এবং এর পরিমাণ পরিমিত করতে বদ্ধপরিকর। রাজ্যগুলিকে নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্য কেন্দ্রের চাপও রয়েছে। অবশ্য পঞ্চম ফিনান্স কমিশন থেকে যত বেশী সম্ভব অর্থ সম্পদ আদায়ের জন্য প্রায় অধিকাংশ রাজ্যের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ স্ফীত করে দেখানো হয়েছিল। ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ পাওয়া গেছে। তার সামান্য রদ-বদল হতে পারে মাত্র। অতঃপর চতুর্থ পরিকল্পনার পাওনা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে অর্থ সম্পদের বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রাজ্যগুলিকে নিজ নিজ আর্থিক পরিস্থিতি সামলাতে হবে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্বের দিকে

তাকিয়ে তাদের দিনগুণলে চলবে না, ঘর সামলাবার জন্য নিজেদের অর্থসম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা দুর্বার হয়ে উঠবে।

অভিনব সত্যাগ্রহ

বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের শাসনে বিপর্যস্ত আইন-শৃঙ্খলা, মানুষের নিরাপত্তা বোধের অভাব, নারী মর্যাদাহানি, গৃহদাহ, সন্ত্রাস, জবরদখল জমি-দখল, হানাহানি, ইত্যাদি ঘটনার ফলে পশ্চিম বাংলায় যে জংলী রাজত্ব-এর সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের জন্য অনশন সত্যাগ্রহ সুরু করবেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েক সহস্র 'শান্তি ফৌজও' ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বাঁকুড়া সম্মেলনে (২রা নভেম্বর) এই সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে আর্তনাদ শোনা গেছে এবং সি, পি, এমকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য মুখ্যত দায়ী করা হয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নিজেই পশ্চিম বাংলার অবস্থাকে 'জংলী শাসনে'র সঙ্গে তুলনা করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। অথচ তাদের প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এই দলের নেতৃস্থানীয়রা বলছেন, এই সত্যাগ্রহ কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়, যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় যুক্ত ফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে শক্তিশালী করবার জন্য এই সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা করেছেন।

পশ্চিম বঙ্গের রাজনীতিতে বাংলা কংগ্রেসের এই পরিকল্পনা সীমাহীন কপটতার একটি দুর্লভ স্বাক্ষর। মার্ক্স-বাদী কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষমতার মঞ্চে আসীন থেকে আজ পশ্চিম বঙ্গের জনজীবনে বাংলা কংগ্রেস যে বিভীষিকার রাজত্বের শরিক হয়েছেন, নিজেদের কৃতকর্মের এই প্রতিচ্ছবি তাদের শঙ্কিত করে তুলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন থেকেও মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্ব আরোপে প্রথম থেকেই উপেক্ষা, অবহেলা ও অক্ষমতা দেখিয়ে বিভিন্ন দপ্তরগুলিকে মন্ত্রীদের দলীয় কুক্ষিগত করতে উৎসাহিত করে এবং প্রশাসনিক কাঠামোকে এবং পুলিসী নিষ্ক্রিয়তার নীতিকে দলীয় প্রাধান্য বিস্তারে মার্ক্সবাদীদের ঢালাও সুযোগ দিয়ে অতঃপর কৃতকর্মের অপরাধ স্খালনের জন্য স্থীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় কুমার মুখোপধ্যায়-এর সত্যাগ্রহ ঘোষণার মধ্যে চটক থাকলেও এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে স্বচ্ছ পথ নির্দেশের পরিবর্তে আরও বিভ্রান্তি ডেকে আনবে যার আড়ালে মার্ক্সবাদীরা তাদের ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরও প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবে। নয়মাসের শাসনে দেশে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্ ধ্বসিয়ে দেবার শরিক হয়ে বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল সরাসরি এই সর্বনাশকে স্বীকার করে মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে যৌথ সরকারের মহড়ায় ছেদ টেনে গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও জাতীয়তা-বাদের সংহতি-সাধনে প্রত্যাবর্তন করা। বাংলা কংগ্রেস তাদের যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির সর্বনাশা পরিণতি স্বীকার করবার সৎসাহস দেখাতে পারলে এরূপ নির্বীর্য, অসহায় স্ববিরোধিতায় তারা নিমগ্ন হতেন না। সরাসরি ফ্রন্ট ভাঙ্গার দায়িত্ব না নিয়ে, সত্যাগ্রহের পরোক্ষ পথে ফ্রন্ট থেকে বার হবার পথ খুঁজলেও তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। যারা অভিযুক্ত করবার তারা ফ্রন্ট-ভাঙ্গার জন্য তাদের দায়ী করবেন-ই।

ধান কাটার লাল সংকেত

ধান কাটার মরশুম যতই এগিয়ে আসছে, জমি নিয়ে সংঘাতের দৈনন্দিন ঘটনা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আসন্ন গুরুতর সংঘাতের গুরুর সন্ত্রাসের আবর্ত সৃষ্টি করছে। কয়েক শ পুলিশ ক্যাম্প সম্ভাব্য সংঘর্ষের এলাকাগুলিতে

গঠিত হয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ক্যাম্পগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ধান কাটার নীতি ঘোষণায় বলেছেন যে চাষী খাসজমি কিম্বা বেনামী জমিতে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করেছে, সে-চাষীই এই ফসলের অধিকারী হবে। যে সব ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে একদল চাষী আইনের সীমার মধ্যে দখলী জমির মালিকের জমি জবরদখল করেছে সে-সব ক্ষেত্রে এই সব দখলী জমির মালিকদের ফসলের একটা অংশ দিতে হবে। এই অংশের পরিমাণ নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট জেলায় চলতি ভাগচাষ প্রথার উপর। যদি কোনো ক্ষেত্রে দলীয় বিরোধ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলগুলির সঙ্গে প্রশাসনকে কাজ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করবার উপদেশ দিয়েছেন। এ-ছাড়া সাধারণভাবে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশ এবং ফ্রন্টের অন্তর্দলীয় বোঝাপড়ার পরও প্রতিদিনই জমির বিরোধে সংঘর্ষ ও হত্যার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং সরকারী নির্দেশ, মুখ্যমন্ত্রীর সদুপদেশ কতটা কার্যকরী হবে সে-বিষয়ে গভীর সংশয় রয়ে গেছে। এ কথা সত্য যে গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ একর বেনামী জমি কৃষকেরা সংঘবদ্ধভাবে উদ্ধার করেছে এবং ৮ লক্ষ বিঘা বেনাম জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। কিন্তু সরকার যে কাজ আইনের সাহায্যে করতে পারতো, সেই বেনাম দলীয় শক্তিতে উদ্ধারের প্ররোচনা যুগিয়ে একদিকে যেমন জবরদস্তির পথ খুলে দিয়ে ছোটজোতের চাষী, ভাগচাষী, সরকারে বর্তানো জমির লাইসেন্সধারী চাষী, জমির আইন-সঙ্গত অধিকারী চাষীর জমি দখলে সহায়তা করেছে, তেমনি জমি-দখলের নামে আন্তর্দলীয় সংঘাত সৃষ্টিতে সহায়তা করে ভূমি-সংস্কারের নামে জমিতে দলীয় স্বার্থ সাধনে অগ্রসর হয়েছে। বেনাম জমি উদ্ধার করে কৃষকেরা একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছে। কিন্তু লুটপাট, জোরজবরদস্তি, খুন-জখমের পথে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে তারা জমিতেও প্রতিক্রিয়াশীল স্থিতস্বার্থের হাত শক্ত করেছে। জমির নায্য চাষীর ফসল লুটের প্রবণতা সৃষ্টি করে ভূমিহীনেরা দলীয় স্বার্থের ক্রীড়নক হয়ে জমিতে স্থিতস্বার্থদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে এবং বহু ছোট ছোট জোতের কৃষকদের, অনেক ভাগচাষীদের এমনকি লাইসেন্সধারী খাস জমির চাষীদের জমি রক্ষার এবং ফসল রক্ষার তাগিদে স্থিতস্বার্থের শিবিরে ঠেলে দিয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে পশ্চিম বাংলায় যেমন সাড়ে সাত লাখ ভূমিহীন পরিবার রয়েছে তেমনি সাড়ে সাতলাখ ভাগচাষী পরিবার এবং বার তের লাখ ছোটজোতের চাষী পরিবার রয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ ভাগচাষীদের এবং ছোট-জোতের চাষীদের হিংস্র পথ অবলম্বন করে ভূমিহীনরা যদি স্থিতস্বার্থের শিবিরে ঠেলে দেয়, সেক্ষেত্রে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির, বিশেষভাবে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির দলীয় স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে, কিন্তু ভূমিহীনদের স্বার্থসাধন হবে না।

ভূমি জবরদখলের আর একটি পরিণতি সম্পর্কে সরকার নীরব রয়েছেন। যে সব ছোট জোতের কৃষকদের, ভাগ-চাষীদের, খাসজমির লাইসেন্সধারী কৃষকদের কিম্বা সিলিং-এর সীমানার অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের জমি জবরদখলের ফলে তারা পুরো ফসল উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হোলো, তাদের কেবলমাত্র ফসলের একটি ভাগ দিয়েই সরকার বিদায় দিচ্ছেন। এই ভাগও কতটা পাবে সেটা সন্দেহস্থল। যদি পায় তাহোলেও তারা যে পুরো ফলন উপার্জন থেকে বঞ্চিত হল, সেজন্য সরকারকে এই সকল বঞ্চিত চাষীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ-দাবী সঙ্গত, নায্য এবং অমোঘ।

১৭. ১১. ৬৯

বাঙ্গলার জাগৃতি

কালীচরণ ঘোষ

সভা-সমিতি

ব্যাপক শিক্ষার স্পৃহা যখন চিন্তাশীল লোকের মনে স্থান লাভ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাব প্রচারের চেষ্টাও চলেছে। প্রথম দিকটার সাধারণ জ্ঞানলাভের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয়তা ভাব কিছুটা সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে।

ডিরোজিও প্রবর্ত্তিত এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অংশভাগীদের মধ্যে নব চিন্তা ধারা প্রবর্ত্তনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তার বাইরে যে ভাবধারা জন্মলাভ করে, সেটা গড়িয়ে গিয়ে দেশপ্রেমের মূলে রসসিঞ্চন করতে সমর্থ হয়।

কয়েকটি সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে এ সবগুলিই—সিপাহী অভ্যুত্থান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পূর্ব্বের ঘটনা।

এ শ্রেণীর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে "গৌড়ীয় সমাজ", স্থাপিত হয় ১৮২৩.তে। যাঁরা ইংরেজিতে কৃতবিদ্য এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরা বুঝলেন ইংরেজি শিক্ষার ফল ভাল হতে পারে, কিন্তু বাঙ্গলাকে উপেক্ষা করে তাকে বড় হতে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হতে পারে না। এখানে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীরা এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ফলে দ্বারকা নাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসময় দত্ত প্রভৃতি হাত মিলিয়ে মাতৃভাষার উন্নতি ও তৎসাহায্যে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গৌণ উদ্দেশ্যর মধ্যে ছিল শাস্ত্র চর্চ্চা, প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার।

এ স্রোত একবার বইতে আরম্ভ করে একেবারে রুদ্ধ হয়নি। গতি কখনও দ্রুত কখনও স্তিমিত হয়েছে বটে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সর্ব্বতত্ত্ব-দীপিকা সভা স্থাপন করেছিলেন ১৮৩২-তে। এখানেও সেই ইংরেজি ভাষার অব্যাহত প্রভাবকে কতক পরিমাণে রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল। সভার এক বিধানে বলা হয় যে সভ্যরা বাঙ্গালা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করবেন না; এ বিষয়ে একটা অঙ্গীকার মেনে নিতে হ'তো।

এর পরে আবির্ভূত হয় (১৮৩৬) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা। সাধারণ নিয়মে সমিতির নাম থেকে মনে করলে দোষ হতো না যে এই সভার কাজ হবে বাঙ্গলা ভাষার বিস্তৃততর প্রকাশ। উদ্যোক্তা ও স্থাপয়িতা হচ্ছেন কালী নাথ রায় চৌধুরী, দ্বারকা নাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি। এ সভার বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার মত। এঁরা শুরুতেই স্থির করেন যে সভার অধিবেশনে ধর্ম্ম চর্চ্চা করবেন না। অপর পক্ষে ভারতের স্বার্থের হানিকর যে সকল সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে তার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করবেন। গভর্ণমেণ্ট যখন লাখেরাজ (নিষ্কর) জমি জমার ওপর কর ধার্য্য করে, তার বিরুদ্ধে "সভা" প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন

করেছিল। সভা "was a joint political move.... taken with the avowed object of opposing the Regulation for resumption of rent free lands." (P. N. Singh Roy : Chronicle of the British Indian Association, p-2). প্রকৃত পক্ষে বাঙলা দেশে এইটিই প্রথম রাজনৈতিক সভা।

যখন শিক্ষিত চিন্তাশীল ও ধনীদের মধ্যে জাতীয়তা-ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে ও স্বার্থরক্ষার চেষ্টা এসে রূপ নেয় তখন হিন্দু কলেজের ছলে ১৮৩৭ (নভেম্বর ১২ই) (Zemindary Association) জমিদার সম্মিলন গড়ে ওঠে। এখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হতো "rejecting all exclusiveness" and "to be based on the most universal and liberal principles." তবে একটা সর্ত ছিল, সভ্যদের এ দেশের জমির সঙ্গে সম্পর্ক বিশিষ্ট হওয়া চাই, অর্থাৎ কিছু জমির মালিক (জমিদার) হওয়া চাই।

এ নাম শীঘ্র বদলে যায়। ১৮৩৮ (মার্চ ২১-এ) "জমিদার" কথা বদলে "Landholders" (ভূস্বামী) কথা গ্রহণ করা হয়, এবং তখন থেকে পরিচয় দাঁড়ায় "Landholders' Society". মুখবন্ধ হিসাবে বলা হয় প্রতিষ্ঠান যদিও মুখ্যতঃ জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান থাকবে তথাপি এর প্রধান কর্তব্য হবে "to afford the first lesson in the art of fighting constitutionally for their rights" and "to teach them manfully to assert their claims and give expression to their opinions."—সংবিধানসম্মতভাবে ন্যায্য দাবী আদায় করবার জন্য সংগ্রামের রীতি পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হবে, আর সাহসের সঙ্গে তাদের ন্যায্য পাওনার কথা উল্লেখ করে তাদের মতামত প্রকাশের বিধি শিক্ষা দেবে।

জ্ঞান লাভের স্পৃহা লোকের মধ্যে ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই ক্ষুধা মেটাবার জন্যে ১৮৩৮ (মার্চ ১২-ই) (Society for the Acquisition of General Knowledge) সাধারণ জ্ঞানার্জন ভিত্তিক সভা স্থাপিত হয়েছিল। এখানে সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, সমাজ ও অর্থনীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির চর্চাও হতো। এক এক সভায় বক্তার জ্ঞান ও মন্তব্যের ওপর ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। তারাচাঁদ হলেন সভাপতি ও পিয়ারীচাঁদ মিত্র সাধারণ সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৩৯ (অক্টোবর ৬ ই) জন্মলাভ করে। মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অনেক পরে, ১৮৪৩ (আগষ্ট ১৬-ই) যাত্রা শুরু করেছিল। এ সভায় সাধারণত রাজনীতি আলোচনার অবকাশ ছিল না। শিক্ষা, সমাজ, ইতিহাস, নারীকল্যাণ, অনুবাদ, প্রাচীন গৌরব, সরল বিজ্ঞান, মিশনারীদের আক্রমণের প্রতিবাদ প্রভৃতি ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকার জনয়িতা ছিলেন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, পালনকর্তা অক্ষয় কুমার দত্ত।

ভারতের কল্যাণে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সভা, (British India Society) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসায়েটি লণ্ডনে (William Adam) এ্যাডাম কর্তৃক স্থাপিত হয় ১৮৩৯-এ। ঐ যুগে এ্যাডাম ছিলেন ভারতের প্রকৃত হিতৈষী। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৪১-তে ইংলণ্ডে (British India Advocate) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাডভোকেট পত্রিকা পরিচালিত হয়। কাজের সুবিধার জন্য (ভূস্বামী পরিষদ) ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসায়েটির পক্ষ থেকে ১৮৩৯ (নভেম্বর ৩০-এ) গৃহীত এক প্রস্তাবের বলে দুই সমিতি মিলিত হয়ে যায়। (যোগেশ চন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১৩৫২, পৃঃ ৫১)।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (George Thomson) টমসনকে বিলাত থেকে সঙ্গে করে কলকাতায় আনবার পর

১৮৪৩ (এপ্রিল ২০) বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসায়েটি স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর প্রকৃত আর্থিক ব্যবস্থা, আইন কানুন, দেশের প্রাকৃতিক ও অপরাপর সম্পদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তৎসাহায্যে সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সে সকলের প্রয়োগ ক্ষেত্র সৃষ্টি করা, সাধারণের মঙ্গল বিধান, তাদের ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ("to employ such other means of peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects").

বিভিন্ন ধারা এক হ'য়ে মিলিত হবার পথ খুঁজছিল যদিও প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে যা কিছু করা। এই ভেবে, এবং উদ্দেশ্য যখন একই তখন আর দুটো স্বতন্ত্র সংস্থা না-রেখে ১৮৫১ (অক্টোবর ২৯-এ) (Landholders' Society) ভূস্বামী সঙ্ঘ ও (Bengal British India Society) বঙ্গীয় ইঙ্গ-ভারত সঙ্ঘ মিলিত হয়ে (British Indian Association) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে পরিণত হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বিস্তার ও ভারতীয় জনগণের কল্যাণ সাধন প্রচেষ্টায় "এ্যাসোসিয়েশন" এক নূতন আদর্শ স্থাপন করার অগ্রদূত। বিলুপ্ত দুইটি সংস্থাতেই অভারতীয় সভ্য ছিল। কিন্তু বীটন (বেথুন) প্রবর্ত্তিত "কালা-আইন"-এর প্রতিবাদে ইংরেজের যে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল, (১৮৪৯) তখন তাকে পরিবর্জন করার আর কারও আপত্তি ছিল না। এ প্রতিষ্ঠান formed without a single European as its member.."

এই প্রসঙ্গে আরও একটি স্বল্পদিনস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। যখন ইউরোপীয়রা "কালা আইনের" প্রতিবাদে গভর্ণমেণ্টকেও নাজেহাল করে ছাড়ল এবং ১৮৫৩-তে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নতুন শাসন-সংস্কার আসন্ন হয়ে এসেছে তখন সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কথা বড় হ'য়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্য পাইকপাড়া রাজবাটীতে ১৮৫১ সেপ্টেম্বর ১৯-এ প্রতিপত্তিশালী লোকের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত এবং জাতীয় সভা (National Association) গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অপরাপর ভদ্রমহোদয়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি। মুখ্য লক্ষ্য হ'লো "to promote the welfare of the country by asserting 'our legal rights by legitimate means', to apply for any amendment or reform either to the local government or to the authorities in England". স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সম্পাদক। প্রায় মাস দেড়েক কালের মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়ায় জাতীয় সভা (National Association) তার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে নতুন নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করেছে। শিশির কুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগ (Indian League) ১৮৭৫ (সেপ্টেম্বর ২৫) জন্মলাভ করে। তখনকার দিনের পক্ষে এ প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত প্রগতিশীল বলে মনে হ'য়েছিল। দুঃখের বিষয় এটি অধিককাল স্থায়ী হয় নি।

এর অত্যল্পকালের মধ্যেই এক শক্তিশালী সংগঠন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (ভারত সভা) গড়ে ওঠে ইণ্ডিয়ান লীগের বাছাই করা সভ্যদের সহযোগিতায়। জন্ম ১৮৭৬ (জুলাই ২৬-এ)। বলিষ্ঠ জনমত গঠন, ভারতীয় সকল জাতি ও বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীর মিলনের দ্বারা একইভাবে ভাবিত ও দাবী দাওয়ার ব্যাপারে ঐক্য

স্থাপন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন এবং জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার, এই ছিল "এ্যাসোসিয়েশনের" লক্ষ্য।

এমন সময় এসে পড়লো ইলবার্ট বিল অর্থাৎ ১৮৪৯-তে বেথুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বড় লাটের কাউন্সিলের আইন সভ্য ('Courtney' Ilbert) ইলবার্ট আর একবার বিচার-ক্ষেত্রে "ধলা" অপরাধীর বিশেষ সুযোগ সুবিধা কিছুটা খর্ব্ব করার চেষ্টা করেন ১৮৮২ (ফেব্রুয়ারী ২-রা)। সকল শ্রেণীর সকল স্তরের শ্বেতাঙ্গ দল প্রবল বিরোধিতা করে এবং তারা সফলকাম হয়। ১৮৮৩ জানুয়ারী ২৮-এ যে আকারে আইন পাশ হয় সেটা ইলবার্টের মূল বিলের একটা কঙ্কালমাত্র। এখানে ইংরেজের সঙ্ঘশক্তি বাঙ্গালীর জীবনে নবচেতনা এনে দিয়েছিল। তাদের গঠিত (Defence Committee) প্রতিরোধ সমিতি এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ ভাণ্ডার সৃষ্টি থেকে বাঙ্গালী বুঝলে যে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

কার্য্যক্রমের সূচনায় শিক্ষিত চিন্তাশীল বাঙ্গালী ১৮৮৩ (জুলাই ১৭-ই) দশ সহস্র লোকের এক বিরাট সভায় জাতীয় ভাণ্ডার সৃষ্টির প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই বৎসরের শেষের দিকে, ডিসেম্বর ২৮, ২৯ ও ৩০ কলকেতায় (National Conference) জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এতে অংশ গ্রহণ করেন। এই সভার সভাপতি আনন্দমোহন বসু বলেছিলেন যে জাতীয় পার্লামেণ্ট গঠিত হবার এটি প্রথম পদক্ষেপ ("it was the first stage towards a National Parliament")। মোটের ওপর এই অধিবেশন জাতীয় মহাসভা (National Congress) স্থাপিত হবার পূর্ব্বাভাষ বলে গৃহীত হয়ে থাকে।

১৮৮৩-র পর ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৫ তে (ডিসেম্বর ২৫, ২৬, ২৭) পুনরায় কলকেতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের বিশেষত্ব যে পূর্ব্বে যে সকল প্রতিষ্ঠান, যথা, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান এবং কেন্দ্রীয় মুস্লিম সভা (Central Mahomadan Association)—যাঁরা পূর্ব্ব সম্মেলনে কোনো অংশ গ্রহণ করেনি, তারা হলেন আহ্বায়ক। ভারতের নানা অঞ্চল হ'তে প্রতিনিধি এসে যোগদান করেছিলেন।

এ দিকে যখন জাতীয়তার ভাব গ্রহণ করে একটা সম্মিলিত সভা (১৮৮৫) চলছে, তখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে চঞ্চলতা বিস্তার লাভ করতে দেখা যায়। যে সময় কলকেতায় জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন চলছে, (২৫, ২৬ ও ২৭-এ ডিসেম্বর) তখন বোম্বাই সহরে (২৮, ২৯ ও ৩০-এ ডিসেম্বর) ভারতের শান্ত শিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হচ্ছিল।

সতেরোটি শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ দাসের প্রাসাদে মিলিত হয়েছিলেন ১৮৮৪ ডিসেম্বরে। পর বৎসরই মার্চ্চ মাসে স্থির হয় যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধি আহ্বান করে একটি বড় গোছের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই মতে ১৮৮৫ (ডিসেম্বর ২০-এ) গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (W. C. Bonnerjee) এর সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress)র অধিবেশন চলে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করা পর্য্যন্ত এই কংগ্রেসই সকল আন্দোলনের উৎস সৃষ্টি করেছে, শক্তি যোজনা করেছে। ১৯০৭ সালে সুরাটে নরম ও গরম দলে বিরোধ ঘটে এবং গরম দল কতকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯১৭ থেকে আবার নরম দল পিছিয়ে পড়লো।

তবে ইতিমধ্যে বিপ্লবী দল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এবং এবং তাদেরই কার্য্যকলাপ কখনও কখনও ভিতর থেকে কংগ্রেসকে শক্তি যোজনা করেছে এবং বরাবরই বাইরের যোগাযোগ বজায় রাখলেও গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। সে কাহিনী সবিস্তারে বলার সময় সমুপস্থিত।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ : অনুবাদ

চার্লস ডিকেন্স

পথচারী

৫

এতটা পড়ে ডিকেন্স-প্রেমিক কেউ এতক্ষণে হয়ত আমার ওপর চটে গেছেন।

সাহিত্য-গুণাবলি উপেক্ষা করে শুধু তাঁর বাণী অবলম্বন করেই আমি ডিকেন্সের আলোচনা করছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক লেখকের, বিশেষ করে প্রত্যেক ঔপন্যাসিকেরই একটি বাণী আছে। তিনি সে-কথা স্বীকার করুন আর নাই করুন। আর তাঁর রচনার সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি পর্যন্ত এই বাণী-দ্বারা প্রভাবিত। আর্ট বলতেই প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচারণা। ডিকেন্স বা অধিকাংশ ভিকটোরীয় ঔপন্যাসিক কেউ একথা অস্বীকার করবার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। পরন্তু সব প্রচারণাই আর্ট নয়। আমি আগেই বলেছি, যে-সব লেখকের লেখা চুরি করার যোগ্য মনে করা যায় ডিকেন্স তাঁদেরই একজন। তাঁর লেখা থেকে মার্কসবাদীরা, ক্যাথলিকরা, সর্বোপরি রক্ষণশীলরা চুরি করেছেন। প্রশ্ন হল, চুরি করবার মতো কী ওতে আছে। ডিকেন্সকে আদৌ আমল দেওয়া হয় কেন? ডিকেন্সের জন্য আমারই বা মাথাব্যথা কেন?

ওরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সাধারণত নন্দনতত্ত্ব-ঘটিত পছন্দটা এমন কিছু যা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না অথবা ওটা অ-নন্দনতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য-দ্বারা এতটা দূষিত যে, সমস্ত সাহিত্য সমালোচনাকে এক বিশাল ভাঁওতার জাল বলে মনে হয়। ডিকেন্সের বেলা যে-ব্যাপারটা জটিলতা সৃষ্টি করে তা হল তাঁর অতি-পরিচয়। ঘটনাচক্রে তিনি সেই 'বিরাট গ্রন্থকারদের' অন্যতম—যাঁদের লেখা শৈশব থেকে ঝিনুকে করে গলাধঃকরণের ব্যবস্থা করা হয়। তখনকার মতো এতে বিদ্রোহ ও বমন উদ্রেক করে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে এর ফল ভিন্ন রকম হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ছেলেবেলায় 'Ye Mariners of England,' 'Charge of the Light Brigade' প্রভৃতি দেশ-প্রেমের কবিতা মুখস্থ করে তার জন্য গোপন আকর্ষণ প্রায় সকলেই অনুভব করেন। কবিতা নয়, তার স্মৃতি-রোমন্থনই সকলে উপভোগ করে থাকেন। আর ডিকেন্সের বেলাও সেই অনুষঙ্গ-শক্তিই সক্রিয় হয়ে ওঠে। সম্ভবত অধিকাংশ ইংরেজের বাড়িতেই তাঁর বইয়ের দু'এক খণ্ড কোথাও পড়ে থাকেই। পড়া শুরু করার আগেই অনেক ছেলেমেয়ে তাঁর চরিত্রগুলোকে চোখে দেখে থাকে, কারণ ভাগ্যগুণে তাঁর বইয়ের জন্য সেরা চিত্রশিল্পী তিনি পেয়েছিলেন। এত কচি বয়সে যা শোষণ করা যায়, তার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক বিচার-বুদ্ধি গড়ে ওঠে না। একথা ভাবতে গেলেই ডিকেন্সের যা কিছু খারাপ, বোকাটে বা অর্থহীন তা-ই সবাই-চিন্তা করে—চিন্তা করে তাঁর শক্ত ছকে বাঁধা 'প্লট,' অসার্থক সব চরিত্র, longueurs, মুক্তবন্ধ ছন্দে লেখা অনুচ্ছেদ 'করুণ রসে' সিক্ত বিশ্রী পৃষ্ঠাগুলি। আর তখনই ভাবনার উদয় হয়, যখন বলি ডিকেন্সকে ভালবাসি তার অর্থ কি এই যে শৈশবের চিন্তা করতেই আমার

ভালো লাগে। ডিকেন্স কি তবে শুধু একটি প্রতিষ্ঠান (institution)?

যদি তাই হয়, তবে তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কোনো লেখক—এমন কি, যার প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে, তেমন লেখক সম্বন্ধেও কত সময় আমরা চিন্তা করি তা স্থির করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, একবার যে ডিকেন্স পড়েছে কোনো না কোনো প্রসঙ্গে তাঁকে মনে না করে এক সপ্তাহ তার কাটবে না। পছন্দ করুন আর না-ই করুন, নেলসন স্তম্ভের (the Nelson Column) মতো তিনি সেখানে আছেন-ই। যে-কোনো মুহূর্তে কোন দৃশ্য বা চরিত্র আপনার মনে পড়তে পারে, আর সে দৃশ্য বা চরিত্র ডিকেন্সের এমন বই থেকে আসতে পারে—যার নাম আপনি স্মরণ করতেও পারেন না। মিকৌবার-এর (Micawber) চিঠিগুলি! সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উইঙ্কল্! শ্রীমতী গ্যাম্প! শ্রীমতী উইটি-ট্যারলি ও স্যার টমলি স্নফিম (Sir Tumley Snuffim)! টজার্স্ (Todgers's)! (জর্জ গিসিং বলেছেন, মনুমেণ্ট পার হতে গিয়ে কখনো লণ্ডনের আগুনের কথা চিন্তা করেন নি, ভেবেছেন টজার্স দের কথা। শ্রীমতী লিও হাণ্টার (Mrs. Leo Hunter)! স্কুয়ারুজ্ (Squeers)! সাইলাস ওয়েগ (Silas Wegg) ও রুশ সাম্রাজ্যের অবনতি ও ধ্বংস। মিস্ মিলৃজ্ ও সাহারা মরু! হ্যামলেট-এর ভূমিকায় ওয়পস্‌ল! মিসিস জেলিবি (Mrs. Jellyby)! ম্যানটালিনি, জেরি ক্রাঞ্চার, বার্কিস পম্বল্-চুক, ট্রেসি টাপ্‌ম্যান, স্কিম্‌পল, জো গার্জারি, পেকস্নিফ—ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা তো বইয়ের ধারা নয়, একটা দুনিয়ার সঙ্গেই এর বেশী সাদৃশ্য। আর তাই বলে নিছক কমিক দুনিয়াও নয়, কারণ ডিকেন্সের রচনায় যা মনে রাখার মতো তার একাংশ হল তাঁর ভিক্টোরীয় বিষাদ ও মৃত্যুকামনা (necrophilia) আর রক্তারক্তির দৃশ্য—সাইক্স্-এর (Sykes) মৃত্যু, ক্রুক-এর (Krook's) স্বতোদহন, মৃত্যুদণ্ডাদিষ্টের কুঠুরিতে ফ্যাগিন (Fagin), গিলোটিন ঘিরে সীবনরত রমণীর দল। বে-পরোয়া লোকেদের মনেও এ সব অতি গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। সঙ্গীত ভবনের রঙ্গ-রসিক অভিনেতা মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে মিকৌবর বা মিসিস্ গ্যাম্প-এর ভূমিকায় নাটক করতে পারে (বা অন্ততঃ সেদিনও পারত), আর বিশের মধ্যে মধ্যে একজন শ্রোতা ডিকেন্সের একখানা বই আগাগোড়া পড়ে থাকলেও অনেকে নিশ্চিততা বুঝত। এমন কি যাঁরা তাকে হেয় মনে করেন তাঁরাও অজান্তে তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি করে থাকেন।

ডিকেন্স এমন একজন লেখক যাঁকে খানিকটা অনুকরণ করা যায়; যেমন, স্যুইনি টড্ এর (Sweeny Todd) হাতী ও প্রাসাদের বর্ণনা (the Elephant & Castle version) অতি নির্লজ্জভাবে তাঁর লেখা থেকে চুরি করা হয়েছে। কিন্তু যা অনুকরণ করা হয়েছে তা হল শুধু চিরাগতধারা (tradition) এইধারা পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে ডিকেন্স স্বয়ং গ্রহণ করে তার পুষ্টি সাধন করেছেন, 'চরিত্র-প্রীতি অর্থাৎ খ্যাপামি প্রীতি। যার অনুকরণ সম্ভব নয়, তা হল ডিকেন্সের উদ্ভাবনী শক্তির উর্বরতা; আর তা চরিত্র উদ্ভাবন নয়, সন্ধিক্ষণের (situations) উদ্ভাবনও ততটা নয়, যতটা হল বাগ্-ভঙ্গিমা ও বাস্তব খুটিনাটির উদ্ভাবন। ডিকেন্সের লেখার বিশিষ্ট ও সংশয়াতীত লক্ষণ হল অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় খুটিনাটি ব্যাপার। আমি যা বোঝাতে চাই তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল। নিচে যে কাহিনীটি দেওয়া হল তা বিশেষভাবে মজাদার নয় বটে; তবু এর মধ্যে এমন একটি বাগ্‌ভঙ্গি আছে যা ব্যক্তির আঙুলের ছাপ বা টিপ-সইয়ের মতোই ব্যক্তিগত (individual)। বব সইয়ার-এর (Bob Sawyer) ভোজসভায় মিঃ জ্যাক হপ্‌কিন্স্ একটি ছেলের গল্প বলছেন, সে তার বোনের গলার হার গিলে ফেলেছিল:

"পরদিন ছেলেটি ছুটো পুঁতির দানা গিলে ফেলল; তার পরের দিন তিনটি, এমনি করে এক সপ্তাহে পুরো হারটাই গিলে ফেলল—সব শুদ্ধো ২৫টি দানা। বোন ছিলো পরিশ্রমী মেয়ে—সে গহনা প্রায় ব্যবহার করতনা—হার খুইয়ে কেঁদে চোখ প্রায় অন্ধ করে ফেলল; আকাশ-পাতাল খুঁজে বেড়াল। আর হার যে পেলেনা তা বোধ হয় না বললেও চলে। কয়েকদিন পর পরিবারের সবাই খেতে বসেছে—ঝলসানো ভেড়ার মাংস, তার সঙ্গে আলু। ছেলেটির ক্ষিদে ছিলনা, ঘরে খেলা করছিল; সে হঠাৎ এমন উৎকট শব্দ করতে শুরু করল যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। অমনটি করিসনি বাছা 'বাবা বললেন' বেশ, আর করিস নে, একটুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর আবার শব্দ শুরু হল—আগের চেয়ে আরো বেশী। 'যা বলছি, তা না শুনিস তো', বললেন বাবা, 'হাঁ করবার আগেই শয্যা নিতে হবে।' যাতে কথা শোনে তারজন্য ছেলেকে ধরে একটা ঝাঁকানি দিলেন, আর এমন খুট্‌খুট্ শব্দ শুরু হল যা কস্মিনকালেও কেউ শোনে নি। 'পোড়া কপাল আমার, ব্যাপারটা তো ছোকরার ভেতরে, ওর বে-জায়গায় ঘুংরি কাশি হয়েছে দেখছি!' বাবা বললেন। 'না, বাবা কাশি নয়, সেই হারটা' —বলেই কাঁদতে শুরু করল, 'ওটা আমি গিলে ফেলেছি, বাবা।' বাবা ছেলেকে তুলে নিয়ে ছুটলেন হাসপাতালে; ঝাঁকানি লেগে সারা পথ দানাগুলো ছেলেটার পেটের ভেতরে খুট্‌খুট্ শব্দ করতে লাগল; আর কোত্থেকে এই অদ্ভুত শব্দ আসছে তা দেখবার জন্য লোকগুলো একবার ওপরের দিকে আবার নিচের কুঠুরির দিকে তাকাতে লাগল। জ্যাক হপ্‌কিন্‌স্ বলল, 'ও এখন হাসপাতালে আছে, আর হেঁটে বেড়াবার সময় এমন অদ্ভুত শব্দ করছে যে পাছে রোগীদের জাগিয়ে ফেলে এই ভয়ে পাহারাওলার কোট দিয়ে ওকে জড়িয়ে রাখা হয়েছে।'

উনিশ শতকের যে-কোনো কমিক কাগজেই এরকম গল্প বেরুতে পারত। কিন্তু আর কেউ বা ভাবতেও পারত না সেই সংশয়াতীত ডিকেন্সীয় 'স্পর্শটি' হল—সেই ঝলসানো ভেড়ার মাংস ও তার আলু। এতে গল্পটাকে কী করে এগিয়ে দেয়? উত্তর—দেয় না। এ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। অপ্রয়োজনীয়, পৃষ্ঠার ধারে ফুল-আঁকা ছোট্ট লিপিচিত্র (squiggle)। ঠিক এই সব লিপিচিত্র দিয়েই বিশেষ ডিকেন্সীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। লক্ষ্য করবার মতো আরেকটি বিষয় হল যে, গল্প বলতে ডিকেন্সের বেশ সময় লাগে। এর একটা চমৎকার উদাহরণ হল পিকউইক পেপারস্-এর ৪৫-র অধ্যায়ে একগুয়ে রোগী সম্বন্ধে স্যাম ওয়েলার-এর কাহিনীটি। এটা উদ্ধৃত করতে অনেকটা সময় দরকার। ব্যাপারটা হল, এখানে তুলনার একটা মান পাওয়া যায়, কারণ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ডিকেন্স গ্রেফ চুরি করছেন। গল্পটা কোনো প্রাচীন গ্রীক লেখকও বলেছেন। এখন সে লেখাটা খুঁজে পাচ্ছিনে, কিন্তু বহু বছর আগে ওটা আমি পড়েছিলাম, তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম। গল্পটা অনেকটা এই ধরণের:

"এক যে ছিল থ্রেসবাসী—নামজাদা একগুঁয়ে; তার ডাক্তার তাকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন এক হাঁড়ি মদ খেলে সে মারা যাবে। সেই থ্রেসবাসী তখনই এক হাঁড়ি মদ খেল, আর বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেল। 'কারণ,' সে বলল, 'আমি এমনি করেই প্রমাণ করব যে মদ-খেয়ে আমার মৃত্যু হয় নি।'"

এই হল সমস্ত গল্পটা—প্রায় ছ'লাইন গ্রীক। লেখক অমনি করেই গল্পটি বলেছেন। এটা বলতে গিয়ে স্যাম ওয়েলার-এর লেগেছে কম-বেশি হাজার শব্দ। মূল বিষয়ে পৌঁছাবার অনেক আগেই তিনি শোনালেন আমাদের রোগীর পোষাক-আশাক, আহার-বিহারের কথা। এমন কি সে যে খবরের কাগজ পড়ে তাও। বলা হল ডাক্তারের গাড়ির অদ্ভুত গড়নের কথা, তাতে চাপা পড়ল এই তথ্যটি যে,

কোচোয়ানের পাজামা তার কোটের সঙ্গে খাপ খায় না। এর পর আছে ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে আলাপ। "রোগী বলল, 'ক্র্যাম্‌পেট পিঠে, স্যার, বেশ উপকারী।' ডাক্তার উগ্রভাবে বললেন, 'না মশাই, ক্রাম্পেট উপকারী নয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীটি খুটিনাটির তলায় চাপা পড়ে গেল। আর ডিকেন্সের বৈশিষ্ট্য যে রচনাংশে সব চেয়ে পরিস্ফুট তা সবই এই রকমের। এক প্রকার আগাছার মতো তার কল্পনা সব-কিছুই আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্কুয়ার্জ (Squeers) ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করতে দাঁড়ায়, আর আমরা শুনতে থাকি বোলডার-এর (Bolder) বাবার কথা—যিনি ছিলেন দু'পাউণ্ড দশ আউন্স ওজনে কম; আর মব্‌স্-এর (Mobbs) মায়ের কথা—যিনি মব্‌স্ স্নেহপদার্থ খেতে চায় না বলে শয্যা নিয়েছেন এবং আশা করছেন মিঃ স্কুয়ার্জ বেত মেরে তার মেজাজ নরম করবে। মিসিস লিও হাণ্টার (Mrs. Leo Hunter) একটি কবিতা লিখলেন, 'মুমূর্ষু-দর্শন'; তার দুটো পুরো স্তবক দেওয়া হল। বফিন-এর খেয়াল হল কৃপণ বলে নিজেকে জাহির করবে, আর অমনি আমাদের সামনে হাজির করা হল ১৮শ শতকের কৃপণদের বিশ্রী দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবন-কথা; তার সঙ্গে রইল ভালচার হপকিন্‌স্ (Vulture Hopkins) ও রেভরেণ্ড ব্লবেরি জোন্‌স্-এর মতো সব নাম আর 'দ্য স্টোরি অব্ দ্য মটন পাইজ' ও 'দ্য ট্রেজার্স-অব দ্য ডং হিল'-এর (The Story of the Mutton Pies' & "The Treasures of the Dunghill') মতো অধ্যায়ের শিরোনাম। মিসিস্ হ্যারিস-এর অস্তিত্বই নেই, কিন্তু একটা সাধারণ উপন্যাসে তিনটি চরিত্রের চেয়েও তাঁর খুটিনাটি বিবরণ অনেক বেশি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা বাক্যের মাঝখানে আমরা এটুকু মাত্র জানতে পাই যে, তার শিশু ভাগনেকে গ্রীনউইচ-এর মেলায় একটা বোতলের ভেতরে দেখতে পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আছে আরক্ত-নয়না মহিলা, প্রুশীয় বামন আর জ্যান্ত কঙ্কাল। জো গার্জারি (Joe Gargery) বর্ণনা করছে কী করে ডাকাতরা শস্য ও বীজের ব্যবসায়ী পম্বল-চুক-এর (Pumble-chook) বাড়ি ভেঙে সেখানে ঢুকেছে, তার টাকা-কড়ি রাখার দেরাজ, তার ক্যাস-বাক্স নিয়ে গেছে, তার মদ খেয়েছে, তার Wittles-এর ভাগ নিয়েছে, আর গালে চড় মেরে, নাক মলে দিয়ে, খাটের ডাণ্ডার সঙ্গে তাঁকে বেঁধে ডজনখানেক ঘা দিয়েছে, আর যাতে চেঁচাতে না পারে তার জন্য মুখে ফুল গাছের চারা ভর্তি করে দিয়েছে।" আবার সেই সংশয়াতীত ডিকেন্সীয় স্পর্শ, ফুলন্ত গাছ; কিন্তু অন্য যে-কোনো ঔপন্যাসিক এই জুলুমের অর্ধেক মাত্র উল্লেখ করতেন। সবকিছু, খুঁটিনাটির ওপরে খুঁটিনাটি, কশিদার ওপরে কশিদা—থরে থরে সাজানো। এরকম কাজকে অলংকার-বাহুল্য (rococo) বলে আপত্তি জানানো বৃথা-বিয়েতে কেক্-এর আয়োজনে আপত্তি জানানো যেমন নিষ্ফল। হয় আপনাদের ভালো লাগল, নয় তো না-ই লাগল। ১৯শ শতকের অন্যান্য লেখক—স্যারটিজ ব্যার্‌হাম, থ্যাকারে, এমন কি ম্যারিয়ট-(Surtees, Barham, Thackeray, even Marrayat) এরও ডিকেন্সের এই প্রাচুর্য—উপচে-পড়া বাহুল্যগুণ আছে, কিন্তু কারো অতটা নেই। এসব লেখকের আবেদন আজ নির্ভর করে কিছুটা যুগ-রসের (period-flavour) ওপর, আর যদিও ম্যারিয়ট আজও officially শিশু দর লেখক এবং ম্যারিটিজ শিকারীদের কাছে পৌরাণিক খ্যাতি লাভ করেছে, তবু সম্ভবত তাদের রচনা পুথিগত-প্রাণ লোকেরাই পড়ে থাকে।

তাৎপর্যের বিষয় যে, ডিকেন্সের সবচেয়ে সার্থক বই (সব-সেরা বই নয়) হল 'দ্য পিক-উইক পেপারজ্' (The Pickwick Papers), 'হার্ড টাইম্‌জ্' ও 'অ্যা টেল অব টু সিটিজ্'। এ গুলোর মধ্যে 'পিকউইক পেপারজ্' উপন্যাস

নয়, বাকীগুলো মজাদার নয়। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর প্রকৃতিগত উদ্ভাবনী শক্তি তাঁকে বাধা দিচ্ছে, কারণ অদ্ভুত-রসকে তিনি কখনো আটকে রাখতে পারেন না, ওটা সর্বদা বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়চে তারই মধ্যে যা হওয়া উচিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সন্ধিস্থল। এর সেরা দৃষ্টান্ত রয়েছে—গ্রেট এক্স্‌পেক্টেশান্‌স্-এর (Great Expectations) প্রারম্ভিক অধ্যায়ে। পলাতক দাগী ম্যাগউইচ (Magwitch) দু'বছরের পিপ-কে (Pip) গির্জা প্রাঙ্গনে সবে পাকড়েছে দৃশ্যটা পিপ-এর দৃষ্টি কোণ থেকে যথেষ্ট ভয়াবহ। দাগী অপরাধী কাদায় রুদ্ধশ্বাস, পায়ে তার শেকল ঝুলছে—কবরগুলোর মাঝে হঠাৎ আঁতকে উঠে শিশুটিকে জাপটে ধরল, উল্টে ফেলে তার পকেট মেরে দিল। তারপর যাতে খাবারও একটা রেত এনে সেয় তার জন্য তাকে ভয় দেখাতে লাগল:

আমার হাতদুটো ধরে আমাকে সে সোজা দাঁড় করালো পাথরটার ওপরে এবং সেই ভয়াবহ ভায়ায় বলতে লাগল—

"কাল খুব ভোরে আমাকে ঐ রেত ও wittles এনে দেবে। ঐ যে পুরাণো ব্যাটারি (Battery) দেখা যাচ্ছে—সব কিছু ওখানে নিয়ে আসবে। কাজটি করবে, কিন্তু আমার মতো কোনো লোককে দেখেছ একথা আকারে ইঙ্গিতে বলবার মতো সাহস যেন তোমার না হয়। তবেই প্রাণে বাঁচবে। যদি না করতে পার, আর আমার কথার এক চুলও নড়চড় কর, তা যতই তুচ্ছ হোক, তোমার কলজে ছিঁড়ে বার করে ঝলসে খাওয়া হবে। আর মনে কোরো না আমি একা; আমার সঙ্গে একটা যোয়ান ছেলে আছে, আর সেই সন্তানের তুলনায় আমি সাক্ষাৎ দেবদূত (Angel)। আমার কথা ঐ জোয়ান ছেলেটি শুনতে পাচ্ছে। আর তার এমন গুপ্ত কৌশল আছে যাতে একটা ছেলেকে, তার হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎকে সে ধরতে পারে। সেই যোয়ানের কাছ থেকে কোনো ছেলের লুকোবার চেষ্টা বৃথা। যে-কোন ছেলে দরজায় তালা লাগিয়ে, বিছানায় আরামে শুয়ে গুটিসুটি মেরে থাকতে পারে, মাথায় কাপড়-চোপর টেনে দিয়ে, আরামে ও নিরাপদে আছে মনে করতে পারে, সেই যোয়ানটি কিন্তু গুড়িগুড়ি তার কাছে গিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এই মুহূর্তে আমি সেই যোয়ান লোকটিকে আটকে রেখেছি, যাতে তোমার ক্ষতি না করতে পারে, কিন্তু খুব কষ্টে। তোমার ভেতরে যাতে সে না ঢুকতে পারে তেমনিভাবে তাকে ধরে রাখা ভারি শক্ত হয়ে উঠেছে। এবার তুমি কী বলতে চাও?"

এখানে ডিকেন্স প্রলোভনের কাছে হার মেনেছেন। শুরুতেই বসা যায়, নিরাহারী ও তাড়া খেয়ে কোনো লোক আদৌ ও রকমভাবে কথা বলবে না। আরও, ঐ শিশুমন কী ধারায় কাজ করে এ কথা থেকে তার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পরে যা ঘটতে যাচ্ছে তার সঙ্গে এর শব্দ-গুলির আদৌ সঙ্গতি নেই। এতে ম্যাগউইচ (Magwitch) মূক শয়তান খুড়াতে পরিণত হয়েছে, অথবা শিশুর চোখে দেখলে, ভয়াবহ দৈত্যের রূপ নিয়েছে। বইটাতে পরে আর এ দুটি রূপের একটিতেও তাকে আর দেখানো হবে না; আর অতিবাঞ্ছিত কৃতজ্ঞতা—যার ওপরে কাহিনীটি (plot) আপতিত হচ্ছে—অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়াবে; এই কথাবার্তাই তার কারণ। ডিকেন্সের কল্পনা তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছে, সচরাচর যেমনটি হয়ে থাকে। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এমন বর্ণাঢ্য যে, একে ছেঁটে ফেলা যায় না। ম্যাগ্‌উইচ-এর চেয়ে যে-সব চরিত্র আরো সু-সঙ্গত তাদের বেলাও কোনো আকর্ষণীয় বাক্যাংশে প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর পদস্খলন ঘটতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গণিতের একটি দারুণ অংক দিয়ে প্রতিদিন সকালে ডেভিড কপারফিল্‌ড্-এর লেখা-পড়া শেষ করাই মিঃ মার্ড স্টোন-এর (Mr. Murdstone) অভ্যাস। অংকটা সব সময়ই এইভাবে শুরু হয়: 'যদি পনীর-বিক্রেতার দোকানে যাই,

সাড়ে চার পেন্স দরে পাঁচ হাজার ডবল-গ্লোস্টার পনীর কিনি আর দাম দিই—"। আর একবার ডিকেন্সের বিশিষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা—ডবল-গ্লোস্টার পনীরের টুকরো-গুলি। কিন্তু মার্ডস্টোনের তুলনায় সহৃদয়তার স্পর্শ এতে ঢের বেশী; সে ওর থেকে পাঁচ হাজার নগদ টাকা করতে পারত। যতবার এ-সুর ধ্বনিত হয়েছে ততবারই উপন্যাসের ঐক্য ব্যাহত হয়েছে। এতে যে খুব বেশী কিছু এসে যায় তা নয়, কারণ ডিকেন্স স্পষ্টতই এমন লেখক যাঁর সমগ্র রচনার চেয়ে রচনাংশগুলিই মহত্তর। তাঁর সবটাই যেন খণ্ডখণ্ড, খুটিনাটি—ভাঙাচোরা স্থাপত্যবিশেষ, কিন্তু ছাদের পাইপের অদ্ভুত সিংহমুখ—আর যখন তিনি এমন চরিত্র রচনা করতে থাকেন যে পরে বেখাপ্পা আচরণ করতে বাধ্য তখনই তিনি সবার সেরা।

অবশ্য ডিকেন্সের বিরুদ্ধে সরচাচর এমন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না যে তিনি তাঁর চরিত্রগুলোকে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণে বাধ্য করেন। সাধারণত তাঁর বিরুদ্ধে এর উল্টো কাজের অভিযোগই করা হয়। তাঁর চরিত্রগুলোকে নিছক 'টাইপ' বলেই মনে করা হয়—প্রত্যেকটি চরিত্র এক-একটি বিশেষ গুণ বা ধর্মের স্থূল প্রতিনিধিত্ব করছে, আর এমন পরিচয়-পত্র বহন করছে যা দিয়ে আপনি তাঁকে চিনতে পারেন। ডিকেন্স "একজন ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী মাত্র"—এটাই সাধারণ অভিযোগ, আর এ-দ্বারা তাঁর প্রতি অপেক্ষাকৃত কম ও বেশী ন্যায়-বিচার করা হয়েছে। শুরুতেই বলতে হয়, তিনি কখনো নিজেকে ব্যঙ্গচিত্রের শিল্পী মনে করতেন না, এবং যে-চরিত্রগুলোর নিছক নিষ্ক্রিয় হওয়া উচিত ছিল তাদেরই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। স্কুয়ার্জ, মিকৌবার (Micawber), মিস্ মৌচ্যার (Mis Mowcher), ওয়েগ (Wegg), স্কিম্পল্ (Skimpole), পেকস্নিফ (Pecksniff) এবং আরো অনেক চরিত্র শেষ পর্যন্ত প্লটের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে—যেখানে তাদের সত্যিকার ঠাঁই নেই এবং যেখানে তারা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য আচরণ করেছে। তাদের শুরু ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড হিসেবে, তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রে জড়িত হয়ে তাদের শেষ বা পরিণতি। কখনো একটিমাত্র বাক্যে আঙুল ছোঁয়াতেই মূল মায়া ছবিটি নষ্ট হয়ে যায়। ডেভিড কপারফিল্ড-এ এরকম একটি বাক্য আছে। বিখ্যাত ভোজ-সভার শেষে (যাতে ভেড়ার ঠ্যাং কম সিদ্ধ হয়েছিল) ডেভিড তার অতিথিদের বিদায়ের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। সে সিঁড়ির ওপরে ট্র্যাডল্স্কে থামিয়ে ধরে বলল:

'ট্র্যাডল্স্,' আমি বললাম, 'মিঃ মিকৌবার কোনো ক্ষতি করতে চায় নি, আহা বেচারা! কিন্তু আমি যদি তুমি হতাম, তবে আমি তাকে কিছুই ধার দিতাম না।'

"প্রিয় কপারফিল্ড, ধার দেবার মতো আমার কিছুই নেই।"

"আমি বললাম, জান তো, তোমার নাম আছে।"

মন্তব্যটা যেখানে আছে সেখানে ওটা একটু বেসুরো ঠেকে, যদিও আগে বা পরে ওরকম কিছু আসতে বাধ্য। কাহিনীটি মোটামুটি বাস্তব-ঘেঁষা, আর ডেভিডও বড় হয়ে উঠছে; শেষ পর্যন্ত মিঃ মিকৌবার যে একটি ভিখারী বদমাস তা সে নিশ্চিত দেখতে পেত। পরে অবশ্য ডিকেন্সের ভাবালুতা (sentimentality) তাঁকে অভিভূত করে ফেলে আর মিকৌবারকে তিনি নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তখন থেকে মূল মিকৌবার আর ঠিক ফিরে পাইনে,—আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পাইনে। সাধারণত ডিকেন্সের চরিত্রগুলো যে 'প্লটের' সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে তাকে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করা যায় না। কিন্তু বাস্তবের ভাণ অন্তত সেখানে রয়েছে, পক্ষান্তরে চরিত্রগুলো যে-দুনিয়ার অধিবাসী সে-দেশ হেথা নয়—নিরবধি কালে তার স্থিতি। কিন্তু ঠিক এখানেই দেখা যায় যে, 'নিছক ব্যঙ্গচিত্রী' বস্তুত নিন্দনীয় নয়। ডিকেন্সের প্রতিভার অব্যভিচারী লক্ষণ হয়,

লক্ষণ হল, তাঁকে চিরকাল ব্যঙ্গ শিল্পী মনে করা হয়, যদিও তিনি অন্যতর রূপে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা সর্বদাই করে গেছেন। তিনি যে-সব উদ্ভট অতিকায় চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, সম্ভাব্য মেলোড্রামার সঙ্গে মিশে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো তাদের সেই উদ্ভট অতিকায় চরিত্ররূপেই স্মরণ করা হয়। তাদের প্রথম ছাপটা এতই সুস্পষ্ট যে, পরে যাই ঘটুক না কেন, সে ছাপটাকে আর মুছে ফেলতে পারে না। যেমন ছেলেবেলায় যাদেরকে জানা হয়েছে তাদের কে সেই বিশেষ ভঙ্গিতে সেই কর্মে নিরত বলেই লোকে চিরকাল মনে রাখে যেন। মিসিস্ স্কুরার্জ চিরকাল হাতা দিয়ে গন্ধক আর গুড় নাড়ছে, মিসিস্ গামিজ (Mrs. Gummidge) সর্বদাই কাঁদছে, মিসিস্ গার্জারি (Mrs. Gargery) সর্বদা তার স্বামীর মাথাটা দেয়ালে ঠুকছে, মিসিস জেলিবি (Mrs. Jellyby) চিরদিন খস্ খস্ করে প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছে, আর তার ছেলেমেয়েরা তার মধ্যে এসে পড়ছে—আর তারা সবাই নস্যির কৌটোর ঢাকনার ওপরে ছোট্ট অ-অলে মিনিয়েচার-এর মতো আঁকা হয়ে স্থির অচঞ্চল হয়ে আছে—সম্পূর্ণ আজগবি ও অবিশ্বাস্য তবু গুরুগম্ভীর ঔপন্যাসিকদের কর্মপ্রয়াসের তুলনায় ঢের বেশী পাকা (solid) এবং হাজার গুণ স্মরণীয়। এমন কি, তাঁর নিজের যুগের মান অনুসারেও ডিকেন্স ছিলেন একান্ত কৃত্রিম লেখক। রাসকিন বলেছেন, 'মঞ্চের উত্তেজনা-চক্রের মাঝেই কাজ করা তিনি পছন্দ করতেন।' স্মলেট-এর (Smollett) তুলনায় তাঁর চরিত্রগুলো আরো বিকৃত এবং সরলীকৃত। কিন্তু উপন্যাস-লেখার তো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আর শিল্পকর্মের যাচাই করতে একটি মাত্র নিকষেরই প্রয়োজন সে-টি হল—কালোত্তরণ। এ পরীক্ষায় ডিকেন্সের চরিত্রগুলো উত্তীর্ণ—যদিচ যাঁরা এদের মনে রেখেছেন তাঁরাও কদাচ এদের 'মানব' বলে মনে করেন। ওরা অতিকায় দানব, তবু দিব্যি জীয়ে-বর্তে আছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দানবদের সম্বন্ধে লেখার একটা অসুবিধা আছে। তা হলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, ডিকেন্স শুধু কয়েকটি মেজাজের কাছে তাঁর কথা বলতে পারেন। মানব-মনের এমন অনেক বিভাগ আছে যাকে তিনি কখনো স্পর্শ করেন নি। তার বইগুলোর কোথাও কাব্যানুভূতি নেই, নেই খাঁটি ট্রাজেডি, এমন কি নরনারীর কামও তাঁর ভাবনার বাইরে। তার বইগুলোকে কখনো কাম-বর্জিত বলে ঘোষণা করা হয়, প্রকৃত পক্ষে ওগুলো তেমন কাম-বর্জিত নয়। আর যে-যুগে তিনি লিখতেন সে-যুগের কথা বিবেচনা করলে তিনি বেশ দিলখোলা ও স্পষ্টভাষী। কিন্তু ম্যানন লেসকট (Menon Lescaut), সালাম্বো (Salambo) কারমেন (Carmen) উদারিং হাইট্স্-এ (Wuthering Heights) যে-অনুভূতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার লেশমাত্রও তাঁর লেখায় নেই। অলডাস হাক্স্লির মতে ডি. এইচ লরেন্স একবার বলেছিলেন ব্যালজাক (Balzac) ছিলেন 'এক বিরাট বামন,' আর এক অর্থে-সে উক্তি ডিকেন্সের বেলা সত্য। এমন জগৎ আছে যার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না অথবা উল্লেখমাত্র করতে চান না। ঘুরপথে ছাড়া ডিকেন্সের থেকে বেশি কিছুই জানা যায় না। আর, একথা বলতে গিয়ে প্রায় তখনই ১৯শ শতকের বড় বড় রুশ উপন্যাসিকদের কথা ভাবতে হয়। ডিকেন্সের চেয়ে টলস্টয়ের ধারণা-শক্তিকে বড় বলে মনে হয় কেন? কেনই বা মনে হয় তিনি আপনাদের সম্বন্ধে এত বেশী কথা বলবার সামর্থ্য রাখেন। তিনি যে বেশী প্রতিভাবান বা চরম বিচারে বেশী বুদ্ধিমান তা নয়। এর কারণ, তিনি লিখছেন তাদেরই সম্বন্ধে যারা বেড়ে উঠছে, পরিণতি লাভ করছে। তাঁর চরিত্রগুলো আত্ম-সৃষ্টির জন্য যুঝছে, আর ডিকেন্সের চরিত্রগুলো প্রবাহে পরিণত ও নিখুঁত। আমার মনে হয়, ডিকেন্সের চরিত্রগুলো টলস্টয়ের চেয়ে অনেক বেশী সময়, বেশী স্পষ্ট রূপে উপস্থিত, কিন্তু

ছবি বা আসবাবের মতো সর্বদা এক অপরিবর্তনীয় ভঙ্গিতে। ধরুন পিটার বিজুকফ-এর সঙ্গে কল্পনায় কথা বলছেন, ডিকেন্সের কোনো চরিত্রের সঙ্গে তেমনটা পারেন না। আর এই না-পারার কারণ শুধু এটাই নয় যে টলস্টয়ের ঐকান্তিকতা বেশী, যেহেতু কল্পনায় কথা বলতে পারেন এমন কমিক চরিত্রও আছে—যেমন ব্লুম (Bloom), বা পিক্যুচেট (Pecuchet), এমন কি ওয়েল্‌স্-এর মিঃ পলি (Mr. Polly)। ডিকেন্সের চরিত্রের মানসিক জীবন নেই, এই কারণেই আপনারা কল্পনায় তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন না। তাদের যা বলার তা নিখুঁত ভাবেই তারা বলে, কিন্তু আর কোনো বিষয়ে তারা কথা বলছে এমনটা ধারণা করা যায় না। তারা কখনো শেখে না, কখনো জল্পনা-কল্পনা করে না। সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে চিন্তাপ্রবণ চরিত্র হল পল ডম্বি (Paul Daumby) আর তার ভাবনাগুলো সবই খিচুড়িপাকানো। তবে কি মনে করতে হবে টলস্টয়ের উপন্যাসগুলো ডিকেন্সের তুলনায় 'ভালো'? সত্য বলতে, 'ভাল ও 'মন্দর' মানদণ্ডে এমনতর তুলনা করা বাতুলতা। ডিকেন্সের সঙ্গে টলস্টয়ের তুলনা যদি করতেই হয়, তবে আমি বলব সুদূর ভবিষ্যতে টলস্টয়ের আবেদন হয়ত ব্যাপকতর হবে, কারণ ইংরাজি-ভাষী সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের বাইরে ডিকেন্সকে কম লোকেই বোঝে, অপরপক্ষে ডিকেন্স সরল সাধারণ লোকের হৃদয়-দ্বারে পৌঁছতে পারেন, টলস্টয়ই পারেন না। টলস্টয়ের চরিত্রগুলো সীমান্ত পার হয়ে যেতে পারে, ডিকেন্সের চরিত্রগুলো একটি ছোট্ট সিগারেট কার্ডের ওপরে আঁকা হতে পারে। কিন্তু চাটনি ও পোলাপের মধ্যে যেমন পছন্দ করা চলে না তেমনি দুজনের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যেও কোন্‌টি মনোমত তার বিচার করতেও কেউ বাধ্য নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য পরস্পর-ছেদী নয় বলা চলে।

৬

ডিকেন্স যদি শুধুই কমিক লেখক হতেন, তাঁর নাম বোধ হয় আজ আর কেউ স্মরণ করত না। অথবা ভিক্‌টোরীয় পরিবেশের অপ্রীতিকর জের হিসেবে ফ্র্যাঙ্ক ফেয়ারলে (Fank Fairleigh), মিঃ ভ্যারডাণ্ট গ্রীন (Mr. Verdant Green) ও মিসিস কডল্‌স্ কার্টেন লেকচারস্ (Mrs. Candles Curtain Lectures) যেমন করে টিকে আছে তেমনি করে বড়জোর কয়েকখানা বইও টিকে থাকত। ডিকেন্স যে লিট্‌ল্ ডরিট ও হার্ড টাইম্‌জ এর মতো বই লেখার জন্য পিকউকর-এর ধারা বর্জন করেছিলেন এজন্য কে না কখনো-সখনো বেদনা বোধ করেছেন? জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের কাছে লোকে যা দাবি করে তা হল—তিনি ফিরে ফিরে সেই একই বই লিখবেন; তাঁরা ভুলে যান যে, একই বই যিনি দুবার লেখেন তিনি সে বই একবারও লিখতে পারতেন না। যে-লেখক নিতান্ত-প্রাণহীন তিনি একরকম অধিবৃত্তের পথ ধরে চলেন এবং নিচের বাঁকা অংশটা ওপরের বাঁকা অংশেই নিহিত থাকে? জয়েস-কে (Joyce) ডাবলিনার্স-এর (Dubliners) আবেগহীন নিরস দক্ষতা নিয়ে শুরু করতে আর ফিনাগান্‌জ্ ওয়েক-এর (Finnegans Wake) স্বপ্নময় ভাষা দিয়ে শেষ করতে হয়, কিন্তু য়ুলিসিস্ (Ulysis) ও পোট্রেট অব্ দি আর্টিস্ট (Portrait of the Artist) হল ট্র্যাজিকটবির অংশ। ডিকেন্স নীতিবাদী ছিলেন তাঁর কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে' এই চেতনা তাঁর ছিল। এতেই তাঁকে চালিত করেছিল এমন এক শিল্পরূপ রচনায় যার প্রকৃত যোগ্যতা তাঁর ছিল, আর তার জন্য আমরা তাঁকে মনে রাখতে বাধ্য হয়েছি। তিনি সর্বদা কোনো উপদেশ-বাণী প্রচার করছেন, আর তা-ই হল তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার চরম রহস্য। কারণ, সৃষ্টির আগ্রহ থাকলে তবেই সৃষ্টি করা যায়। মজা করা যায় এমন কিছু খুঁজে বেড়ায় যে ফালতো বা ভাড়াটে লেখক সে সুরার্জ ও

মিকৌবরে-এর মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না। যা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা যায় এমন তামাসার পেছনে সর্বদাই কোনো বিশেষ 'ভাব' থাকে। কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন বলেই ডিকেন্স মজাদার হতে পারেন, আর উপহাস করবার মতো কর্তৃপক্ষ চিরকালই আছে। আরেকটা বেশী মিষ্টি পিঠের যায়গা পেটে সর্বদাই হয়ে থাকে।

ডিকেন্সের সংস্কারবাদ নিতান্ত অস্পষ্ট ধরণের, তবু সবাই জানে ওটা আছেই। নীতিবাদী হওয়া আর রাজনীতিক হওয়া—এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ ঐখানেই। গঠনমূলক কোনো ইঙ্গিত তাঁর নেই, তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য যে-সমাজ তার প্রকৃতি সম্বন্ধেও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর নেই, আছে শুধু এই অনুভূতি যে কোথাও কিছু একটা গলদ বা অন্যায় আছে। শেষ পর্যন্ত যে-কথা তিনি বলতে পারেন তা হল —"সুষ্ঠু শালীন আচরণ করুন,' আর ও-কথা শুনতে যতটা খেলো বা হাল্‌কা, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। আকারে ইঙ্গিতে কথাটা আমি আগেই বলেছি, অধিকাংশ বিপ্লবী হল অ-ভব (potential) টোরি, কারণ তাঁরা কল্পনা করেন যে সমাজের চেহারা পালটে দিয়েই সব কিছু ঠিক করা যায়, একবার সে পরিবর্তন সাধিত হলে—কখনো হয়ও—আর পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন না। ডিকেন্সের এজাতীয় মানসিক স্থূলতা নেই। তার অসন্তোষের অস্পষ্টতাই এর স্থায়িত্বের লক্ষণ। এ-প্রতিষ্ঠান বা সে-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া নয়। তাঁর ঝগড়া, চেস্টারটন বলেন, মানব-মুখের প্রকাশ ভঙ্গির সঙ্গে। মোটামুটি বলতে গেলে, তাঁর নীতি হল খ্রীস্টান নীতি, কিন্তু অ্যাংলিকান আবহাওয়ায় লালিত হয়েও তিনি ছিলেন মূ-ত বাইবেল-খ্রীস্টান; তাঁর উইল লিখ্‌তে সে-কথা তিনি স্পষ্ট প্রকাশ কর্‌তে ত্রুটি করেন নি। যাই হোক, তাঁকে ঠিক ধার্মিক লোক বলা যায় না। তিনি যে ধর্ম-বিশ্বাসী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্ম বলতে যদি প্রার্থনা বোঝায় তবে তাঁর চিন্তায় তা যথেষ্ট প্রবেশ করে নি বলেই মনে হয়। খানিকটা সহজ প্রবৃত্তিবশে তিনি যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পক্ষাবলম্বন করতেন তাতেই তিনি খ্রীস্টান। স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র সর্বদা তিনি ছিলেন 'তলার মানুষের' (under-dog) পক্ষে। একে যুক্তিসিদ্ধ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে তলার মানুষ যখন উচ্চকোটির মানুষ হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে পক্ষ পরিবর্তন করতে হয়, আর বস্তুত ডিকেন্সের ঝোঁকটা সেই দিকেই ছিল। যেমন, তিনি ক্যাথলিক ধর্ম-সম্প্রদায়কে ঘৃণা করতেন, কিন্তু যেই ক্যাথলিকরা নির্যাতিত হয়েছে (বার্নাবি-রাজ—Barnaby Rudge) সেই তিনি তাদের পক্ষে চলে গেছেন। অভিজাতদের তিনি আরো বেশী ঘৃণা করতেন, কিন্তু যেই তারা ক্ষমতাচ্যুত হল (অ্যা টেল অব টু সিটিজ্‌, এ বিপ্লব সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলো) সেই তার সহানুভূতি ঘুরে গেল তাদেরই দিকে। এই আবেগ-পূর্ণ মনোভঙ্গি থেকে যখনই তিনি বিচ্যুত হয়েছেন তখনই তিনি বিপথগামী হয়েছেন। এর একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত ডেভিড কপারফিল্ড-এর শেষে দেখা যায়। যিনি-ই তা পড়েছেন তিনিই অনুভব করেছেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। আর গোলযোগ যা ঘটেছে তা হল এই যে, শেষের অধ্যায়-গুলোর সর্বত্র সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে সাফল্য-ভজনা সঞ্চারিত হয়ে আছে। ওটা ডিকেন্সের নজিরে বেদবাক্য নয়, তার পরিবর্তে স্মাইল্‌স-এর নজিরে বেদবাক্য। আকর্ষণীয় জীর্ণবাস চরিত্রগুলোকে বাতিল করা হয়েছে, মিকওবার বিত্তবান হয়ে উঠেছে, হীপ জেলে গেছে—এ দুটো ঘটনাই একান্ত অসম্ভব—আর ডোরাকে হত্যা করে সরিয়ে দিয়ে অ্যাগনিস-এর পথ করে দেওয়া হয়েছে। ভালো লাগে তো ডোরাকে ডিকেন্সের স্ত্রীরূপে আর অ্যাগনিসকে তার শ্যালিকারূপে আপনারা মনে করতে পারেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হল ডিকেন্স ভদ্র-ভব্য হয়ে উঠেছেন এবং 'স্ব-ভাবের' ওপর জুলুম করেছেন। হয়ত এই কারণেই

তার নায়িকাদের মধ্যে অ্যাগনিস-ই হল সবচেয়ে অপ্রীতিকর, ভিক্টোরীয় রোমান্সে যথার্থ অবান্তর নিষ্পাপ চরিত্র (legless angel), থ্যাকারের লরা-র মতোই বাজে।

কোনো প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকই ডিকেন্স পড়ে তাঁর সামর্থের সীমা সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে পারেন না। তবু তাঁর মনের সহজ ঔদার্য্য থেকেই যায়, আর তাই এক রকম নোঙরের কাজ করে এবং প্রায় সর্বক্ষণই তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে ধরে রাখে। সম্ভবত তাঁর জনপ্রিয়তার কেন্দ্রগত রহস্য হয়ত এটাই। অনেকটা ডিকেন্সের anti-monianism-এর ধাঁচের খুশ-মেজাজী নীতি-বিরোধের ভাবই হল পাশ্চাত্য লোকায়ত সংস্কৃতির একটা লক্ষণ। লোক-কাহিনী ও কমিক গানে এটাই দেখতে পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায় মিকি মাউজ (Micky Mouse) ও পপ-আই দ্য সেইলার এর (Pop-eye the Sailor) মতো স্বপ্ন-সৃষ্ট। চরিত্রে (dream-figure), মজুরশ্রেণীর সমাজবাদের ইতিহাসে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদে (সর্বদা নিষ্ফল কিন্তু সর্বদা মিথ্যা নয়) বড়লোকের মোটর পরিবকে চাপা দিলে ছুড়ি অত্যধিক ক্ষতিপূরণের রায় দেন যে প্রবৃত্তিবশে সেই প্রবৃত্তিতে। এটা হল সর্বদা 'তলার মানুষের,' সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের পক্ষাবলম্বনের মনোভাব। এক অর্থে এটা হল ৫০ বছর পূর্বেকার অনুভূতি। সাধারণ লোক এখনো ডিকেন্সের মনোলোকে জীয়ে আছে, কিন্তু প্রায় প্রতিটি আধুনিক বুদ্ধিজীবী কোনো না কোনো রকমের সামগ্রিক-বাদের (totalitarianism) পক্ষে চলে গেছে। ডিকেন্স যা কিছু সমর্থন করেন তার সবই মার্কসবাদী বা ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বুর্জোয়া নীতিবাদ বলে বাতিল করা যায়। কিন্তু নৈতিক মনোভাবে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে বেশী 'বুর্জোয়া' আর কেউ নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাধারণ লোক মনের দিক থেকে কখনো বাস্তব-বাদের ও ক্ষমতার রাজনীতির (power-politics) দুনিয়ায় প্রবেশ করে নি। অবিলম্বে সে কাজ তারা করতে পারে, সেক্ষেত্রে ডিকেন্স ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতোই সেকেলে হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর নিজের যুগে এবং আমাদের কালে তিনি অনপ্রিয় ছিলেন, তার প্রধান কারণ তিনি সাধারণ লোকের সহজ শালীনতাকে কমিক, সরলীকৃত, অতএব স্মরণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই দৃষ্টি কোণ থেকে একান্ত বিভিন্ন জাতের লোককে "সাধারণ" বলা যায়। ইংলণ্ডের মতো দেশে শ্রেণী-বিন্যাস (class-struoture) থাকা সত্ত্বেও একপ্রকার সাংস্কৃতিক ঐক্য নিশ্চয়ই বর্তমান। সমস্ত খ্রীষ্টীয় যুগ ধরে, বিশেষত ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে পাশ্চাত্য জগৎকে স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণার ভূতে তাড়া করে চলেছে ; এটা একটা ধারণা মাত্র, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরেই এটা অনুপ্রবেশ করেছে। অতি জঘন্য অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা উন্নাসিকতা সর্বত্র বর্তমান, কিন্তু এসব জিনিসকে একজন রোমান দাস-মালিক (slave-owner) যে ঔদাসীন্যে দেখে তেমন ভাবে অতি অল্প লোকেই দেখে থাকে। এমন কি কোটিপতিও অস্পষ্ট ধরণের অপরাধ বোধে পীড়িত—চুরিকরা ভেড়ার ঠ্যাং খেতে কুকুরের যেমন পীড়া বোধ হয় এও তেমনি। প্রায় প্রত্যেকেই—তার প্রকৃত আচরণ যেমনই হোক—মানব সৌভ্রাত্র্যে আবেগের সঙ্গে সাড়া দেয়। ডিকেন্স এমন একটা নীতি-বিধান ঘোষণা করেছেন যা উল্লঙ্ঘনকারীরাও আজও মোটামুটি বিশ্বাস করে। নতুবা ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন শ্রমিকরা তাঁর লেখা পড়ে (তাঁর মতো উঁচুদরের আর কোনো ঔপন্যাসিকের বেলা এমনটা ঘটেনি) এবং তিনি ওয়েস্টমিনস্টার গির্জায় সমাধিলাভ করেন।

প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপমারা কোনো বই পড়লে তার পৃষ্ঠার পেছনে কোথাও একখানা মুখ দেখতে পাচ্ছি এমন ধারণা হয়। এটা যে লেখকেরই সত্যকার মুখ তা নাও হতে

পারে। স্যুইফ্‌ট, ডিফো, ফিল্‌ডিং, স্টেণ্ডহল, থ্যাকারে, ফ্লবার্ট-এর বেলা এটাই আমি প্রবলভাবে অনুভব করি —যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সব ব্যক্তি দেখতে কেমন ছিলেন তা জানি না এবং জানতে চাই না। যা দেখতে চাই তা হল এমন একখানা মুখ যা লেখকের হওয়া 'উচিত' ছিল। হাঁ' ডিকেন্সের বেলা আমি এমন একখানা মুখ দেখতে পাই, যা ঠিক ডিকেন্সের ফটোর মুখ নয়, কিন্তু তার অনুরূপ। প্রায় ৬০ বছর বয়সের এক ব্যক্তির মুখ-খানা— তাতে ছোট্ট দাড়ি আর চড়া রঙ্। তিনি হাসছেন, সে-হাসিতে ক্রোধের আমেজ আছে, কিন্তু বিজয়োল্লাসের ভাব নেই, নেই বিদ্বেষ। চিরকাল একটা কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন এমন এক ব্যক্তির মুখ, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে লড়াই করেন, আর ভয় পান না; এমন এক ব্যক্তির মুখ, যিনি ঔদার্য-বশেই ক্রুদ্ধ - অর্থাৎ ১৯শ শতকেরউদার-পন্থীর, মুক্ত-বুদ্ধির, সেই জাতের যাকে সর্বপ্রকার পূতিগন্ধময় সংকীর্ণ গোঁড়ামি সমানভাবে ঘৃণা করে; আর সেই সব গোঁড়ামিই এখন আমাদের চিত্ত অধিকারের জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। *

* জর্জ অরওয়েল-এর লেখা'ডিকেন্স' নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ। এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯৩৯ সালে বিগত বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৭·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

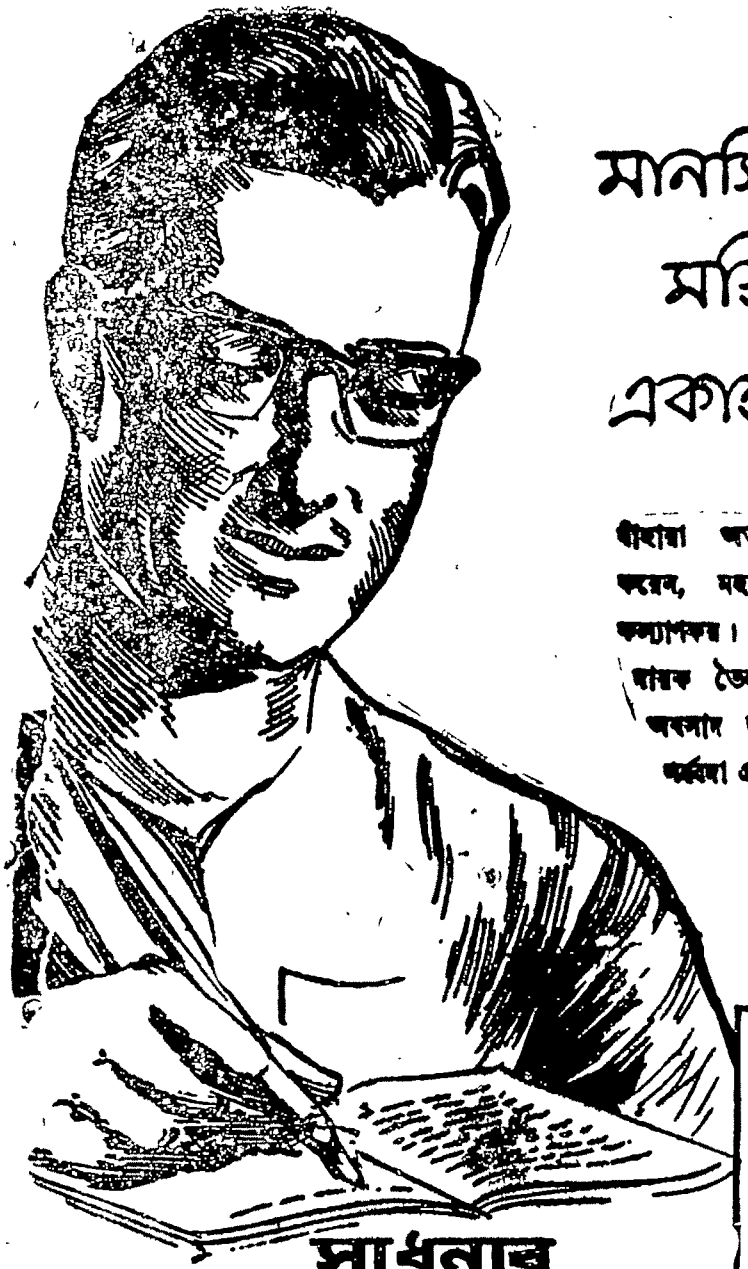

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আয়ু-বর্দ্ধক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

সাধনার

মহা ভৃঙ্গরাজ

তৈল

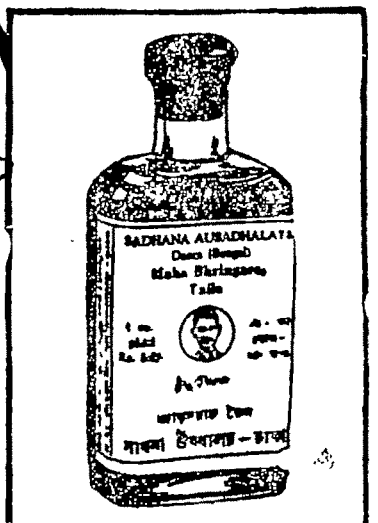

সাধনা ঔষধালয় লিমিটেড-চাকদহ

সাধনা ঔষধালয় হোড কলিকাতা-৫৮

কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম, বি, এস, (লণ্ডন) এম, বি, এস (আমেরিকা)
আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের মহান পাঠের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কবিপক্ষে কাব্যচিন্তা

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

পত্রাবলী

টমাস স্টার্নস এলিয়ট

১৮৮৮-১৯৬৫

এজরা পাউন্ডকে

মার্টন কলেজ, অক্সফোর্ড,

২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম, আমার হয়ে তুমি যা করছো তা তোমার দাক্ষিণ্য। 'মহিলা'র ('এক মহিলার পট' কবিতা) একটি কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। কালের ব্যবধানে যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা হল এর মধ্যে আরো দু'তিনজন মহিলার আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা এটি যদি কখনো ছাপা হয় ত এটির মডেল হিসেবে বসেছিলেন এমন দাবী করে পরস্পর লড়াই করবেন। আশা করি তুমি শুনে সুখী হবে যে আমি মহিলাটির কাছ থেকে একটি 'ক্রিসমাস' কার্ড পেয়েছি যাতে 'এই মহোৎসবের কালের এক বন্ধুর কাছ থেকে আর এক বন্ধুর প্রতি উচ্চকিত অভিনন্দন' রয়েছে। পুরনো দিনের মত মনে হচ্ছিল।

ডগমেটস পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমায় আবার ধন্যবাদ জানাই—আমার দেখা পরিবারগুলির মধ্যে সুন্দর'ম একটি পরিবারে আমি সুন্দরতম একটি বিকেল কাটিয়েছি। ঠিকই বলেছিলে—কথাবার্তা চালাতে অসুবিধে হবে না, এবং আমি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আশ্চর্য শিশুগুলির বন্ধু হতে পেরেছিলাম, তাদের আবার দেখার জন্যে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছি। নাচের ব্যাপারে বলি, (গৃহকর্তা ছাড়া) আমার মনে হয় সবাই প্রায় একঘণ্টা ধরে নেচেছিল আর আমি তন্ময় হয়ে বসেছিলাম। আমি লিউইসের সঙ্গে লেখালিখি করেছি, কিন্তু আমার প্রচারের ব্যাপারে মনে হয় তার শুচিবাই বাধা দিচ্ছে। আমার আশঙ্কা 'রাজা বোলো' এবং 'বড় কালো কুইন' কখনো ছাপা হবে না। আমি বুঝতে পারছি 'প্রারাপিজম,' 'নার্সিসিজম' ইত্যাদি মঞ্জুর করা হয় না, এবং এই নির্দোষ মিলটিকেও ডেকাডেন্ট মনে করা হয়:

.....pulled her stockings off
With a frightful cry of "Hauptbahnhof !!"

তোমার কিছু লেখা আমি সম্প্রতি পড়ছি। 'ভর্টেক্স' (বৃত্ত) এর ওপর লেখাটি আমার ভাল লেগেছে (দয়া করে জানাও ক্যানডিনস্কি কে)।

আমি সৌন্দর্যতত্ত্বকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করি যখন তা বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং শূন্যে বাষ্প হয়ে যায়, কিন্তু তুমি তা করো নি। আমার মনে হয় শিল্পীর নিজের প্রকরণসম্পর্কিত আলোচনার ওপর যত বেশি নজর দেওয়া যায় ততই ভালো, এবং যে শিল্প একজনের ভালো লাগে সেই শিল্প-সম্পর্কেই সে কথা বলতে পারে। আমার মতে চিন্তাশীল বা ইজিচেয়ার সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে কিছু নেই; যে কিছু করতে চলেছে তারই কেবল সৌন্দর্যতত্ত্ব থাকতে পারে। আমি ভয় করছিলাম পাছে তুমি আবার এটাকে বের্গসঁ বা জেমস বা অন্য কোন

দার্শনিকের কাছে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাও, কিন্তু ভর্টিসিজম (বৃত্তবাদ) যে কোন দর্শন নয় একথা জেনে আশ্বস্ত হলাম।

আশা করি তোমার কাজ ভালভাবে এগিয়ে চলেছে। আমি সম্ভবত মার্চ পর্যন্ত আবার সহরে থাকবো না। আশা করি ইয়েটস তখনো থাকবেন। আমার কথা শ্রীমতী পাউণ্ডকে জানিও।

ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স

১৮৮৫-১৯৩০

এডওয়ার্ড গার্নেটকে

(পোঃ) এবেমহয়সেম]

শুক্রবার, ১৭. ৪. ১৯১৩

আমি দুঃখিত যে কবিতাগুলি মাত্র ১০০ কপি বিক্রি হয়েছে। — ফ্রিডা দারুণ ক্ষুব্ধ। তোমার কি মনে হয় না ডাকওয়ার্থের মুদ্রাকর বা আর কেউ অত্যন্ত মন্থর? যদি কেউ চায় যে জিনিসগুলি গরম কেকের মত বিক্রি হোক তাহলে কেকগুলোর অবশ্যই গরম হওয়া উচিত। কিন্তু কবিতাগুলি কয়েকমাস পড়ে ছিল—'সন্স এ্যাণ্ড লাভার্স'ও সেইরকম পড়ে আছে। এর যেটুকু আকর্ষণ আছে তা ধীরে ধীরে উত্তাপ সঞ্চার করছে। এটা ভাল নয়—যদি এখন 'হ্যামলেট' ও 'ঈডিপাস' প্রকাশিত হত, তাহলে তারাও ১০০ কপির বেশি বিক্রি হত না যদি না সেগুলির জন্যে তদ্বির ('পুশ') করা হত: আমি জানি যতদিন আমার নাম না হয় ততদিন তার টাকার জন্যে ডাকওয়ার্থকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি বুঝেছি সে আমাকে এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু তার ভয় করার দরকার নেই। আমি জানি আমি ইংল্যাণ্ডের যে কোন লোকের চেয়ে বৃহত্তর জিনিস লিখতে পারি। এবং আমি যা পারি তাই আমাকে লিখতে হবে। আমি ডেভিড ও হ্যারলড শ্রেণীর লোকদের জন্যেই লিখি—তারা শিগ্রি আমার লেখা পড়বে। আমার কথাবস্তু তারা যা চায় তাই: যখন তারা জানতে পারবে তারা কী চায়। তুমি অপেক্ষা করে থাকো। ...আমি কি 'ফোরাম' পত্রিকার জন্যে কিছু কবিতা আর একটি গল্প পাঠাবো? ...আমার মনে হয় আমাদের এই চিঠিগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ। ফ্রিডা এত লম্বা চওড়া লেখে যে আমাকে গুটিয়ে ছোট করতে হয় নিজেকে। আমি খুব সংক্ষিপ্ত হতে পারি।...

অসকার ওয়াইল্ড্

১৮৫৪-১৯০০

স্তেফান মালার্মেকে

হোটেল ড লাখেনে (পারি)

বুধবার (পোষ্টমার্ক ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)

আপনি যে মধুর ভঙ্গিমায় ঐ মহৎ গদ্যসিম্ফনিটি—যা মহান কেলটিক কবি এডগার এ্যালান পোর প্রতিভানিঃসৃত সঙ্গীত দ্বারা অনুপ্রাণিত—আমাকে উপহার দিয়েছেন তার জন্যে কেমনভাবে আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত

জানি না। ইংল্যাণ্ডে আমাদের গদ্য এবং কবিতা আছে, কিন্তু ফরাসী গদ্য ও কবিতা আপনার মত প্রতিভাধরের হাতে এক এবং একই বস্তু হয়। 'ফনের অপরাহ্নে'র লেখককে জানার সুযোগ কারুর কাছে খুব আনন্দদায়ক না মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তার আবিষ্কারেই আপনার অবিস্মরণীয় সত্যতাকে জানা যায়।

অতএব, প্রিয় মাস্টার, আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

ডবলিউ. গ্রাহাম রবার্টসনকে

১৬ টাইট ষ্ট্রীট
(১৮৮৮?)

ছবিগুলোর জন্যে তোমায় ধন্যবাদ। আমার আনন্দের প্রকৃত উৎস ওগুলি। তুমি ফিরে আসার মধ্যেই আমি আশা করি গল্পটা শেষ করতে পারবো। আমার ইচ্ছে আমি যদি তোমার মত আঁকতে পারতাম, কারণ আমি শব্দের চেয়ে রেখা ও বাক্যের চেয়ে রং বেশি পছন্দ করি।

যাই হোক, 'বিশ্বকে' মাঝে মাঝে সনেটে বিধৃত করার চেষ্টা করে নিজেকে সান্ত্বনা দিই।

কোন একদিন তুমি নিশ্চয়ই সনেটের জন্যে একটা ছবি আঁকবে: একটি যুবক এক অদ্ভুত স্ফটিকের দিকে তাকিয়ে আছে যার মধ্যে সারা পৃথিবী প্রতিফলিত। কবিতাকে স্ফটিকের মত হতে হবে, এটা পৃথিবীকে আরো বেশি সুন্দর ও আরো কম বাস্তব করবে। তুমি চলে যাচ্ছো বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু তোমার নার্সিসাস তোমাকে আমার মনে গেঁথে রেখেছে।

তুমি তোমার বন্ধুদের তোমায় কী বলে ডাকতে দাও? "ডবলিউ"? বা "গ্রাহাম"? আমি চাই আমার বন্ধুরা আমায় বলুক অসকার।

জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স

১৮৪৪-৮৯

আর. ডবলিউ. নিক্সনকে

গ্রোসভেনর স্ক্যার, ডবলিউ
৫, অক্টোবর ১৮৭৮

...আপনি মিলটন সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় তা দরকারী এবং চিরন্তন (পারসেলের সঙ্গীতও আমার কাছে তাই মনে হয়)।...এখন মিলটনকে বেশ ভাল করে পড়া হচ্ছে, এবং ম্যাসন তাঁর একটা জীবনী লিখছেন বা লিখেছেন। কোন একটা ত্রৈমাসিকে 'মিলটন সম্পর্কে ফরাসী সমালোচক (মনে হয়, শেরের)—এর মত' এই প্রবন্ধের ম্যাথু আর্নল্ডকৃত একটা সুন্দর রিভিউ দেখেছি। সেই ম্যাথু আর্নল্ডই বলেছেন মিলটন ও ক্যাম্পবেল আমাদের দুই স্টাইলের রাজা। মিলটনের শিল্পকলা অতুলনীয়, কেবল ইংরেজি সাহিত্যেই নয়, আমার মতে যে কোন সাহিত্যেই; গ্রীক বা রোমান সাহিত্যের সুন্দরতমের সঙ্গে সমান, যদি না তার চেয়েও বেশি

কিছু হয়। তাঁর কাব্যে, ছন্দে, রীতিপ্রকরণে এই গুণ সবিশেষ দেখা যায় বলে, এটা বিস্ময়কর লাগে যখন দেখি নিউম্যানের মত বিরাট লেখকও ভুল করে 'এ্যাগনিস্টেসের' প্রথম কোরাসটি 'থালাবার' (সাদের কবিতা) আরম্ভের সঙ্গে তুলনা করেন এই বলে যে মিলটনের পরে কাব্যরূপে মসৃণতা ও শুদ্ধতা লাভ করা গেছে—যদিও মিলটন কাব্যের গঠন ভঙ্গিতে শুধু যে তাঁর কালের এবং পরবর্তী কালেরই অগ্রবর্তী তাই নন এই বিশেষ কোরাসগুলি তাঁর নিজেরই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ যেন দেবীমন্দিরের ফ্রিজের সঙ্গে চায়ের টেবিলের তুলনা করে শেষেরটির সপক্ষেই রায় দান।

আমি মিলটনের ছন্দপ্রকরণের দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছি এবং তাঁর শেষ পর্যায়ের ছন্দ সংগ্রহ করেছি : একাজ আমি করেছিলাম যখন কয়েক বছর আমাকে ছন্দ-অলঙ্কারের ওপর বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ আমি দেখেছি 'প্যারাডাইস রিগেনডে' এবং লিরিকের সুরে 'এ্যাগনিষ্টেস'-এ। আমি প্রায়ই সে-সম্পর্কে লিখবো ভেবেছি, সাধারণভাবে ছন্দের ওপরই লিখবো ভেবেছি ; আমার মনে হয় বিষয়টি কমই বোঝার চেষ্টা হয়েছে।

আমি কবিতা লিখি কি না আপনি জিগ্যেস করেছেন। যা লিখেছিলাম জেসুইট হওয়ার আগেই পুড়িয়ে ফেলেছিলাম এবং যদি না আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরা ইচ্ছে করেন ত আর লিখবো না বলে মনস্থ করেছিলাম যেহেতু তা আমার জীবিকার সমধর্মী ছিল না ; সেইজন্যে সাময়িক প্রয়োজনে উপহারের জিনিস হিসেবে সাত বছরের মধ্যে আমি দুতিনটি ছাড়া আর কিছুই লিখি নি। কিন্তু '৭৫ এর শীতে যখন টেমসের মুখে ডরেটসল্যাণ্ড জাহাজটি ডুবে গেল, এবং ফক আইনের বলে জার্মানি থেকে নির্বাসিত পাঁচ জন ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসিনী ডুবে মারা গেলেন, তখন আমি সেই ঘটনার কথা শুনে খুব বিচলিত হয়েছিলাম এবং রেকটরকে সেকথা বলাতে তিনি কেউ যদি বিষয়টি নিয়ে একটি কবিতা লেখে এমন ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এই আভাস পেয়ে প্রথমে আমার অভ্যাস ছেড়ে গেলেও আমি কাজে লেগে গেলাম ও একটি কবিতা লিখলাম। অনেকদিন ধরে আমার কানে একটি নতুন ছন্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যা এখন আমি কাগজে রূপ দিলাম। অল্প কথায়, অক্ষরের ('সিলেব্‌ল') সংখ্যার হিসেব ছাড়াই এটা কেবল প্রস্বর ('এ্যাকসেন্ট') ও ঝোঁকের ('ষ্ট্রেস') মাধ্যমে পর্ববিভাগ বোঝায়, যার ফলে কোন 'পর্ব' বলতে একটি কঠিন অক্ষর বা অনেকগুলি সহজ ও একটি কঠিন অক্ষর বোঝায়। আমি বলছি না চিন্তাটা সম্পূর্ণ নতুন ; সঙ্গীতে, শিশুকবিতায়, জনপ্রিয় চুটকিতে এর আভাস আছে, এবং তার পর থেকে আমি সমালোচকদের কথায় এটিকে সম্ভবপর বলে উচ্চারিত হতে শুনেছি। দৃষ্টান্তগুলি এই— 'ডিং, ডং, বেল ; পুসি'জ ইন দি ওয়েল ; হু পুট হার ইন ? লিট্‌ল্ জনি থিন। হু পুলড হার আউট ? লিট্‌ল্ জনি স্টাউট। সেই রকমই, 'ওয়ান, টু, বাক্‌ল্ মাই শু' ইত্যাদি। ক্যাম্পবেলে পাবেন 'এ্যাণ্ড দেয়ার স্লীট এ্যালং দি ডিপ প্রাউডলি শোন'—'ইট ওয়াজ টেন অব এপ্রিল মর্ন বাই দি চাইম' ইত্যাদি ; শেক্সপীয়রের 'হোয়াই শুড দিস ডেজার্ট বি ?' সম্পাদকেরা ভুল করে সংশোধন করেছেন ; মুরের ছোট্ট গান আমি উদ্ধৃত করতে পারছি না ; ইত্যাদি। কিন্তু আমি যতদূর জানি কেউ ই এটা জোর গলায় এবং পুরোপুরি রীতি হিসেবে ব্যবহার করেন নি। এতদ্‌সত্ত্বেও, আমি স্বীকার করি, আমার মতে এটি সাধারণ পদ্ধতির চেয়েও ভালো এবং স্বাভাবিক, অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক ও এর অনেক বেশি ফলশ্রুতি। যাই হোক, ঝোঁকগুলিকে আমার নীল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করতে হয়েছিল, সেগুলো ও পংক্তিতে পংক্তিতে বিন্যস্ত আমার মিলগুলি, আমার পঠিত ওয়েলশ কবিতার কিছু ধ্বনি এবং আরো অদ্ভুত করেকটি বস্তু কোন সম্পাদকের চোখে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতো, সেইজন্যে যখন আমি এটি আমাদের 'মানথ' পত্রিকায় দিলাম, তখন তারা

প্রথমে এটি গ্রহণ করলেও, কিছুদিন পরে পিছু হাঁটলো এবং এটি ছাপতে সাহস করলো না। এটা লেখার পর আমি লেখার ব্যাপারে মুক্ত হলাম, কিন্তু তবু বিবেকের কাছে এগুলি লিখে কালক্ষেপ করার সাড়া পাচ্ছিলাম না; সেইজন্যে আমি অল্পই লিখেছি এবং আরো অল্পই লিখবো। ইউরিডিসের ওপর একটি ছোট কবিতা লিখেছিলাম, সেও আমার দেওয়া নাম এই 'প্রাং রিদমে,' এবং এটি আরো সহজ, আরো ছোট, ও চিহ্নহীন ছিল এবং এটিও 'মানথ' কে দিলাম, কিন্তু তারা এটাকেও পছন্দ করলো না। আমি কিছু সনেট ও ছোট ছোট আরো কিছু লেখা লিখেছি; কয়েকটি 'প্রাং রিদ্‌ম্‌'-এ, আরো নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে—'বাড়তি পর্ব' হিসেবে, যাতে অংশ-বিশেষ পর্ববিভাগের সময় ধরা হয় না (আর্ষপ্রয়োগ হিসেবে যা শেক্সপীয়রের নাটকে দেখা যায়, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে পরিকল্পিত প্রয়োগ); অন্যগুলি সাধারণ পর্ববিভাগে বিপরীত সঙ্গীতাবদ্ধ (counterpoint) হত [এই হল বিপরীত সঙ্গীত: 'হোম টু হিজ মাদার'স হাউস প্রাইভেট রিটার্ন্ড' এবং বাট টু ভ্যাংকুইশ বাই উইঅড্রম হেলিশ ওয়াইলস' ইত্যাদি]; অন্য একটি ছুটি সাধারণ বিপরীত সঙ্গীতবিহীন ছন্দে লেখা। কিন্তু লেখার উৎসাহের অভাব কেননা প্রকাশ করার কোন চিন্তাই আমার নেই।

আমি এই সঙ্গে বলবো যে মিলটন বিপরীতসঙ্গীতের (counterpoint) মহান আদর্শ। 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'রিগেনড্ড', বিশেষত শেষেরটায় খুব বেশি করে আছে, যেহেতু সেটাতে তাঁর প্রকরণগত প্রাগ্রসরতা দেখা যায়, তিনি সব জায়গাতেই 'কাউন্টারপয়েন্ট' ব্যবহার করেন, এখানে সেখানে স্পষ্টতই ব্যবহার করেন; কিন্তু আমার বিচারে 'স্যামসন এ্যাগনিস্টেস'-এও আগাগোড়া 'কাউন্টারপয়েন্টের' ব্যবহার; অর্থাৎ, প্রায় প্রতি পংক্তিতেই ছুটি আলাদা পর্ববিভাগ পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু সেই বিস্মৃতে পৌঁছোলে দ্বিতীয় পর্যায়ের বা 'মাউন্টেড রিদ্‌ম্‌,' যা প্রকৃতই 'প্রাং রিদ্‌ম' মৌল ও চিরাচরিতটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তখন এটা বাড়তি হয়ে যায় ও এটিকে ছেঁটে ফেলা যায়; ঐ শেষ পন্থা অনুসরণ করে সোজা 'প্রাং রিদমে' পৌঁছোনো যায়। মিলটন অবশ্যই এটা জানতেন কিন্তু এটা না গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি ছিল।.....

ইস্তেফান মালার্মে

১৮৪২ ৯৮

ক্রাঁস কাউন্টির গেরেটে

সেপ্টেম্বর ১৮৭২

আপনার সম্মানিত পত্রিকা ঠিকই ঘোষণা করেছেন যে বহুকাল থেকে ভিক্টর হুগোর অনেক পারিসীয় বন্ধুরা আমাদের সেই বিখ্যাত কবি যেখানে জন্মেছেন সেই গৃহে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেছেন।

বেসাসোঁতে আমি যখন অল্প সময়ের জন্যে গিয়েছিলাম, তখন আপনাদের সহরে এই বাড়িটি একজন আমাকে দেখিয়েছিল যা, আমার বিশ্বাস, অল্পই পরিচিত; মঁসিয়ে কাটুল মঁাদে ও আমি একটা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছি যা আপনার সম্মানিত পত্রিকাও নিজেরা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

আমাদের থেকে দূরে বেসাঁসো সহর যে তার কৃতী সন্তানকে নিজেই সম্মানের গৌরবে ভূষিত করতে চলেছে সে

বড় আনন্দের কথা; কিন্তু আমাদের চিন্তার পূর্বাবির্ভাবের জন্যে আপনাকে বলবো যে আমাদের সহযোগিতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবেন না। আমরা সসম্মানে সেই মর্মরফলকটি আপনাকে দিতে চাই যাতে ভিক্টর হুগোর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত আছে।

এটি একজন বিখ্যাত ভাস্কর মঁসিয়ে গডেবস্কির সৃষ্টি যাঁকে প্রত্যেক বছর সালোঁতে তাঁর স্ট্যাচু ও বাস্টগুলির জন্যে জনসাধারণ প্রশংসা করে।

এই মুহূর্তে যখন আপনাকে লিখছি, তখন কাজটি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। প্রধান সম্পাদকমশাই, আমি প্রার্থনা করি যে আপনি আপনার পরবর্তী সংখ্যায় এই চিঠিটি প্রকাশ করবেন, এবং আমাদের জানাবেন আমরা মঁসিয়ে গডেবস্কিকে তাঁর কাজটা চালিয়ে যেতে বা থামিয়ে দিতে বলবো কি না। দয়া করে গ্রহণ করুন, ইত্যাদি……।

আর্তুর র‍্যাঁবো

১৮৫৪-৯১

খেওডর দ বাঁভিলকে ১

শার্লভিল, আর্ডেনেস
২৪মে ১৮৭০

আমরা এখন প্রেমের মাসে পৌঁছেছি; আমার বয়স হল সতেরো।[২] কেউ কেউ যেমন বলে—আশায় ভরা স্বপ্নের বয়সকাল,—এবং আমি সুরু করেছি, আমি সরস্বতীর অঙ্গুলিস্পৃষ্ট শিশু—মাফ করবেন কথাটা যদি নেহাৎ বাজে মনে হয়,—যে আমার কবিজনোচিত বস্তুগুলিকে—আমার উত্তম বিশ্বাস, আশা, অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করবে,—আমি একেই বসন্তঋতু বলি।

এই কবিতা থেকেই যদি কয়েকটি আপনাকে পাঠাই,—এবং নামী প্রকাশক আলফ লমেরের মাধ্যমে—যেহেতু আমি সব কবিকেই, সব পার্নাসিয়েনদেরই ভালবাসি—যারা আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত—এবং কবি বলতে পার্নাসিয়েনই বোঝায়; খুব সূক্ষ্মভাবেই আমি আপনার মধ্যে রঁসারের একজন উত্তরাধিকারীকে, ১৮৩০-এর মহারথীদের একজন ভ্রাতৃস্থানীয়কে, একজন প্রকৃত রোমান্টিক, একজন প্রকৃত কবিকেই প্রশংসা করি। সেইজন্যেই এই। আমার আশঙ্কা, এগুলি প্রলাপ, তাই নয় কি, কিন্তু অবশেষে?…

দু বছরের মধ্যে সম্ভবত এক বছরের মধ্যে, আমি পারী যাবো।

—আঁসিও, কাগজের সম্পাদকমশাইরা, আমি পার্নাসিয়েন হবো।

—আমি জানি না আমার মধ্যে কী আছে…যা প্রকাশিত হতে চায়…প্রিয় মাস্টার, আমি শপথ করছি যে আমি সর্বদা দুই দেবীর আরাধনা করবো, তাঁরা শিল্প ও স্বাধীনতা।

এই কবিতাগুলি পড়ার সময় বেশি জিদ ভ্যাঙাবেন না:…প্রিয় মাস্টার, আপনি যদি 'পার্নাসিয়েনে' আমার 'ফ্রিডো ইন উনাম' রচনাটির স্থান করে দেন তাহলে আমি আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে যাবো। 'পার্নাসের' শেষতম সংখ্যায় আমার রচনা থাকা উচিত: এটা কবিদের মতবাদ হয়ে যাবে। হায় উদ্বেল উচ্চাশা।

১। বাঁভিল 'ল পারনাস কঁটেমপরঁ্যা'র নির্বাচক-মণ্ডলীতে ছিলেন।

২। তখন র‍্যাঁবোর বয়স প্রকৃতপক্ষে ১৫ বছর ৭ মাস ছিল।

আয়ুরেখা

বিজন কুমার ঘোষ

দুপুর বেলা। চৈত্র মাস। পথে পথে শুকনো পাতার জটলা—তীব্র জটলা থেকে ঘূর্ণীপাক।

আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে ফিরছিলাম। রাস্তায় আমি একা। বাস নেই রিকশা নেই। রাস্তার ধারে শুকনো ডালে একটা কাকও নেই। লাইব্রেরীর প্রাচীরের পাশে যে তিরতিরে ময়লা জলের ড্রেন তার মধ্যে শরীর ডুবিয়ে একটা কালো রঙের কুকুর জিভ বের করে বিশ্রাম নিচ্ছে। ছায়া সরে গেছে। রোদের রেখাগুলি গরম সুচের মত ইনজেক্‌সন দিচ্ছে। এই নিদারুণ সময়ে একটা লোক ডাক দিয়ে উঠল, ও মশাই—

রাস্তায় তাহলে আমার মত আরেকজন হতভাগাও আছে। তাকালাম। লোকটার উসকো খুসকো চুল। দাড়ি কামায়নি প্রায় দু সপ্তাহ। গায়ে উদ্ভট রকমের পোষাক। কালো রঙের কম্বল কেটে জামা তৈরী করেছে। পরণে ছেঁড়া খাকী প্যাণ্ট। ক্যাম্বিশের জুতো। আঙুলের মাথা-গুলো ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।—ও মশাই ডাকার ছিরিছাদও ভাল না। অতএব পাগল। গাছের ছায়া খুঁজে তাতে পা রেখে রেখে চলতে লাগলাম।

—কথা কানে যাচ্ছে না? ও মশাই—

—কি দরকার?

—দরকার আছে বলেই তো ডাকছি।

—এদিকে আসুন। আমি যেতে পারব না।—একটা বড় পাতার তলে দাঁড়ালাম। ছাতি আনিনি।

আমার বিরক্তি দেখে আর ঐ ভাবে দাঁড়ানো দেখে লোকটা সাবধানে রাস্তা পার হল। পার হবার ভঙ্গী দেখে হাসি পেল। সম্পূর্ণ হেসে উঠবার আগেই লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল, আমার আয়ুরেখাটা দেখুন তো?

—ইয়ার্কি মারবার জায়গা পেলেন না।

—সিরিয়াসলি বলছি, বিশ্বাস করুন—।

—আমি জ্যোতিষী নই।

—আহা, চটছেন কেন? আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি নাম্বার ওয়ান জ্যোতিষী। কাইণ্ডলি—

ভাল জ্বালা! আমি হাতটা ঠেলে এগিয়ে যেতেই লোকটা ধুরন্ধর সেণ্টার করোয়ার্ডের মত পাশ কাটিয়ে আমার আগে চলে গেল।

—কবে মরব বলতে পারেন?

—সে আমি কি জানি।

—আলবৎ আপনি জানেন।

—জানি না বলছি—

—একশোবার জানেন।

—মহা জ্বালাতন!—ঠিক তক্ষুণি ষ্টপেজে একটা বাস এসে দাঁড়াতেই আমি উঠে পড়লাম। ভিড় ছিল। যাক বাঁচা গেল। একটু ভিতরের দিকে এগোতেই—খুব যে ফাঁকি দিয়ে পালানো হচ্ছিল, কেমন অন্ধ।—আরে সেই লোকটা। আমি টিকিট কাটলাম। দেখাদেখি লোকটাও। অফিস ভাঙা ভিড়ের মধ্যেও হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি হাতে একটা চিমটি কেটে দিলাম। ভিড়ের মাঝখান থেকে শব্দ হল—উঃ! পাগলটার থেকে আমার গায়ে জোর

বেশী। রোখো, ফের জ্বালাতন করতে এলে একখানা ঘুসি বসিয়ে দিলেই পাগলামী ঘুচবে। চেতলা সেন্ট্রাল রোডে নেমে তাড়াতাড়ি কেওড়াতলার পোলের দিকে হাটতে শুরু করে দিলাম। এখন শহরে মড়কের মরসুম। একটা চিতাও বোধ করি খালি নেই। দক্ষিণ থেকে বসন্তের হাওয়া ধোয়াগুলোকে সোজাসুজি চোখের মধ্যে উড়িয়ে এনে ফেলছিল। সেই সঙ্গে মরা পোড়ার উৎকট গন্ধ।

—আজ্ঞে রাগ করলেন?

——আপনি দেখি এখনো আমার পেছন ছাড়েননি।

—ছাড়ব না তো আগেই বলেছি।

—কোন্ অপরাধে জানতে পারি কি?

—আমার হাতের আয়ুরেখাটা পড়ে দিতে হবে।

—এক কথা বারবার বলে কি সুখ পান?

—বারবার এড়িয়ে গিয়ে আপনি কি সুখ পান?

—আমি জ্যোতিষী নই।

—আলবৎ জ্যোতিষী।

—আচ্ছা পাগল!

—মোটেই আমার পা' গোল নয়। রীতিমত চ্যাপ্টা। এই দেখুন—

—নেশা করেছেন নাকি?

—সে বলতে পারবেন না। আপনি তো বার চারেক নস্যি নিলেন। আমি তাও নয়। আমার ঠাকুমা বলতেন—

আমি হাটতে শুরু করে দিয়েছি। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! কি আছে কপালে!

—আহা, বলুন না কবে মরব?

—ওই তো কেওড়াতলা। যান না—

—যাবই তো। এই কাজটা করার জন্যে তো আমার দেশবাসী এক পায়ে খাড়া। কিন্তু—

—দোহাই। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এক পায়ে খাড়া নই।

—ওই জন্যেই তো ছাড়ব না! আপনার মধ্যে একটা মৌলিকত্ব আছে। আপনার প্রশস্ত কপালের নিচে চোখ। চোখের দিকে তাকালে মনে হয়—

বিপজ্জনক ভাবে একটা ছুটন্ত ট্রামের হাতল ধরে কোন রকমে উঠে পড়লাম। পরক্ষণেই দেখি আরো বিপজ্জনক ভাবে লোকটাও উঠে পড়ল। অথচ একটু এদিক ওদিক হলে আমাকে আর ঘ্যানঘেনে প্রশ্নের উত্তর দিতে হত না। লোকটা ভক্ত প্রহ্লাদের জাত। মৃত্যুর তারিখটা নিয়ে একটু সৌখিনতা করছে। পাগলামীর একটা মাপকাঠি থাকা দরকার। এই রে, লোকটা আবার ভিড় ঠেলে আমার দিকে আসতে চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখি গড়িয়াহাটার মোড়। একটা পাঁচ নম্বর লাল আলো দেখে থির থির করে কাঁপছে। আমি এক লাফে নেমে পাঁচ নম্বরে উঠে পড়লাম।— যাদবপুরের টিকিট দেখি এক খানা।

—আমারও একখানা যাদবপুরের টিকিট।

সেই লোকটা! আমার লোম খাড়া হয়ে গেল। লোকটা কোদালে দাঁত বের করে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে। এই দৃশ্যে পিত্তি জ্বলে যাবার কথা। কিন্তু আমার শরীরটা যেন কেমন করতে লাগল। একবার পানের সঙ্গে কড়া দোক্তা খেয়ে আমার এই অবস্থা হয়েছিল। পায়ের তলায় পৃথিবীটা অনেকক্ষণ কাঁপছিল। কেমন যেন একটা কালো রঙের ভয় আলোয়ানের মত আমাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসছে। আমার ঘাম শুকিয়ে গেল। কি করে এই অদ্ভুত চরিত্রের লোকটার হাত থেকে মুক্তি পাই! সারা রাত্রিটা ও যেন আমার পেছনে পেছনে ঘুরবে। রাত্রির পর দিন, তারপর সপ্তাহ, মাস বছর—আমি যতদিন বাঁচব এই লোকটাও সমানে হাতখানা এগিয়ে দেবে। এখন আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। ভয়ও শুকিয়ে গেছে। চিৎকারও করতে পারছি না—আমাকে বাঁচান। মনে হচ্ছে লোকটা যতক্ষণ কাছে কাছে থাকবে ততক্ষণ আমি আত্মরক্ষার সমস্ত

উপায়ই ভুলে যাব। এখন আমার মধ্যে শুধু আতঙ্ক। তবে এক্ষুণি বাঁচতে পারি যদি এক্ষুনি লোকটা মরে যায়। কিন্তু তা কি যাবে! উল্টে আমাকেই মেরে ফেলবে।

যাদবপুর যাব, চাকুরিয়াতেই নেমে পড়লাম। এদিক ওদিক তাকাইনি। কয়েক মিনিটের ভিতর কয়েক মাইল হেটে বেরিয়ে যেতে চাইলাম। হঠাৎ আমার মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে গেল।

—শেষ পর্যন্ত কি মনস্থ করলেন?

—কিছুই না।

—এটা কি ভদ্রলোকের মত কথা হল?

—বিশ্বাস করুন, আমার বংশে কেউ কোন দিন হস্তরেখা বিচার করেনি।

—না করলেই বা। বংশে কাউকে দিয়েই তো শুরু করতে হবে।

—আমি যদি হারমোনিয়াম নিয়ে বসি তাহলেই কি বড়ে গোলাম হব?

—বড়ে গোলাম তো হবেন।

—আজই যদি ফুটবল খেলতে শুরু করি তাহলেই কি চুনী গোস্বামী হব?

—কাচ গোস্বামী তো হবেন।

—আমার মধ্যে কি এমন দেখলেন যে বংশ আমাকে দিয়েই শুরু করতে হবে?

—বলেছি তো আপনার মধ্যে একটা মৌলিকত্ব আছে। আপনার প্রশস্ত কপালের নিচে চোখ। চোখের দিকে তাকালে মনে হয়—

—আপনি ভয়ানক ফাজিল।

—কিন্তু আপনাকে ছাড়াতে পারিনি।

—আপনি অতি নির্বোধ;

—তাতেও আপনি ফার্স্ট।

—আপনি এখন কেটে পড়ুন তো। আপনার বাঁচা মরায় আমার কোন লাভ নেই।

—জগতে লাভ লোকসানটাই কি সব?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ফুলের বাগানে হা করে চেয়েছিলেন কেন? ক' পয়সা পেয়েছিলেন?

—বাগানের ফুল দেখা আর হাতের রাবিশ রেখা দেখা কি এক?

—রাবিশ বৈ কি। যেহেতু আমার খোচা খোচা দাড়ি। আমি মেয়ে হলে তো হাত টেনে নিয়ে দেখতেন মশাই। কফি খাওয়াবার জন্যে এতক্ষণে এসপ্লানেডে নিয়ে যেতেন। ভারী মীন মাইণ্ডেড আপনি—!

—মুখ সামলে কথা বলবেন।

—কেরে আমার সোনার চাঁদ!

এই সময় মৃত্যুঞ্জয়ের চায়ের দোকান পড়ল। কয়েক জন বসে আছে। আমি সটান ঢুকে পড়লাম। মৃত্যুঞ্জয়কে ইশারায় গরম জল দিয়ে ধুয়ে এক কাপ চা দিতে বললাম। আর দু' গেলাশ জল। ভীষণ পিপাসা পেয়েছে। পাখাটা তিন নম্বরে মৃদু হয়ে ঘুরছিল। এক সোচড়ে স্পীড্ বাড়িয়ে দিলাম। আলুর দম ঘুঘনি মাংসের চপ চিংড়ির কাটলেট—অনেকগুলো নাম মৃত্যুঞ্জয় বলে গেল প্রথামত। আমি দেখছিলাম লোকটা কোথায় গেল। ওর পকেটে পয়সা নেই নিশ্চয়ই। নাহলে আমাকে কিছুতেই একা ফেলে রাখত না। মাথার পাশের জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। কি জানি এদিক দিয়েই হয়ত ওর আয়ুরেখাটা বাড়িয়ে দেবে। আমার চোখে মুখে কোন ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠায় খরিদ্দারদের মধ্যে আলোচ্য বস্তু হয়ে গেলাম এক মিনিটে। মৃত্যুঞ্জয় আমার অনেক দিনের পরিচিত। ফিসফাসের ধার ধারে না। বলল, আজ কিছু খেলেন না, শরীর খারাপ নাকি? কিছু হয়নি শুনে বলল, স্পেশাল চিংড়ির কাটলেট করেছি দিই একখানা?

আর বসা গেল না। ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে দোকানের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ব, সম্পাদকীয় থেকে দাদের মলমের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত, যাতে বিরক্ত হয়ে লোকটা ফিরে যায়। কিন্তু হঠাৎ অনেকগুলি খরিদ্দারের কৌতূহল এক সঙ্গে জেগে ওঠার তা হল না। আশ্চর্য, লোকটা ওৎ পেতেই ছিল।

—চা খেতে বড্ড সময় নিলেন আপনি।

—আপনাকে কে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে?

—কেউ বলেনি। আমি নিজের ইচ্ছেয় দাঁড়িয়ে আছি।

—বেশী বকবক করবেন না। মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন আপনি, জানেন?

—চটপট একটা এ্যানাসিন খেয়ে নিন। এতে চার রকমের কাজ দেবে।

—ইডিয়েট!

—মাইরি বলছি মুখ খারাপ করবেন না। নেহাৎ জ্যোতিষী বলে খাতির করছি। অন্য কেউ হলে—

—অন্য কেউ হলে কি করতেন শুনি?

—এই তো পায়ে পা' দিয়ে ঝগড়া করেন! আহা, বলেই দিন না কবে মরব।

—আজকেই মরবেন।

—কখন?

—একুণি।

—কি করে বুঝলেন, আয়ুরেখা তো দেখলেন না?

—বড় জ্যোতিষীদের দেখতে হয় না। আপনার ছোট কপাল। কপালের নিচে কুতকুতে চোখ। ওই চোখের ভিতর দিয়ে বীভৎস মৃত্যু উঁকি মারছে—

—মাইরি বলছেন?—লোকটার মুখে কে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল।

—হা, হা, হা—বলতে বলতে……ঢাকুরিয়া স্টেশনের এপারে আমি, যাদবপুর থেকে ভীষণ বেগে ইলেকট্রিক ট্রেন আসছে, খুব কাছাকাছি থাকতে আমি তিন লাফে লাইন পার হয়ে গেলাম। লোকটাও বোধ হয় আমাকে ফলো করেছিল। কেননা তখনি একটা আর্ত চিৎকার উঠল স্টেশন জুড়ে। ট্রেনটা ঘসতে ঘসতে বিকট যান্ত্রিক আওয়াজ দিয়ে থেমে গেল। লোকজন ছুটতে আরম্ভ করল। যে আতঙ্কটা কিঞ্চিৎ ফিকে হয়ে গিয়েছিল তা ফের চাগিয়ে ওঠায় আমি প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলাম। দাসপাড়া নাজির বাগান হালতু মসজিদ ছাড়িয়ে রামলালের বাজার। আমার গতি মন্দ হয়ে এল। হাফাচ্ছি। না, পেছনে সেই লোকটা নেই। বড় রাস্তার পাশে ঝোপজঙ্গল। তারপর একটা পুকুর। পুকুরের পারেই আমার বন্ধুর বাড়ি। বন্ধু বাড়ি ছিল না। ভাল। বন্ধুর বৌ অতি লজ্জাশীলা। আরো ভাল। বন্ধুর মা ভীষণ বকবক করেন। কিন্তু তিনি গীতাপাঠ শুনতে গিয়েছিলেন। অতি সুসংবাদ। বিছানায় ওপর শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পরে সুশীলা চা নিয়ে এল। এদিকে এখন অনেক রাত্রি। শিয়ালের ডাক। জোনাকি জ্বলছে। পুকুরের জলে হারিকেন দোলাতে দোলাতে কে যাচ্ছে। একটা কালো কুকুর অদ্ভুত ভাবে ছুটে চলে গেল। এই কুকুরটাকেই কি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ড্রেনের জলে গা' ডুবিয়ে থাকতে দেখেছিলাম? সেই লোকটা যদি খুঁজে খুঁজে এখানে এসে পাকড়াও করে?—দেখুন তো মশাই—কবে মরব?

ঢাকুরিয়া স্টেশনে একেক জন প্রত্যক্ষদর্শীকে ঘিরে ঘিরে জটলা। সেই সঙ্গে গবেষণা।—জানিস রক্তে ভেসে গেছে রেল লাইন। সাত বালতি হবে।—উহু এদিককার লোক নয়। বিদেশী।—কম্বল কেটে জামা তৈরী করেছে এই গরমে। কি নোংরা লোকটা।—ডান হাতখানা ছিটকে এসেছিল এদিকে। আয়ুরেখাটা তো ভালই ছিল। অপঘাত না হলে অনেক দিন বাঁচত।

চায়ের দোকানে তখনো ঝাঁপ ওঠেনি। মৃত্যুঞ্জয় রাগে গজগজ করছিল।—মরবার আর জায়গা পেল না। আজই চিংড়ির কাটলেট করলাম। চোখের সামনে এ্যাকসিডেন্ট হলে কারো খেতে ইচ্ছে হয়? মাথার ওপর জানালাটা সেই ভাবেই বন্ধ আছে। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পাল্লাটা খুলে দিলাম।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিজয় কুমার নাগ

অসাধারণ চিকিৎসক
একজন অ-সাধারণ রোগী

১৯৫২ সাল, আমায় নিয়ে যাওয়া হল মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের এক পুরণো বাড়ীর এক চিকিৎসকের নিকট। ইতিপূর্বে সব চিকিৎসকই রায় দিয়েছেন অপারেশন করতে হবে, পিসি আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি পূর্ব হতেই এই চিকিৎসকের সহিত পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী অনিল রায়ের নিদারুণ ব্যাধিতে সাময়িক স্বস্তি এই চিকিৎসকই দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাকালের অকরুণ হাত অনন্ত বিপ্লবী নেতার প্রাণটিকে আত্মীয়-বন্ধুদের নিকট হতে কেড়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তবু তাঁর নিদারুণ যন্ত্রণার সময় সামান্যতম স্বস্তি যে চিকিৎসক দিয়েছিলেন, তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডঃ সন্তোষ কুমার দাস। সংক্ষেপে ডঃ এস, কে দাস। তখনও তিনি একবেলা বসেন চৌরঙ্গী রোডের chamber-এ। আমার পথ্যের নিষ্করুণ বিধানে এবং নিয়মিত আহার্য্য-গ্রহণের সুব্যবস্থায় এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ আর হোলনা। ডাঃ দাস পুরোনো বাড়ী থেকে নতুন বাড়ীতে গেলেন। রোগীর স্রোত বাড়তে আরম্ভ করলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই চৌরঙ্গীর চেম্বার ছেড়ে দিতে হল। একটি ঘরে তিনি বসতেন, বাইরে কম্পাউণ্ডার প্রাণকেষ্ট বাবু বাদে আরো দু একজন সহকারী ছিলেন। শত শত নারী-পুরুষ, শিশু রোগীদের নামের সবুজখাম জমা পড়ছে, একে একে নাম ডাকা হচ্ছে, ডঃ দাস রোগীদের নিকট হতে প্রথম জানতে চাইলেন, রোগী কেমন আছেন, রোগীকে পরীক্ষা করে দেখতেন তারপর কম্পাউণ্ডারকে ডেকে খামের নম্বরটি বলতেন। প্রাণকেষ্টবাবু পূর্বেকার ওষুধের নাম বলতে থাকতেন, নিমীলিত চোখে ডঃ দাস বসে আছেন, মনে হচ্ছে ঝিমুচ্ছেন, কিন্তু হঠাৎ দেখা যেত কম্পাউণ্ডারকে বলছেন 'তুমি ভুল বলেছো দেখ ভাল করে। ওষুধের নামটি বলে গেলেন, বিস্মিত হতাম তাঁর এই শত শত রোগীর স্রোতের মধ্যে প্রত্যেক রোগীর নির্দ্দিষ্ট ওষুধ যা হয়তো ১৫দিন পূর্বে দিয়েছেন মনে রয়েছে। ক্রমশঃ তাঁর বাড়ীতে রোগীর ভীড় বাড়তে শুরু করলো, এবং সেই অনুযায়ী কম্পাউণ্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। নিয়মের কড়াকাড় সবই বাড়তে আরম্ভ করলো। যাঁরা তাঁকে দেখান তাঁদের অসীম আস্থা তাঁর ওপর, ডাক্তার বাবু সিদ্ধ-পুরুষ, দেবতুল্য, কাজেই এখানকার রোগীরা শুধুমাত্র রোগী নয় যেন ভক্ত, ভক্তেরা ওষুধ নিয়ে চুপি দিয়ে ডাক্তারবাবুর আশীর্বাদ ভিক্ষে করবেন, ডঃ দাস, ক্লান্তিহীন, অসীম ধৈর্য্য সহকারে একের পর এক রোগীর খাম মাথায় ছুঁয়ে পরমেশ্বরের নিকট তাঁর আর্জি পেশ করছেন, রোগী ভাল হয়ে উঠছেন। রাত্রি বারোটা, একটা, আবার সকাল ৮টা থেকে বিরাম নেই। কম্পাউণ্ডাররা বলেন কোনও কোনদিন ভোর হয়ে যায়। কিন্তু রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাওয়ার পরবর্ত্তী সময়ে, অর্থাৎ গত কয়েকবৎসর যাবৎ, তাঁর সহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার একান্ত সহকর্মী ছিলেন হরেনবাবু, আর পরম নির্ভর স্থল পুত্র সমীরকুমার

দাস ; দুজনেই চিকিৎসাশাস্ত্রে পাশ করা। M.B. B.S.। পূর্বে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলে হয়তো দর্শন সম্ভব হত কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ সেই নিয়ম পরিবর্তিত হয়েছিল, বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য দীর্ঘ দিন পূর্বে আবেদন করতে হত। কিন্তু এসবেরই ব্যতিক্রম ছিল এক জায়গায়। সেখানে কোন অসুবিধাই গ্রাহ্য হোত না। একটা অদ্ভুত দাবী জন্মে গিয়েছিল তাঁর ওপর এবং ডাক্তার দাসও সেই দাবী আনন্দচিত্তে মেনে নিতেন।

সংবাদ পত্রে ডাঃ দাসের বিয়োগ সংবাদ আমরা যারা পিসির নিকটবর্ত্তী ছিলাম তাদের যেমন বেদনাবিদ্ধ করছে, তেমনি বেদনাবিদ্ধ করছে এই ভাবনায়, যে যিনি প্রতিটি বিষয়ে ডাক্তার দাসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, শুধু ডাক্তার হিসেবেই নয়, একজন হিতৈষী বন্ধু হিসেবে যিনি পিসির নিকট-স্বীকৃত ছিলেন, তার বিয়োগ আজ সেই সংবেদনকশীল মন, বন্ধুর বিয়োগে কাতর, মরমী মনটি অনুভব করতে পারলো না। সেই মনটি এক নৈর্ব্যক্তিক উদাসীন সাধনায় স্তব্ধ। জানি না, মনের কোনো সূক্ষ্ম স্তরে এই সংবাদ তরঙ্গ তুলছে কিনা। বহুজনের হিতের জন্য ডাঃ দাসের নিকট নানা সময় পিসি রোগীদের প্রেরণ করতেন। প্রায়শই কোনে কথা হোত। ডঃ দাসের অদ্ভুত শ্রদ্ধা, অদ্ভুত টান ছিল পিসির প্রতি। একজন আত্মনিবেদিত দেশসেবিকার প্রতি জনসেবক হিসেবে তারও যেন একটা কর্ত্তব্য রয়েছে। কর্মব্যস্ত পিসি কর্মের সাধনক্ষেত্রে দেহ-মনের কথা ভুলে যেতেন, পরার্থে পরহিতে জীবন উৎসর্গ করা প্রাণ নিজের কথা ভাববার সময় নেই। ১৯৫৫ সালে প্রথম stroke হবার পর থেকে পিসি হলেন ডাক্তার দাসের নিয়মিত রোগী। তবে তখনও অতটা নিয়মিত ছিলেন না, কারণ শরীর নিয়ে ভাবনা তার ধাতে ছিল না, স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। ডাক্তার দাস Powder ঔষধ দিতেন আর সর্বসময়ের জন্য সেই সময় থেকে গত ১৯৬৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নিয়মিত হার্ট, ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ সেবন করতেন। ১৯৬১ সালে রাসবিহারী এভিনিউর বাড়ী ত্যাগ করে নাকতলায় আসার পর থেকে পিসি ডাক্তার দাসের উপর বেশী নির্ভরশীলয় হয়ে পড়লেন। এই সময় থেকে অর্থাৎ তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে তিনি প্রচারধর্মী রাজনীতি (Platform politics) ত্যাগ করলেন। শরীর খারাপ হলেই ডাক্তার দাসকে ফোন করতেন, 'শরীর খারাপ, আজই ভাল করে দিতে হবে, আমি কোন কথা শুনতে চাই না।' ডাক্তার দাস বলতেন 'তা কি হয়, আপনি কোন কথা শুনবেন না, মানবেন না, আর ওষুধ খেলেই কি সেরে যাবে!' কিন্তু যিনি রোগী তিনি তো সাধারণ রোগী নন, রোগ তো তাকে আটকে রাখতে পারে না, অগণিত সাহায্যপ্রার্থী তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে! কাজেই ডাক্তার দাসের নিকট দাবী— 'এক্ষুণি সারিয়ে দিতে হবে।' বলতেন 'ডাঃ দাসের ওষুধ খেলেই আমি ভাল হয়ে যাই। এলোপ্যাথি আমার পক্ষে ক্ষতিকর।' ১৯৬৭ সালে পিসির stroke হল, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। ডান দিকটায় সাময়িক অবশভাব হল। তারপর অন্য উপসর্গ দেখা দিল। পিসি জড়ানো ভাষায় বললেন, ডাক্তার দাসকে ডাকতে, সেবার একজন সারাদিন ডাক্তার দাসের সঙ্গে ঘুরে রাত ৮ টায় তাকে নিয়ে বাড়ীতে এলেন, এবং আশ্চর্য্য, আধঘণ্টার মধ্যে সেই উপসর্গের উপশম হল। আমার একবার ডাঃ দাস বলেছিলেন, 'তোমার পিসিকে দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কি করবো তোমরা এত দূর চলে গেল গেছ, আর যাওয়া হয় না, ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারি না, তোমাদের ওখানে এই যে আজ যাচ্ছি এই দুঘণ্টার আরও কত রোগীকে দেখতে পাচ্ছি না, তারা ক্ষুব্ধ হয়।'

১৯৬৮ সালে stroke এর পর ডাঃ দাস শুনেই দেখতে এলেন হাসপাতালে, ছল ছল করে উঠলো তাঁর চোখ।

পিসির তখন ডানদিক পূর্ণ অবশ। কথা বন্ধ হয়ে গেছে, বাঁ হাত দিয়ে তাঁর প্রিয় ডাক্তারের মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন, মুখ দিয়ে আওয়াজ হল কি বলতে চাইলেন বোঝা গেল না, কেঁদে উঠলেন। সেদিন এই অসহায় দেশনেত্রী তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গীতে দাবী পেশ করতে পারলেন না, কি অসহায় বোধ সে চাহনি! আর সেই অসীম ক্ষমতাবান চিকিৎসক অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ফিরলেন, বল্লেন 'এতটা ভাবি নি। দেখি কি করতে পারি।' তারপর নিয়মিত খবর যেত, মাঝে মাঝে ওষুধ আসতো। সেই চিরবন্ধু আজ চলে গেছেন, পরম হৃদয়বান সুহৃদ আজ নেই, কে সেই মর্ম্মভেদী সংবাদ পিসিকে পৌঁছে দেবে? শুধু কি তাই, যে অলৌকিক অমিত শক্তির আত্মনিবেদিত সাধনায় অচৈতন্য হবার পূর্ব পর্যন্ত পিসি তাঁর জীবনের গত কয়েক বছর নিযুক্ত ছিলেন, ডাঃ দাস সেই সাধনার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকায় পিসির সহকারী ছিলেন। পিসি সংজ্ঞাহীন হবার পরও ডাঃ দাস সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ডাঃ দাসের লোকান্তর শুধু একজন প্রখ্যাত চিকিৎসকের নয়, একজন সাধকেরও লোকান্তর। এই চিকিৎসক-সাধকের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

মার্চ ১৯৬৫। দার্জিলিঙ থেকে ফেরার পথে শান্তিনিকেতন যাব স্থির করেছি। বহুদিনের ইচ্ছা ঋষি-কবির সাধনক্ষেত্র, মহর্ষির তপোবন, শান্তিনিকেতনে যাব। 'জয়শ্রী'র 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা' প্রকাশিত হবে এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতির সঙ্গে পত্রালাপ চলেছে। দার্জিলিঙ থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হবার পূর্বে চিঠি লিখলাম সবাইকে। সুধাকান্ত বাবুকে লিখেছিলাম ইতিপূর্বে কোনও দিন শান্তিনিকেতনে যাইনি, নতুন জায়গা, কোথায় থাকি, কোথায় যাই তার স্থিরতা নেই।

শান্তিনিকেতনে অনেক খোঁজাখুজির পরই আত্মীয়ের বাড়ী পেয়ে গেলাম। বিকেলের দিকে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর বাড়ী গেলাম। বারান্দায় একটি খাটে বসে ছিলেন। রঙ কালো, লম্বা দাড়ি। সাক্ষাৎকারের প্রথম কথা 'আপনি জয়শ্রী থেকে আসছেন? খাওয়া হয়েছে? আমরা সকাল থেকে বসেই আছি। স্ত্রীকে বলেছি, নতুন আসছে, কাউকে চেনেনা থাকার জায়গা নেই। ভাবলাম জায়গা একটি জুটবে কিন্তু এসেই খেতে হবে তো কিছু।' আমি দেখছিলাম একটি মানুষকে যে মানুষের কথা অনেক শুনেছি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে যাঁর নিকট থেকে একটি লেখা চেয়েছি, ঋষি-কবির সেই একান্ত অন্তরঙ্গ কাছের মানুষটিকে। বহুলোকের মুখে মুখে শুনে রবীন্দ্রসান্নিধ্যলব্ধ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মেছিল তা ভাঙল। প্রথমেই বল্লেন, আমি কিন্তু গুরুদেবের নামে জাকামো পছন্দ করি না। সেদিন বহু বিষয়ে কথা হয়েছিল। কত কিছু লেখার আছে, কত বিচিত্র মানুষের দর্শন লাভ করেছেন, কত বিচিত্র ঘটনা শুনেছেন। তাঁর কিছু কিছু বল্লেন। আমি তাকে সব কিছু লিখে রাখতে বল্লাম। কারণ এই অমূল্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর অন্যদের নিকট থেকে পাব না জানতাম। অসুস্থ, রোগগ্রস্ত সেই মানুষটির, দীপ্ত মধুর চরিত্র সেদিন আমাকে আকর্ষণ করেছিল। দুঃখ-দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, বার্ধক্য জর্জরিত জীবনেও কি অফুরন্ত উচ্ছল প্রাণ!

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে তিনি লিখলেন, তারপর নন্দলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কালিদাস নাগ প্রভৃতি নানা প্রখ্যাতদের নিয়ে লিখেছেন জয়শ্রীতে। নিজের

লিখতে কষ্ট হত, তাই শ্রুতিলেখক লিখে দিতেন। কিন্তু শ্রুতিলেখককে দিয়ে লিখিয়ে তাঁর মন শান্তি পেত না। এ বিষয়ে তিনি আমায় বারংবার তাঁর মনের কথা লিখেছিলেন: "ডিকটেশন দিয়ে যে লেখা তৈরী হয় তার বাঁধন হয় শিথিল এবং বিষয় বস্তুর পরিবেশনও হয় এলো-মেলো। স্বহস্তে প্রবন্ধ রচনায় পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য শক্তি থাকলে প্রবন্ধগুলি আরও মাজাঘষা এবং সুপাঠ্য হতো। কিন্তু সে শক্তি আর নাই। শ্রুতিলেখক যেভাবে আমার মুখের কথা কলমে লিখে নেন তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই"। অন্য একটি চিঠিতেই লিখেছিলেন—"অন্যকে ডিক্‌টেশন দিয়ে প্রবন্ধ তৈরী করা গেলেও সে প্রবন্ধ ঠিক মনের মতন হয় না, অনেক ত্রুটি থেকে যায়।" এই যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করতো।

জয়শ্রী পত্রিকার সুভাষ-অনুরাগ সর্বজনপরিচিত, এবং স্বভাবতঃই আমাদের চিঠি পত্রাদিতে সেই প্রসঙ্গ প্রায়শই থাকতো। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর সুভাষ-অনুরাগ দেশসেবকদের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসায়, শ্রদ্ধায় অতুলনীয়।

আমি তাঁর কয়েকটি চিঠি থেকে দেশ ও সুভাষ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি—"বাঙালী আর সে কালের (অর্থাৎ বিপ্লবী যুগের এবং বিবেকানন্দ, যতীন দাস, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত, এবং সুভাষচন্দ্রের যুগের) বাঙালী নাই। অর্থ-দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি দারিদ্র্য মনের। সদ্‌গুণের অভাব জনিত এই নিদারুণ দারিদ্র্য আজ বাঙালীর প্রায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিলোপ-কারী ঘুণ ধরিয়েছে। আজ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন-মুখী চিন্তা এবং কর্মধারা আন্দোলনাদি সব কিছু সংগঠনমূলক কাজের বিরোধী। যাঁরা সংগঠনমূলক কাজ করতে জয়ডঙ্কা বাজান তারাও সেটা করেন নিজ নিজ দলের কবলে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার যন্ত্রকে আনতে। 'দেশ' শব্দ আজ আমার কাছে ধোঁয়া,—অর্থহীন, উন্মাদের প্রলাপ। আজ "রাষ্ট্র" হল নতুন কথা এবং একমাত্র সত্যি কথা, এই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা বিচিত্র, বিচিত্র এদের জীবনযাত্রা,—বিচিত্র সংস্কার, সব জড়িয়ে অনৈক্যের গোলকধাঁ ধাঁ। এর প্রতিকার হতে পারে একটা জবরদস্ত খাঁটি নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্বের দ্বারাই। চলতিধরণের রাজনৈতিক (হওয়া উচিত রাষ্ট্রনৈতিক) আন্দোলন দ্বারা অন্ধকার দূর হবে না।" (৯.৮.৬৬)

অন্য একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "দেশের বর্তমান অবস্থার বিবিধ নৈরাশ্যময় সংবাদ পড়ে এবং দেখে মনে হয় কেন সুভাষের মতন—কিম্বা ঐ সময়কার অন্যান্য স্বার্থ ত্যাগী কম-বেশী ঐ শ্রেণীর যুবক আবার দেখা দিচ্ছেন না, দেশের যা অবস্থা চলছে—তার মোকাবিলা করার জন্য চাই একজন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণবান্ ব্যক্তিত্ব বা personality। রাজনৈতিক দলের কর্ম নয়—এই দুর্দিনের অন্ধকারে আলো জ্বালাবার। একজন কেউ সর্বত্যাগী দুঃসাহসী ব্যক্তির নেতৃত্ব ব্যতীত এই ঘোর বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। এই আমার ধারণা।" (১.১২.৬৬)

পুনরায় লিখেছেন—"আমি যতদূর বুঝি সুভাষচন্দ্রের জীবন দর্শনের মূলে ছিল তিনি যাকে নিজের দেশ মনে করতেন সেই দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের সুখ, সুবিধা, আরাম এবং জীবন পর্য্যন্ত, ত্যাগ করার সাধনা। তাঁর এই সাধনার মধ্যে ছিল একটা সংগ্রামী সজীব সত্য। এই সত্যব্রতীর সংখ্যা আজ একটিও নাই বললেই হয়, অথচ আজ বঙ্গদেশে তথা আলকের ভারতে ঐরকম পুরুষসিংহের প্রয়োজন।"

সুভাষচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা গুরুদেবের। একটি কাহিনী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী আমায় বলেছিলেন। গুরুদেব তাঁকে একদিন বল্লেন 'একজন রাজা আসবেন তখন অন্য কেউ যেন না থাকেন তার ব্যবস্থা করবে। সন্ধ্যার দিকে একটি গাড়ীতে এক ভদ্রলোক

এলেন, আপাদমস্তক ঢাকা। আমরা সেইসময় পূর্বনির্দেশ মত অন্যত্র ছিলাম। কবি অমিয় চক্রবর্তীকেও গুরুদেব বাইরে থাকতে বললেন। কিছুক্ষণবাদে রাজা গাড়ীতে ফিরে গেলেন। সেদিন থেকে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত গুরুদেবের মুখে দারুণ চিন্তার ছাপ, গম্ভীর উদ্বিগ্ন সে মুখ, কি ভাবেন, কি একটা চিন্তায় কবি যেন ডুবে আছেন, আর সারা মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ। তারপর যেদিন সুভাষের অন্তর্ধান এবং বার্লিন থেকে ঘোষণা শোনা গেল সেদিন গুরুদেব বল্লেন জান সেদিন কে এসেছিল— সুভাষ এসেছিল প্রণাম করতে। সুভাষের সব বিষয়ে গুরুদেব একমত না হলেও সুভাষকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। অন্তঃ টান ছিল তার প্রতি।"

আর গল্প শোনা হল না। আর শান্তিনিকেতন থেকে নিয়মিত চিঠি কারুর পাব না। শান্তিনিকেতনে গেলেও সেই অপরিচিত ছেলেটির জন্য আর কেউ আহার্য্য নিয়ে বসে থাকবেন না, গুরুদেব যে শিশুকে রেখে গিয়েছিলেন, সেই সুধাকান্ত দীর্ঘ ত্রিশবছর নিরবিচ্ছিন্ন সুধা ঢেলে আজ অমৃত-সাগর পাড়ি দিয়েছেন

Always insist on

Super Cycle Accessories

Carriers and Ancillary Cycle Accessories, the choice of the millions in India and abroad for superior quality, smooth mechanism and excellent finish. A true "Friend of the Road."

Indian Union Manufacturers Private Limited.
CALCUTTA-29.

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

'...আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত এবং স্কুল কলেজে সুভাষের মহান জীবন জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত।'

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু

...'সুভাষচন্দ্র' প্রথম খণ্ড পাঠের ফলশ্রুতি কেবল সমুদ্র স্নানের চরিতার্থতার সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। সমুদ্র সন্তরণ নিছক শারীরিক ব্যায়াম নয়, মানসিক সাহস ও বীর্যেরও উদ্দীপক। পবিত্রকুমারের সাধনার মধ্যে যে-কোনো পাঠক যুগপৎ সে ব্যায়াম ও বীর্যে নিষ্ণাত হতে পারার সঞ্জীবতাটুকু সংগ্রহ করতে পারবেন'—

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

'...এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।' —যুগান্তর

...'বিস্মিত হয়েছি লেখকের গভীর গবেষণায় আর অনুভূতির তীব্র মাধুর্যে, তাঁর ঐতিহাসিক সমীক্ষায় আর রাজনীতিক দূরাবগাহনে, পুলকিত হয়েছি তাঁর প্রসাদ-গুণসমৃদ্ধ ভাষার সাবলীল শ্রীমণ্ডিত ব্যবহারে, গভীর শ্রদ্ধার অকৃত্রিম আন্তরিকতায়।'

—যুগবাণী

দাম : নয় টাকা

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন : ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক। জয়শ্রী প্রকাশন : ২৫১-এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭

: উপন্যাস

উত্তরখণ্ড

কঙ্কাবতী বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

এগারো

রঘুজীর ভোঁসলার প্রধান সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহটকর এবার বিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। সঙ্গে দক্ষিণাপথের নামকরা সেনানায়ক আলীভাই করাওওল। আলীভাই জাতিতে মারাঠা, ধর্মে মুসলমান। যেমন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, তেমনি কূটনীতিতে ভাস্কররামের প্রধান সহায় এই আলীভাই। এছাড়া আরো একুশজন বাছা বাছা মারাঠা সর্দার সঙ্গে রয়েছেন।

যশোবন্তরাও গুজর, দাজীবা ভোঁসলে, মনাজী ভোঁসলে, সন্তাজী ভোঁসলে, বাপুজী কদম, ব্যাঙ্কটরাও ভাও, বলবন্তরাও শির্কে, সঠবাজী যাদব, সুভানজীরাও, জোতিবা কারভারী, নীলকণ্ঠরাও মোহিতে, বাবুজী মহাডীক, নারায়ণ ভোঁসলে, কৃষ্ণরাও নিম্বলকর, শ্রীপৎরাও মেহেকর, দাজীবা পাঠণকর, গোবিন্দরাও শেলুকর, শিবাজী জমাদার, নানা বখশী, রঘুজী গায়কোয়াড় এবং আরো একজন মুসলমান সর্দার শাহ আহমদ খাঁ।

ভাস্কর পণ্ডিত এবার একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেন। গেল বছর শুধু হাতে পালাতে হয়েছিল রঘুজী ভোঁসলাকে। গোলাবারুদ, তাঁবু, রসদ—সব ফেলে যেতে হয়েছিল।

আর ওদিকে পেশবা বালাজীরাও হঠাৎ এসে নবাববাহাদুরের কাছ থেকে ফাঁকতালে বাইশ লাখ টাকা আদায় করে নিলেন; তাছাড়া সুবে বাংলা মুলুকে আসার পথে বিহার এলাকা লুটপাট করে যা পেয়েছিলেন, তাতো নিয়েছেনই।

কিন্তু এবার আর পেশবা আসবেন না। পেশবা আর ভোঁসলার মধ্যে লুণ্ঠনের সীমানা ভাগ হয়েছে। কেউ কাউকে বাধা দেবেন না, কেউ কারো বিরুদ্ধতা করবেন না। যে যার নির্দিষ্ট এলাকায় ইচ্ছেমত অত্যাচারের আগুন জ্বালাতে পারবেন, চৌথ আদায় করতে পারবেন। গত বছরের লোকসান এবার পুষিয়ে নিতে হবে। কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করতে হবে। তাই ভাস্কর পণ্ডিতের এবার ভয়ঙ্কর মূর্তি। কোন দয়া নেই, কোন ক্ষমা নেই। ধনী-নির্ধন, শিশু বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে নির্যাতন শুরু হল।

চতুর্দিকে শুধু হত্যা আর লুণ্ঠন, শুধু ধ্বংস আর অত্যাচারের আগুন।

মেদিনীপুর আর বর্ধমানে হাহাকার পড়ে গেল। বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেন পরিবার পরিজন নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালালেন।

মহারাজার মত শক্তিমান, সম্পদশালী ব্যক্তিরই যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ জনমানুষের আর ভরসা কোথায়। বড় বড় জমিদার-মহাজন থেকে শুরু করে সামান্য গরীব-গৃহস্থ, তাঁতি, চাষী, কামার-কুমোর, মাঝি-মাল্লা—সবাই ভয়ে দিশেহারা।

নবাব আলীবর্দী খাঁনও দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। বছরের পর বছর এই উৎপাতের সঙ্গে লড়াই করে করে তাঁর সৈন্যদল ক্লান্ত, বিরক্ত, অবসন্ন। এদিকে রাজকোষ শূন্য। চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙে পড়ার মুখে।

নিরুপায় নবাববাহাদুর অগত্যা স্থির করলেন বর্গীদের সঙ্গে

বেইমানী করতে হবে। শঠে-শাঠ্যং সমাচরেৎ। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে হাতের মুঠোয় এনে সব কয়জন সর্দারকে খুন করাতে হবে।

বর্গীদের শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন নবাব আলীবর্দী খাঁন। অযথা লড়াই করে লাভ কি?

সুবে-বাংলা-বিহার উড়িষ্যা থেকে বছর বছর চৌথ, অর্থাৎ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ পাবেন রঘুজী ভোঁসলা।

ভাস্কর পণ্ডিত তখন দিগনগরে ছিলেন। কাটোয়া থেকে ষোল ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম আর বর্ধমান শহর থেকে নয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এই দিগনগর। সেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন ভাস্কররাম।

নবাব বাহাদুর ছিলেন আমিনগঞ্জে। সন্ধির প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হলেন ভাস্কর পণ্ডিত।

হয়তো ভেবেছিলেন, নবাব বাহাদুরকে চাপ দিলেই টাকা আদায় হবে। হয় তো মনে করেছিলেন, গেল বছর যখন বিনা মেহনতে বাইশ লাখ টাকা বার করে নিলেন পেশবা বালাজীরাও তবে তিনিই বা কেন, কিছু চাপ দিয়ে, কিছু ভয় দেখিয়ে কিছু দর কষাকষি করে টাকা আদায়ের পাকা-পাকি একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন না। তা'ছাড়া নবাব নিজেই যখন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তখন আলাপ-আলোচনা করতে অসুবিধে কি? বরং লড়াই না করে, মারামারি কাটাকাটির অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে না গিয়ে, যদি কূটনীতির পথে কাজ হাসিল হয়, তবে রঘুজী ভোঁসলা নিশ্চয়ই তাকে তারিফ করবেন। আর নাগপুরের দরবারে তার প্রভাব প্রতিপত্তিও অনেক বেড়ে যাবে।

যে সব সর্দাররা তাকে মনে মনে ঈর্ষা করে, তারা আরো জ্বলবে, আরো জব্দ হবে।

অতএব, সন্ধির কথা পাকাপাকি করার জন্য আলী ভাইকে নবাবের নিকট পাঠালেন ভাস্কর পণ্ডিত।

আমিনগঞ্জে নবাব-শিবিরের প্রচুর আদর আপ্যায়ন, খানদানী আদব-কায়দা আর খানাপিনায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন আলীভাই। সদা সতর্ক যোদ্ধা, ধূর্ত আলীভাইও বৃদ্ধ নবাব বাহাদুরের প্রশান্ত মুখশ্রী দেখে আর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে ভেতরের মতলব কিছু আন্দাজ করতে পারলেন না। পুরোপুরি বিশ্বাস নিয়ে বিদায় হলেন তিনি।

সেদিন ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হয়েছে। সেদিন সকালবেলা যমুনা বলছিল—আচ্ছা, আপনি কেমন পুরুষ মানুষ, নিজের বউএর শরীর খারাপ কিনা জানেন না, সে কথা কি অন্যলোকে বলে দেবে—

—সেবার নবান্নের সময় দেখে এলুম—আমতা আমতা করে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—তখন তো শরীর খারাপ কিছু দেখলুম না, রাধাও কিছু বললো না—

—ওমা, আমি কোথায় যাব—মুখে আঁচল তুলে কুল কুল করে হেসে উঠল যমুনা—এসব কথা আবার কোন মেয়ে মুখ ফুটে বলতে পারে নাকি—

শিবদাস মুখুজ্জের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। এই ঘরটায় আগে থাকতো ভারতচন্দ্র। এখন খালি পড়ে আছে। পরিপাটি নিকোনো মাটির দাওয়ায় কাঁঠাল কাঠের পিড়িতে বসেছে ভারত। গেল অগ্রহায়ণ মাসেও এই দাওয়ায় বসে রামায়ণ পাঠ করত সে।

গেল মাঘী পূর্ণিমায় এখানে বসে নিজের লেখা সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ করে শুনিয়ে গেছে। এখন যমুনার কথাবার্তা শুনে কেমন বিব্রত বোধ করছিল।

কিছুক্ষণ আগে শিবদাসের মুখে রাধার শরীর খারাপের খবর পেয়ে কিছু উদ্বেগ, কিছু আশঙ্কা নিয়ে বেশ ব্যস্তভাবেই চলে এসেছিল ভারত। কিন্তু যমুনার কথার ধরণ আর হাসি হাসি মুখ দেখে আশ্বস্ত হয়েছে। অনুমান করেছে, হয়তো রাধার অসুখটা তেমন গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু সামান্য অসুস্থতার খবর নিয়ে বিশ্বনাথ এমনভাবে ছুটে আসবে কেন?

একখানি কাঁসার রেকাবিতে যমুনার ছোট জা' গায়ত্রী কিছু জলপান নিয়ে এল।

ঘরে তৈরী নারকেলের সন্দেশ, মুড়কি, পাটালীগুড়। রাধার খুড়তুতো বোন এই গায়ত্রী।

সাবিত্রীর ছোটবোন। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক যদিও, তবে একটু লাজুক। মুখ ঢেকে ঘোমটা সবসময়। ঘোমটার ভেতর থেকেই বোধহয় হাসছিল গায়ত্রী।

হাসিমুখে ধমক দিল যমুনা—এই মুখপুড়ি, তুই হাসছিস কেন লা—তারপর ভারতকে লক্ষ্য করে বললো—দেখুন আপনার কাণ্ড শুনে গায়ত্রীও হাসছে, সবাই হাসবে—

—কিন্তু কাণ্ডটা যে কি করলুম, তাতো বুঝতে পারছিনা—না বোঝার ভাণ করে বললো ভারত। কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও যমুনার মুখ থেকে সোজাসুজি না শোনা পর্য্যন্ত ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

—ওমা, আমার কি হবে—মুখে আঁচল তুলে আবার হেসে উঠল যমুনা, হাসতে হাসতে বললো

—কাণ্ডতো আপনিই করেছেন, আপনিই তো ষোল আনা দায়ী—তারপর গায়ত্রীকে লক্ষ্য করে—এই মুখপুড়ি, তুই এখানে দাঁড়িয়ে হাসছিস কেন, যা এখান থেকে—

একেবারে চলে গেল না গায়ত্রী, চোখের আড়ালে সরে দাঁড়াল মাত্র।

আবার জিজ্ঞেস করল যমুনা—সত্যিই আপনি কিছু বুঝতে পারেননি, না আমার সঙ্গে চালাকি করছেন—

—চালাকি করবো কেন—একটা নারকেলের নাড়ু মুখে দিয়ে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—মেয়েদের মনের খবর কে বুঝতে পারে বলুন, স্ত্রীরাশ্চরিত্রম, দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ—

—আহা, আপনি এত বড় পণ্ডিত, এত শাস্ত্র পড়েছেন, এত রসের কথা জানেন, মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারেন, পাচালী লিখতে পারেন আর এই কথাটা বুঝতে পারছেন না—

যমুনার কথা শুনে আগের মতই মাথা নাড়ল ভারত, আরেকটা নাড়ু তুলে মুখে দিল।

আবার বললো যমুনা—তাহলে আমাকেই কথাটা ভেঙে বলতে হচ্ছে, রাধার যে ছেলেপুলে হবে, এই বোধহয় আট মাস, সামনের মাসে ভাল একটা দিন দেখে ওর সাধ দেওয়া হবে, এখন বিশুর হাতে মিষ্টি আর শাড়ি কিনে পাঠিয়ে দিন, আমাদেরও মিষ্টি মুখ করাতে হবে, এই বলে রাখছি—

যদিও যমুনার কথাবার্তার নমুনার আগেই এরকম কিছু আন্দাজ করেছিল, তথাপি সোজাসুজি খবরটা শুনে কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন আচ্ছন্নের মত বসে রইল ভারতচন্দ্র।

একসঙ্গে আনন্দ, বিস্ময়, বেদনা আর দায়িত্ববোধের বিচিত্র অনুভূতি। দেশব্যাপী এই দুর্বিপাকের মধ্যে, এই আতঙ্ক আর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তার প্রথম সন্তান আসছে। সে নিজে এখনো প্রায় নিরাশ্রয় আর রাধাও পড়ে রইল বাপের বাড়ি।

স্বামীর সংসারের সুখ-শান্তি, শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, কিছুই তার অদৃষ্টে জুটল না। এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেই ভুরশুট রাজবংশের বউ, নতুন বংশধরের জননী হতে চলেছে।

একবার ভাবল ভারত, ভুরশুটের বাড়িতে বাবা-মাকে কি একটা খবর দেওয়া উচিত, পরক্ষণেই মনে হ'ল রাধাকে তো তারা গ্রহণ করেননি, তার বিয়েটাই তারা কেউ স্বীকার করেননি। এ অবস্থায় কোনমুখে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াবে সে। না, ভুরশুটের বাড়িতে আর যাওয়া চলে না, যাওয়া ঠিক হবে না। যদি কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—

—ওকি আপনার কি হ'ল, কি ভাবছেন—যমুনার কথায় খেয়াল হ'ল ভারতের, শুকনো মুখে সামান্য হাসল—না কিছু হয়নি—

—তবে খাচ্ছেন না কেন—মুখ টিপে হাসল যমুনা—রাধার কথা ভেবে মন খারাপ হল নাকি, ভয় নেই, রাধার শরীর

ভালই আছে, অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি, আমাদের কর্তাটির কাছে কিছু খুলে বলিনি, শুধু বলেছিলুম, রাধার শরীর খারাপ, তুমি রায়-জামাইকে পাঠিয়ে দাও, এখুনি আসতে বলবে, বিশেষ দরকার—

—হ্যাঁ, প্রথমে আমারও ভাবনা হয়েছিল—মৃদু হাসিমুখে বললো ভারত—মুখুজ্জে মশাই যেমন হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে খবর দিলেন, বিশ্ব নাকি অনেক রাতে এসে পৌঁছেছে, আমি ভাবলুম কি জানি কি হ'ল, তাড়াতাড়ি যাই, শুনে আসি—

—সে কথা আর বলবেন না, কাল রাত দুপুরে এসেছে বিশ্ব, আপনি তো জানেন, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই বেশ রাত হয়ে যায়, তারপর রান্নাঘর মুক্ত করে, এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে মুছে সবে ঘরে এসে পান সাজতে বসেছি, এমন সময় হঠাৎ বিশ্বর গলা শুনে আমার বুকের মধ্যে যে কিরকম করে উঠল, সে কথা আর কি বলবো—

—অত রাত হয়েছিল কেন—

—ওদের নৌকা নাকি তুখোড় বাতাসের মুখে পড়ে কোন চড়ায় আটকে গিয়েছিল, জোয়ার আসা পর্য্যন্ত সেখানেই আটকে ছিল—

—এখন কোথায় গেছে বিশ্ব—

—গঙ্গার ঘাটে গেছে, এসে পড়বে এক্ষুনি, আজ দুপুরেই আবার চলে যাবে, আপনি আর দেরি করবেন না, কাপড় আর মিষ্টি যাহোক এইবেলা কিনে আনুন—

যমুনার কথামত আর দেরি করল না ভারত। মহেশকুণ্ডুর আড়ত থেকে রাধার জন্য তাঁতের শাড়ি কিনল একজোড়া। গোবিন্দ ময়রার দোকান থেকে খোয়া ক্ষীর, সন্দেশ, ফেণী-বাতাসা, কদমা, পাটালী গুড়, আর দই কিনল কয়েক হাঁড়ি। কিছু পাঠাল বিশ্বর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি, কিছু দিয়ে এল যমুনার হাতে। তারপর বিশ্বনাথের নৌকা ভাড়া মিটিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে যখন ফিরে এল ভারতচন্দ্র, তখন বেলা দুপুর ঘুরে গেছে। তখন ঘরের সামনে রোয়াকের পাশে সুলেমান কাগজীকে বসে থাকতে দেখে মনে পড়ল, এ মাসে সুলেমান-কে সে আসতে বলেছিল, দু'দিস্তা কাগজ নিয়ে রাখবে। কিন্তু এখন তার হাতে আর একটি টাকাও অবশিষ্ট নেই। গুটি চার পাঁচ টাকা যা এই দু'তিন মাসে জমেছিল, সব একসঙ্গে খরচ হয়ে গেছে। তাকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল সুলেমান মিঞা, হাসিমুখে সেলাম দিয়ে বললো—

আদাব, পণ্ডিতমশয়—

—এই যে সুলেমান, কি মনে করে—

—আজ্ঞে আপনি যে বলেছিলেন কাগজ নেবেন, তাই দুদিস্তে নে আলাম—

—কিন্তু এখন তো আমার হাতে টাকা নেই, সুলেমান—

—ট্যাকার জন্যি কি আছে, সে আপনি যখন মনে করেন দেবেন—

য-এর উচ্চারণ সুলেমানের মুখে ঝ-এর মত শোনায়।

—না সুলেমান, আর ঋণের বোঝা বাড়াব না, একেই নানা মানুষের উপকারের ঋণে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি, তার উপর আবার তোমার কাছে নগদ অর্থের ঋণ আর বাড়াতে চাই না—

এই গুরুতর মন্তব্যের তাৎপর্য বোধহয় বুঝতে পারল না সুলেমান, লম্বা জিভ কেটে খোশামোদের সুরে বললো—

কিযে বলেন পণ্ডিতমশয়, আপনারা হলেন এলেমদার লোক, কত বিদ্যে আপনাদের প্যাটে, আপনি জলের মত ফারসী পড়তি পারেন, এই ফরাসডাঙ্গায়, গোন্দলপাড়ায় অনেক হিন্দুর পণ্ডিত দেখেছি আবার অনেক মোল্লা-মৌলভীও দেখেছি, আসুক দেখি কেউ আপনার মত ফার্সী জানা লোক, মোরা মানুষ চিনি, আপনাদের দুয়ারে ঘুরি ঘুরি প্যাটের ভাত যোগার করি, আপনারা কাগজ না রাখলি মোদের চলবেডা কিসি—

বলতে বলতে কাপড়ের পুটুলি খুলে দু'দিস্তা তুলোট কাগজ বার করে সামনে ধরল সুলেমান।

—কিন্তু আমার হাতে টাকা নেই, সুলেমান বিশ্বাস করো—

— আহা ট্যাকার কথা কে বলতিছে, আপনি যখন খুশি দেবেন আগে লিনিষ দেখুন, আপনার জন্যি দু'দিস্তে আলাদা করে রেখেছি—

চমৎকার মসৃণ কাগজ। সুলেমানের হাতের কাজ ভাল। কাগজগুলি উল্টেপাল্টে দেখে ঘরের ভেতর রেখে এল ভারত। পোটলাপুটলি বেঁধেছেদে আবার আদাব দিয়ে চলে গেল সুলেমান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রামধন এসে উপস্থিত।

—আমি দু'বার এসে আপনার সিধে নিয়ে ঘুরে গেছি—

—এবেলা আর রান্না করব না রামধন, শিবদাস মুখুজ্জে-মশাইর বাড়িতে চিড়ে-দইর ফলার খেয়েছি—

ভারতের জবাব শুনে আমতা আমতা করে বললো রামধন—একেবারে কিছুই খাবেন না, একটু দুধ এনে দিই—

এরকমভাবে খাতির করার কথা নয় রামধনের। মতলবটা বুঝতে পেরে হাসি পেল ভারতের।

আবার সেই বিয়ের কথা তুলতে চায় বোধহয়।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মশাইর সেরেস্তার হুকোবরদার সাধুচরণ। রামধনের দেশের লোক, তাদের পালটি ঘর। ভারতচন্দ্রকে নাকি মান্যগণ্য করে সাধুচরণ। অন্ততঃ রামধনের তাই ধারণা। এখন সাধুচরণের দশ বছরের মেয়ে হরিমতীর সঙ্গে বিয়াল্লিশ বছর বয়সের রামধনের সম্বন্ধ স্থির করে দিতে হবে।

এতো মহামুস্কিলের ব্যাপার হ'ল, দেখছি। অন্যসময় হলে রামধনের সব কথাই ধৈর্য ধরে শুনতো ভারতচন্দ্র। শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করত। কিন্তু এখন আর ভাল লাগছে না। নতুন দু'দিস্তা কাগজ পেয়ে এখুনি লিখতে বসতে ইচ্ছে করছে। মুখে মুখে যে কবিতাগুলি বানিয়েছে সেগুলি লিখে রাখা দরকার। দিন কেটে যাচ্ছে, সময় চলে যাচ্ছে। বয়স হচ্ছে।

আর কবে লিখবে? কবে নিশ্চিন্ত মনে বসে কালজয়ী কাব্যরচনার অবসর পাবে, কে জানে?

—না রামধন, এবেলা আর কিছু খাব না, আচ্ছা তুমি এসো—

দরজার কাছেই কম্বলের আসন পেতে পুঁথিপত্তর নিয়ে বসল ভারতচন্দ্র।

তখন দুপুর ফুরিয়ে যাচ্ছিল। সেই ফাল্গুনের শেষ দুপুরে যখন গোন্দলপাড়ায় রামেশ্বর মুখুজ্জের বারবাড়ির অতিথি-শালার ঘরে বসে নতুন কেনা তুলোট কাগজে ছোট ছোট কবিতাগুলি লিখে রাখছিল ভারতচন্দ্র, ঠিক তখন দিগনগরে ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে ফিরে এসেছিলেন আলীভাই করাওওল।

(ক্রমশঃ)

In any language, it's sweet

In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

জাপানের দিনগুলি

বারীন বর্দ্ধন

উৎসবের দিনগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কেউ হয়ত রাজকীয় কি ঐ জাতীয় নির্দেশের বলে দিনগুলি ঠিক করে দিয়েছে। তারজন্যে প্রয়োজন হয়নি কোন পণ্ডিতীয় বিধান বা পাঁজীর তিথিনক্ষত্র। যেমন মার্চ মাসের তিন তারিখ জিনামাৎসুরী, মে মাসের পাঁচ তারিখ কোইনোবোরী, জুলাইয়ের সাত তারিখ তানাবাতা। উৎসবটা কবে হচ্ছে, পূর্ণিমা আজ রাত পুরো থাকবে না রাত্রিশেষে সুরু হয়ে কাল অবধি চলবে—এ সমস্ত প্রশ্নের কোন বালাই নেই। কেউ কোনদিন ভুলবে না এমনি করে সাজান আছে তারিখগুলো। অর্থাৎ তৃতীয় মাসের তিন তারিখ, পঞ্চম মাসের পাঁচ তারিখ, সপ্তম মাসের সাত তারিখ। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত আর গুপ্তপ্রেসের মতামত নিয়ে মারামারি, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত নিতান্তই বিশুদ্ধ কি না, এর প্রয়োজন নেই জাপানী জীবনে। কেবল একটি মাত্র উৎসবের কথা জানি যে মানে না কোন তিথিনক্ষত্র বা দিনের নির্দেশ।

ওচা নো ইউ বা সবুজ চা নিয়ে উৎসব। জাপানে কোন ক্যালেণ্ডারের পাতায় লেখা নেই এর জন্মতারিখ। আসলে এই উৎসবটা একান্তই ঘরোয়া। সবাই যে ভক্তিসহকারে পালন করবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একসঙ্গে বসে চা খাওয়া—উৎসবের আভিজাত্য বলতে কিছুই নেই। না রয়েছে এর পিছনে কোন রূপকথা বা ধর্মীয় শাসন। তবু যে রকম জাকজমক করে এবং কায়দাকানুন মেনে জাপানীরা এ কাজটি করে তাতে 'ওচা নো ইউ' আর বাকী চারটা উৎসবের মতই এক আসনে ঠাঁই পাবার উপযুক্ত।

সাধারণ কাজকর্মের ফাঁকেও সুন্দরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, বাস্তবের উপর সেই সুন্দরকে যথাসম্ভব রূপায়িত করার চরম আগ্রহ—এ থেকেই জন্ম নিয়েছে জাপানী শিল্পকলা বা আর্ট; এ থেকেই প্রাণে পেয়েছে ওচা নো ইউ। উৎসবে রূপায়িত হয়েছে হানামি বা ফুলের উৎসব, ও ৎসুকিমি বা চাঁদ দেখার উৎসব। তৈরী হয়েছে জাপানী উদ্যান যার সঙ্গে পরিচয় নেই এমন রসজ্ঞ ব্যক্তি দুর্লভ।

বৌদ্ধ ধর্মের জেন সম্প্রদায় থেকে ওচা নো ইউ-র গোড়াপত্তন। যদিও এর বর্ত্তমান চেহারার পিছনে রয়েছে শোগুন ইত্তসিমাসা এবং সেন্‌নো রিউকিউর শিল্পীমনের ছাপ।

জাপানে থাকাকালীন ওচার উৎসবে যোগ দিইনি কোনদিন। কিন্তু থিয়েটার বা নাটকের মাধ্যমে যদি সমস্ত রীতিনীতি মেনে উৎসবটা পালন করা হয়, তবে ষ্টেজের উপর রূপায়িত হলেও তার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। ব্যাপারটা ঘটেছিল একটা অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে।

২০শে নভেম্বর ছিল 'গাইগোর' ভিত্তিস্থাপনের দিন। কাজেই প্রতিবছর এই ২০শে নভেম্বর বেশ জাকজমকের

সঙ্গেই পালন করা হত। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রকমও ভিন্ন। আমাদের দেশে এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার।

বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা বুঝি এমন একটা অধ্যাপনার স্থান যেখানে শুধু অধ্যাপনাই শেষ কথা নয়। তার অধীনে থাকবে কতগুলো কলেজ এবং প্রতিবছর কলেজগুলোর শেষ পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান করবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম করেও আট দশটি বিষয় নিয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন আছে কলিকাতা, দিল্লী বা আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব এবং ব্যবস্থা আলাদা ধরণের। ভারতীয় অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় জাপানে নেই এবং সেজন্য টোকিও সহরে বিশটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে শুনলে প্রথমটা অদ্ভুত লাগলেও অসম্ভব নয়।

জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি কি দু'টি বিষয় নিয়ে অধ্যাপনা করে। একটু বিশদভাবে বললে বলা যায়—জাপানী মানদণ্ডে প্রেসিডেন্সী বা স্কটিশচার্চ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ভুক্ত। নিরঙ্কুশ নিজেদের। বাইরের কেউ তার মধ্যে মাথা গলায় না। হায়ার সেকেণ্ডারীর শেষে আমাদের ছেলেরা কলেজে ভর্ত্তি হয় এবং ছয় বৎসর কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় থেকে পড়াশুনা করে বেরিয়ে আসে সার্টিফিকেট্ বা ডিপ্লোমা নিয়ে। এখানেও হায়ার-সেকেণ্ডারীর পর ছেলেরা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে পারে। তবে তার আগে ঠিক করে নেয় কোন বিষয় নিয়ে ছয় বৎসর পড়াশুনা করবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সব রকম ব্যবস্থা নেই। কেউ যদি পড়তে চায় কৃষিবিদ্যা, তাকে যেতে হবে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারোর যদি ইচ্ছা হয় অর্থশাস্ত্র বা কমার্স পড়তে তবে তাকে যেতে হবে মুশাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার কেউ যদি ভাবে যে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে বিদেশীভাষা শেখা প্রয়োজন, তবে সে চলে আসবে আমাদের 'গাই গো' তে।

এই 'গাই গো' ছিল সারা জাপানের মধ্যে বিদেশী ভাষা শিখবার পীঠস্থান। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান্ থেকে সুরু করে হিন্দী, বাংলা, ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি পনরটা ভাষা শেখবার ব্যবস্থা ছিল এখানে। আর অধ্যাপকরাও যে সব বিদেশী ছিলেন তা নয়। প্রতি বিভাগের গড়পড়তা তিনজন করে অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিদেশী। অর্থাৎ বিদেশের কাছে যতটা সম্ভব কম ঋণ স্বীকার করে কাজ চালান যায় তারই প্রচেষ্টা। কাজেই ঐ একজন বিদেশী অধ্যাপককে বাদ দিয়ে বাকীরা সকলেই ছিলেন, 'গাই গো' থেকে ডিগ্রী পাওয়া ছাত্র। তারা ডিগ্রী পাবার পর সেই ভাষাভাষীদের দেশে গিয়ে নিজেদের জ্ঞান এবং ধারণা সেই দেশের জলমাটিতে পুষ্ট করে এনেছেন। হিন্দী ভাষার অধ্যাপক দোই ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর এবং এই তিনবছর হিন্দী চর্চা করে যখন ভারতীয় চেহারা দেখে এগিয়ে এসে পুরোপুরি এলাহাবাদী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের কুশল-বার্ত্তা, তখন আমার চেয়ে ডাক্তার আগরওয়ালই হয়েছিল বেশী হতচকিত।

জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাঠামো মোটামুটি এই রকমের। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ করলেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া গেল তা মনে করা ঠিক হবে না। ভর্ত্তি হতে গিয়ে আবার আরেক প্রস্থ পরীক্ষা পাশ করতে হবে এবং এবারকার পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্ত্তৃপক্ষ। তার প্রশ্নপত্র থেকে সুরু করে প্রতিটি ব্যবস্থা আলাদা। ভর্ত্তি হওয়া থেকে সুরু করে প্রতিটি পরীক্ষার পরিচালনার দায়িত্বও এদেরই। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়াশুনা করে যে পরের বছর বিষয় পালটিয়ে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলাম, সে হবার জো নেই। বসে থাকতে হবে ভর্ত্তি হবার পরীক্ষার জন্য।

এবং সবার সঙ্গে সে পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই ভর্তি হবার ছাড়পত্র পাবে, নতুবা নয়।

আমরা ভারতীয় তিনজন ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের ছেলেই ছিল এই 'গাই গো'র ছাত্রমণ্ডলীতে। পাকিস্তান, বর্মা, শ্যামদেশ, ভিয়েৎনাম বা ফিলিপাইন—কোন দেশের ছেলেই বাদ যায় নি। সবাই এসেছে নানা রকম কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ব করতে। জাপানে থাকবে চার থেকে পাঁচ বছর। কেউই আসে নি আমাদের মত এক বছরের মেয়াদে জাপানী ভাষা ও সংস্কৃতি শিখতে। তবে আমাদের পড়াশুনা হচ্ছিল একই সঙ্গে। বিদেশী ভাষার পীঠস্থানে স্বদেশী ভাষা শিক্ষার বিভাগ। শুনে অদ্ভুত মনে হলেও ব্যবস্থাটা ছিল বিদেশী ছাত্রদের জন্য জাপানের মাটিতে ভাষাগত বৈষম্যের নিরসন করা। উদ্দেশ্য ছিল এক বছরে দেশীয় ভাষাটা আয়ত্ব করতে পারলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের আর অসুবিধা পোয়াতে হবে না। ইংরেজী বা কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা চলে না জাপানে। সবই চলে জাপানী ভাষায় এবং বই পত্র ইত্যাদি ছাপা হয় জাপানী হরফে। অসুবিধার প্রথম ঝড়টা কাটাবার জন্যই হয়েছিল 'গাই গো'র জাপানী বিভাগের সৃষ্টি।

বিরাট জায়গা নিয়ে তৈরী হয়েছে এই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়। দু'টো দালানে হয় পড়াশুনা। তাছাড়া আছে নাট্যশালা, আছে খেলাধুলার জন্য ছেলেদের কাপড় ছাড়বার ঘর। হাজার থেকে বারশ' ছেলে মেয়ে পড়াশুনা করে এই 'গাই গো'তে। সিট্ না থাকার দরুণ ফিরেও যায় ততোধিক ছেলেমেয়ে। সরকারের দায়িত্ব শুধু মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাই মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষার পরই জাপানীদের বেছে নিতে হয় ভবিষ্যতের কর্মপন্থা। নগ্ন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই সুরু হয় স্কুলে থাকতে থাকতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা পেলে এরা নিজেদের মনে করে ভাগ্যবান। অধ্যয়নটা হয়ে পড়ে অনেকটা তপস্যারই অঙ্গ।

গাই গোর ময়দানে ফুটবল, রাগবী, বেস্‌বল খেলা হত সাধারণতঃ লাঞ্চের সময় অথবা ক্লাশের শেষে। খেলার শিক্ষক এসে দেখাচ্ছেন রাগবী বল নিয়ে কি করে দৌড়োতে হয়। তাই অনুকরণ করছে ছেলের দল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যার ঝোঁক আছে বক্সিং-এর দিকে সে হয়ত পুরো দু'ঘণ্টা খড়ের তৈরী নকল মানুষের মাথা বুক লক্ষ্য করে অনবরত ঘুষি চালাচ্ছে। কারোর হয়ত নজর আছে লেখাপড়ার সাথে সাথে গানবাজনার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেজন্য ব্যবস্থা রয়েছে বিলেতী বাদ্যযন্ত্রের। আমাদের 'গাই গো'তেও ছিল বেহালা, হার্মোনিয়াম থেকে সুরু করে অর্গ্যান্ বাঁশী ইত্যাদি। আর ছিল ডজনখানেক টাইপরাইটার। ক্লাশের ফাঁকে ইচ্ছে মত টাইপিং শেখা হয়ে যাচ্ছে।

টোকিও সহরে লোক গিস্ গিস্ করছে। ট্রেন, ট্রাম, বাস, 'সাবওয়ে'—কিছুতেই রক্ষা নেই ভীড়ের হাত থেকে। প্রতি বাড়ীতে যদিও বা একটু চৌকোণো জমি আছে, কিন্তু সন্ধ্যাশীতল হাওয়া খেতে খেতে সে উঠোনে পদচারণা করা একেবারেই অসম্ভব। আশী লক্ষ লোকের বাস এই টোকিওতে। খোলা জায়গার যে অভাব হবে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কিন্তু বিশেষত্ব ছিল এই স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পাউণ্ড্‌গুলি। স্কুলের বাড়ী ছাড়াও রয়েছে খেলাধুলা বা স্পোর্টসের ময়দান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনটার কথা আজও মনে আছে। জাপানী ভাষার ক্লাশে সবাই মিলে আমরা ছিলাম কুড়িজন। বেলা এগারটা নাগাদ আমরা সবাই গিয়ে পৌঁছেছি। অফিসেরই এক ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এলেন দোতলায় এবং বসিয়ে দিয়ে গেলেন কমনরুমের লম্বা টেবিলের চারপাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দরওয়ান বা বেয়ারা বলে কিছুই নেই। সবাই যে যার কাজ করে যাচ্ছে। ক্লাশ শেষে

ঘণ্টা বাজাবার জন্ত প্রয়োজন হয় নি কোন গালপাট্টাধারী বিহারী বা হিন্দুস্থানী দরওয়ান। প্রতি দু'তিন ঘর অন্তর আছে একটি করে ইলেক্‌ট্রিক বেল্। একটু পরেই অধ্যাপকেরা সব একে একে এসে কমন্ রুমে ঢুকলেন। পরিচয় দেওয়া নেওয়ার পালা চলল কিছুক্ষণ। হাসিঠাট্টার মাঝেই দেখা হয়ে গেল ছাত্র আর মাষ্টারে। তারপর ধীরে ধীরে সে পরিচয় হয়েছে আরও গাঢ় এবং শেষের দিকে ছাত্র মাষ্টারের সম্পর্ক পরিণত হয়েছিল নিছক বন্ধুত্বে। সেজন্তই আরও বিশদভাবে জাপানী মাষ্টারদের দেখতে পেয়েছিলাম অনেকটা ঘরোয়া পরিবেশে।

তখন শীতের সুরু। কাঠের তৈরী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী হয়ে পড়েছে বেজায় ঠাণ্ডা। হাওয়া আসছে এদিক ওদিক সবদিক থেকে। হাতে দস্তানা পরেই বসে আছি আমরা কয়জন। আর ভাবছি কি করে রুখব ঠাণ্ডার তাড়না। ইতিমধ্যে কুরাতা সেন্‌সেই এলেন পড়াতে। তিনি ছিলেন জাপানী ভাষা বিভাগে সবার উপরে। যাকে বলে ইন্‌চার্জ। কাজেই অন্যান্য অধ্যাপকদের তুলনায় অতিরিক্ত গম্ভীর। আমাদের দিকে তাকিয়ে সমস্যাটা আঁচ করে নিলেন এবং পরক্ষণেই ডাক্তার আগরওয়ালাকে ডেকে বললে—আগরওয়াল সান্, একটু সাহায্য করবেন কি?

কুরাতা সেনসেইর সঙ্গে ডাক্তার আগরওয়াল বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই দু'জনে মিলে বিরাট 'হিবাচি' বয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে একটা সবুজ চায়ের কেট্‌লি। আমরা সবুজ চা খেতে খেতে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। শুধু দেখলাম ডিপার্টমেণ্টের মাথা হলেও 'হিবাচি' টানাহেঁচড়ার জন্ত লোক ডাকাডাকি করলনা একটুও। ক্ষুদ্রাকৃতির 'হিবাচি' হলে হয়ত একাই নিয়ে আসত। ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু মনে রাখবার মত বই কি! সমস্ত কোট্ প্যাণ্ট্ আর জুতো পরে 'হেড্ অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট্' উনান বয়ে আনছে অধ্যাপকদের ঘর থেকে ক্লাশরুমে। বড় বড় স্কুল কলেজ তো দূরের কথা। গ্রামের ক্ষুদ্র পাঠশালাতেও এ জাতীয় ঘটনা সম্ভব কিনা জানিনা।

এর আগেও দু'একবার বলেছি জাপানী জীবনে শ্রমের মর্যাদার বাস্তব রূপায়ন সম্বন্ধে। অর্থনৈতিক মন দিয়ে জাপানী জীবন পর্যালোচনা করে এর উত্তর পাবার চেষ্টা করেছি। জাপানী বন্ধুদের নানা কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলাম যে গুটিকয়েক বাদ দিলে কেউই পাঁচশ' বা হাজার টাকার চাকুরী সুরু করেনা। সবাই নীচ থেকে যথারীতি কাজ দেখিয়ে তবেই আফিসের কর্ণধার হতে পারে। অর্থাৎ উঁচু নাক নিয়ে পরকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা এদের কর্মজীবনের অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

অধ্যাপক ওনো ছিলেন শ্যামদেশীয় ভাষার অধ্যাপক। তবে প্রতি সপ্তাহে একটা করে জাপানী ভাষার ক্লাশও নিতেন। ভদ্রলোক ছিলেন অনেকটা দিলদরিয়া মেজাজের। সবই খোলাখুলি। পড়াতে গিয়ে সাধারণের চেয়ে একটু জোরে কথা বলতেন। কিন্তু মাত্রাটা সপ্তমে চড়ে যেত কারো থেকে শুদ্ধ উত্তর না পেলে। কণ্ঠস্বরের আকস্মিক উত্থান পতনের দরুণ পাশের ঘরের অধ্যাপকেরা আগে থেকেই দরজা বন্ধ করে রাখতেন।

সেই ওনো সেনসেই একদিন এসে বললেন—আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি ক্লাশ ছেড়ে দেব। এক জায়গায় ছাত্র পড়াতে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—সে কি! আপনি শ্যামদেশীয় ভাষার পাকাপাকি অধ্যাপক। জাপানী ভাষা পড়াবার জন্তও নিশ্চয়ই কিছু রোজগার করেন। আপনাকে আবার ছাত্র পড়াতে হবে কেন?

—দেখুন, সব মিলিয়ে প্রায় আড়াইশ' টাকার মত হয়। কোনরকমে তিনশ' টাকা মাসে রোজগার করতে পারলে চারজন অর্থাৎ গিন্নী আর দু'টো ছেলে নিয়ে বেশ আরামে

থাকা চলে। তাই একটু বাইরের কাজও করতে হয় বই কি।

টোকিওর মত সহরে চার কি পাঁচজনের একটি পরিবার তিনশ' টাকায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই থাকতে পারে। অধ্যাপকদের মাহিনা সুরু হয় একশ দশ কি একশ' কুড়ি টাকা থেকে। এরপরেও কি বলা যায় জাপানে জীবনযাত্রার খরচ আমাদের দেশের তুলনায় বেশী? হয়ত বেশী নয়। হয়ত কর্মজীবনের সুরুতে মাসিক অঙ্কের পরিমাণ এবং তার তারতম্যতা অস্বাভাবিক নয় বলেই সবার অলক্ষ্যে জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ এদের চরিত্রে এসে গিয়েছে। কিন্তু সর্বসাকুল্যে আড়াইশ' কি তিনশ' টাকায় সংসার চালান যে ধারণারও অতীত! দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কোথায় এই গোপনীয় সত্ত্বাটি লুকিয়ে রয়েছে? টেন্‌কাৎসুর দেশে মুহূর্তে ষ্টেজের উপর হাতি অদৃশ্য করার মতই কি এই ভোজবাজী?

জাপানে থেকে অর্থনৈতিক মন দিয়ে যা উপলব্ধি করেছিলাম তাতে মনে হয় এর মূলে রয়েছে একটি মাত্র ব্যবস্থা। সাধারণের জীবনধারণোপযোগী জিনিষগুলির দাম সাধারণের নাগালের বাইরে নয় বলে। কিন্তু তার মধ্যেই যদি কেউ নিজের রুচিজ্ঞানের তাড়নায় একটু উন্নততর জিনিষের খোঁজ করেন তবে তাকে দাম দিতে হবে চতুর্গুণ।

জাপান শীতপ্রধান দেশ। তাছাড়া জীবনযাত্রার মান আমাদের চেয়ে অনেক উপরে। শ্রমিকদের জুতো না হলে চলে না। অথচ জাপানে চাহিদা মেটাবার পক্ষে চামড়ার পরিমাণ নেহাৎই অল্প। বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। আমদানী চামড়ার তৈরী জুতো প্রতি জোড়া পঞ্চাশ থেকে ষাট্ টাকা। শ্রমিকদের নাগালের বাইরে। তাই তাদের জন্য তৈরী হয়েছে কৃত্রিম রবারের তৈরী জুতো। যার জন্য কাঁচামালের অভাব জাপানে নেই। এই জুতোর এমন কোন শ্রীছাঁদ নেই যা পরে স্কুল কলেজ বা আফিসে যাওয়া আসা চলে। তাই ব্যবস্থা রয়েছে কাঠের জুতো বা গেতা। গেতা পরে ছেলের দল স্কুল কলেজ থেকে আফিস সবই করে যাচ্ছে। অকারণ লজ্জার বালাই নেই কোথাও।

ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শেখান আমাদের দেশে একটা মহা সমস্যার ব্যাপার। বিশেষত' খরচপত্রের দিক থেকে। স্কুলকলেজের মাইনে থেকে সুরু করে পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করতে আমাদের দেশে অভিভাবকদের হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতে হয়। সেই সমস্যা কিন্তু জীবনযুদ্ধে সমস্যার পদমর্য্যাদা পায়নি জাপানের মাটিতে। মিড্‌ল স্কুল অবধি শিক্ষাদানের দায়িত্ব সরকারের। পাঠ্যপুস্তক সব ছাপা হচ্ছে অতি সাধারণ সস্তা চেহারায়। গল্প, উপন্যাস বা পুরোনো ক্লাসিকস সব বেরিয়ে আসছে ছাপাখানা থেকে একশ কি দু'শ ইয়েনের ছাপ নিয়ে। টাকা হিসাবে যার দাম দু থেকে আড়াই টাকা। খাতাপত্রের দাম ও তদনুপাতে সস্তা। এরপর থেকে যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের একই রকমের পোষাক। হোক্কাইদো থেকে কিউসিউ পর্য্যন্ত কোথাও এর ব্যতিক্রম নজরে পড়েনি। কাল মোটা জীপের গলাবন্ধ কোট এবং প্যাণ্ট্। মাথায় কাল চৌকোনো বা গোল টুপী। কোটের বোতামে এবং গলায় আছে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মোনোগ্রাম। একমাত্র এই মোনোগ্রাম দিয়ে বাছাই করা যায় কোন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। এই পোষাকে ছেলেমেয়ের দল চলে বেড়ায় সারা দেশে নির্ভাবনায়। গোলটুপী মাথায় থাকলে বুঝতে হবে ছেলেটি এখনও পড়ছে স্কুলে। গোলটুপীই চৌকোনো হবে যখন ছেলেটি পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ে। যখন সমস্ত ছেলের জন্য ঐ একই রকমের পোষাক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তখন সারা দেশে তার কাটতি অসম্ভব। এবং সে জন্যই দামে সে যে কোন পোষাকের চেয়ে সস্তা। অভিভাবকদের এ পোষাকে আফিস করা চলে না। তাদের দরকার পুরোপুরি বিলেতী ধরণের সুট। অর্ডার দিয়ে সুট্ তৈরী করতে গেলে

খুব কম করেও দাম পড়বে দু'শ টাকা। কাজেই কেউ তা করে না বা করার কথা ভাবে না। সুটের দরকার হলেই চলে যায় ডিপার্টমেণ্ট্ ষ্টোরে রেডীমেড সুটের খোঁজে। একশ' থেকে একশ দশটাকার সুট্ একটা কিনে নেয় এবং টাকা শোধ করে মাসে মাসে। ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরে বা সাধারণ পোষাকের দোকানে এই ইনষ্টলমেণ্টে ধার শোধ করার ব্যবস্থা থাকার দরুণ কাউকে ঐ মাসে অর্থকষ্ট পোয়াতে হয়না অস্বাভাবিক রকমের।

দৈনন্দিন আহার্যের কথা ভাবলেও ঐ একই চেহারা নজরে পড়বে। আমাদের দেশের তুলনায় খাওয়ার কষ্ট আপা ন অনেক বেশী। বেশী বলছি কারণ দুববস্থাটা সবাই ভাগ করে নেয় বলে। লোকসংখ্যার ভয়াবহ বাড়তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাবার তৈরী করা সম্ভব হচ্ছেনা জাপানে। প্রাকৃতিক পরিবেশ এর প্রধান কারণ। আগেই বলেছি মাত্র শতকর' তেরভাগ জমিতে এরা চাষ করে। তাও আবার পাহাড়েব ঢালু জমি যোগ করে। তাই জাপানীদেব খাবারেব ঘাটতি পূরণ করতে হয় বিদেশ থেকে আমদানী করে এবং সামুদ্রিক মাছ বা উদ্ভিদ দিয়ে।

সবকিছুর মূলে এরা ভাবছে পরিমাণের কথা। কি করে সবার খাবার দেশে তৈরী করা চলে তবে পরিমাণের দিকটা ভাবতে গিয়ে খাবারের শরীরোপযোগী গুণগুলি নিয়েও এরা গবেষণা করছে রাতদিন। সারা জাপানে খুব করে হলেও দু'রকমের বেশী চালের খোঁজ মিলবে না দোকান-গুলোতে। মোটা, বেটে চাল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা আমাদের দেশে এ চাল খেতে আপত্তি করবেন। কিন্তু সে আপত্তি জাপানের মাটিতে অচল। গোবিন্দ ভোগ, দেরাদুন রাইস, বাসমতি বা পেশেয়ারী আতপ—এর বালাই নেই জাপানী জীবনে। একটি ভ্যারাইটি তৈরী হচ্ছে সারা জাপানে যা সবদিক দিয়ে তাদের রুচিব সঙ্গে মিলে। জাপানের যে কোন বাড়ীতে ঐ একই ধরণের চাল শোভা পাচ্ছে ডিনার টেবিলে। বিভিন্ন ধরণের চাল যে করা অসম্ভব তা নয়। তবে পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে একই ধরণের চাল তৈরী করা লাভজনক। তাই গ্রামের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশের বিভিন্নধরণের চাল নিয়ে গবেষণা করছে। গবেষণা করে বার করেছে যে ভারতীয় সরু সুগন্ধি চালের চেয়ে ইতালীয় মোটা চাল জাপানের জীবনে বেশী উপযোগী।

(ক্রমশঃ)

1 DEC 1969

শরীর যার ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অসার্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

প্রধান ডাঃ মোহেশ চন্দ্র ঘোষ এম এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী এফ সি এস (লণ্ডন), এম.সি এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম বি, বি এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·70
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

অগ্রহায়ণ
১৩৭৬

জয়শ্রী

সম্পাদিকা :
লীলা রায়

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। যাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৪৭

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly
Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Ordinary

Full Page :	Rs. 100·00
Half Page :	Rs. 55·00
Quarter Page :	Rs. 30·00

Cover Page

Second Cover :	Rs. 175·00
Third Cover :	Rs. 200·00
Fourth Cover :	Rs. 350·00

For Special Position contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm.
(8″ × 6″)

Contact
Manager, Jayasree
251A/32, Netaji Subhas Chandra Bose Road
Calcutta—47
Phone : 46-4116

Always insist on

Super Cycle Accessories

Carriers and Ancillary Cycle Accessories, the choice of the millions in India and abroad for superior quality, smooth mechanism and excellent finish. A true "Friend of the Road."

Indian Union Manufacturers Private Limited.

CALCUTTA-29.

সূচীপত্র

: অগ্রহায়ণ জয়শ্রী : ১৩৭৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫৩৭
বাঙলার জাগৃতি (প্রবন্ধ)	কালী চরণ ঘোষ	৫৪৫
ধানকাটার সংগ্রাম : গরীব চাষীর ক্ষতিপূরণ চাই	সুনীল দাস	৫৫৩
বাদশা খাঁ		৫৫৫
বাদশা খাঁর দৃষ্টিতে		৫৫৮
সাবিত্রী (ধারাবাহিক উপন্যাস : অনুবাদ)	পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে অনুবাদ : পিনাকীপ্রসাদ বর	৫৬১
স্মৃতির উপরে নতুন আলোকপাত (প্রবন্ধ)	পথচারী	৫৬৯
কণ্ঠভরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৫৭৩
উত্তাল সমুদ্রে যাত্রা (কবিতা)	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৫৭৯
বাচাও (কবিতা)	স্বদেশরঞ্জন দত্ত	৫৮১
আমাকে বলে দাও (কবিতা)	মণিদীপা বিশ্বাস	৫৮২
দিকভ্রম (গল্প)	মহীতোষ দিশ্বাস	৫৮৩
কবিপত্রে কাব্যচিন্তা (পত্রাবলী)	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫৮৯

সম্পাদনা : সুনীল দাস

সহযোগী সম্পাদক

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

'...আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত এবং স্কুল কলেজে সুভাষের মহান জীবন জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত।'

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু

...'সুভাষচন্দ্র' প্রথম খণ্ড পাঠের ফলশ্রুতি কেবল সমুদ্র স্নানের চরিতার্থতার সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। সমুদ্র সন্তরণ নিছক শারীরিক ব্যায়াম নয়; মানসিক সাহস ও বীর্যেরও উদ্দীপক। পবিত্রকুমারের সাধনার মধ্যে যে-কোনো পাঠক যুগপৎ সে ব্যায়াম ও বীর্যে নিষ্ণাত হতে পারার সজীবতাটুকু সংগ্রহ করতে পারবেন'—

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

'... এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।' —যুগান্তর

...'বিস্মিত হয়েছি লেখকের গভীর গবেষণায় আর অনুভূতির তীব্র মাধুর্যে, তাঁর ঐতিহাসিক সমীক্ষায় আর রাজনীতিক দূরাবগাহনে, পুলকিত হয়েছি তাঁর প্রসাদ-গুণসমৃদ্ধ ভাষার সাবলীল শ্রীমণ্ডিত ব্যবহারে, গভীর শ্রদ্ধার অকৃত্রিম আন্তরিকতায়।'

—যুগবাণী

দাম : নয় টাকা

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন : ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক। জয় শ্রী প্রকাশন : ২৫১-এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭

জয়ন্তী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৩৪ বর্ষ ০ অষ্টম সংখ্যা ০ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

সুভাষ-বাণী

"ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বহু আধুনিক আন্দোলনই সংস্কারমূলক। এই সকল আন্দোলন জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়—জীবনের রূপটিকে পরিবর্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না—মূলগত রূপান্তরই চাই। ব্যাক্তিগত ও সামাজিক —উভয় জীবনকেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই নবজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে উদ্দীপিত করিবার জন্য স্বাধীনতার একটা নূতনতর ধারণা জন্মানো প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে স্বাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণাটি ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজ স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে—সকল প্রকার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি। অন্ততঃ এই অর্থটিই যুবকদের মনে ভালো লাগিয়াছে। অর্ধপথে গিয়া থামিয়া থাকা আর আমাদের ভালো লাগে না—আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। আমরা যদি স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে ভালবাসি, তবে বন্ধন বা বৈষম্যকে আমরা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না। রাজনৈতিক হউক, অর্থ নৈতিক হউক বা সামাজিক হউক—সকলের উপরেই পূর্ণ স্বাধীনতার মূল নীতিটিকে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে এবং তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই আমাদের দিতে হইবে—ইহাই হইবে আমাদের কথা।"

[মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন, ২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯]

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

পি, জি, হাসপাতালের ক্যাবিনের আজ ৬৯০ যাবৎ শ্রীযুক্তা লীলা রায় রোগশয্যা ভোগ করছেন এবং একাদিক্রমে প্রায় সতের মাস সংজ্ঞাহীন হয়ে রয়েছেন। গত ১১ই ডিসেম্বর অল্পসময়ের জন্য তাঁর Convulsion হয়। তারপর সপ্তাহখানেক তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি ঘটে। প্রবল কাশীতেও তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কাশী হয়েছে অথচ কাশবার কোনো শক্তি নাই। ফলে কাশী এলে চোখ-মুখ যেন ঠিকরে পড়বার উপক্রম হয়। বিধাতার কাছে প্রতিনিয়তই আমরা প্রার্থনা জানাই।

পরিচালকমণ্ডলী

২১-১২-৬৯ জয়শ্রী

দুই কংগ্রেস

কংগ্রেসের ভাঙনের পর ২২শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর শিবিরের উদ্যোগে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তলবী সভার বৈঠক হয়ে গেছে। এই তলবীসভায় অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি নিয়োগ, নিজলিঙ্গাপ্পা বিতাড়ন, নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন, বোম্বাইএ ২৫শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশন আহ্বান ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কাজগুলি সম্পন্ন হলেও, অর্থনৈতিক দিক থেকে নূতন কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই। দিল্লীর বৈঠকে প্রাক্তন ইস্পাত মন্ত্রী সি, সুব্রহ্মনিয়ম অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেও ডি সঞ্জীবায়ার এই পদের প্রতি প্রবল দাবী ছিল। কিন্তু অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর প্রবল আপত্তির ফলে সঞ্জীবায়া এই পদে অধিষ্ঠিত হতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর শিবিরে ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের প্রাথমিক আভাস এই ঘটনা থেকে পাওয়া গেছে।

প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টারী দলে যেমন, তেমনি সংগঠনেও আপাত-প্রতিষ্ঠা সপ্রমাণ করেছেন দিল্লী বৈঠকে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৭০৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ৪৪০ জন দিল্লীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আরও ৬ জন তারযোগে তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। পাছে এই সংখ্যা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে তাই প্রতি রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রধান মন্ত্রী পৃথক পৃথকভাবে ফোটো তুলিয়ে রেখেছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতিপক্ষের প্রতি 'খোলা দরজা' এবং বন্ধুত্বের নীতি ঘোষণা করেছেন এবং সেই সঙ্গে যারা নীতির প্রশ্নে কংগ্রেস ত্যাগ করেননি তারা স্বতন্ত্র অথবা যে কোনো দলেই থাকুন না কেন, তাদের কংগ্রেসে ফিরে আসবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বানে অবশ্য কেউ সাড়া দেবেন কিনা তা এখনই বলা না গেলেও, এই আহ্বান একেবারে নিরর্থক হবে না সেকথা বলা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় কংগ্রেস ও জনসাধারণের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করে কংগ্রেসকে একটি বেগবান সংগঠনে

রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিলেও তার বক্তব্যে কিম্বা দিল্লী বৈঠকের আবহাওয়ায় সে প্রতিশ্রুতি রূপায়নের কোনো তৎপরতার সন্ধান পাওয়া গেলো না।

মুন্দ্রা কেলেঙ্কারীর রাহু-কবলিত টি. টি কৃষ্ণামাচারীকে দিয়ে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে পুনঃপুনঃ কৃষ্ণামাচারীর উল্লেখ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রস্তাবের মূল ব্যাখ্যাতারূপে কৃষ্ণামাচারীর ভাষণ, দিল্লীর বৈঠককে আর যাই হোক সমাজবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় নাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী পিছু হটে বাম ও দক্ষিণ উভয় পন্থা পরিহার করে মধ্যপন্থায় স্থির থাকতে চেয়েছেন এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি প্যানেল গঠনের সুপারিশ করে তার বৈপ্লবিক প্রতিভা নিঃশেষিত করেছেন। অপরপক্ষে "তরুণ তুর্কীর" দল প্রধানমন্ত্রীর মধ্যপন্থায় হতাশ হয়ে বুরোক্রাটদের বিরুদ্ধে তাদের বৈপ্লবিক আক্রমণ নিঃশেষিত করেছেন। এমন কি এক বছরের মেয়াদে ভূমি-সমস্যা সমাধানের দুইটি প্রাথমিক সর্ত পূরণের জন্য চন্দ্রশেখরের প্রস্তাবও উপেক্ষিত হয়। এদিকে কৃষ্ণামাচারী তার বক্তৃতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত করবার সদুপদেশ দিয়ে ধীরে চলবার সুপারিশ করেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে রাতারাতি সমাজ-বাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সরাসরি এই মন্তব্য করে তরুণ তুর্কীদের বৈপ্লবিক প্রেরণায় ঠাণ্ডা জল ঢালতেও কৃষ্ণামাচারী পশ্চাৎপদ হন নি। তিনি আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন সদস্যদের চঞ্চল হলে চলবে না। তারা যেন মনে না করেন উৎপাদনের উদ্যোগগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই প্রকৃত সমাজবাদের পত্তন হবে। প্রাইভেট সেক্টরে কতকগুলি চলতি উৎপাদনের উদ্যোগ দখল করার চাইতে রাষ্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যমে বণ্টনের উদ্যোগের বিস্তৃতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লী সম্মেলনে অর্থনীতির সমাজবাদী রূপায়নে অক্ষমতা আড়াল করবার জন্য বোম্বাই-এর আগামী প্রকাশ্য অধিবেশনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে। এ-সম্পর্কে নীরবতা যে বিপজ্জনক অস্থায়ী সভাপতি সুব্রহ্মনিয়ম সে সম্পর্কে অবহিত থেকে বলেছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে পার্টি তার নূতন ভূমিকা স্মরণ করে যদি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে দারিদ্র্য দূর করে সমাজবাদের পত্তন সম্ভব হবে না। তার দাবী, আগামী বাজেটে এই পরিবর্তনের স্বাক্ষর চাই।

টি টি কৃষ্ণামাচারীকে বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে প্রচারের পাদপীঠে টেনে এনে প্রধান মন্ত্রী যেমন তার অনুচরদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন, নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনজন প্রাক্তন কম্যুনিষ্টদের স্থান দিয়ে, 'তরুণ তুর্কী'দের প্রতিনিধি বর্জন করে এবং বরোদার গায়কোয়ারকে স্থায়ী আমন্ত্রিত করে তেমনি বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিলেন। বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে প্রাক্তন কম্যুনিষ্টদের তিনজন—নন্দিনী সতপথি, চিরঞ্জীব যাদব এবং কে আর, গণেশ নব গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগে বাধ্য হয়। অতঃপর তাদের মান ভঞ্জন করে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করানো হয়। চিরঞ্জীব যাদব মাত্র কয়েক দিন আগেও কংগ্রেসকে কম্যুনিষ্টমুখীন করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন। কে, আর, গণেশ আন্দামান থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে তামিল নাড়ুর প্রতিনিধিরূপে ওয়ার্কিং কমিটিকে নেওয়া হয়েছে। তামিল নাড়ুতে এই ব্যক্তিটি একেবারেই অজ্ঞাতকুলশীল। নূতন ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের পুরো এবং প্রকাশ্য দায়িত্ব সুব্রহ্মনিয়ম গ্রহণ করলেও, আসলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই তাকে চলতে হয়েছে। দিল্লীর বৈঠকে চ্যবন একেবারে নীরব রয়েছেন। কোনো প্রস্তাব উত্থাপনে কিম্বা কোনো শলা-পরামর্শে চ্যবনের ডাক পড়েনি, তা নিয়ে মহারাষ্ট্র শিবিরে বিক্ষোভও দেখা দিয়েছিল। 'তরুণ তুর্কী'দের ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ না করে চন্দ্রশেখরকে কেবলমাত্র স্থায়ী নিমন্ত্রিত করে রাখার মধ্যে শুধু এই

উগ্র গোষ্ঠির প্রতিই উপেক্ষা দেখানো হয় নাই, মূলত চ্যবনের প্রতি উপেক্ষা দেখানো হয়েছে। কারণ একথা সুবিদিত এই 'তরুণ তুর্কী'র দল চ্যবনের প্রতি অনুগত। বিভিন্ন গোষ্ঠি-উপগোষ্ঠির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার খেলায় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ওয়ার্কিং কমিটির গড়নেও তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। প্রাক্তন কম্যুনিষ্টদের ওয়ার্কিং কমিটিতে গ্রহণের মধ্যেও কৌশল নিহিত রয়েছে, অনুমান করবার কারণ আছে। ভবিষ্যতে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে ফেলে সরকার পরিচালনার সম্ভাবনা সামনে রেখে প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্টদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি তৈরীর মহড়ার মধ্যে দিয়ে তার দলের পাঁচমেশালী গোষ্ঠির উপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যই হয় তো প্রধানমন্ত্রী এই পরীক্ষা করে থাকবেন। ওয়ার্কিং কমিটির আয়ুষ্কাল বোম্বাই-এ প্রকাশ্য অধিবেশন পর্যন্ত সীমিত করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আপাতত রেহাই পেলেও, এই ধরণের আপোষ দলের অনুসারীরা সহজে মেনে নেবে না—সে-সঙ্কেত তারা জানিয়ে দিল।

রাজন্য ভাতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গোষ্ঠির দ্বিধাচিত্ততা প্রকট হয়ে ওঠে, বরোদার গায়কেওয়াড়কে দলে ভেড়াবার উদ্দেশ্যে ওয়ার্কিং কমিটিকে স্থায়ীভাবে আমন্ত্রিত করার মধ্যে। দিল্লীর বৈঠকে রাজন্যদের ভাতা কিম্বা বিশেষ সুযোগসুবিধা রদের সম্পূর্ণ অনুল্লেখ, গায়কোয়াড়ের সঙ্গে সাংগঠনিক ঘনিষ্ঠতা, প্রধানমন্ত্রীর সমাজবাদের প্রতিশ্রুতিকে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছিল এবং গায়কোয়াড়ের অবস্থাও গুজরাত ক্যাবিনেটে এবং সেখানকার রাজনীতিতে অসহনীয় করে তুলেছিলো। গায়কোয়াড় প্রধানমন্ত্রীর দল বর্জন করে নিজলিঙ্গাপ্পার দলে প্রত্যাবর্তনে গুজরাতের মন্ত্রীত্ব বাঁচালেও রাজন্য ভাতা বাঁচাতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রীকে অতঃপর রাজন্যভাতা বিলোপের প্রতিশ্রুতি পূরণে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। দিল্লীর বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর বৈপ্লবিক ভাবমূর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে, সমাজবাদী কার্যক্রমে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করেছে, এবং পাঁচমেশালী গোষ্ঠির সমবায়ে তৈরী দলের দুর্বলতা উন্মোচিত করে ভবিষ্যতে তার দলের ভাঙন সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে দিয়ে গেছে। কথায় ও কাজের যে বৈপরীত্যের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী সংগঠনের নেতাদের অভিযুক্ত করে কংগ্রেসের ভাঙনকে সুনিশ্চিত করে তুলেছিলেন, সেই বৈপরীত্যে তার প্রথম পদক্ষেপ আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। ভবিষ্যতে দৃঢ়, প্রত্যয়সিদ্ধ সমাজবাদী পদক্ষেপ এবং তা রূপায়নে দ্রুত কার্যক্রম নির্ণয়ের উপর নির্ভর করবে প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ কোন পথে!

জগজীবনরামের কর ফাঁকি

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম দশ বছর কর ফাঁকি দিয়ে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। দায়িত্বশীল পদে আসীন কোনো ব্যক্তিই বোধ হয় কর ফাঁকির এতো বড় ঐতিহ্য ইতিপূর্বে রচনা করেন নাই। ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কোনো আয়ের হিসাব দাখিল করেন নাই। অথচ অর্থ দপ্তর ক্রমাগত দশবছর এই কর ফাঁকিকে উপেক্ষা করে গেছেন। সবচাইতে আশ্চর্যের কথা যদিও দশ বছরের আয়কর ছত্রিশ হাজার টাকার উপর এবং ছয় হাজার টাকার উপর সুদ জগজীবন রাম জমা দিয়েছেন, আয়কর আইন লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও তার কোনো সাজা হয় নাই। আয়কর কমিশনার তাঁর উপর ন্যস্ত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাবলে সে দণ্ড মকুব করে দিয়েছেন। যদি দশবছরের ছত্রিশ হাজার টাকা আয়কর দাখিল না করে রেহাই পাওয়া যায়, অতঃপর অন্য ফাঁকিবাজেরা কেন রেহাই পাবেন না সে-প্রশ্ন থেকে যায়। দায়িত্বশীল পদে আসীন থেকে যারা এ-ধরণের চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন, তাদের দায়িত্ব-ভার থেকে অবিলম্বে অপসারণ করা

উচিত। তা না করে প্রধানমন্ত্রী জগজীবনরামের সাফাই গেয়ে কর জমা দিতে তার বিস্মরণের উল্লেখ করেছেন। অজ্ঞতা কিম্বা বিস্মরণ, আইনের চোখে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করালে আইন মানবার আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সবচাইতে বিপদের কথা পদমর্যাদার বলে আইনের রক্ষকদের উপর যদি প্রভাব বিস্তার করে তাদের কর্তব্যভ্রষ্ট করা হয়, প্রশাসন দলীয় কুক্ষিগত হয়ে স্বৈরাচারের পথ প্রশস্ত করবে, আইনের শাসন লোপ পাবে। জগজীবনরামের কর ফাঁকি, আয়কর কমিশনারের দণ্ড মকুব এবং প্রধানমন্ত্রীর সাফাই-এর মধ্যে সেই বিপদ নিহিত রয়েছে।

এ-হেন ব্যক্তিই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধানমন্ত্রীর অনুগত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মন্ত্রীপদ থেকে অপসারণে অক্ষম হয়ে কংগ্রেস সভাপতি পদে জগজীবন-রামকে স্থাপন করার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কুশলতার পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু জগজীবনরামের আচরণ এবং প্রধানমন্ত্রীর সাফাইয়ের পর তার সভাপতি নির্বাচনে রাজনীতির নৈতিকতা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছে। এই নৈতিক পরাজয় দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর কংগ্রেসের যাত্রা সুরু।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি

গত ১২ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীটের নিকট রাসেল ষ্ট্রীটে ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখায় সশস্ত্র ডাকাতিতে ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং শেয়ার ও সরকারী সিকিউরিটি পেপার লুঠ হয়ে গেছে। ষ্টেনগান ও গ্রিনেড নিয়ে এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ডাকাতিতে লিপ্তের সংখ্যা দশেরও বেশী। ছয়জন কর্মচারী গুলিবিদ্ধ হন এবং একজন নিহত হন। ব্যাঙ্কের গার্ডের ছুটি বন্দুকও সেই সঙ্গে লুঠ হয়ে গেছে। সামান্য কিছু টাকা এবং সিকিউরিটির কাগজ ইত্যাদি পরে উদ্ধার করা গেছে।

গত দেড় বছরে কলকাতায় পাঁচটি বড় বড় ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে গত আট মাসে তিনটি। ১৯৬৮-এর ১লা জুলাই পার্ক ষ্ট্রীটে ডাকঘর থেকে ৪ লক্ষ টাকা লুঠ হয়। সে-বছর ২২শে অক্টোবর সদর ষ্ট্রীটে ১ লক্ষে ১৩ হাজার টাকার ডাকাতি হয়। এ বছর ২ এপ্রিল নিউ আলিপুরে ন্যাশনাল এণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা লুঠ হয়। প্রতিটি ডাকাতিই দিনের বেলা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র সদর ষ্ট্রীটের ডাকাতিতে পুলিশ মামলা সুরু করেছে, অন্যগুলির কোনো কিনারা করতে পারে নাই। ১৯৬৮-এর আগে ১৯৫৬ সালে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়। ১৯৪৭ গড়িয়াহাট ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে, ১৯৭৮-এ ভবানীপুর ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ১৪৪৬-এ হুগলী ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়। এবারকার ডাকাতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, লাল পতাকার ব্যবহার তার অন্যতম। এ-ছাড়া ঘটনাস্থলে তিনটি পুস্তিকা দুষ্কৃতিকারীরা ফেলে গেছে। পুস্তিকাগুলি ইংরাজী এবং বাংলাতে লেখা। প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে: "বাই অরডার লিটল কমিউনিষ্ট কোর, ডিসেম্বর, ১৯৬৯"। আরও লেখা আছে: "দো উই আর কালেকটিং পেবল্‌স ইন দি ভাষ্ট সীশোর অব মার্ক্সইজম লেনিনিজম, ইয়েট উই ডু ক্লেম উই হ্যাভ ষ্টাডিড ইন টারমস অব আরমড ইনসারেকশন এণ্ড হ্যাভ ডাইজেষ্টেড মাওজ থট ইন টারমস অব ব্যারেল অব গান।" উপসংহারে দাঁতোর বাণীতে উজ্জীবিত হয়ে লেখা হয়: "বি ডেয়ারিং, বি ষ্টিল ডেয়ারিং, অ্যাণ্ড বি ডেয়ারি অলওয়েজ।" দিন দুপুরে বহু যুবকের দ্বারা সংঘটিত এই ধরণের পৌনঃপুনিক ডাকাতি রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করছে। ষ্টেট ব্যাঙ্কে সর্বশেষ ডাকাতি সব চাইতে দুঃসাহসিক অভিযান বলা যেতে পারে। এই ডাকাতির আনুসঙ্গিক রাজনৈতিক পশ্চাদপট কতটা খাঁটি, কতটা মেকী তা

নিঃসংশয়ে বলা না গেলেও, এটা যে সাধারণ ডাকাতি নয় সে-কথা, নিঃসংশয়ে বলা চলে। রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা, রাজনৈতিক হত্যা, সন্ত্রাস, লুঠ এবং সর্বোপরি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দ্রুত বিলোপ যে অরাজকতা এবং দুর্বৃত্তের নিকট আত্মসমর্পণের মানসিকতা সৃষ্টি করেছে তারই ফলশ্রুতি এই ধরণের ডাকাতি। এই ঘটনা এবং ধানকাটার লড়াই বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর পরিমাপও ঘোষণা করছে। এই ধরণের অবস্থা চলতে থাকলে অদূরভবিষ্যতে ক'লকাতা শহর দুর্বৃত্তের রাজত্বে পরিণত হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহ অভিযান

মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাঁর দল বাংলা কংগ্রেসের হিংসার বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করবার জন্য সর্বত্র সভাসমিতিতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানাচ্ছেন। এই সূত্রে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ উত্থাপন করে এই দলকে পশ্চিম বাংলার বর্তমান আইন-শৃঙ্খলাহীন পরিস্থিতির জন্য সরাসরি দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রী দাবী করছেন যে ফ্রন্ট ভাঙবার জন্য তাঁর এই অভিযান নয়, ফ্রন্টের এই বিপথগামী শরিককে চাপ দিয়ে হিংসার পথ বর্জনের জন্য এই সংগ্রাম। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযানে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের বেদনা ভাষা পেয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রতিরোধে কতটা অগ্রসর হতে পারবে, সে-সম্পর্কে সংশয় রয়ে গেছে। কারণ, ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে জোর করে অপরের জমির ধানকাটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্তিমিত হয়ে গেছে। ফলে খুনোখুনির সংবাদও কমে গেছে, কারণ সশস্ত্র দলের জবরদস্তি ধানকাটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি আর কারো অবশিষ্ট নেই।

গত ২০শে নভেম্বর আরামবাগে যে ঘটনা ঘটেছে তারপর আইন-শৃঙ্খলার আর কি অবশিষ্ট আছে, সে প্রশ্ন আর উপেক্ষা করবার অবকাশ নেই। মুখ্যমন্ত্রী আরামবাগে জনসভা এবং সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠক করে চলে যাবার পরই একদল ছাত্র এস, ডি, ও'র বাড়ী চড়াও হয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট এবং মহকুমা পুলিশ শাসককে প্রাহার করে এবং মহকুমা শাসককে খালি পায়ে ও খালি গায়ে রাস্তায় ঘুরতে বাধ্য করে। যেখানে শাসকদের নিরাপত্তা নেই, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন একেবারে অবান্তর হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল আগামী ২৮শে নভেম্বর ব্যাপক গণ অনশন করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন থেকে যারা বর্বরোচিত হিংস্রতার পোষকতা করে আইন-শৃঙ্খলায় ধ্বস নামিয়ে দিচ্ছে, ক্ষমতার আসন থেকে তাদের নির্বাসিত করে জনসাধারণ ও পুলিশের প্রতিরোধের ভূমিকার পথ নির্বিঘ্ন না করতে পারলে মুখ্য-মন্ত্রীর এই অভিযান অন্তিমে ব্যর্থ হয়ে ভয়ঙ্কর হিংস্রতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। যত বিলম্ব হবে, ততই এই ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্ভাবনার গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে এবং সে-সময় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের তলার মাটিও সরে যাবে। সুতরাং সময় থাকতে মুখ্যমন্ত্রীকে হিংস্রতার মূলোৎপাটনে অগ্রণী হতে হবে। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় আসীন থেকে হিংস্রতার প্রশ্রয় দিতে বিরত থাকতে পারবে না, তাদের নীতি এবং কৌশলের তা হবে পরিপন্থী।

রাবাতের বিপর্যয়

মরোক্কোর রাজধানী রাবাতের ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এবং পরে পাকিস্তানের আপত্তির ফলে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের চাপে ঐ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়ে ভারত সরকার যে অসম্মানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, দেশের সেই অবমাননার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে

কেন্দ্রীয় সরকার ধিক্কৃত হয়েছে। রাবাত সম্মেলন মূলতঃ ইসলামধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনরূপে আহূত হয়েছিল আল অসকা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য এবং সেই সঙ্গে আরব-ইসরাইল সংঘাতে মুসলীম রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। এই সম্মেলনে কে আমন্ত্রণ জানালো, কিভাবে আমন্ত্রণ জানালো ভারত সরকার সে-সম্পর্কে একেবারে নীরব। পার্লামেণ্টেও এই প্রশ্নের সদুত্তর তারা দিতে অস্বীকার করে। এই ঘটনার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। সেই গণতন্ত্র-সঙ্গত পথে না গিয়ে কম্যুনিস্টদের ও ডি-এম কের সমর্থনে রাবাত বিতর্কে ভারত সরকার ৩০৬-১৪০ ভোটে জয়ী হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। জাতীয়তাবাদী দলগুলি একযোগে সরকারের আচরণের নিন্দা করে লোকসভার মূলতুবী প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়ে তাঁদের জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

লোকসভায় ও রাজ্যসভায় সহকারী অধ্যক্ষ নির্বাচন

লোকসভায় সহকারী অধ্যক্ষ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কৌশলে আঞ্চলিক দল, সংখ্যালঘু এবং কম্যুনিস্টদের প্রতি নির্ভরশীলতা এবং আনুকূল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিরোধীদলদের দাবী ছিল সরকার পক্ষ যেন তাদের সঙ্গে একযোগে পরামর্শ করে প্রার্থী স্থির করেন। বিরোধীদলদের মধ্যে কোনো কোনো দল খাসিয়া নেতা অধ্যাপক সোয়েলকে লোকসভার সহকারী অধ্যক্ষ পদের জন্য সম্মত হতে অনুরোধ জানায়। অধ্যক্ষ সোয়েল অস্বীকৃত হলে তারা কুণ্টের সম্মতি পাবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী দুই কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ডি, এম, কের সঙ্গে অগ্রিম চুক্তি করে এবং সোয়েলকে সম্মত করিয়ে বিরোধীদের সভায় তার নাম প্রস্তাব করলে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। অন্যান্য বিরোধীরা কুণ্টের নাম উত্থাপন করলে জানা যায় প্রধানমন্ত্রী সোয়েলের নির্বাচনে প্রতিশ্রুত হয়েছেন এবং পূর্বেই কম্যুনিস্টদের এবং ডি, এম, কের সঙ্গে রফা করে ফেলেছেন। রাজ্যসভার সহকারী চেয়ারম্যানের পদের জন্যও রিপাবলিকান দলের খোবরাগাড়ের নাম অনুরূপ পদ্ধতিতেই স্থির করেন। তবে এবার মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের তিনি সমর্থন পান নাই। প্রধানমন্ত্রীর এই কৌশল চতুরতার নামান্তর। রাজনৈতিক চাতুরী এবং কম্যুনিস্ট, ডি, এম, কে ও সংখ্যালঘুদের আনুকূল্য প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভোটের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই চাতুরী এবং এই ধরণের ভোট বিরোধীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হবে না। প্রধানমন্ত্রীকেও রাজনৈতিক স্ববিরোধিতায় অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে আসবে। সে-পরিণাম থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা

লোকসভার সদস্যদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে দশভাগ সদস্য কোনো একটি দলভুক্ত হলে সেই দলকে বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেবার বিধান আছে। লোকসভায় ৫২২ জন সদস্য রয়েছেন। এ-যাবৎ কোনো দল এই মর্যাদা দাবী করতে পারেন নাই। লোকসভায় এযাবৎ সবচাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠি স্বতন্ত্র পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২। সাংগঠনিক কংগ্রেস দলের লোকসভার নেতা ডাঃ রামসুভগ সিং বিরোধীদলের স্বীকৃতির অধিকার অর্জন করায় লোকসভার অধ্যক্ষ তাকে বিরোধী নেতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু কম্যুনিস্টরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি কারণ তারা ডাঃ রামসুভগ সিংকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতা বলে মনে করে। রাজ্যসভায়ও এস, এল, মিশ্র বিরোধীদলের নেতার স্বীকৃতি পেয়েছেন। কম্যুনিস্টদের গাত্রদাহের কারণ তারা বিরোধীদের সারিতে একদিকে যেমন একঘাপ নেমে গেলেন এবং পার্লামেণ্টে তাদের প্রচারের সুযোগও হ্রাস

পেলো, তেমনি সাংগঠনিক কংগ্রেসের ছাতার তলায় বিরোধী দলরূপে কাজ করতে তারা সম্মত নন। পরিষদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি কোনো দলের ভাল-লাগা মন্দ লাগার উপর নির্ভর করে না এবং যারা পরিষদীয় গণতন্ত্রকে স্বীকার করে, তাদের সবটাই মেনে নিতে হয়। পশ্চিম বাংলায় বিধান সভায় কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু বিরোধী নেতার মর্যাদা পেয়েছিলেন। সে সময় বিধান সভার অ-কম্যুনিস্ট দলগুলিরও সে-ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল, তাদের ভাল না-লাগা সত্ত্বেও।

আর একটি অ্যাপোলো

কম্যাণ্ডার চার্লস কনরাড, রিচার্ড গর্ডন ও অলান বীনকে নিয়ে অ্যাপোলো ১২ ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ৫২ মিনিটে ১৪ই নভেম্বর আর একটি চন্দ্রাভিযান শুরু করে। এবারকার যাত্রার প্রায় মাঝপথে রকেট জ্বালিয়ে আকাশচারীরা মহাকাশযানের যাত্রাপথ পরিবর্তন করে নেয়। এই পরিবর্তনের ফলে ফিরবার পথে তাদের বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। ইতিপূর্বে চন্দ্রাভিযানে যে পথ ব্যবহৃত হয়েছে, সেই পথে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন স্বতঃসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এবারকার পথে রকেট জ্বালিয়ে ফেরবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে আর যদি রকেট না কাজ করতো তবে চিরকালের জন্য তারা মহাকাশে হারিয়ে যেত।

১৯শে নভেম্বর সকাল ১০টা ১৬ মি কনরাড ও বীন চাঁদের ভেলা 'ইন্টিগ্রিড'এ আরোহণ করে প্রায় সাড়ে বারোটায় চাঁদে এসে পৌঁছায় এবং বেলা প্রায় সাড়ে চারটায় পৃথিবীর তৃতীয় মানুষ কনরাড চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে আসেন, তার আধঘণ্টা পর বীন। গডডন মূল মহাকাশযান 'ইয়াকিং ক্লিপার' নিয়ে চন্দ্র কক্ষে পরিভ্রমণ করেন। চাঁদের মাটিতে ৩১ ঘণ্টা অবস্থানের পর মূল মহাকাশযানের সঙ্গে কনরাড ও বীন যুক্ত হয় এবং ২৫শে নভেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি নেমে আসে।

কনরাড ও বীন চাঁদের ঝড়ের সমুদ্রে অবতরণ করে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে মানুষহীন মহাকাশযান সারভেয়ার এর দেখা পায়। শুধু যে সারভেয়ারে যন্ত্রাংশ নিয়েই কনরাড ও বীন ফিরে এসেছেন তা নয়, অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াও তাঁরা সম্পন্ন করে এসেছেন। তারমধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ একটি আণবিক শক্তি উৎপাদনের প্ল্যান্টের পত্তন, বেতার কেন্দ্র স্থাপন, এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও তারা রেখে এসেছেন। প্রায় ১০০ পাউণ্ড চাঁদের পাথর বহন বহন করে এনেছেন পরীক্ষার জন্য। অ্যাপোলো ১২-এর অভিযান দুর্গমের দুয়ারে কেবলমাত্র পদচারণা নয়, দুর্গমকে জয় করবার নিপুণ বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ।

২০-১২-৬৯

বাঙ্গলার জাতি

কালীচরণ ঘোষ

সিপাহী বিদ্রোহ ও পরবর্ত্তী অধ্যায়

(১৮৫৭ ১৮৮২)

সিপাহী বিদ্রোহ একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। নানা ক্ষেত্রের নানা স্তরের এবং রূপের অনাচার সঞ্চিত হয়ে অসন্তোষ বিরাট আকার ধারণ করে ফেটে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অংশে মাঝে মাঝে সিপাহীদের ছোট বড় অভ্যুত্থান নানা সামরিক ছাউনিতে ঘটেছে, সে সকলের গুরুত্ব এতখানি ছিল না। কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী, ফারাজি মিলে অবস্থা খুব শান্ত হতে দেয় নি। তা সত্ত্বেও ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ধীরে ধীরে কায়েম হয়ে বসেছে এবং পরবর্ত্তি শত বৎসরের মধ্যে এমন দৃঢ় শিকড় গেড়ে ছিল যে তাকে আর সম্পূর্ণ বিতাড়ন সম্ভব হচ্ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ জুন ২৩-এ, আর সিপাহী মঙ্গল-পাণ্ডে বারাকপুরে রাইফেলের গুলি ছুটিয়েছিলেন ১৮৫৭ মার্চ্চ ২৯-এ। ফলে পাণ্ডেজীর ফাঁসি হয়ে যায় এপ্রিল ৮-ই। এই স্ফুলিঙ্গ উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় আগুন ছড়িয়ে দেয়। সেনা কটকের মধ্যে যে ধূমায়িত অসন্তোষ ছিল সেটা দাবাগ্নিতে পরিণত হ'লো। বহরমপুর, মীরাট, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বুন্দেলখণ্ড, পেশোয়ার, ফতেপুর, ফরাক্কাবাদ, আরা, রাচি, লোহারডাগা, সম্বলপুর, পালামৌ প্রভৃতি স্থানে গুরুতর বিক্ষোভ হতে থাকে এবং ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রামে বহু যুযুৎসু ও নিরীহ লোক হতাহত হয়। স্থানে স্থানে দারুণ নৃশংস ও বীভৎস কাণ্ড ঘটেছে। এমন সময় গিয়েছে যখন মনে হ'য়েছিল হয় ত বিদ্রোহীরা জয়লাভ করবে। তবে এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ভারতের শাসনযন্ত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়েছে। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা ১৮৫৮ নভেম্বর ১-লা ভারতের কোনো কোনো দাবী আংশিকভাবে মিটিয়েছে। "কোম্পানী"র হাত থেকে ভারত শাসন সাক্ষাৎ ইংলণ্ডের হাতে চলে গেল। একজন ভারত সচিব (Secretary of State) নিযুক্ত হলেন এবং তাঁকে (Cabinet) মন্ত্রীমণ্ডলীতে গ্রহণ করা হ'লো। লাট-বাহাদুর (Governor General)এর সঙ্গে ইংলণ্ডেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি (Viceroy) বলে পদ (খেতাব) সংযোজিত হ'লো।

সিপাহী সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের একটা বড় অংশের বিশেষ যোগ ছিল না। এ সময়ে বাঙ্গলার সাধারণ জীবন-যাত্রা, বড় রকম কিছু ব্যাহত হয় নি। সাহিত্য অবলম্বন করে জাতীয় ভাবধারা প্রচার বিরাট তাণ্ডবের আগে যেমন চলছিল, সেটা অব্যাহত রইল। উপরন্তু ভারতীয়ের পক্ষে দুর্দ্ধর্ষ অপরাজেয় ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবার সাহস সাহিত্যে কিছু শক্তি যোজনা করে।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত নিজে কবিতা এবং প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে কেবল দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসতে শেখালেন না, একদল "শিষ্য" তৈরী করে গেলেন যাঁরা গুরুর সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করে গেছেন। এদের প্রথম হলেন রঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) যে সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

এ যুগের অন্যান্য সাহিত্যের কিছু উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩) র নীল দর্পণ (১৮৬০), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) র শিবাজী চরিত্র (১৮৬০), মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩) মেঘনাদ বধ (১৮৬১) প্রথম স্তরে স্থান লাভ করেছে।

একটু কালের ব্যবধানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)এর "মিলে সব ভারত সন্তান" রচিত হয়, চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য (১৮৬৮)। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ভারতসঙ্গীত (১৮৭০) লিখে দেশকে যে ডাক দিলেন ১৯০৭ সালের পূর্ব্বে সাহিত্যে সংগ্রামের জন্য সে প্রস্তুতির উদাত্ত আহ্বান আর আসে নি। মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)র অনুকরণীয় সঙ্গীত "দিনের দিন সবে দীন" আর জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) পুরু বিক্রম লেখেন ১৮৭৪-তে। অপর কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের নাম এই তালিকার স্থান লাভ করবার যোগ্য। হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার (১৮৭৫) আর নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)এর পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৫-১৯০৪) ম্যাটসিনী গ্যারিবল্ডির জীবন বৃত্তান্ত (১৮৮০) ও (১৮৯০), গোবিন্দ চন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭) রচিত ভারত বিলাপ (১৮৮১) আর সকলের শিরোপি বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৬-১৮৯৪) আনন্দ মঠ (১৮৮২) হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রেখেছে।

এ সকলের পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের গ্রন্থাদি আগের তুলনায় কিছু নিম্নস্থান অধিকার করে।

জনসাধারণের মধ্যে সমকালে এ সকল সাহিত্য বিশেষ উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে নি, কারণ তখনও জমি ঠিক তৈরী ছিল না। "স্বদেশী যুগ" যখন এসে গেল তখন ঐ সব পুরাতন সাহিত্য (গীতা সমেত) নূতন অর্থ, নূতন প্রেরণা জুগিয়েছে, আর বাঙলা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়ে চলেছে।

মানুষ, পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষেত্র যখন প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করেছে সেই সময় কয়েকটি সংশ্লিষ্ট ঘটনা (১৮৫৯-১৮৬২) বিক্ষোভে ইন্ধন যুগিয়েছে। এ সকলের মধ্যে নীল বিদ্রোহকে প্রধান স্থান ছেড়ে দিতে হয়।

নীল বিদ্রোহ

নীল চাষের শুরু থেকেই কিছু কিছু গোলমাল চলেছে। এবার বাঁধলো ১৮৫৯তে আর চলে তিন বৎসরের উপর প্রায় ১৮৬২ পর্য্যন্ত। ব্যাপারের গুরুত্ব হিসাবে এ সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

বাঙালীর জীবনে নীল চাষ একটি কুখ্যাত অধ্যায়। দাদন দিয়ে, সময় সময় বিনা বিনা দাদনে চাষ করতে বাধ্য করা, শ্বেতাঙ্গ সহায়তায় বিচারের প্রহসন, ছল ছুতা অবলম্বনে নানারূপ নির্য্যাতন, দলবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের ভীতি প্রদর্শন, লাঠিয়ালের সাহায্যে লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, রাহাজানি, জালজালিয়াতি, পেয়াদা বরকন্দাজের অবরদস্তি, চামড়ার চাবুক ('ছট্‌কি,) অথবা চামড়া বাঁধানো মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার, নারীর শ্লীলতা হানি, চাষের বলদ অপহরণ, অনাহারে (হয় ত বিনা জলে) বন্দী করে রাখা, হত্যা প্রভৃতি, অর্থাৎ এক কথায় উর্ব্বর মস্তিষ্কে যত রকম অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়নের ফন্দী আবিষ্কার সম্ভব সবই অসহায় নিরস্ত্র রায়তদের উপর একক বা সমষ্টি-ভাবে প্রযুক্ত হ'তো। একবার চুক্তিবদ্ধ করে নিতে পারলে আমরণ আর মুক্তি ছিল না; দাদনের মেয়াদ কখনও শেষ হ'তো না। অগ্রিম দেওয়া ঋণ পরিশোধ হবার লক্ষণ ছিল না। ধান চাষের ভাল জমি নজরে পড়লে, আর এ সংবাদ

কুঠীতে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব ছিল না,—নীলকরদের লোক এসে জোর করে চিহ্নিত করে দিয়ে যেত, সেখানে এ বছর নীল চাষ হবে ; ধান নয়।

অত্যাচারের কাহিনী যখন আর উপেক্ষা করা চলে না, তখন নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের কাণে কিছু জল প্রবেশ করেছিল। রায়তদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করবার জন্যে ১৮৫৯ ফেব্রুয়ারী ২০-এ সরকারী নির্দ্দেশ বেরিয়েছিল যে কারও অমত অনিচ্ছায় দাদন গছিয়ে দেওয়া, আর মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষেতে নীল চাষ করা চলবে না।

এ সংবাদ প্রচারিত হবার পরও নীলকররা তাদের পূর্বপ্রচারিত পন্থা ছাড়ে নি। স্থানে স্থানে সরকারী আদেশ উপেক্ষিত হয়েছে কারণ বিচারের আসনে শ্বেতাঙ্গ হাকিমরা অধিষ্ঠিত। আইনের ফাঁক খুঁজে বার করা কঠিন নয় ; পক্ষীর উকিল মোক্তার ত আছেনই, আরও আছে হাকিমী ব্যাখ্যা। এ সকল থাকা সত্ত্বেও এ তাবত নির্য্যাতিত রায়তদের মধ্যে প্রতিবাদের যে রোল উঠেছে। ক্রমে ক্রমে সেটা শক্তি সঞ্চয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিদেশী হাকিমের হাতে রায়ত নীলকরদের মামলার ভার, কালা মুন্সেফ বা জজ দেওয়ানী আদালতে শ্বেতাঙ্গদের বিচার করতে পারতেন না ; যদি কোনো হাকিম রায়তদের পক্ষে একটু "দুর্ব্বলতা" প্রকাশ করতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নীলকররা সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ পেশ করলেই এ শ্রেণীর হাকিমকে বদ্‌লি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোনো হাকিম নীলকরদের বিরাগভাজন হ'তে সাহস করতেন না। মেকলে (Thomas Babington Macaulay) ১৮৩৬-এর একাদশ আইন (Act XI of 1836) বলে দেওয়ানী মামলায় সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের সুযোগ বন্ধ করে দেন। এতে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের প্রথম দফা অসুবিধা দেখা দেয়।

আরও কিছু আনুষঙ্গিক ঘটনা নীল চাষীদের মনে সাহস জুগিয়েছিল। ফরাজি (মুস্লিম) আন্দোলন (১৮৩০-১৮৪০) মাঝে মাঝে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এদের দ্বারা হিন্দু জমিদার আর বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি সমভাবেই লুণ্ঠিত হয়েছে। ১৮৫৯ নাগাদ আন্দোলন কতকটা দমিত হয়ে আসে। ফরাজিদের মধ্যে অনেকেই লাঠি সড়কি এবং অন্যান্য অস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। সর্ব্বোপরি ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার মনোবল। এদের অনেকেই রায়তদের দলভুক্ত হওয়ায় নীল বিদ্রোহ বিশেষ শক্তি লাভ করে।

১৮৫৫-৫৭-র সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৫৮-র সিপাহী বিদ্রোহ এবং স্থানে স্থানে ভারতীয়দের বীরত্ব কাহিনী রায়তদের মনে শক্তি দান করেছে।

হ্যালিডে (Frederick Halliday) ১৮৫৩ বাঙলার ছোটলাট নিযুক্ত হন। তাঁর কাছে নদীয়ার রায়তদের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত বহু শহুর লোক স্বাক্ষরযুক্ত করে এক আবেদন পেশ করেন। কিন্তু 'কাল্পনিক' আখ্যা দিয়ে হ্যালিডে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে ছেড়ে দেন। যতটা দরখাস্তে লেখা ছিল প্রকৃত অবস্থা তার চেয়ে তখনই অনেক খারাপ য়ে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে আপদ দূর করার চেষ্টা এটাই যে প্রথম সে কথা বল্লে খুব ভুল হয় না। চাষীদের সৌভাগ্যবশতঃ গ্রাণ্ট (Peter Grant) এই সময় বাঙলার ভাগ্য নিয়ন্তা-রূপে আবির্ভূত হলেন। তখন থেকেই "জমানা বদল"-এর লক্ষণ পাওয়া গেল। হাঙ্গামার প্রধান কেন্দ্র বারাসাতে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এলেন ইডেন (Ashley Eden). তিনি পূর্ব্বের সরকারী আজ্ঞা আরও পরিস্ফুট করে প্রকাশ করেন। জমি রায়তের, তারা যে ফসল ইচ্ছা উৎপাদন করবে, জোর করে কেউ তাতে অন্য চাষ করতে বাধ্য করতে পারবে না ("Since the ryots can sow in their own land whatever crop they like no one can without their consent and by violence sow any other crops".) তার পর ম্যাঙ্গল্‌স্ (J. H. Mangles) এসে

প্রকাশ্যভাবেই রায়তদের মতের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যোগাযোগের ফলে রায়তরা কতকটা বে-পরোয়া হয়ে উঠতে সুরু করে।

বড় রকমের গোলমাল আরম্ভ হ'ল ১৮৫৯-র শরৎকালে। শীঘ্রই সে আন্দোলন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়লো। কোনো কোনো জমিদার রায়তদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নড়াইলের বড় তরফের রামরতন রায় এবং তাঁর নদীয়া জমিদারীর নায়েব মহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাণাঘাটের শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী ও তাঁর ভাই শ্যামচন্দ্র পাল চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁদের সঙ্গী ছিলেন নবীন বিশ্বাস।

নদীয়া আওরাঙ্গাবাদ কুঠীর সাহেব মালিকদের সঙ্গে রায়তদের প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ বাধে। নীলকরদের পক্ষ থেকে কয়েকজন রায়তকে বলপূর্ব্বক আটক রাখা হয়। ১৮৬০ ফেব্রুয়ারী ২৩-এ আওরাঙ্গাবাদে (মুর্শিদাবাদ) মরদ বিশ্বাস, সুহাস বিশ্বাস এবং কালাচাঁদ সাহার নেতৃত্বে (B. B. Kling: The Blue Mutiny, p. 92) কয়েক শত লোক দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নীলকরদের কবল থেকে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্ত করে নিয়ে আসে। এইটিই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বড় ধরণের প্রকাশ্য 'সংগ্রাম'।

এখন থেকে শপথ নিয়ে নীল চাষ বন্ধ করা, ঢাকের শব্দে ভিন্ ভিন্ গাঁ থেকে লাঠিয়াল জমায়েত করা, সাধারণ তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা প্রভৃতি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। পুলিশ পক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আর রায়তরা নিজেদের ইচ্ছামত প্রতিরোধ আরম্ভ করে।

মুর্শিদাবাদ থেকে মালদহ। সেখানেও মার্চ্চ ২০-এ রায়ত কর্ত্তৃক নীলকুঠী আক্রান্ত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। নদীয়া চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীল বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। প্রথমে তাঁরা লোক পাঠিয়ে দুব দুব গ্রামের প্রজাদের নীলচাষ করতে নিষেধ করে পাঠান। গোবিন্দপুর গ্রামের একজন প্রজাও নীল চাষ করতে সম্মত না হওয়ায় শ্বেতাঙ্গ নীলকরের পক্ষে শতাধিক লাঠিয়াল, তন্মধ্যে কেউ বা হস্তী পৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে, ১৮৫৯ সেপ্টেম্বর ১৩-ই চাষীদের সায়েস্তা করতে হাজির হলেন। দিগম্বরের লাঠিয়ালদের দুর্দ্দান্ত প্রহারে আক্রমণকারী দল রণে ভঙ্গ দেয়। দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ লোকবল ছাড়া প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। বিদ্রোহ চালনা করতে গিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় দিগম্বর দেহরক্ষা করতে বাধ্য হন।

জমিদার-রায়তদের সম্মিলিত সার্থক প্রতিরোধের কাহিনী যথেষ্ট পাওয়া যায়। ক্রমে রায়তরা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে ওঠে এবং এক এক জন সাধারণ রায়তও হঠাৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁদের "যুদ্ধাস্ত্রের" কথা এখন আজগুবি বলেই মনে হবে। রায়ত পক্ষের লাঠিয়ালরা হঠাৎ এক সঙ্গে জমায়েত হতে শিখে গেল। একটা সংগ্রামকে নমুনা স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যে-অস্ত্র চালনায় তিনি দক্ষ তিনি উপস্থিত। "Each specialising in the weapon it found most suitable—bow and arrow, slings ("like David of old") bricks, bale fruit, brass plates thrown horizontally (which does great executions), earthen pots thrown by women, lathis and finally the fiercest of all, a dozen men armed with spears." (The Blue Mutiny, p. 102) তীর ধনু, গুলতি, ইট, (কাঁচা) বেল, ধাতব থালা, (সমতল ভাবে ছুড়ে দিলে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সমর্থ), স্ত্রীলোকদের পরিত্যক্ত মাটির তৈজসপত্র, শেষ পর্য্যন্ত ডজন খানেক ভয়ঙ্কর সড়কিধারী লোক লড়াই করে নীলকরদের বাহিনীকে পরাভূত করে।

দেশীয় সহানুভূতিসম্পন্ন লোক ছাড়া বিদেশী খৃষ্টীয় পাদ্রীরা প্রকাশ্য ভাবেই রায়তদের সমর্থন করেছেন। তাঁদের প্রেরিত ঘটনার বিবরণী পিয়ারী চাঁদ মিত্রের ইণ্ডিয়ান ফিল্ড (Indian Field) আর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট (Hindoo Patriot) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। তাঁদের মতামতের প্রতি শ্বেতাঙ্গ শাসকদলের কিছুটা আস্থা ছিল বলে জানা আছে।

নীলের উপদ্রব নিবারণকল্পে স্থানীয় আইনজীবীরা বিশেষ করে কোনো কোনো মোক্তার নীলকরদের এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটদের কোপানলে পড়ছেন। কারও কারও হাজতবাস ও ঘটছে। অপরদিকে তাঁদের প্রেরিত ঘটনার বিবরণী কলকেতার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে প্রতিপত্তিশালী লোকদের সহানুভূতির উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচার নিরাকরণ-প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

১৮৬০ মার্চ্চ পর্য্যন্ত নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ করা যায়নি। মার্চ্চ ২৪-এ বড়লাটের আইন সভার এক নির্দ্দেশমতে সমস্ত ব্যাপারের তদন্তের জন্য এক কমিশন গঠিত করার কথা ওঠে এবং ১৮৬০ এপ্রিল ৯-ই তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিশন কার্য্যারম্ভ করে ১৮-ই মে। ১৮৬০ নভেম্বরে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। নীলকরদের অনাচার সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী মুখে মুখে চলে আসছিল এবং যার অনেকখানি "কাল্পনিক" ও অবিশ্বাস্য বলে পরিত্যক্ত হচ্ছিল, তার সমস্তই সমর্থিত হয়। গ্রাণ্টের সুপারিশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারত সচিব কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। কুখ্যাত নীলচাষ এক আঘাতেই মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। পরে জার্ম্মানীতে যৌগিক নীল আবিষ্কৃত হ'লে ভারতীয় নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

নীল দর্পণ

নীল বিদ্রোহ প্রসঙ্গ ত্যাগ করবার পূর্ব্বে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম, নীলদর্পণ নাটকের প্রকাশ (১৮৬০) আর যখন নীল আন্দোলন চরম অবস্থায় উঠেছে ঠিক সেই সময় প্রকৃত ঘটনার নিখুঁত চিত্রাঙ্কন দ্বারা এখানি লোকের মনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। লিখিত ছড়া লোকের মুখে মুখে চলেছিল। তার পর যখন ১৮৭১ ডিসেম্বর ১১-ই নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়, তখন চোখের সামনে অত্যাচারের রূপ দেখে লোক উন্মত্ত প্রায় হয়ে ওঠে এবং নীলকর সাহেবদের ওপর মন তিক্ত বিষাক্ত হয়। ইংরেজ, নীলকর, ম্যাজিষ্ট্রেটও সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের ওপর বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি করতে নীল দর্পণ-এর দান অসীম।

নীলের বা নীলদর্পণের জের আর এক অধ্যায়ে টানা হয়েছিল। বইখানির ইংরেজি অনুবাদ করে দেন (১৮৬১ মধুসূদন এবং পাদ্রী লঙ (James Long, 1814-1887) হলেন প্রকাশক। মানহানিকর ও মিথ্যা প্রচার অভিযোগে লঙের নামে ১৮৬১ জুলাই ১৯-এ নালিশ রুজু করা হয় নীলকরদের পক্ষ থেকে। বিচারে আগষ্ট ২৬-এ লঙের এক মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ সে টাকা তৎক্ষণাৎ কোর্টে জমা দেন। কিন্তু এই সূত্রে বইখানির খুব প্রচার হয়ে গেল, অনুপাতে শিক্ষিত মহলে ইংরেজ জাতের ওপর বিরূপ মনোভাব তীব্রতর হয়ে উঠলো। এ বইয়ের শিক্ষা ও স্বদেশী যুগে ভাল করে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং প্রথমতঃ এর অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। বইখানি "নিষিদ্ধ" পুস্তকের তালিকায় স্থান না পেলেও সবরকমে এর প্রচার বন্ধ করে। সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ীর তল্লাসীতে বইখানি পেলেই পুলিশ নিয়ে যেত, যেমন হয়েছিল গীতা, আনন্দমঠ প্রভৃতি গ্রন্থের দুরবস্থা।

নীল দর্পণের আরও এক অধ্যায় বাকী রয়েছে। হাই কোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালেই ওয়েল্‌স্ (Mordaunt Wells) ১৮৫৯ আগষ্ট ২৪-এ এক রায়ে

সমস্ত বাঙালী জাতকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াত, শঠ প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেন। তখন উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ হয় নি। লঙের মামলায় ওয়েলস্ যে দিন রায় দেন অর্থাৎ তাঁর উক্তির দুবৎসর বাদে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজার রাজবাটির নাট মন্দিরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। হাই কোর্টের কোনো বিচারপতির পক্ষে একটা সমস্ত জাতকে অশালীন উক্তি দ্বারা হেয় করতে চেষ্টা করা যে অত্যন্ত গর্হিত সে বিষয় অতি কঠোর ও তীব্র ভাষায় উল্লেখ করা হয়। লঙ মামলায় রায় অন্যরূপ হ'লে এ সভার আয়োজন হ'তো কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে সময়কার বাঙালীর পক্ষে এক অসাধ্য কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রায় বিশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ লিপি ভারত সচিব (Charles Wood) কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে জজসাহেব বিশেষভাবে তিরস্কৃত হন (P. N. Singh Roy: Chronicles of the British Indian Association, p. 32).

শেষ অধ্যায়টিকে করুণ বলাও চলতে পারে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় এক নীলকর সাহেবের নৈতিক চরিত্র নিয়ে এক তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হরিশ মুখার্জ্জির নামে ১৯৬০-এ মানহানির মোকদ্দমা রুজু হ'লো। মামলা চলছে; ইতিমধ্যে ১৮৬১ জুন ১৪-ই হরিশ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন তাতেও নীলকরদের আক্রোশ শান্ত হয় নি। তাঁরা চাইছিলেন পত্রিকাখানি একেবারে বন্ধ করা। মামলার রায়ে হরিশ্চন্দ্রের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। অতি দুরবস্থার মধ্যে তাঁর পত্নী কষ্টেসৃষ্টে সে টাকা পরিশোধ করে মুক্তি পান।

চৈত্র মেলা

(১৭৬১-১৭৬৭)

কেবল মৌখিক প্রতিবাদ নয়। চিন্তাশীল লোকে ক্রমে গঠন মূলক কাজের দিকেও মন দিতে থাকেন। ইংরেজকে উদ্দেশ করে কুকথা বল্লেই জাত বড় হবে না; তাদের সদ্‌গুণ চিন্তা করে নিজেদের মধ্যে তাকে আয়ত্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য রূপ নিয়ে চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলার আবির্ভাব। সমসাময়িক কালে এবং হয়ত অনেক পরেও চৈত্র মেলার যে অবদান তার তুলনা খুঁজে বার করা কঠিন।

ইংরেজের প্রভাব প্রবল বন্যার মত অতীত গৌরব, সাহিত্য কৃষ্টি সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আর তার মধ্যে যে কয়জন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন তার মধ্যে ঋষি রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। ১৮৬১-র আগে নানা দিক থেকে জাতীয় সম্বিৎ গড়ে তোলার চেষ্টা যে হয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নেই, কিন্তু একটি লক্ষ্য নিয়ে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সঙ্কল্প যিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দূরদর্শিতার কথা ভেবে আজ বিস্মিত হতে হয়।

ইংরেজ শাসনের মোহ অনেককেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পরনির্ভরতা, পরমুখাপেক্ষিতা জাতির মজ্জার বাসা গড়ে তুলছিল। অপর দিকে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিজেদের বহু করণীয় আছে সে চিন্তাও মনকে অধিকার করতে আরম্ভ করেছিল।

ঐ বিষয়ের অগ্রণী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। মেদিনীপুরে থাকাকালীন ১৮৬১-তে তিনি জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা সঞ্চারিণী সভার পত্তন করেন। স্বাস্থ্য, ভাষা, সাহিত্য, বাক্য ও পত্রালাপ, সঙ্গীত, আলোচনা, বক্তৃতা, বেশভূষা, আদব কায়দা প্রভৃতি সকল ব্যাপারে ভারতীয় আচরণের গৌরব বৃদ্ধি করাই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশী নানা প্রভাব জাতিকে আত্মভোলা করে ছাড়ছে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

এই সভা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে ১৮৬৬-তে জাতীয় কর্ম্মবিধি বা কর্ম্মসূচী (National Programme) প্রণয়ন করেন। যে সকল কার্য্য কারণ জাতির গৌরবের

বিষয় ছিল এবং যে সকল নতুন কার্য্যকলাপ দেশপ্রীতির সঙ্গে জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে, তিনি সে সকল বিষয়েরই উল্লেখ করেন। তাঁর জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী সভার পক্ষে আচরিত কর্ম্মতালিকার সঙ্গে নানাবিধ ব্যায়াম, কুস্তি ঘোড়া চড়া, নৌকা চালনা, জিমনাষ্টিক প্রভৃতি যুড়ে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের পরামর্শ দেন।

১৮৬৬-তেই তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনকল্পী সমিতি (Society for the Promotion of National Feeling amongst the educated Natives of Bengal), গঠনে অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের সর্ব্বরকমে, এমন কি কথিত ভাষার মধ্যেও "বাঙ্গালিত্ব" বজায় রাখবার নীতি গৃহীত হয়।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠ-পোষকতায় নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪) হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলার প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৬৭ এপ্রিল ১২-ই (চৈত্র সংক্রান্তি) মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। শুরু থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৫৯) প্রভৃতি উৎসাহশীল হয়ে পড়েন। প্রথম অধিবেশনের সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর সহকারী সম্পাদক নব গোপাল মিত্র।

মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনটি নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। সভার সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে খোস গল্প করবার জন্য এটা সাধারণ মিলন নয়, এই সভা "স্বদেশের জন্য, ভারতভূমির জন্য।" পরের শাসনে থেকে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত লজ্জাজনক হীন অবস্থা; আত্মনির্ভরতা লাভের জন্য জাতিকে কৃতসঙ্কল্প হতে হবে।

এই অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথের দেশানুরাগরঞ্জিত ভারতের মহামহীয়ান অতীতের স্তবগীতি তাঁর "মিলে সব ভারত সন্তান" সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী, ব্যায়াম প্রতিযোগিতা, জিমনাষ্টিক, দেশীয় ক্রীড়া, লাঠি চালনা, ঘোড়া চড়া, নৌকা প্রতিযোগিতা, পাইকের খেলা, বাঁশ বাজী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হ'তো। কৃতিত্বের জন্য বিখ্যাত গায়ক, শিকারী, দক্ষ, শিল্পী প্রভৃতিকে পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হ'তো।

এই (দ্বিতীয়) অধিবেশনে মনমোহন ঘোষ বলেছিলেন যে তাঁরা সেখানে "ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছেন।" সে বীজ থেকে যে "মনোহর বৃক্ষ" উৎপন্ন হবে, তাতে "জাতি গৌরব রূপ পত্রাবলী"র জন্ম সঙ্ঘটিত হবে এবং "সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত" হবে। তা থেকে যে ফল প্রসূত হবে "অপরদেশের লোকেরা তাকে স্বাধীনতা নামে" পরিচয় দেয়। (যোগেশ চন্দ্র বাগল : জাতীয়তার নব মন্ত্র, ১৩৫২, পৃঃ ১৩৪)।

প্রায় পনেরো বৎসর চলবার পর "মেলা" বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'ন্যাশনাল' নব গোপাল মিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা জাতীয় ভাবের গঠনমূলক দিকটা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং আর ফলও সুদূরপ্রসারী হ'য়েছিল। এ সময় নবগোপাল ন্যাশনাল পেপার নামে এক পত্রিকাও বার করেছিলেন। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা আলোচনা করতে গেলে রাজনারায়ণ, নবগোপাল, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্র নাথ, মনোমোহন প্রভৃতি মনীষীদের কথা স্বতঃই স্মরণে আসে।

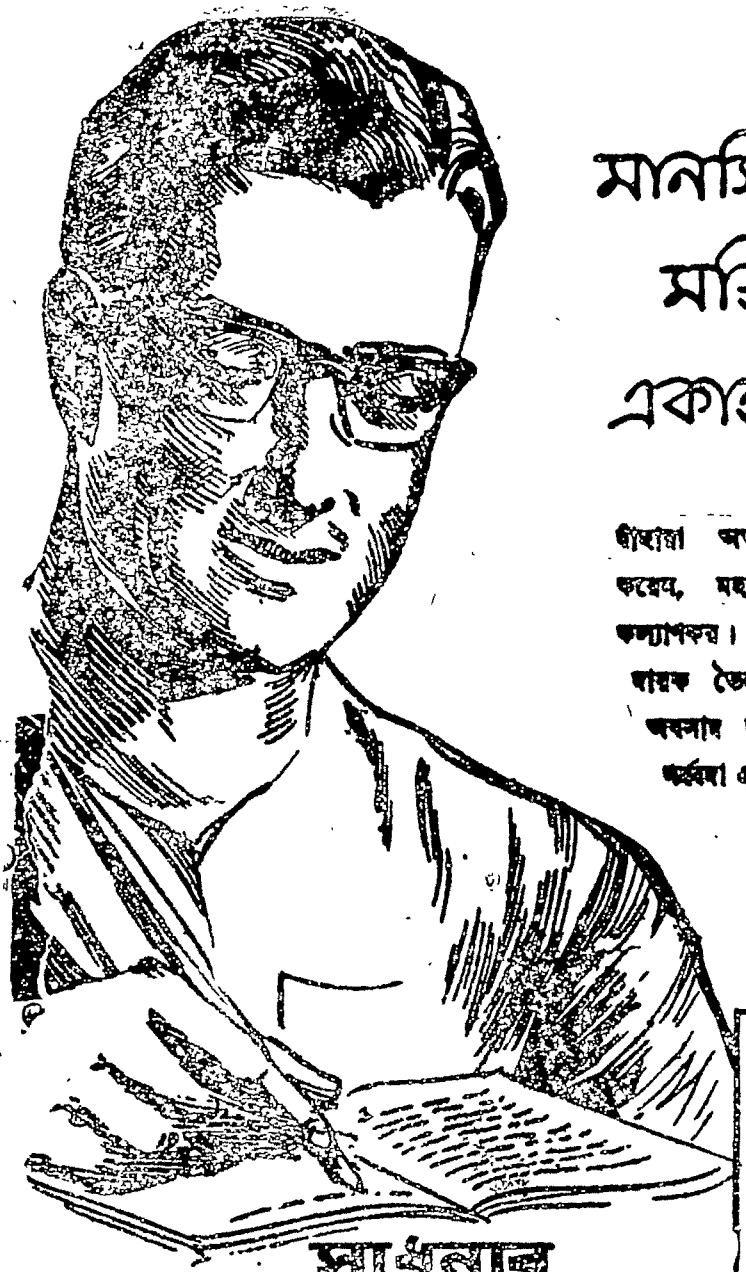

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

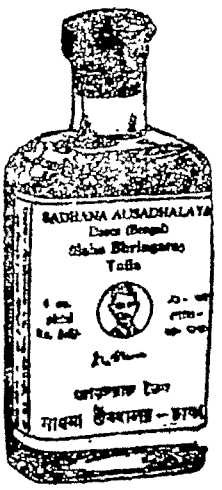

সাধনার

মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ডাকঘর

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এল. এম. পি, এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল, এম, পি, এস. (লণ্ডন) এফ, পি, এস (গ্লাসগো)
আয়ুর্ব্বেদপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ধান কাটার সংগ্রাম : গরীব চাষীদের ক্ষতিপূরণ চাই

সুনীল দাস

পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি জমি দখলের সংগ্রাম, ধানকাটার সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। 'লাঙল যার জমি তার', ভূমি-সমস্যা সমাধানের এই অন্তিম নীতির সমসাময়িক রূপান্তর ঘটেছে 'চাষ করেছে যে, ধান কাটবে সে'—এই নীতিতে। তাই ধানকাটার মরশুম যতই এগিয়ে এসেছে ধানকাটা নিয়ে সংঘাতের দৈনন্দিন ঘটনা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও গুরুতর সংঘাতের আশঙ্কা সন্ত্রাসের আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইনের আওতা এড়িয়ে যে সব জমি এতোকাল বেনাম করে রাখা হয়েছিল, তা থেকে গত কয়েকমাসে কৃষকেরা সংঘবদ্ধভাবে প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমি উদ্ধার করে দখল করেছে। পঁচাত্তর বিঘা সিলিং-এর কৃষিজমির অতিরিক্ত আইনের বিধানে যে জমি সিলিং-এর আওতার বাইরে "ছাড়" জমিরূপে স্বীকৃত ছিল; যথা, বাগিচা, দেবোত্তর জমি, মেছোভেড়ী ইত্যাদি—যে জমি আইন পরিবর্তন করে সরকারে বর্তালে আরও কয়েক লক্ষ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি হতে পারতো—তাও দখল হয়েছে। এ-ছাড়া যে সব জমি সরকারে বর্তানো সত্ত্বেও এবং সরকার দল নেবার পরও ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি হয় নাই, সরকারে বর্তেছে কিন্তু আইনের বলে সরকারী দখলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে, ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টিত সরকারী জমি, সরকারী খাস জমি, নদী-ভরাটি চর জমি, জনহিতকর কাজের জন্য সংরক্ষিত সরকারী জমি এবং সিলিং-এর আওতার অন্তর্ভুক্ত জমি, ছোটজোতের কৃষকের জমি এবং ভাগচাষীর জমিও দখল হয়েছে।

এই সকল বিভিন্ন ধরণের দখলী জমিতেই চাষ হয়েছে এবং ধান কাটাও সুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ধানকাটার নীতি ঘোষণায় বলেছেন, যে চাষী খাস জমি কিম্বা উদ্ধার করা জমিতে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করেছে, এই ফসলের উপর সেই চাষীর অধিকার রক্ষা করতে হবে। কেউ তাতে বাধা দিতে চাইলে সরকার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। সরকারী নীতি-ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাদের ৭৫ বিঘার বেশী জমি নাই, অর্থাৎ বেনামী জমি নাই, সিলিং-এর সীমার মধ্যে এই সব জমির মালিকের জমি যদি কোনো চাষী একক বা দলবদ্ধভাবে জবরদখল করে থাকে, সেক্ষেত্রে এই সকল জবরদখলকারী চাষীদের ধান কাটতে দিতে হবে। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এইসব ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত মালিককে আইন মত তার জমিতে উৎপাদিত ফসলের ভাগ দিতে হবে এবং পরে জমির মালিককে তার জমি ফেরৎ দিতে হবে। জমির মালিক ফসলের কত ভাগ পাবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট জেলার ভাগ-চাষের চলতি প্রথার উপর। অনুরূপভাবে যদি কোনো খাস জমিতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত কৃষকের জমি, অন্য কোনো প্রাক্তন লাইসেন্স-প্রাপ্ত কৃষক কিম্বা ভূমিহীন কৃষক চাষ করে থাকে, সে-ক্ষেত্রেও বর্তমান লাইসেন্সধারী কৃষক ও জবরদখলকারী কৃষকের মধ্যে ধান ভাগ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও বলেছেন : যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি হোলো জোতদার-কৃষক বিরোধে সরকারী শাসনযন্ত্র নিরপেক্ষ থাকবে না—নিশ্চিতভাবে দরিদ্র কৃষকদের

সাহায্য করবে। জোতদারেরা যে কোনো আবরণ গ্রহণ করুক না কেন তারা তাদের অন্যান্য কাজে, বিশেষ করে চাষ করা কৃষকদের ফসল কেড়ে নেবার কাজে, সরকারের সাহায্য পাবে না, পাবে বিরোধিতা। কিন্তু শরিকি বিরোধে এ-শাসনযন্ত্র নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং যা বাস্তব সত্য তার ভিত্তিতে কাজ করে যাবে। এই নীতি অনুযায়ী চলার জন্য জেলার অফিসারদের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দরিদ্র কৃষকদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে সরকারের দিক থেকে একটি প্রশংসনীয় উদ্যমের তত্ত্বগত স্বাক্ষর পাওয়া গেলেও কার্যত এই নির্দেশের এবং সরকারের শরিকদের আন্তর্দলীয় বোঝাপড়ার পরও প্রায়ই জমির বিরোধে সংঘর্ষ, ধান লুঠ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যার সংবাদ অনবরত পাওয়া গেছে। এই সংঘর্ষ ও লুঠের বলি হয়েছে কৃষকেরা এবং যখনই এই সংঘাতে দুই বা ততোধিক দল সংশ্লিষ্ট থেকেছে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে জোতদারের প্রতিভূরূপে চিহ্নিত করেছে। ঘটনার বিচারে দেখা গেছে যে এই সকল সংঘাতের এক পক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি। অন্য দিকে অন্যান্য দলের যে কোনো একটি। ধানকাটার মরশুম যতই এগিয়েছে ততই দেখা গেছে যুক্তফ্রন্টের কয়মাসের শাসনে তাদের অনুসৃত ভূমি নীতির ফলে যেমন জবরদস্তির প্ররোচনায় প্রকৃত কৃষক যে, 'যার লাঙল' 'জমি তার' না হয়ে জবরদখলের ফলে জমি অপরের করায়ত্ত হয়ে গেছে এবং 'লাঙল যার জমি তার' —ভূমি-সমস্যার এই মৌলিক নীতি বিড়ম্বিত হয়েছে, তেমনি ফসল যে বুনেছে, সেই যে সর্বত্র ধান কেটে নেবার সুযোগ পেয়েছে তা নয়। ৭৫ বিঘা জমি কেন, আরও অল্প-জোতের জমির—যেমন দুই এক বিঘা জমির কৃষকদেরও—মালিকদের জমি অংশত কিম্বা সবটাই জবরদখল হয়েছে, তেমনি যে জমিতে চাষী ধান বুনেছে,—আইনগতভাবে যে জমির মালিকানা সেই চাষীর—সেই ধান দলীয় শরকি, বল্লম, টাঙ্গি তীর-ধনুক লাঠি-বন্দুকের জোরে বিভিন্ন দলের শিবিরে আশ্রিত চাষীরা সেই সব জমি থেকে ধান কেটে নিয়ে গেছে। এই কাজেও মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিই অগ্রণী। সুতরাং, "ফসল বুনেছে যে, ধান কাটবে সে"—এই নীতির ব্যাপক লঙ্ঘন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। বরং যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি-নীতিকে যদি কোনো স্পষ্টরূপ দিতে হয়, তাহলে বলতে হয় 'জোর যার, ধান তার'।

উদ্ধার করা বেনাম জমি, কিম্বা সরকারে যে জমি বর্তেছে কিন্তু জমির পূর্বতন মধ্যস্বত্বভোগী আইনের আশ্রয় নেবার ফলে জমির দখল নিতে সরকার সমর্থ হয় নাই—এই ধরণের জমি কৃষকেরা যেখানে জবরদখল করেছে, সেই সব ক্ষেত্রে জবরদখলকারী কৃষকেরা তাদের বোনা ফসলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। অবশ্য এ-কথাও সত্য যে আইনের আওতায় যেখানে ভূমি-সংস্কার ও ভূমি-সমস্যার সমাধান সম্ভব সেখানে আইনের দ্রুত পরিবর্তন করে সরকার অনায়াসেই তা করতে পারতেন। প্রশ্ন রয়েছে, যে সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, যে সরকার আমূল ভূমি-সংস্কারে প্রতিশ্রুত এবং চাষীর হাতে জমি দেওয়াই যাদের ভূমি নীতির গোড়ার কথা, সে সরকার দ্রুত আইনের প্রয়োগে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী না হয়ে জোর-জবরদস্তির পথে কৃষকদের উৎসাহিত করে ভূমি-সমস্যাকে রাজনৈতিক সংঘাতে পৌঁছাতে দিল কেন? এ-প্রশ্নের কোনো অর্থনৈতিক সদুত্তর নেই, এর রাজনৈতিক উত্তর খুব স্বচ্ছ। আসলে, কৃষকদের দলীয় প্রভাবে সংহত করবার অদম্য প্রবণতা বর্তমান সরকারের সব চাইতে শক্তিশালী দল মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এ-পথে পরিচালিত করেছে। জমি দখলের স্বাভাবিক পরিণতি ধান-দখলে। অপরের জমির বোনা ফসলও সেই নীতির পরিণতিতে দলীয় গহ্বরে পৌঁছে যাচ্ছে। [শেষাংশ ৫৯৪ পৃষ্ঠায়]

বাদশা খান

সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফর খাঁন বাইশ বছর পর গত পয়লা অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষে এসেছেন। আবদুল গফর খাঁন বাদশা খাঁন নামে সুপরিচিত। ভারতবাসীর স্নেহসিক্ত এই নাম বাইশ বছর আগে তাদের চোখের সম্মুখে যে তেজোদৃপ্ত কমনীয় দীর্ঘদেহী ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতো, বাদশা খান বাস্তব জীবনে আজও তার চরিত্রের মধ্যে সেই ছবিটি বহন করে চলেছেন। উপরন্তু তিনি পরিপূর্ণ অপরিগ্রহেরও প্রতিমূর্তি। পরণে কুর্তা-কামিজ, গায়ে একখানা চাদর আর সঙ্গে আর এক প্রস্থ পরিচ্ছদের পুঁটুলী। বাদশা খান যখন দিল্লীর বিমানবন্দরে পরিচ্ছদের এই সামান্য পুঁটলীটি নিজ হাতে বহন করে বিমান থেকে অবতরণ করলেন সে-সময় সীমান্ত গান্ধী প্রাক-স্বাধীনতা যুগের অনাড়ম্বর, নিরভিমান, সহজ, সরল গান্ধীর জীবনযাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। গান্ধী-জন্মশতবর্ষে গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে আর এক গান্ধী, গান্ধী-বাদী জীবনদর্শনের অতীতসিক্ত অধ্যায়গুলি জাতির দৃশ্যপটে পৌঁছে দিল।

বাদশা খান চব্বিশ বছর পর গত দশই ডিসেম্বর কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় পৌঁছেই সেদিন সন্ধ্যায় রাজভবনের সভায় বলেন গান্ধী শতবর্ষে মহাত্মা-গান্ধীর স্মৃতি এবং জনসাধারণের প্রীতি তাকে তিনমাস পূর্বে এদেশে টেনে এনেছে। সারা ভারত উপমহাদেশে গান্ধী জীবনদর্শনের একমাত্র পতাকাবাহীরূপে সত্য ও অহিংসার পূজারী অপরিগ্রহের প্রতিমূর্তি, সেবা ও সর্বস্বপর্ণের মূর্তপ্রতীক বাদশা খান যে আজও গভীর শ্রদ্ধার আসনে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তাঁর মনের আবেগ-সিঞ্চিত স্বতোৎসারিত কথাগুলি তা সপ্রমাণ করে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বেদনার্তহৃদয়ে এ কথাই সকলকে বোঝাতে চেয়েছেন: "ভারতবর্ষ গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে।" তার এই মন্তব্য হয়তো কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কিম্বা শাসকগোষ্ঠির অনভিপ্রেত হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি যা সত্য বলে মনে করেছেন নির্দ্বিধায় তা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এই দীর্ঘদেহী, আত্মনিবেদিত মানুষটি অতীত থেকে উঠে এসে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে মৃদু ভৎর্সনার সুরে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বলেছেন যে বাইশ বছর পূর্বে মানুষের হৃদয়ে যে প্রেম, সেবা, ন্যায়বিচার ও অহিংসার আবেদন ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর তার পরিবর্তে ঘৃণা, স্বার্থপরতা, অবিচার এবং সর্বাত্মক হিংসা সে স্থান দখল করেছে। দেশ গান্ধীজীকে বিস্মৃত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। গান্ধীজীর সে-জন্য কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। বাদশা খান দুঃখ করে আরও বলেছেন যে দেশ যখন "গুলাম" ছিল তখন তার যে ইজ্জত ও কদর ছিল বর্তমানে তা খুইয়ে ভারতবর্ষ রিক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জাপানে কাকা কালেলকারের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। বিদেশে গান্ধীদর্শন প্রচারের উদ্যোগকে তিনি প্রহসন মনে করেন, কারণ যে দেশের মানুষ আচারে-আচরণে-ভাবনায় গান্ধীজীর জীবনদর্শনের সর্বতোমুখী বিরোধিতায় মত্ত হয়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে বিদেশে গিয়ে গান্ধীজীবন প্রচার বাতুলতা মাত্র। তাদের এই প্রয়াস ভারতবর্ষকে আরও হাস্যাস্পদ করে তুলবে।

এগারই ডিসেম্বর বৈকালে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের মহতী সভায় সরল হিন্দিতে তাঁর মনের আবেগ ব্যক্ত করে বাদশা খান যে কথা বলেছেন, গত বাইশ বছরে ভারতবর্ষের পরিবর্তন সম্পর্কে তা তাঁর গভীর মনোবেদনার পরিচায়করূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। স্বথেদে তিনি বলেন :

"স্বরাজের জন্য যখন লড়াই করি, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা, দুঃখ, কষ্ট ও হিংসা দূর করা। আমরা শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা চাই নাই।

...গান্ধীজী, নেতাজী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অনেক সঙ্গীদের আশা ছিল দেশ স্বাধীন হলে দেশের দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সমস্যা দূর হবে। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য অন্তর্হিত হবে। কারণ এ-সব সমস্যা পরাধীনতার অভিশাপ।"

তিনি আরও বলেন :

"তিনমাস হিন্দুস্থান ঘুরছি। শহরে গেলে দেখি বড় বড় মকান, বড় বড় রাস্তা, কিন্তু গ্রামে গেলেই সেই ঝোপড়ি, সেই দারিদ্র্য, মানুষের প্রতি সেই ঘৃণা এবং আরও বেশী চোখে পড়ে।"

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাতে বাদশা খান গভীরভাবে পীড়িত বোধ করেছেন। গুজরাতের সাম্প্রদায়িক হানাহানি তাঁকে বিচলিত করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"ধর্মের নামে সকল রকম দুষ্কর্ম সাধিত হয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে খুনোখুনী হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ধর্ম হোলো মনুষ্যত্ব, প্রেম, ন্যায়, সত্য। সাম্প্রদায়িক মারপিটে মারা যায় গরীবেরা—এখানে এবং পাকিস্তানে। কেউ কখনও শুনেছে আমীর কোথাও দাঙ্গায় মরেছে।"

ভারতবর্ষের হিন্দুদের পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি দায়িত্ব স্মরণ করিতে দিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি এখানকার হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলেন পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র সিন্ধুতে সামান্য কিছু হিন্দু অবশিষ্ট হয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এখনও এক কোটি হিন্দু রয়েছে। ভারতবর্ষের হিন্দুদের এই এক কোটি হিন্দুর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রয়েছে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনিবার্যভাবে পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেখানকার হিন্দুদের বিপন্ন করে তুলবে। সুতরাং এখানে সাম্প্রদায়িক গোলোযোগের ফলে পাকিস্তানের হিন্দুদের দুর্ভোগের কারণ না হয়। সেদিকে ভারতীয় হিন্দুদের সতর্ক থাকতে হবে।

বাদশা খান স্বাধীনতা সংগ্রামের যে গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে বহন করে ভারতবর্ষে হাজির হয়েছেন বর্তমান যুগের ক্ষমতামদমত্ততা, আদর্শভ্রষ্টতা এবং আত্মসর্বস্বতা সে অতীতকে ম্লান, নিষ্প্রভ এবং অস্পষ্ট করে তুলেছে। সেই অতীতের বিস্মরণ দমদম বিমান বন্দরে মাত্র কয়েক শত লোকের উপস্থিতি সপ্রমাণ করেছে। গৌরবময় অতীত যে দেশের মানুষকে উদ্বেল করে না সেই দেশের দুর্দিন দেখা দিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু বাংলাদেশে যারা আজও সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে শুধু ইতিহাসের বোঝারূপেই নয়, জাতীয় জীবনের অন্তরঙ্গ, অনিবার্য, অবিস্মরণীয় উপাদানের সম্পদরূপে গ্রহণ করে থাকেন, তাদের মনেও সেদিন উদ্বেলতা দেখা দেয় নাই, সেটাই দুঃখের। যারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলেন, তারা সংগ্রামে দুর্জয়, আদর্শে অবিচল, অখণ্ড ভারতের সর্বশেষ জলন্ত শিখাটিকে বিমানঘাঁটিতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে জাতীয় কর্তব্য পালন করেন নাই। এই স্বাগত জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বাদশা খানকে সম্মান দেখাবার প্রশ্ন অবান্তর। বাদশা খান এই সম্মান-অসম্মানের ঊর্ধে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।

বাদশা খান তাঁর আশী বছরের জীবনে ত্রিশ বছর কারা-ভোগ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা যখন ভারতে ক্ষমতার আসন করায়ত্ত করে পদমর্যাদার

জমকে, মসৃণ জীবনযাত্রার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, সে-সময় তাঁদেরই এক প্রবল পরাক্রান্ত আপোষহীন সংগ্রামী সহকর্মী পাকিস্তানে নির্বাসিতের জীবন বরণ করে চরম লাঞ্ছনা, পীড়ন এবং অসম্মানের সম্মুখীন হয়েছেন এবং পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামে পনর বছর কারাজীবনের দুর্ভোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। ধর্মের নামে উন্মাদনা প্রতিরোধ করতে এই বলিষ্ঠ পাঠানের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব ক্ষত-বিক্ষত হয়েও পরাজয় স্বীকার করে নাই। একথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে একমাত্র বাদশা খান তাঁর পতাকা অবনমিত করেন নাই। আজও তা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

বাদশা খানের উপস্থিতি আমাদের স্বভাবতই ভারত-বিভাগের গ্লানিময় অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেদিন পাঠানদের সীমাহীন আনুগত্য, তাদের মহান ত্যাগ ও অহিংসার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা—এ-সব কিছু উপেক্ষা করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বাদশা খানের অন্যান্য সহকর্মীরা দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলো। শুধু তাই নয় দেশ বিভাগের মাত্র কিছুদিন পূর্বে সাধারণ নির্বাচনে খুদাই খিদমদগারদের কাছে সীমান্ত-প্রদেশে সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা পরাস্ত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান কিম্বা ভারত কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণের জন্য নেতৃবৃন্দ গণভোটের প্রস্তাব মেনে নিলেন। ক্ষোভে, দুঃখে বাদশা খানের পাঠান হৃদয় সেদিন তার সহকর্মীদের প্রতি আর্ত অভিযোগ করে বলেছিলো:

"স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা পাঠানেরা তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এবং স্বাধীনতার জন্য আমরা বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছি। কিন্তু তোমরা আমাদের বর্জন করে নেকড়ে বাঘের মুখে ঠেলে দিচ্ছো।"

দেশবিভাগ করে সেদিনকার জাতীয় নেতৃত্ব শুধু বাদশা খান এবং তাঁর সংগ্রামী, দুর্ধর্ষ সহকর্মীদেরই বাঘের মুখে ঠেলে দেয় নাই, গোটা দেশটাকে সর্বনাশের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিলো। '৪২-এর বিপ্লব এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম—দেশের ভিতরে এবং বাহিরে এই দুই দুরন্ত সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামকে যে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবে রূপান্তরিত করতো, জাতীয় নেতৃত্ব দেশ বিভাগে সায় দিয়ে সেই উদ্যত বিপ্লবকে প্রতারিত করেছেন। বর্তমান ভারত-বর্ষের সঙ্কট সেই প্রতারিত বিপ্লবের সঙ্কট এবং বাদশা খান সেই ভয়ঙ্কর প্রতারণার জীবন্ত, মূর্ত প্রতিবাদ।

বাদশা খানের দৃষ্টিতে

দিল্লীতে সাক্ষাৎকারী কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের এক সদস্য বাদশা খানকে প্রশ্ন করেন, গত বাইশ বছরের মধ্যে তিনি কেন ভারতবর্ষে আসেন নি। বাদশা খান উত্তর দেন :

"কিসের জন্য আসবো? আমি এ-সময় পাখতুনিস্তানের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছিল। আরাম করবার জন্য এখানে আসবার আমার কোনো অবসর ছিল না। আমি কেবলমাত্র সাহায্য চাইবার জন্য আসতে পারতাম। কিন্তু কোনো সাহায্য পাবার সম্ভাবনা দেখি নাই। আমি এখন এসেছি, কারণ আমার সংগ্রামের সুফল পাবার সময় আসন্ন। আমাদের লক্ষ্যের সমীপবর্তী হয়েছি। এখন আমি ভারতবর্ষের জনসাধারণের সেবা করতে পারবো এবং তাদের অসংখ্য সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারবো।"

(১৪ই নভেম্বর ১৯৬৯)

দিল্লীর রামলীলা ময়দানে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় :

"আমি আপনাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে আসি নাই, এমনকি পাখতুনিস্তানের সংগ্রামে সাহায্যের জন্যও আসি নাই। যে ধরণের পাখতুনিস্তান আমরা আশা করেছিলাম, অচিরেই তা আমরা পাব। আমি আপনাদের সেবা করতে এসেছি। আমি ঈশ্বরের সেবক। আপনাদের প্রেম এবং মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি আমাকে আপনাদের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে। আমার ভারত-আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য এখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী, প্রেম ও প্রীতি স্থাপন করা (২রা অক্টোবর, ১৯৬৯)

দিল্লীতে জামিয়েত উলামা-ই-হিন্দ কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় মুসলীম শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে :

"আপনাদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী কে তা আপনারা কোনো দিনই বুঝতে পারেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতেও যারা ইংরেজের চর ছিল তাদেরই আপনারা আপনাদের নেতারূপে বেছে নিয়েছিলেন।"

(১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৯)

জামা মসজিদের প্রার্থনা সভায় :

"জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় প্রবণতা এবং জাতীয়তাবোধ একটি জাতির উন্নতির পুর্বসর্ত। আপনারা যদি প্রকৃত জাতীয়তাবোধের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, আপনাদের ধর্মও নির্বিঘ্ন হবে।.....

কোরাণ আমাদের হিংসা ও বলপ্রয়োগ শিক্ষা দেয় না। কোরাণে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের শিক্ষা নিহিত রয়েছে। যদি আপনাকে কেউ আঘাত করে, আপনার উচিত হবে না তাকে প্রত্যাঘাত করা। আপনার কর্তব্য হবে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে সে অন্যায় করেছে।"

(১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

দিল্লীর রাজনৈতিক কর্মীদের সভায় :

"মিঃ কোসিগিন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, গান্ধীজী তাঁর লক্ষ্য সাধনে ব্যর্থ হলেন কেন? উত্তরে আমি বলি গান্ধীজীর কোনো কোনো সহকারী তার প্রতি আনুগত্যহীন হয়ে পড়েছিলেন।....."

(১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

পাঠানদের প্রতি ভারতীয় নেতাদের আচরণের উল্লেখ করে ঐ সভাতেই বলেন :

"ভারতবর্ষ যে সময় বিভক্ত হয়, আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হয় না। আমি সে সময় অভিযোগ করে গান্ধীজীকে বলেছিলাম যে আমাদের নেকড়েবাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। গান্ধীজী সে সময় আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন আমরা যেন উদ্বিগ্ন না হই। কারণ যদি পাঠানদের প্রতি কোনো অবিচার করা হয়, ভারতবর্ষ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু ভারতবর্ষ সে দায়িত্ব পালন করে নাই।"

(১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

মৌলানা আজাদ পার্কের সভায় :

"কয়েকটন খাদ্য শস্যের জন্য যে দেশ আমেরিকা কিম্বা জাপানের কাছে ভিক্ষা করতে যায় অথবা রাশিয়ার নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য যায়, তারা নিজেদের আত্মসম্মানী বলতে পারেনা।" (১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

রাজনৈতিক কর্মীদের সভায় :

"নেতারাই দেশের দাঙ্গা ও সংঘাতের জন্য দায়ী। জনসাধারণ হাঙ্গামা চায় না। যারা ক্ষমতায় আসীন রয়েছেন, তাদের পরামর্শ দেওয়া অবান্তর। কারণ তারা সব জানেন। যারা অজ্ঞ তাদেরই পরামর্শ দেওয়া চলে। নেতারা একই লক্ষ্য সাধনের জন্য কাজ করলেও, দল ও গোষ্ঠিগতভাবে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পাকিস্তানের ঘটনা থেকে আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছি। পাকিস্তানের জনতা যতদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল, তারা কিছু করতে পারেনি। কিন্তু তাদের ঐক্য আয়ুবকে তাদের দাবী স্বীকারে বাধ্য করিয়েছে। আমি আয়ুবকে বার বার সাবধান হতে বলেছি, তার পথ বদলাতে বলেছি। কিন্তু সে কান দেয় নাই। ফল কি হয়েছে, সকলেই দেখেছেন।"

(১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

দিল্লীতে প্রেস ক্লাবের সভায় :

"ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে এবং আফগানিস্তানে পাখতুনিস্তান সমস্যা নিয়ে বহু অপপ্রচার হয়েছে। আমরা পাকিস্তানে ভাই-এর মর্যাদা নিয়ে বাস করতে চাই। বর্তমানে যেমন পরাধীনতার ব্যথা নিয়ে বাস করছি, সে রকম নয়। (কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার) যদি পুস্তভাষীদের দাবী অগ্রাহ্য করে তবে আমরা সিন্ধি, বালুচী প্রভৃতি অন্য জাতিদের সহযোগে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।.....পুস্তভাষীদের জন্য পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত স্বয়ং-শাসিত পাখতুনিস্তান রাজ্যের দাবী পূরণ না হলে আমার পাকিস্তানে ফিরবার ইচ্ছা নেই।.....

(১১ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

দিল্লী শরহদী গান্ধী অভ্যর্থনা সমিতির সভায় :

আপনারা আমাদের ভাইয়েরা যখন আমাদের পাকিস্তানে ফেলে চলে এলেন, আমরা সেখানে এই বাইশ বছর অত্যাচার, গুলি, কারাগারের অন্ধকার সেল ভোগ করবার জন্য রয়ে গেলাম। কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচারকে উপেক্ষা করে আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সংগ্রাম করে এগিয়ে গেছি।"

(১১ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

দিল্লীতে লাল কেল্লার সম্বর্ধনা সভায় :

"...আসল কথা হোলো এই সমস্ত দাঙ্গার উৎস আর্থিক পরিস্থিতিতে। কিন্তু স্বার্থান্ধ লোকেরা এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিচ্ছে। .. আপনারা (রাজনৈতিক নেতারা) আপনাদের ভোট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে চান। এবং এই কারণেই সত্যভাষণে আপনাদের ভয়।.....

ধর্ম কি? জনসাধারণকে বলুন ধর্ম মনুষ্যত্বের অপর নাম, বিধাতার সৃষ্ট জীবের সেবা।.....

পাকিস্তানে আয়ুব সরকারের ভাগ্যবিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিন। আমি আয়ুবকে বার বার সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তার নীতির পরিবর্তন করতে সতর্ক করে দিয়েছি। সে শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি মজবুত কেন্দ্রের বনিয়াদটা কি দিয়ে তৈরী হবে। আয়ুব খান জবাবে বলেছিলেন 'ফৌজ' [সেনাবাহিনী]; আমি বলি না 'কৌম' (জনসাধারণ)। আয়ুব খানকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল আবেদন নিবেদন, সভা শোভাযাত্রার জন্য নয়; অত্যাচারিত জনসাধারণের দৃঢ়পণ ত্যাগ ও সংগ্রামের জন্য। ভারতীয় নেতারাও যদি সময় থাকতে সাবধান না হন দেশের বর্তমান অবস্থা বহির্ভারতে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। (১১ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

আহমেদাবাদে যাবার পূর্বে সংবাদপত্রের বিবৃতিতে তাঁর বক্তৃতার এবং কথার অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গে :

"আমি আপনাদেরই একজন এবং আপনারাও আমারই অংশ বলে আমি মনে করি। আমি স্বচক্ষে আপনাদের অবস্থা দেখতে এসেছি, যদি আপনাদের কোনো সেবায় লাগি। আপনাদের কল্যাণকর হবে মনে হতে পারে এরকম কথা কি আপনারা আমাকে বলতে নিষেধ করবেন যদিও সে-বক্তব্য আপনাদের কাছে কখনও কখনও অপ্রিয় মনে হতে পারে? আপনাদের একজন শুভানুধ্যায়ী প্রাক্তন সেবক, যে আপনাদের স্বাধীনতার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে, তার কি এই অধিকারটুকুও নাই?" (১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৯)

দিল্লীতে পার্লামেণ্ট ভবনে পার্লামেণ্টের সদস্যদের সভায় :

"দেশ সমাজবাদী আদর্শ গ্রহণ করেছে, কিন্তু দেশের সরকার কিম্বা বিরোধীদের জীবনে সমাজবাদের লেশ মাত্র নাই। সকল রাজনৈতিক দলগুলির, তা সে ক্ষমতাসীনই হৌক কিম্বা বিরোধীপক্ষেরই হৌক, একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতাদখল করা। সাধারণ লোকের জন্য তারা নিরুদ্বেগ।

"...গান্ধীজীর স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার পর দারিদ্র্য দূর হবে। কিন্তু এখন মদ ও আবগারী শুল্কই সরকারের প্রধান উপার্জনের উৎস। স্বাধীনতার বাইশ বছর পরও মাদকদ্রব্য বর্জন নীতি গৃহীত হয় নাই।

(২৪শে নভেম্বর ১৯৬৯)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সাবিত্রী

মূল রচনা ঃ পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে

'সাবিত্রী'-র ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গে

দিল্লীতে কবিতাপাঠের একটি আসরে আলাপ হলো পুরুষোত্তম শিবরাম রেগের সঙ্গে। একটি তীব্র নিটোল কবিতা শুনিয়ে তিনি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বশ করে নিলেন। তখনো জানতাম না এই বহুমুখী প্রতিভার কোরক-রহস্য যে তার আশ্চর্য মানবিকতা। ক্রমশই তাঁর আতিথেয় মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়েছি অন্তরঙ্গতা ও আলাপচারিতায়, সহজ স্বভাবের অপ্রতিহত বিকিরণধর্মে।

এখানে তাঁর বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য জানাই।

পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে (জন্ম ২ আগস্ট, ১৯১০) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৭-৩১) এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩১-৩৪) পাঠ সেরে ১৯৩৬ থেকে অধ্যাপনাসূত্রে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে তিনি বোম্বাই এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ এবং অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

অগ্রণী এই অর্থনীতিজ্ঞ মরাঠি সাহিত্যের আধুনিকতার অন্যতম শিল্পী। তাঁর কবিতার বই, যতোদূর জানি, সাতখানি। এ ছাড়াও তাঁর তিনটি উপন্যাস, তিনটি নাটক, একখানি সমালোচনা-সংগ্রহ ও একটি ছোটগল্প সংকলন রয়েছে।

তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সরিতা রেগে-র সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদিত 'চংদ' নামক দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্রিকা (১৯৫৪-৬০) মরাঠি সাময়িকীপত্রের ইতিহাসে নির্বাচনী বিবেকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৯৬৫-র জুন-জুলাই মাসে রেগে ছোটগল্পের উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে রাশিয়ায় যান। একই বছর, ডিসেম্বর মাসে, কেরালায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম সর্ব ভারতীয় লেখক সম্মেলনে তিনি তাঁর সমন্বয়ধর্মী আধুনিকতার সংজ্ঞা পর্যালোচনা করেন। ১৯৬৬-র অক্টোবরে দিল্লীতে য়ুনেস্কো-আয়োজিত পুব-পশ্চিম নাট্যসেমিনারে যোগ দিয়েছেন। সাহিত্যের অন্তর্মুখী এবং বহিরাশ্রিত উভয় ধারাতেই তাঁর আগ্রহ সমান। তাঁর বিষয়ে বিশেষভাবেই একথা আমার মনে হয়েছে, অন্তরে-অন্তরে ভারতীয় থেকেই আধুনিক জীবনাদর্শ ও শিল্পৈষণাকে তিনি পূর্ণ মর্যাদা দিতে পেরেছেন।

এঁর বহু রচনা নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় তর্জমার আকাঙ্ক্ষায় আমি তাঁর 'সাবিত্রী' উপন্যাসটি সংগ্রহ করি। শ্রীমান পিনাকীপ্রসাদ ধর যোগ্যতার সঙ্গে এই উপন্যাসের বাংলা ভাষান্তর ঘটিয়েছেন। এই সূত্রে লেখক ও অনুবাদককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যিনি আমার কাম্য আমি তাঁকেই করে তুলি
সাহসী, যোদ্ধা দ্রষ্টা আর পরম ধীমান।
(ঋগ্বেদ, ১০. ১০. ১২৫)

তিরুপেট : কুর্গ, এপ্রিল ১৯৩৯—জুলাই ১৯৩৯,

এক

এমন কি এর আগে আমাদের আলাপও ছিল না। আমি চিঠি লিখতাম আর তুমি উত্তর দিতে সেই একই ধরণের স্বভাবী আবেগে। কী করে তোমাকে আমি নিজের কথা বোলবো বলতো? আমি ভালো ভাবে জানিই না কেমন করে বড় হলাম; মা মারা গিয়েছিলেন আমার,—সুতরাং আপ্পার সঙ্গেই যতো অন্তরঙ্গতা, আর আপ্পা আমায় সব সময়েই কাজে ডুবিয়ে রাখতেন। তাই প্রথমেই শিখেছিলাম কিভাবে নিজেকে ভুলে থাকতে হয়। আমার নাম তো তুমি জানোই। অনেকেই আমায় সাউ বলে ডাকে কিন্তু আপ্পা আমাকে একবার বলেছিলেন: ওরে তুই নিজেই যেন আনন্দ। এমন কথা তিনি অনর্গল বলে যেতে পারতেন —আর সেই অল্প বয়স থেকেই আমি বোধহয় এমনি আনন্দিত, (শুরুতে তুমিও আমাকে তাই ভেবেছিলে)। চিঠিতে তুমি লিখতে আমি একটু খোলামেলা, মুখে বলতেও তাই। আমি যখন খুব ছোট তখন রাজাম্মা আমাকে একটি গল্প শুনিয়েছিলেন:

গ্রাম থেকে অনেক দূরে বনের মধ্যে এক বুড়ী আর তার নাতনী লাচ্চি থাকতো। একদিন এক ময়ূর এলো বুড়ীর কুঁড়েঘরের কাছে। ময়ূরকে দেখেই লাচ্চি নাচতে লাগলো। ময়ূরও নাচলো। লাচ্চি চাইলো ময়ূরটিকে উঠোনেই বেঁধে রাখবে, কিন্তু বুড়ী বললো, 'তা কেমন করে হবে রে? কি খাওয়াবি ওকে, আমাদের কি ধান আছে'? দু'জনে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। তখন ময়ূর নিজেই বললো, 'আমি এখানেই তোমাদের কাছাকাছি থাকবো। আমার ধান লাগবে না, চারপাশে বন তো রয়েছেই। তবে একটি শর্ত আছে আমার। আমি এলে লাচ্চিকেই কিন্তু প্রথম নাচতে হবে। যদি ও নাচ থামায় তাহলে আমি আর কখনো আসবো না'। লাচ্চি রাজি হয়ে গেল, বুড়ীও খুশি হোল খুব। কিন্তু নাচ তো অত সহজ কাজ নয়, নাচতে গেলে মনকেও একই সুরে বাঁধতে হবে। তারপর থেকে লাচ্চির মনে সব সময়েই দারুণ আনন্দ। কেউ বলতে পারে না ঠিক কখন সেই ময়ূর আসবে। শেষের দিকে ময়ূর কখন এসেছে কি চলে গেছে তাও লাচ্চির খেয়াল ছিল না।

রাজাম্মা গল্পের আসল কথাটি কখনোই বলতেন না। আমার কিন্তু প্রায়ই মনে হোতো রাজাম্মা নিজের বানানো গল্পেই কি ভাবে যেন ঠাকুমার ঝুলির গন্ধ মাখিয়ে দিতেন।

আমি বলতাম: যদি কেউ একটি ময়ূরকে চায় তাহলে নিজেই ময়ূর হয়ে যাবে সে। আমরা যা চাই আমাদের তাই হয়ে উঠতে হয়।

এখানে থাকবো বেশ কিছুদিন। আর এই ভাবেই, —তোমাকে আগে থাকতে কিছু না জানিয়ে মাঝে মাঝে তোমার কাছে চলে যাবো আমি।

দুই

ট্রেনে বাচ্চাদের সঙ্গে দুটো আলাদা ভাষায় কথা বলতে দেখে তুমি একটু 'অবাক' হয়েছিলে। সমস্তটাই ভোজবাজি বলে মনে হয়েছিল তোমার। কিন্তু আসলে দুটো ভাষা বলতে আমাকে একটুও চেষ্টা করতে হয় নি। বাচ্চাদের একজন এখানকারই ছেলে, তাই ওর ভাষা তুলু। আর ছোট ছেলেটি—যার মাত্র আড়াই বছর বয়স,—ও কথা বলে কোনকানি ভাষায়। ওদের দু'জনকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ভার ছিল আমার ওপরে। এক হিসেবে আমি বহু

ভাষাবিদ্। কিন্তু আমার আগের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বাচ্চাদের ব্যাপারে ভাষা কোনো সমস্যাই নয়।

আমি তোমার জন্য চা কিনেছিলাম—তাতে কি হয়েছিল বল তো? কোথায় লেখা আছে যে তুমি একাই চায়ের দাম দেবে? তুমি আমাকে ট্রেন থেকে জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করেছিলে সেটাই খুব কম ছিল নাকি?

তিন

দু'বছর বাঙ্গালোরে ছিলাম; তবু তোমার সঙ্গে এর আগে কোনোদিন দেখা হোল না কেন? আসলে ঐ দু'বছরেই আমি অনেক লোককে চিনেছিলাম। মেয়েদের হস্টেল তো বলতে গেলে আমার নিজেরই, সেখানে যে সব মেয়েরা কাজ করে তারা কোনো কিছুর দরকার হলেই আমার কাছে চলে আসে। কলেজ জীবনে খুব বেশী হুল্লোড় করি নি আমি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে সব সময়েই বই মুখে নিয়ে বসে থাকতাম। আসলে বাঁধাধরা কাজ আমার কখনোই ভালো লাগে না।

ক্লাশে অধ্যাপক গুপ্তপদস্বামী একদিন তোমার রচনাটির কথা বলেছিলেন: তিনি তোমার প্রশংসাও করেছিলেন তখন। প্রত্যেক বছরই রচনার জন্য কেউ না কেউ পুরস্কার পায়; সে বছর তুমিই পুরস্কারটি পেয়েছো—এর বেশী কিছু ভাবি নি সে সময়ে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে পড়তে তাহলে হয় তো এ খবর শুনে আরো একটু কৌতূহলী হতাম; কিন্তু সে বছরই আমরা প্রথম কলেজে ঢুকেছি আর তুমি এম. এ ক্লাশের ছাত্র। গুরুপদস্বামী খুব ভালো পড়ান, তাই না? প্রথম বছরের পরীক্ষায় আমি ওঁর কাছে পুরো নম্বর পেয়েছিলাম।.... কিন্তু ওই ভাখো, কখন আবার নিজের কথা শুরু করেছি।

এ-জায়গাটি খুব শান্ত। আপ্পা একটা নতুন বই লিখছেন, তাই সমস্তক্ষণ কাজ করতে হয় ওঁকে। এ সব সময়ে তিনি নিজের আশেপাশে কাউকে সহ্য করতে পারেন না, এমন কি আমাকেও না। আমি তখন আপ্পাকে একটুও বিরক্ত না করে বাড়ির কাজ দেখি, জিনিষপত্র গুছোই।

কয়েকদিন আগে পুনা থেকে ভাষাতত্ত্বের একজন অল্পবয়স্ক প্রোফেসর আপ্পার সঙ্গে দেখা করতে এখানে দু'দিন ছিলেন। ভদ্রলোক সরবর্ণের ডক্টরেট। নন্দনতত্ত্বে তাঁর নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে আপ্পার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন তিনি।

আপ্পা সমস্ত কিছুই খুব মন দিয়ে শুনে ভদ্রলোকের সঙ্গে অল্প একটু আলোচনা করেছিলেন। আপ্পার পরবর্তী প্রশ্নটি আমার দারুণ ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়েছিল। নবরাত্রির দুর্গাপ্রতিমা, রামলীলার রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি আর গণেশ পূজার মাটির পুতুলগুলির অস্তিত্ব খুব ক্ষণস্থায়ী জেনেও কারিগর নিজের সমস্ত শিল্প দিয়েই তাদের তৈরী করেন। কিন্তু এর কারণ কি?

প্রোফেসরের ধারণায় এ সব ক্ষেত্রে শিল্পী তাঁর সৃষ্টির স্থায়ীত্বের কথা ভুলে যান, তাঁর সমস্ত মনোযোগ থাকে সেটিকে সম্পূর্ণ করে তোলার দিকে।

আপ্পাকে দেখে মনে হল এ উত্তরে তিনি একটুও খুশী নন। 'একাগ্রতা', 'সমাধি'—এই শব্দগুলি তিনি এড়িয়ে চলেন। আর তাই এ ধরণের ব্যাখ্যাকে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

শুনতে শুনতে আমি বলে উঠলাম, 'শিল্পী কাজ করেন এক অন্য ধরণের সাধনায়। তাঁর মনে হয় এই আমার দুর্গা, এই আমার রাম, এই আমার সীতা, এই আমার গণেশ,—আর চেতনাই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।'

মনে হল আপ্পাও আমার সঙ্গে একমত। তিনি বললেন, 'আসলে স্রষ্টা সম্পূর্ণ করে তোলেন নিজেকেই। রং, বাঁশ, কাগজ, মাটি, পাথর—এদের কেবলমাত্র উপকরণ বলাই

যথেষ্ট নয়। এদের যদি শুধু যন্ত্র বলি তাহলে শিল্পী নিজেও একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জিনিসগুলি স্রষ্টার নিজেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি।'

এ সব কথা আমি বিশেষ করে তোমার জন্যই লিখছি। কেন না তোমার থীসিস—ও তো এই ধরণের বিষয় নিয়েই।

চার

ব্যাপারটা হয়েছিল আমার গীটার হারিয়ে ফেলার দিনে। সারাক্ষণ মাথায় বুনো ফুল লাগিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়িয়েছিলাম।

একটা ছোট জংলা পাহাড়ে আমাদের চড়ুইভাতি হয়েছিল সেদিন। আসলে ছোট ছোট সাতটি পাহাড় মিশে গিয়ে তৈরী হয়েছে পাহাড়টা। এখানে তাকে সবাই সাত কুমারীর ঘর বলে। পাহাড়টা সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিংবদন্তী আছে। সাতটি পরিবারের সাতটি কুমারী মেয়ে স্বামী পাচ্ছিল না তাই বাড়িতেও শান্তি ছিল না ওদের। গ্রাম ছেড়ে এসে এখানেই তারা ঘর বেঁধেছিল। কিছুদিন পরে সাতটি বাড়ির চারদিকেই দারুণ ঘন বন দাঁড়িয়ে গেল। আর শেষ পর্যন্ত কোনো চিহ্নই রইলো না তাদের; তার বদলে দেখা গেল সাতটি পাহাড়। কুমারী মেয়েরা এখানে পুজো দিতে আসে। পুরুষদের আসা বারণ; কখনো এলে বনের মধ্যেই পথ হারিয়ে ফেলে তারা। এরকম কয়েকটি ঘটনা সত্যিসত্যি ঘটেছে।

একটি মেয়ে তার ভাইকেও সঙ্গে এনেছিল। সেই ছেলেটি আর আমি পাহাড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ও একটু ভয় পেলেও হাবে ভাবে তা দেখায় নি। আমিও খুব শান্ত ছিলাম কেন না তখন আর কিছুই করার ছিল না। পাহাড়ের ঢালু দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সামনে আরেকটা উঁচু পাহাড় এসে যাচ্ছিল। এ ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমরা কি করে আবার যেন ঠিক যেখানে ওঠা আরম্ভ হয়েছিল সেখানেই গিয়ে পৌঁছলাম। বন্ধুরা খুব চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য।

বাড়িতে ফিরে এসে এই ঘটনার কথা আমরা কাউকে বলিনি।

পাঁচ

চিঠিটা ছ'দিন অপেক্ষা করার পর লিখছি। আশা করি আমাকে ভুল বোঝ নি, তাই না? বোধ হয় কোনো কারণ ছাড়াই আমি এত ভাবছি। সত্যি বলছি আমি যা লিখেছিলাম তা ভুলে যেও তুমি।

প্রায়ই আমি নিজের কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারি না। হয় তো আমি কিছু চিন্তা না করে খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনো কাজ করলাম, কিন্তু পরে কেউ একজন হয় তো বুঝিয়ে দিল আমার কাজের অর্থ আমি যা ভেবেছিলাম আসলে মোটেই তা নয়। এ ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

এবার থেকে আমিও অন্যদের মতো হতে শিখবো।

ছয়

গতকাল তোমার চিঠি পেয়ে খুব আশ্বস্ত হয়েছি। দেখলাম আমার ভয়গুলি সমস্তই একেবারে মিথ্যে।

হঠাৎ আমার ভীষণ একঘেয়ে লাগছে—এখানে, তুমি কি দিন কয়েকের জন্য আসতে পারো না? অনেক কিছু দেখবার আছে এখানে। তাছাড়া ভদ্রকালী উৎসব এ-সময়টাতেই হয়ে থাকে। দারুণ ব্যাপার সেটা। এসো কিন্তু। আমিই তোমাকে সবকিছু দেখাবো।

সাত

তোমার থীসিসের একটু দেরী হয়ে গেলেও চিন্তার কিছু নেই। এখানে হয় তো আরো নতুন প্রেরণা পাবে,—এমন

কি শিল্পের কোনো অজানা সূত্রও হঠাৎ চোখে পড়ে যেতে পারে তোমার।

আপ্পার বইটা আস্তে আস্তে একটা রূপ নিচ্ছে। গত দশদিন ধরে তিনি সারাক্ষণ শুধু লিখে যাচ্ছেন। আপ্পা লেখা শুরু করেন একটা 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে। কোনো একটা নতুন অবস্থা বা বিষয় আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে,—তার মানে আমরা অতীত থেকে আরো দু'এক পা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। অভিজ্ঞতা ব্যাপারটা বর্তমান থেকে পেছনে সরে এসে স্মৃতির সাহায্যে একটা রেখাচিত্র আঁকবার মতো। উভয়ক্ষেত্রেই এই মুহূর্তের অস্তিত্বকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি, এই হচ্ছে আপ্পার বলার কথা। এই সমস্ত কিছু আমি বুঝবার চেষ্টা করছি।

আচ্ছা বলোতো কি ভাবে তোমাকে এখানে নিয়ে আসা যায়?

আট

তুমি আসবে জেনে আমি কী ভীষণ খুশী হয়েছি! রাজামন্না অবশ্য আমার চেয়েও বেশী উৎসাহী। (ওঁর ধারণা তুমি আমাকে 'পরিদর্শন' করতে আসছো।) আপ্পাকে জানাতেই তিনি বললেন: 'ও তোমার বন্ধু হলে আসুক। তারপর কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন তুমি টাইপ করতে পারো কি না। সত্যি তুমি কি পারো? কিন্তু ঘাবড়ে যেও না। আপ্পার তোমাকে বসিয়ে রেখে কাজ করাবার ইচ্ছে নেই, আর আমার তো একদমই না।

কিন্তু মনে রেখো মন্দিরের উৎসবে এখানকার নিয়ম মতো তোমাকেও নাচতে গাইতে হবে।

নয়

এখানে আসবার কিছু নির্দেশ তোমার কাজে লাগবে।

এটি পাহাড়ী জায়গা। রাজনাদে ট্রেন থেকে নামতে হবে তোমাকে। সেখান থেকে তিরুপেটের বাসে চড়ে আরো তিরিশ মাইল পথ ভেতরের দিকে চলে আসবে। তারপর আমাদের বাড়ী ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে আরো দু'মাইল। বুধবার তিরুপেটে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো আমি। তারপর আমাদের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়ে তোমাকে বাড়ী নিয়ে আসবো, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, পারবে তো? এই একমাস চিঠি লিখে লিখে আমরা দু'জন কিন্তু যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গেছি। আসলে সামনা-সামনি আমাদের দেখা হয়েছে কেবল একবার, সে-ই সেদিন।

আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় হালকা লাল শাড়িটা পরবো, আর আমার হাতে তোমার জন্যে দুটো ফুল থাকবে। আমাকে দেখতে পেলেই হাতের লাঠিটা তুলে ধরবে তুমি।

তিরুপেট থেকে আমরা কিন্তু সোজা বাড়ী যাবো না। দুপুরের খাবার সঙ্গে নেবো আমি। তোমার জিনিসপত্র নিয়ে আমরা কাশ্মীর লেকে চলে যাবো। লেকের কাছেই একটা পুরাণো মন্দির আছে। সেখানে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাওয়া যাবে। তিরুপেটে কখনো গেলেই আমি এই মন্দিরটিও ঘুরে আসি।

এবার তোমার করণীয়গুলি শোনো: তুমি লিখেছো এক সপ্তাহের বেশী থাকতে পারবো না। বেশ অসুবিধের ফেলে দিয়েছো কিন্তু। আমি তোমার জন্যে ঠিক পনেরো দিনের একটা প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলাম। বুধবার একেবারে কিছুটি করা হবে না, সেদিন তোমার বিশ্রাম দরকার। খাবার সময় আপ্পার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। দুটি সম্ভাব্য আচরণের জন্য তৈরী থেকো,—হয় তিনি একটি কথাও বলবেন না আর না হলে অসংখ্য প্রশ্ন তোমার দিকে ছুঁড়ে মারবেন। যখন কথা বলেন না তখনো তিনি সব কিছুই খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে যান। আমাদের আতিথেয়তায় সামান্য একটু ত্রুটি থাকলেও তিনি পরে আমাকে বকবেন।

বৃহস্পতিবার সকালে আমাদের ক্ষেতের জমি দেখতে যাবো। তোমার যত ইচ্ছে কমলালেবু দেখতে পাবে সেখানে। দুপুরের খাবারটা ভেড়াপ্পার কুঁড়েঘরে ওর আতিথেয়তা উপভোগ করতে করতে খাওয়া যাবে। ঠিক বিকেল চারটের বাড়ী ফিরে আসবো আমরা। খাবার পরে জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে আমার বীণা বাজানোর অনুষ্ঠান।

শুক্রবার সকালটা তোমার হাতেই ছেড়ে দেবো। সেদিন আমি কাছাকাছি একটা মেয়েদের স্কুলে পড়াতে যাই। সেখানে তুমি থাকলে আমি একেবারেই পড়াতে পারবো না। সেদিন আপ্পা তোমার সঙ্গে গল্প করবেন। তোমাদের দু'জনেরই দু'জনকে ভালোভাবে জানা দরকার। [সন্ধ্যাবেলা একটু ঘুরতে যাবো। এখানকার বাজার আর ঘরবাড়ী তোমার কাছে খুব নতুন বলে মনে হবে।

শনিবার উৎসবের দশম দিন। সেদিন সন্ধ্যায় সবাইকেই নাচে যোগ দিতে হয়। আমি তোমার জন্যে আপ্পার একটা পুরোনো পোশাক ঠিক করে রেখেছি।

রবিবার সমস্তদিন অনেকে দেখা করতে আসবেন। তোমার ইচ্ছে থাকলে সেদিন রাত্রে আমরা একটি গ্রামীন নাটক দেখতে পারি। দেখো ঠিক যন্ত্র-গণের কথা মনে পড়ে যাবে তোমার।

সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি ক্লাবে কিছু বলতে হবে তোমাকে। আমি বিষয় নির্বাচন করেছি। 'মানুষের শিল্প' অবশ্য তুমি তার বদলে 'শেক্সপীয়রের নায়িকা' অথবা 'সমুদ্রের উদ্ভিদ' সম্বন্ধে বলতে পারো।

মঙ্গলবার দিনটা তোমার নিজের কাজকর্মের জন্য ছেড়ে দেবো, কেননা তুমি তো নিজেই ঠিক করে রেখেছো যে বুধবারই ফিরে যাবে।

আসবার সময় আমার জন্যে কিছু এনো না কিন্তু।

তোমার আগমন উপলক্ষে আমি নিজের জন্য কয়েকটি নিয়ম তৈরী করে ফেলেছি:

১) সবার আগে উঠবো: আর সবা শেষে ঘুমোতে যাবো।

২) কাজের লোকদের সঙ্গে খুব আস্তে আস্তে কথা বলবো।

৩) অতিথি কিছু বলবার আগেই তিনি কী চাইতে পারেন তা আমাকে আন্দাজ করে নিতে হবে।

৪) অকারণে ব্যস্ত হবো না।

৫) যথেষ্ট সংযত হয়ে কথা বলবো।

৬) যখন তখন গান গেয়ে উঠবো না।

৭) মাঝে মাঝে অথিতিকে একলা থাকতে দেবো। (তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে এখানে তোমার কাজের কথা লিখতে গিয়ে এ ব্যাপারটি সব সময়েই আমার মনে ছিল।)

৮) নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা আক্ষরিকভাবে সত্যি বলে মনে করবো না।

এগারো

গত চারদিন তোমার কোনো চিঠি না আসায় একটু চিন্তিত ছিলাম। এই মাত্র তোমার চিঠি এসেছে আর চিঠি পড়ে আমি একইসঙ্গে খুব অবাক আর দুঃখিত হয়েছি। হঠাৎ মত বদলে ফেললে কেন? তুমি লিখেছো যে তোমাকে ইংলণ্ডে যেতে হবে। কিন্তু তার তো এখনো প্রায় তিন মাস দেরী আছে। সব কিছু ঠিক করে নিতে তোমার নিশ্চয়ই অতোদিন সময় লাগবে না। আসলে হয় তো অন্য কোনো কারণেই আসছো না তুমি। কি করে আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব? আর তাছাড়া তোমার কথা জানার আমার কিইবা অধিকার আছে। নিজের মনকে শান্ত হতে বলার সাহসও আমার নেই।

মনে আছে ছেলেবেলায় আমার এক বান্ধবীর ভাই বিদেশ থেকে আসবে বলে লিখেছিল। কিন্তু ও এল না শেষ পর্যন্ত। প্রথমে বন্ধুকে জ্বালাতন করলেও পরে আমিও ওর সঙ্গেই কেঁদেছিলাম। আজ আর কাঁদি নি। কেন না এখন আমি বুঝতে শিখেছি যে আগে থেকেই খুব বেশী কিছু ভেবে রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া যা একবার ঘটে গেছে তাকে আবার নতুন করে তৈরী করাও অসম্ভব। যা ঘটে গেছে তাকে রেখে দেবো যথাযথ স্থলে—দূরে। তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেই বরং তার ছায়া-রং অনেক ম্লান হয়ে পড়বে।

এখন আমার একে একে সবকিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। ছুটিতে এখানে ফিরে এসে আমি প্রায় কাউকেই চিঠি লিখিনি। বলতে গেলে কারো সঙ্গে দেখাও করিনি। আমি বুঝতে পারছি না,—কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি ভাবে যে এত সময় চলে গেল।

বারো

দু'একদিন আগে তোমার একটা পুরোণো চিঠি আবার পড়তে পড়তে আমি নিজের কথা ভেবেই হেসে উঠেছিলাম। কি জানি তুমি আমাকে কি ভেবেছো। তুমি আমাকে যতটা গুছোলো বলে মনে করেছো আমি আসলে তা নই। আমি একটু ঠাণ্ডা আর স্থির বলেই হয়তো তোমার এমন ধারণা হয়েছে। এক্ষুণি, এই মুহূর্তেও আমি তোমাকে খুব শান্ত-ভাবেইচিঠি লিখছি, তাই না?

আমার বইয়ের কথা জানতে চেয়েছো তুমি। গত পাঁচ ছ'দিন্ ওঁর লেখার কাজও একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। আমাদের বাড়ির কাছেই এজওয়ার্থ নামে একজন বাগানের মালিক থাকেন, আপ্পা ওঁর সঙ্গেই ছিলেন কয়েকদিন, আপ্পা আর ওই ইংরেজ ভদ্রলোক একই সময়ে অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছিলেন আর সেখানেই ওঁদের বন্ধুত্ব জমে ওঠে। প্রায় প্রত্যেক মাসেই তিনি দু'একদিনের জন্ত আপ্পার কাছে আসেন আর নয়তো আপ্পাই তাঁর কাছে যান। ছেলেবেলা থেকেই দেখছি এটা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এজওয়ার্থ এখনো বেশ জোর গলায় বলেন যে একসময় আমি ওঁর বাদামী দাড়ি ধরে টানাটানি করেছি। এজওয়ার্থ অবিবাহিত, এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের চেয়ে কিছু বেশী। তিনি যত খুশি পড়েন, কাজ করেন আর চারপাশের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে বেড়ান। আপ্পা এজওয়ার্থকে ইতিমধ্যেই আমাদের 'ওঙ্কার' অবৈতনিক সদস্য করে নিয়েছেন।

ওঁর কিছু অদ্ভুত ধারণা আছে। তার একটি হচ্ছে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে। এজওয়ার্থের বিশ্বাস আগের জন্মে উনি নিশ্চয়ই কুর্গী ছিলেন। তা না হলে গত তিরিশ বত্রিশ বছর কুর্গীদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে রইলেন কি করে? এজওয়ার্থ বলেন গত জন্মে কুর্গী না হলে এজন্মে তিনি আর কিছুতেই কুর্গে আসতেন না।

একবার আমি ওঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম: তাহলে আপনার গত জন্মের কুর্গী বৌ কোথায়? কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে উনি বলেছিলেন: সাউ, গতজন্মে ওরা আমার বিয়ে দিতে পারেনি, আমি তখন ভাবলাম গতজন্মে বিয়ে হয়নি বলে এজন্মেও এজওয়ার্থের বৌ নেই। তাহলে কি ভবিষ্যতেও কখনো ওঁর বিয়ে হবে না? একথা মনে হতেই ভীষণ দুঃখ হোলো আমার। কিন্তু এজওয়ার্থ তার একটু পরেই হেসে উঠলেন, বললেন: পরের জন্মে আমি আবার এগ্রামেই ফিরে আসবো। সেবার কুর্গী মেয়ে হয়ে জন্মাবো আমি আর তাহলেই আমার খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাবে, তাই না? একথা শুনে আপ্পাও হাসলেন। তারপর আবার যথারীতি ওঁদের গল্প চললো।

তোমার যাবার তোড়জোড় কতদূর হোলো? একটা টার্ম পড়াবে লিখেছো, তার মানে তুমি হয়তো আমাদেরও ক্লাশ নেবে।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক: পিনাকীপ্রসাদ ধর

ইউনিট ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া

সমস্ত ইউনিটের মালিক ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের জানাচ্ছে

বর্ষব্যাপী শান্তি ও শুভেচ্ছা

আর ইউনিট্ ট্রাস্টের শুভেচ্ছা মানেই হোলো আপনার জন্যে প্রতিবছর লাভাংশের ব্যবস্থা। সেই লাভাংশ আপনি অতি অবশ্যই পাবেন। শুভেচ্ছার এই হোলো বাস্তব, নির্ভেজাল রূপ। আর আপনি যখন এই লাভাংশ নিশ্চিত ভাবে পাবেন, তার মানেই হোলো—আপনার মনে শান্তি বিরাজ করবে—হ্যাঁ, বছর ভোর। তাছাড়া, এই লাভাংশে 1000 টাকা পর্যন্ত কর-মুক্ত।

সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্। ইউনিট্ কিনুন। খুব সহজেই ইউনিট্ পাওয়া যায়। তাছাড়া, দরকারের সময়ে ইউনিট্ ভাঙ্গানো খুবই সোজা ব্যাপার।

ইউনিট—এমন এক বিনিয়োগ ব্যবস্থা যাতে আপনি সদাসর্বদা আস্থা রাখতে পারেন।

ইউনিট ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া

বোম্বাই ■ কলিকাতা ■ দিল্লী ■ মাদ্রাজ

69/410

স্মৃতির ওপরে নতুন আলোকপাত

পথচারী

মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক—এবিষয়ে আমাদের জ্ঞান ধীরে ধীরে বাড়ছে। এর দুটো কারণ। ঠিক প্রশ্ন আমরা করতে পারিনে। এই মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্কের প্রকৃতি যেমনই হোক, এটা কখনো দুটো বস্তুর (যেমন, কলসী ও ভেতরকার জল) অথবা রাজা ও প্রজার মতো দুটো সচেতন প্রাণীর সম্পর্কের অনুরূপ হতে পারে না। কাজেই যে-রকমের যথাযথ ভাবনা একদিকে অধিকাংশ বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে আইনের বৈশিষ্ট্য তা আমাদের সাহায্য করবে না। এটা নিতান্তই সম্ভব বলে আমার মনে হয় যে, মানুষের মনকে অজ্ঞান-প্রসূত মায়া বলে গণ্য করা যায়। যা হোক, এই সব মায়ার সাধ্যমত সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আমাদের করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের অন্যান্য অঙ্গ ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কতটা অবাধে পরীক্ষা করা যায় মানুষের মন বা মস্তিষ্ক নিয়ে ততটা অবাধে পরীক্ষা করার অধিকার আমাদের নেই। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের মস্তিষ্কে ক্ষত করবার অনুমতি দিলেও স্নায়ু বিজ্ঞানীরা যে তা করতে রাজী হবেন, আমি তা মনে করিনে। খাতক ও তদ্দ্বারা হত উত্তমর্ণেরই যে সমান গুরুতর ক্ষতি হয়—এ উপলব্ধি যে-স্নায়ু বিজ্ঞানীর নেই, তিনি অতি অধম মনোবিজ্ঞানী—এত অধম যে তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

কাজেই প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা করে আমরা কিছু শিখতে পারলেও, তাতে পরীক্ষাকারীরাও প্রায়ই কিছু ক্ষতি হয়। তবু মস্তিষ্কের এই অস্ত্রোপচার থেকেই আমরা প্রভূত সংবাদ সংগ্রহ করে থাকি। সৌভাগ্যবশত, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে কিছু পরীক্ষা সাধারণত এর অন্তর্গত।

অর্বুদ (cancer) অপসারণ বা করোটি ও মস্তিষ্কের মাঝ থেকে একটুকরো হাড় অপসারণ বিরল ঘটনা। এই বিরল ঘটনা বাদ দিলে, আবরণ-মোচিত মস্তিষ্কাংশকে বৈদ্যুতিক শক্তি-দ্বারা উত্তেজিত করাই মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসকদের প্রচলিত রীতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বিরল জাতীয় সন্ন্যাস-রোগের চিকিৎসায় হয়ে থাকে। এমন ধরণের সন্ন্যাস রোগ আছে যা দুর্ভাগ্যবশত বিরল এবং অস্ত্রোপচারে সারানো যায়। সে জন্যে যখন অস্ত্রোপচার করা হয়, তখন মস্তিষ্কের একাংশকে উত্তেজিত করে সন্ন্যাসের আক্ষেপ সৃষ্টি করা হয় এবং সর্বাপেক্ষা সুবেদী (sensitive) অংশটি কেটে বার করে ফেলা হয়। কাটার সময় এবং তার পরে মস্তিষ্কের ফটোগ্রাফ তুলে অপসারিত কলা (tissue) অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়।

সাধারণ অবেদন (anaesthesia) প্রয়োগে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার আজকাল কদাচ করা হয়। এর আংশিক কারণ, এতে খুব বেশী সময় নষ্ট হয় এবং ইথার-অবেদন প্রয়োগের একঘণ্টা পরে যারা সেরে ওঠে তাদের অনেকে দু'ঘণ্টার পরেও সেরে উঠতে পারত না। এর কারণ অংশত এই যে, অবেদনের একটি প্রধান কাজ হল পেশীর (যেমন, উদরের পেশীর) শিথিলতা (relaxation) ঘটানো। মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে এটা প্রয়োজন হয় না। আরো

কারণ এই যে, সচেতন রোগী শল্যচিকিৎসককে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পারে। কাজেই কয়োটি ও মস্তিষ্কের বহির্ভূত অন্যান্য কলাকে স্থানীয় অ-বেদনিকের (anaesthaetic) সাহায্যে অসাড় করে দেওয়া হয়।

মস্তিষ্ক-তলের (brain-surface) ছেদন বা বৈদ্যুতিক উত্তেজন (stimulation) কখনো বেদনার কারণ হয় না। মস্তিষ্কের অনেক ভেতরের একাংশে বেদনা অনুভূত হয়; এই অংশ শল্য-চিকিৎসকের অনধিগম্য। মস্তিষ্কতলের কোনো-কোনো অংশ পেশী সঞ্চালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানুষের মধ্যে হাতের পেশী, চোখের পেশী কথাবলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশী অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। দেহকাণ্ড ও পায়ের পেশীর চেয়ে এই পেশীগুলোর ওপরেই আমরা ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে থাকি। এই সব অঞ্চলের বৈদ্যুতিক উত্তেজন অনৈচ্ছিক আন্দোলন বা নড়াচড়া ঘটিয়ে থাকে। সঞ্চালক অঞ্চলের (motor areas) নিকটেই মূল সংবেদক অঞ্চল (sensory areas) বর্তমান। আবার মস্তিষ্কের যে বিরাট অংশ দেহকাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে তার অনুরূপ বিরাট অংশই হাতের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এই সব অংশ উত্তেজিত হলে দেহের অনুরূপ (corresponding) অংশে স্পর্শানুভূতি বা অসাড়তা সৃষ্টি করে। মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগে দর্শনের এবং দুইপাশে শ্রবণের বিশেষ অঞ্চল আছে। কিন্তু মস্তিষ্কতলের বেশীর ভাগই "নীরব।" এর উত্তেজনায় বিশেষ ফল দর্শে না। মূল সংবেদক অংশের কাছাকাছি অঞ্চল সংযোগকারী (co-ordinating) সংবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই রূপে যে অঞ্চলের উত্তেজনায় হাতে সংবেদন ঘটায় তার নিকটস্থ অঞ্চল যখন বোমার টুকরোর (splinter) আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনও রোগী হাতের যে-কোনো অংশে স্পর্শ অনুভব করে থাকে, কিন্তু মুদ্রা বা দেশলাইয়ের বাক্স সে ধরে আছে কি না তা বলতে পারে না।

এ ব্যাপার ৪০ বছর হল জানা গেছে। আরো সাম্প্রতিক কালে প্রমাণিত হয়েছে যে কপালের ঠিক পেছনে একটি অংশ আছে যা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (concerned। এর রজ্জুগুলো ছেদন করা হলে উগ্র এবং অবাধ্য রোগী শান্ত হয়ে সহযোগিতা করতে পারে। এর বিশেষ একাংশের (সিঙ্গুলার জাইরাস—singular gyrus) অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ আছে বলে মনে হয়। তীব্র বেদনাদায়ক অস্ত্রোপচারের অযোগ্য কর্কটরোগে মৃতপ্রায় কোনো কোনো রোগীর এই অংশটি অপসারিত হল; তখন সেই রোগীরা বলে থাকে-তারা এখনো তীব্র বেদনা বোধ করছে, কিন্তু সে-বেদনা তাদের কাবু করতে পারে না বা তাদের ক্লেশকর হয় না। মাসেকের মধ্যে যে তার মৃত্যু হবে সে চিন্তাও তাকে ক্লিষ্ট করে না। একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, হিন্দু দার্শনিকরা যাকে অহংকার—অহংবোধ বা অহংরূপ মায়া বলেছেন মস্তিষ্কের এই অংশটি তারই অধিষ্ঠান। স্বভাবতই এই অংশের অস্ত্রোপচার বা ক্ষতির ফল অত্যন্ত অনভিপ্রেত হতে পারে। এরকম ক্ষতিগ্রস্ত কোনো কোনো রোগী আত্মপ্রেরণা বা উদ্যম (initiative) সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে, দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন স্ত্রীলোক খাদ্যরূপে কী পরিবেশন করবেন স্থির করতে পারতেন না, কিন্তু অন্য কেউ স্থির করে দিলে সন্তোষজনক ভাবে তা রান্না করতে পারতেন।

আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অতি সাম্প্রতিক একটি সংযোজনের কথা একটি প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধটি পাঠ করেন পেনফোল্ড (Penfold) নামে বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক; পঠিত হয় গত বছর ওয়াশিংটন অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেজ-এ (Washington Academy of Sciences)। ৩৭ বছর পূর্বে অক্‌স্‌ফোর্ডে শেরিংটন-এর পরীক্ষণাগারে তিনি আমার অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। সম্পূর্ণ সচেতন রোগীর অস্ত্রোপচার কালে মস্তিষ্কে উভয় দিকে

যে সব অংশকে পূর্বে 'নীরব' মনে করা হত সেই সব অংশকে ঘন-ঘন উত্তেজিত করে তিনি নিম্নলিখিত ফল পেয়েছেন। রোগীরা তাদের অতীত (জীবনের) কোনো ঘটনার অনেক খুটিনাটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠত। উদাহরণ স্বরূপ, একজন স্ত্রীলোক অর্কেস্ট্রায় বাজানো হচ্ছে এমন একটি গান শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন গানটি অস্ত্রোপচার-গৃহের একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে ভেসে আসছে। আর ঐ গানের কোনো কোনো সুর তিনি গুন্ গুন্ করে গাইতেও পারছিলেন। তাঁর স্মরণ হল, কোথায় কবে ও-গান তিনি শুনেছিলেন। অন্যেরা তাদের জীবনের ইমোশানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো যেন জ্যান্তে প্রত্যক্ষ করলেন। দ্বিতীয় ফল হয়েছিল এই যে, তাঁরা অনুভব করলেন ঘটনাগুলোর যে সদ্য অনুভূতি তাঁদের হল তা আগেও তাঁদের হয়েছিল। এই দুটি অভিজ্ঞতাই মানব-স্মৃতির সারভূত উপাদান (essential components), যদিও পেনফোল্ড দুটোকে একই সঙ্গে টেনে বার করতে কখনো পারেন নি।

কয়েক বছর দেখা পাই নি এমন একজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। আমি চিনতে পারলাম যে, পূর্বে তাকে জানতাম। তারপর আমার স্মরণ হ'ল শেষবার যখন তার সঙ্গে দেখা তখন তার পরনে সোনালী পাড়ের লুঙি ছিল এবং মাদ্রাজ রাজ্যে তামাক উৎপন্ন হচ্ছে এ কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। তাঁর মুখ চেনার আগে বা পরে অতীত ঘটনাগুলো আমার স্মরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু সন্তোষজনক স্মৃতির পক্ষে দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। এরকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটে যে, আমার শুধু মনে পড়ে পূর্বে লোকটিকে কোথাও দেখেছিলাম। কিন্তু এতে আমার মন সন্তুষ্ট হয় না। ইংরেজিতে স্মৃতি (Memory) ও স্মরণ করার (Remember) মতো শব্দগুলো খুব ঢিলেঢালাভাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এমনিভাবে বলতে পারি একটা পদ্য আমার মনে আছে, তার মানে আমি সেটা আবৃত্তি করতে পারি ; তাই বলে আমি স্মরণ করতে পারি নে কখন কোথায় কিভাবে ওটা শিখেছিলাম। অন্যান্য ভাষায় প্রকৃত স্মৃতি ও স্মরণ করার সামর্থ্যের পার্থক্য আরো স্পষ্টভাবে করা হয়। স্মৃতির শারীরক (physiology) সম্বন্ধে আরো জানতে পারলে এই শব্দটির বিভিন্ন মানের আরো প্রয়োজনীয় প্রভেদ নির্ণয় হয়ত আমরা করতে পারব।

পেনফেল্ড্ মনে করেন না যে, তিনি মস্তিষ্কের যে-অংশ উত্তেজিত করেছিলেন তারই ফলে বর্তমান অভিজ্ঞতার পরিচিতি (recognition) অথবা অতীত অভিজ্ঞতার অনুস্মৃতি (recall) হয়ে থাকে। সাধারণ নিয়মে, মস্তিষ্কের একাংশের বৈদ্যুতিক উত্তেজন বিস্তৃত ক্রিয়া বা সংবেদন উৎপন্ন করে না। বাক্-কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক উত্তেজন রোগীকে দীর্ঘায়িত স্বরধ্বনি উৎপাদনে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ বাক্য অথবা একটি শব্দ উচ্চারণে নয়। এটা নিতান্ত স্বাভাবিক, কারণ বহু কোষ একই সঙ্গে উত্তেজিত হয় এবং ক্রিয়ার ঠিক প্যাটার্ণ থাকে না। কিন্তু একাংশের উত্তেজন মাঝে মাঝে অল্প অংশে সু-স্পষ্ট ক্রিয়ার বা সংবেদের প্যাটার্ণ রচনা করতে পারে। কাজেই পেনফোল্ড্ মনে করেন স্মৃতির প্রকৃত অধিষ্ঠান অন্যত্র আছে। তিনি শুধু স্নায়ু-রজ্জুগুলোকেই উত্তেজিত করেছেন, ঐ রজ্জুগুলো মস্তিষ্কের অল্প অংশে সংবাদ প্রেরণ করে এবং তা-ই সঞ্চিত স্মৃতিগুলোকে জাগিয়ে তোলে বা সচেতন করে। আমার মনে হয়, তাঁর কথাই হয়ত ঠিক, কিন্তু লঘু মস্তিষ্কে ঐ স্থানিক সীমায়নের (cerebral localisation) অধিকাংশ তথ্যকে আর একটু কম বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়—ব্যার্গসঁ তাঁর 'ম্যাতিয়ের এ মেমোয়্যার (Matiere et memoire—বস্তু ও স্মৃতি) নামক গ্রন্থে যেমনটা চেষ্টা করেছেন।

দার্শনিকদের যে এই তথ্যগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়

—এইটুকুই হল সম্পূর্ণ নিশ্চিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাংখ্যদর্শনে মানব মনের যে-বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তা-ই যদি তাঁরা আঁকড়ে থাকেন তবে অন্তত এইটুকু তাঁদের উপলব্ধি করা উচিত যে, উক্ত দর্শনে বর্ণিত মনের বিভিন্ন উপাদানগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জড়িত। লেনিন লিখেছেন: এটা অবশ্য সম্পূর্ণ হাস্যকর যে বস্তুবাদ চেতনাকে হীনতর (lesser) সদ্‌বস্তু বলে মনে করবে, অথবা গতিশীল বস্তুকে বৈদ্যুত-চৌম্বক বা তার চেয়েও বহুগুণ জটিল বিশ্বরূপ (world picture) মনে না করে তার যন্ত্রবাদী (mechanistic) ব্যাখ্যাকেই আঁকড়ে থাকবে।" আমার নিজের অনুমান হল, লেনিন যখন লিখেছিলেন তখন যে-বিশ্বরূপ সাধারণে প্রচলিত ছিল, তার চেয়ে কপিল-বিচারসিদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে বস্তুর অনেক বেশী মিল আছে; কাজেই আজ থেকে একশো বছর পরে আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় (useful) বিশ্বরূপের মধ্যে সাংখ্যের বিশ্বরূপের অন্তত কয়েকটি উপাদান থাকবে। কিন্তু এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে যে সব তথ্য দিয়েছি তা উপেক্ষা করে সত্যিকার বিশ্বরূপ আমরা নিশ্চয়ই পাব না। *

* জে, বি, এস হলডেন লিখিত New Light on Memory নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৭·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

: উপন্যাস

উত্তরখণ্ড

কঈভরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায়

বারো

নবাব আলীবর্দী খাঁন চতুর্দিকে রটনা করে দিলেন, বর্গীদের সঙ্গে আপোষ রফা হয়েছে। এবার সন্ধি-চুক্তির কথা পাকাপাকি হবে। এবার বাংলাদেশে শান্তি ফিরে আসবে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ হবে, আবার মাঠে-মাঠে ফসল ফলবে, গৃহস্থের গোলায় ধান উঠবে। সেই শান্তির সংবাদ নিয়ে মারাঠা-শিবিরে ফিরে এসেছেন আলীভাই।

অযথা লড়াই করে লাভ কি? বৃথা বলক্ষয়ে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। সুতরাং নবাব বাহাদুর রাজী হয়েছেন। সুবে বাংলা মুলুকের রাজস্বের একচতুর্থাংশ পাবেন ভাস্কর-পণ্ডিতের প্রভু রঘুজী ভোঁসলা।

সেই চুক্তির শর্ত পাকাপাকি করার জন্য এবার দুই প্রধানের সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। এই সাক্ষাত্কার কূটনীতির প্রচলিত শিষ্টাচারসম্মত।

ভাস্করপণ্ডিত কিন্তু ইতস্ততঃ করছিলেন। নবাব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করাটা কি সমীচীন হবে, কি জানি যদি তার মতলব ভাল না হয়। যদি কোন বিপদ ঘটে।

দিগনগরে বর্গীদের শিবিরে বাইশজন সর্দারের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসলেন ভাস্কররাম। নবাব বাহাদুরের সদিচ্ছা সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ।

প্রধান আপত্তি তুললেন রঘুজী গায়কোয়াড়। তাকে সমর্থন করলেন—যশোবন্তরাও গুজর, বাপুজী কদম, সঠভাজী যাদব, নারায়ণ ভোঁসলে। এরা সকলেই যুবক, উৎসাহী যোদ্ধা। তরবারীর মুখেই সব সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী। অন্য কোন মীমাংসা নয়, কোন আপোষ নিষ্পত্তি নয়।

লড়াই করো, লুণ্ঠন করো, হত্যা করো। সংগ্রামের মধ্যে বীরত্বের পরীক্ষা হয়, যোদ্ধার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর লুণ্ঠনের পথে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা। সীমাবদ্ধ চুক্তির নিয়মে আবদ্ধ হয়ে লাভ কি? সেই চুক্তির শর্ত যে পুরোপুরি পালিত হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

সেই মধ্যযুগের রাজনীতিতে চুক্তিভঙ্গের নজীর তো সর্বত্র। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজার আমল থেকেই উত্তরাপথের কোন নবাব-বাদশাহ, কোন রাজা-মহারাজা, কোন সুবাদার ফৌজদার মারাঠাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না। মারাঠারাও কাউকে বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস করাটা উচিত হবে না। আপোষ রফার নামে কোনরকম চাতুরীতে বিভ্রান্ত হবে না তারা।

তামাম হিন্দুস্থানের মালিক স্বয়ং আলমগীর বাদশাহই যখন কথার খেলাপ করে শিবাজী মহারাজকে কয়েদ করে রাখতে পেরেছিলেন; সেখানে আলীবর্দী খাঁনতো সামান্য সুবাদার মাত্র। তা'ছাড়া আলীবর্দীখাঁন আপন প্রভু সুজাখাঁর সঙ্গে নিমকহারামি করেছেন। সুজাখাঁর পুত্র সরফরাজকে খুন করে বেআইনীভাবে বাংলার মসনদ দখল করেছেন।

এরকম মানুষের কথায় বিশ্বাস কি? তার আপোষ আশ্বাসের মূল্যই বা কতটুকু।

রঘুজী গায়কোয়াড়ের তীব্রতীক্ষ্ণ যুক্তি শুনে তার সমর্থনকারীরা উৎসাহিত হলেন আর আপোষকারীরাও যেন দোদুল্যচিত্ত

হয়ে পড়লেন। এমন কি ভাস্করপণ্ডিতও যেন রঘুজীর দিকে ঝুঁকলেন।

আলীভাই কিন্তু নিজের প্রস্তাবে অটল। আলীবর্দীখানকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন তিনি।

শান্তিরক্ষার কথা দিয়েছেন। এখন যদি পণ্ডিতজীর সঙ্গে নবাববাহাদুরের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা না হয়, তবে তার কথার খেলাপ হবে, ইজ্জত নষ্ট হবে। শুধু প্রবীণ নায়ক গোবিন্দ রাও শেলুকর আলীভাইকে সমর্থন করলেন। রঘুজী ভোঁসলার বিশেষ নির্দেশ তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন।

চৌথ আদায়ের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করাই বর্তমান অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

তারপর ক্ষতিপূরণের নাম করে অভিযানের খরচ যতটা সম্ভব আদায় করে নিতে হবে। চৌথের পরিমাণ আর ক্ষতিপূরণের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার জন্যই দুই প্রধানের সাক্ষাত প্রয়োজন। তুমুল তর্ক শুরু হ'ল। উত্তপ্ত আলোচনার মধ্যে হঠাৎ একটি আপত্তিকর মন্তব্য করে বসলেন যশোবন্ত রাও গুজর। যবনদের বিশ্বাস নেই। বেইমানী করাই ওদের চরিত্রগত অপগুণ। এই কারণেই বিধর্মী মুসলমান নবাববাহাদুরকে আদৌ বিশ্বাস করেন না তিনি।

আলীভাইর চোখদুটি জ্বলে উঠল। শাহ আহমদ খাঁ এতক্ষণ চুপচাপ উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনছিলেন, এবার তিনিও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। শুধুমাত্র মুসলমান বলেই যদি অবিশ্বাসের পাত্র হ'ন নবাব বাহাদুর, তা'হলে তারা দুজনেই তো মুসলমান। তবে তারাও বিশ্বাসের যোগ্য নন। কিন্তু মারাঠা মুলুকের সকলেই জানে, আলীভাইর বিশ্বস্ততা আর বিচক্ষণতার উপর স্বয়ং রঘুজী ভোঁসলা এবং ভাস্কর পণ্ডিত উভয়েরই অগাধ আস্থা, অসীম নির্ভরতা।

আলীভাই আর আহমদ খাঁ দু'জনেই কোমরের তরবারীর মুঠোয় হাত রেখে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলেন যশোবন্ত রাও গুজর, রঘুজী গায়কোয়াড, নারায়ণ ভোঁসলে।

সামান্য বিলম্ব হলে হয় তো রক্তপাত ঘটে যেত। গোবিন্দরাও আর বলবন্তরাও তাড়াতাড়ি উঠে দু'পক্ষের মধ্যে দাঁড়ালেন। ভাস্করপণ্ডিত এবার উদ্যোগী হলেন। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের নমুনা প্রকাশ করলেন। মৃদু তিরস্কার করে দু'দলকেই থামালেন।

যশোবন্তরাও তার মন্তব্য প্রত্যাহার করলেন, ক্ষমা চাইলেন।

মারাঠা শিবিরে সাজসজ্জার তেমন আড়ম্বর নেই। চারপাঁচখানা সাধারণ চারপাই আর কাঠের জলচৌকির উপর কম্বলের আসনে বসেছিলেন সবাই। আবার শান্ত হয়ে বসলেন সকলে।

দুই পক্ষের যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ করে এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন ভাস্করপণ্ডিত।

নবাব বাহাদুরের নিকট নিরাপত্তার আরো নিশ্চয়তা চাইবেন মারাঠা সর্দার। সাধারণ কোন কর্মচারীর মারফত এই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে চলবে না। ভাস্করপণ্ডিত যেমন আলীভাইকে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন দু'জন পদস্থ প্রতিনিধিকে পাঠাবেন নবাব বাহাদুর। তাদের একজন হবেন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। এই নতুন শর্তের সংবাদ নিয়ে সংবাদ-বাহক ছুটল আমিনগঞ্জের নবাব শিবিরে।

সমস্ত প্রস্তাবেই সম্মত হলেন নবাব আলীবর্দি খাঁন। কোনরকমে সবকটা বদমাশকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে হয়। তারপর সব শর্ত, সব প্রস্তাব, সব হিসেব-নিকেশের বোঝাপড়া হবে।

এই সব খবরাখবর করতে করতে ফাল্গুন মাস শেষ হ'ল। চৈত্রমাসেরও অর্ধেক ফুরিয়ে গেল।

বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে। শেষ দুপুরে ছাত্রদের নিয়ে বসেছিল ভারতচন্দ্র। ফার্সী শেখাচ্ছিল।

দেউড়ির দীর্ঘ ছায়ায় একখানা খাটিয়ায় বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছিল মিশিরজী। মাটিতে গামছা পেতে বসে গালে হাত দিয়ে শুনছিল ভগীরথ। রামধন বোধ হয় নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছে। দুপুরে আরাম করার সময় এখনো শেষ হয় নি। সমস্ত বাড়িটাই চুপচাপ।

অতিথিশালা ফাঁকা। সেই সাধুবাবাও চলে গেছেন পরশুদিন। যাবার আগে ভারতচন্দ্রকে একটুকরো শুকনো শেকড় দিয়ে গেছেন ধারণ করার জন্য।

গেল পরশুদিন খুব সকালে এসে ডাকাডাকি করে ভারতের ঘুম ভাঙিয়েছিল রামধন।

তখনো ভাল করে ফর্সা হয় নি। পুব আকাশে অল্প অল্প আলো। একটা দুটো তারা জ্বলছে;

এক পাশে ভাঙা চাঁদ। বিষণ্ণ জ্যোৎস্না। সূর্য ওঠার আগেই প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যায় ভারতচন্দ্র।

আরেকটু পরে সে নিজেই উঠতো। এখন দরজা খুলেই রামধনকে দেখে ভাল লাগল না।

সকালবেলা ওই ধূর্ত হাসিহাসি মুখখানা চোখে পড়ল। এখন সারাটা দিন কেমন যাবে, কে জানে।

রামধন বললো— এই যে পণ্ডিতমশাই, সাধুবাবা চলে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চান—

গরদের চাদরখানি গায়ে জড়িয়ে এল ভারতচন্দ্র। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করছিল—কোথায় যাচ্ছেন সাধুবাবা—

—উনি এখন যাবেন বাবা তারকেশ্বরের স্থানে—বলতে বলতে জোড়হাত কপালে ঠেকাল রামধন—

তার পর যাবার ইচ্ছে কালীঘাটে বাবা নকুলেশ্বর দর্শনে, তারপর যে কোন দিক যাবেন কিছু ঠিক নেই, আমার বহুভাগ্য এমন মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছিলুম—

আগে আগে যাচ্ছিল রামধন। হঠাৎ ভারতের ডান পাশে চলে এল। রামধনের বাঁ-হাতে কনুইয়ের দু আঙুল উপরে লাল সুতোয় বাঁধা বেশ বড় আকারের একটি রুদ্রাক্ষ।

পাশাপাশি যেতে যেতে মনে হ'ল, যেন ওই রুদ্রাক্ষটি তার গায়ে ইচ্ছে করেই ঠেকাল রামধন।

প্রথমবার দেউড়ি পার হবার মুখে। দ্বিতীয়বার পুকুরঘাটের কাছাকাছি আসার পথে।

এবার মুখ ফিরিয়ে রামধনের দিকে সোজাসুজি কয়েকপলক তাকিয়েছিল ভারতচন্দ্র।

হেঁ হেঁ করে বোকার মত সামান্য হেসেছিল রামধন। হয় তো মনের ভুল।

কিন্তু এত গায়ে গা লাগিয়ে যাচ্ছে কেন রামধন? কোন দিন তো এরকম করে না।

বরং চলাফেরায় কথাবার্তায় সবসময় একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রাখে বরাবর।

আজ কি হল? খুব গাঁজা টেনেছে নাকি? কই তেমন তো কিছু গন্ধ আসছে না। ব্যাপার কি?

সেদিন দুপুরবেলা কিন্তু আসল ব্যাপারের হদিশ পেয়েছিল ভারতচন্দ্র। ভগীরথ এসে চুপিচুপি বলেছিল সব কথা। সাধুচরণের ছোট মেয়ে হরিমতীকে বিয়ে করার জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছে রামধন। সাধুবাবার অনেক তোয়াজ করে, হাতে পায়ে ধরে বশীকরণের জন্য মন্ত্রপূত একটি রুদ্রাক্ষ আদায় করেছে। ওই রুদ্রাক্ষ যার গায়ে ছোঁয়াবে সেই নাকি রামধনের অনুগত হয়ে পড়বে।

সাধুচরণ, হরিমতী এমন কি ভারত-পণ্ডিতমশাইকেও এবার বশ করে ফেলবে রামধন।

তারপর তার বিয়ে আটকাবে কে? রামধনের ইচ্ছে ভারত-পণ্ডিতমশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বিয়ে দেওয়াবেন, পাওনা-গণ্ডার ব্যাপারে সাধুচরণকে নরম করবেন। ভগীরথের কথা শুনে হাসিও পেল, দুঃখও হল। এই জন্যই আজ অত সকালে পাশাপাশি যেতে যেতে রুদ্রাক্ষটা তার গায়ে ছোঁয়াবার চেষ্টা করছিল রামধন।

সাধুবাবা তখন চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন। দিনের

বেলা এত কাছাকাছি তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় এর আগে কখনো দেখেনি ভারতচন্দ্র। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শালপ্রাংশু চেহারা। কোমরে কৌপিনের উপর বাঘছাল। কাঁধে গেরুয়া কাপড়ের ঝোলা। হাতে ত্রিশূল আর লোহার চিমটে। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা পিঙ্গল জটাভার। কপালে যজ্ঞভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক।

কণ্ঠে বাহুতে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। সাধুবাবা বললেন—আও বেটা, ম্যয় আভি যাউঙ্গা—

তারপর ভাঙাভাঙা বাংলায় বললেন—তোকে আমার বহোত আচ্ছা লাগা, সাবধানে থাকবি, তোর সামনে ভাল-মন্দ দুটো খবর আসবে, আর দু'তিনমাসের মধ্যেই তোর নসীব ফিরে যাবে—

তারপর একটা শুকনো শেকড় দিয়ে বলেছিলেন—এটা রেখে দে, লাল সুতোয় বেঁধে বা হাতে ধারণ করবি—

সাধুবাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার জন্য নিচু হয়েছিল ভারতচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে বলেছিলেন সাধুবাবা—হামাকে ছুঁসনে, আভি ঘর যা—

তারপর আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সেই উষা লগ্নের পূর্ব দিগন্ত সামনে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। পেছন পেছন রামধনও চললো। বাবাজীকে বাদশাহী সড়ক ধরিয়ে দিয়ে আসবে।

এই অদ্ভুত সাধুবাবার একটি কথা কিন্তু দু'তিনদিন পরেই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগে সেদিন দুপুরে ভগীরথের মুখে রামধনের মতলবের কথা শুনে প্রথমে হাসি পেয়েছিল, দুঃখিত হয়েছিল শেষে বিরক্ত বিব্রত বোধ করেছিল ভারতচন্দ্র।

সাধুবাবা নাকি রামধনকে বলেছেন, ওই রুদ্রাক্ষ ধোয়া জল যদি কাউকে খাওয়াতে পারে তবে সে লোক নাকি রামধনের পায়ের কাছে পোষা কুকুর হয়ে থাকবে।

ভগীরথ বলেছিল—আপনি রামধনের হাতে জল খাবেন না পণ্ডিতমশায়, কি জানি যদি কিছু হয়—

—আমি তো কারো হাতের জল খাই না ভগীরথ, তুমি তো জান রোজ সকালে মাটির ঘড়ায় গঙ্গার জল নিয়ে আসি—

—কিন্তু আপনি তো সব সময় ঘরে থাকেন না, কখনো এদিক-ওদিক গেলেন, সেই ফাঁকেও যদি ঘরে ঢুকে আপনার ঘড়ার জলে—

ভগীরথের আশঙ্কা অমূলক নয়। রামধনের পক্ষে এখন সব কিছুই সম্ভব। বুড়ো বয়সে কেউ যদি কচি মেয়েকে বিয়ে করার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে, তাহলে তার কাণ্ডজ্ঞান যে কতখানি লোপ পেতে পারে তার নমুনা এই রামধন প্রামাণিক। বশীকরণের রহস্যটা যদিও পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি ভারতচন্দ্র তথাপি কিসের থেকে কি যে হতে পারে আগেভাগে কিছুই জোর করে বলা যায় না।

সাধুবাবার কথাবার্তা শুনে, আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে মনে মনে কিছুটা বিশ্বাস, কিছু বিস্ময় আর সম্ভ্রমের সূচনা হয়েছে। একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না সে।

তা'ছাড়া বশীকরণের ব্যাপারে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা যদি দিলেও একজন লোক গোপনে তার ঘরে ঢুকে খাবার জল ছুঁয়ে দেবে, নোংরা করে রেখে যাবে, একথা ভাবতেই যেন তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। রামধনের এই পাগলামিকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

উত্তেজিত ভাবে বললো ভারত—ওই বদমাশটাকে আমি আর ঘরে ঢুকতে দেব না, সোজাসুজি বলে দেব, আমার ঘরে ঢুকবে না তুমি—

—ও কথা বলবেন না, পণ্ডিতমশাই, রামধন তা'হলে চটে যাবে, আর ও যদি আপনার পেছনে লাগে, তা'হলে এখানে আর আপনাকে টিকতে হবে না, পাঠশালাটালা গুটিয়ে পালাতে হবে—ভগীরথের কথা শুনে আরো চটে উঠল ভারত—আরে রাখো তুমি—তীব্রস্বরে ধমক দিল—

কত রাজা-মহারাজা দেখলুম, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদকে দেখেছি, তার দেওয়ান রাজবল্লভ বাবুকে দেখেছি, মারাঠা শিবভট্টকে দেখেছি, ছোটবেলা থেকেই কত বিপদ আপদে মুখোমুখি হয়েছি এখন বাকি আছে রামধন প্রামাণিক, হাতি ঘোড়া গেল তল, ওসব ভর আমাকে দেখিও না, এখন যাও, এখান থেকে চলে যাও, তোমরা সবাই সমান—

তখন কাঠের উনুনে রান্না চাপিয়েছিল ভারত। মাটির হাড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছিল।

বিরক্তমুখে সেদিকে মনোযোগ দিল আর পেছন থেকে চুপচাপ সরে পড়ল ভগীরথ।

চারপাশে এখন বিকেল হয়ে গেছে। এখন পাঠশালা ছুটি হবার মুখে। ছেলেরা সব পাততাড়ি গুটিয়ে যাবার জন্ত তৈরী হয়েছে। শুধু মহাদেব একমনে মাথা নিচু করে ফারসী হাতের লেখা লিখছিল। একখানা কালোপাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখছে। বারবার ভুল হচ্ছে, বারবার মুছে মুছে আবার লিখছে। মহাদেবের নিষ্ঠা খুব। সব ছেলেরা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে থাকে। বসে বসে পড়া মুখস্থ করে কিংবা হাতের লেখা মকসো করে। অনেক সময় পণ্ডিতমশাইর ফাই-ফরমাস খেটে দেয়। লেখার সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে আনে। খাগের কলম কেটে রাখে, দোয়াতের কালি দিয়ে শুষনি বানায় কিংবা প্রদীপের সলতে পাকায়।

হঠাৎ দেখা গেল দেউড়ি পার হয়ে শিবদাস মুখুজ্জে এইদিকেই আসছেন, পেছন পেছন বিশ্বনাথ।

হাসি-হাসি মুখে বললেন শিবদাস মুখুজ্জে—ওহে ভারতভায়া, সুসংবাদ এনেছি, মিষ্টিমুখ করাও—

বিশ্বনাথকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল ভারতচন্দ্র। রাধার কিছু হয়েছে। কি হয়েছে? ছেলে না মেয়ে?

কেমন আছে রাধা? কয়েক মুহূর্ত বুকের মধ্যে যেন ওলটপালট হয়ে গেল। কোন কথা মুখে এল না।

শিবদাস মুখুজ্জে বললেন—ছেলে হয়েছে রাধার, পুন্নাম নরক থেকে যে ত্রাণ করে, সেই পুত্রলাভ করেছ, তুমি তো ভাগ্যবান হে—

আসন ছেড়ে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল ভারতচন্দ্র। ছেলেদের লক্ষ্য করে বললো—তোমরা এখন যাও, মহাদেব আজ থাক, কাল আবার হবে—

—কাল হবে কি রকম—শেষের কথাটির জবাবে বললেন শিবদাস—কাল সকালে তুমি বিশ্বর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে যাও, ছেলের মুখ দেখে এসো—

মহাদেব হা করে তাকিয়েছিল। অন্ত ছেলেরাও চলে যাবার জন্ত পা বাড়িয়ে থেমে পড়েছে।

খাজাঞ্চী হরকালী সরকারের ছেলে গৌরাঙ্গপদ জিজ্ঞেস করল—কাল কি পাঠশালা ছুটি থাকবে, পণ্ডিতমশাই?

ভারত কোন জবাব দেবার আগেই হুকুম জারি করলেন শিবদাস মুখুজ্জে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাল ছুটি থাকবে, এখন বাড়ি যা সব, বাড়ি গিয়ে নামতা পড়বি, ধাতুরূপ, শব্দরূপ মুখস্থ করবি, হ্যাঁরে গোরা, তোর বাবাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলবি—

ছেলেরা চলে যাবার পর মাথা চুলকে কিন্তু-কিন্তু মুখে শিবদাসকে লক্ষ্য করে বললো ভারত-যেতে তো বলছেন দাদা, এদিকে হাত একদম খালি কিছু খরচপত্তর তো হবে—

—এই জন্তই বলি, এই পাঠশালা চালিয়ে তোমার লাভ কি—বলতে বলতে রোয়াকে উঠে নিজেই কম্বলের আসনটা টেনে নিয়ে বসলেন শিবদাস—এতে জাতও যাবে, পেটও ভরবে না, তোমার উচিত এখন ছেলে-বউ নিয়ে ভুরশুটের বাড়িতে ফিরে যাওয়া, নিজের বিষয়-সম্পত্তির অংশ নেওয়া, কিন্তু ভাল কথা তো তুমি শুনবে না, কিছু মনে করো না, অত পুঁথিপত্তর ঘেটে ঘেটেই তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে, এই পাঠশালা খুলে এখানে পড়ে থাকায় কোন মানে হয় না—

—দাদা, বিদ্যাদানের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে, কোন ছেলে যখন নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে অফুরন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়া বুঝতে আসে, তারপর কোন জটিল বিষয় বুঝে নেবার পর তার চোখে মুখে যে স্বস্তি আর আনন্দের চিহ্ন ফুটে ওঠে তার কোন তুলনা নেই—

—ওসব বড় বড় আদর্শের বুলি ছেড়ে দাও, ওই সবের জন্যই তোমার কিছু হ'ল না, আসল কথা হ'ল টাকা রোজগার, দিনকাল যা হয়েছে, টাকা না হলে কেউ তোমাকে পুছবে না, পেটে গামছা বেঁধে বিদ্যাদান করে গেলে সারাজীবন তোমাকে ওই কাঁচাকলা সেদ্ধ আর বেগুন পোড়া খেয়ে কাটাতে হবে, বউ ছেলে পোষাতো দূরের কথা, নিজের পেট চালানোই মুস্কিল হবে—

শিবদাসের এই গুরুতর ভবিষ্যদ্বাণীর পরে সোজাসুজি কোন কথা বললো না ভারতচন্দ্র।

বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ব'সো এখানটায়—

আরেকখানা কম্বলের আসন এনে দিল।

শিবদাস হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে হাঁক দিলেন—ও ভগীরথ, সন্ধ্যে হয়ে এল, সেরেস্তাঘরে আলো দেখা, আর এক ছিলিম তামাক সাজ, আমি যাচ্ছি—

পাশের চালাঘরের সামনে রাতের রান্নার জন্য একবোঝা কাঠ এনে রাখছিল ভগীরথ। তাড়াতাড়ি সেরেস্তাঘরের দিকে চলে গেল।

আবার বললেন শিবদাস—আমার কথায় কিছু মনে করলে নাকি ভায়া।

—না না আপনি তো ঠিক কথাই বলেছেন—শুকনো হাসি মুখে জবাব দিল ভারত।

শিবদাস শর্মা কখনো বেঠিক কথা বলে না, যখন যা বলি সবদিক বিবেচনা করেই বলি, তবে টাকার জন্য তুমি ভেবোনা সেরেস্তা থেকে কয়েকটি টাকা তোমাকে আগাম দেওয়াবার ব্যবস্থা করবো, খাজাঞ্চীমশাই আসুন—

—ঋণ নিতে পারবো না দাদা, মাফ করবেন—

— আহা ঋণের কথা কে বলেছে, বললুম তো আগাম দেবো, পরে দলিলপত্তর লিখিয়ে নিয়ে উশুল দেখাযো—

—সে আপনার অনুগ্রহ—

—থাক আর বিনয়-বচন বলতে হবে না, বিনয়ের অবতার তুমি, আমি এখন উঠছি, সেরেস্তায় এবেলা অনেক-কাজ জমে আছে, তুমি তা'হলে গোছগাছ করে নিও, কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পড়বো—

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন শিবদাস—বিশ্বনাথ, তুমিও তোমার মেজদিদিকে বলে কয়ে রেখো—

তখন বেলা পরে আসছিল। রামেশ্বর মুখুজ্জের দোতলা বাড়ির পেছনে সূর্য নেমে গেছে

শিবদাস মুখুজ্জে সেরেস্তাঘরে গিয়ে বসলেন।

সামান্য ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করল বিশ্বনাথ—আপনি পাঠশালায় কি রকমভাবে পড়ান জানতে ইচ্ছে করছে—

অল্প হেসে জবাব দিল ভারতচন্দ্র—আমার পাঠশালা সেরকম কিছু নয়, দেখলে তো চার পাঁচটি ছাত্র, সকালে সংস্কৃত শেখাই, মুখে মুখে যোগবিয়োগ গুণ ভাগ করাই আর বিকেলে ফার্সী পড়াই, চলো কাল একসঙ্গে যেতে যেতে সব বলবো—

(ক্রমশঃ)

উত্তাল সমুদ্রে যাত্রা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কাল সমুদ্রের দিকে যাত্রা, ছায়াময় কালো কালো
ভীষণ কুটিল ঢেউ চারদিকে ; মাথার ওপরে
নীলাকাশ কালো কালো মেঘে ছেয়ে গেল
একটি নিমেষে। আমি উপকূলে দাঁড়িয়ে এখন
জন্মমৃত্যু শৈশবের স্মৃতিচিত্রশালা একবার
দেখে নিতে চাই এই কালের দর্পণে। আমি
সিদ্ধার্থের অনির্বাণ সাধনার কথা মনে রেখে
আত্মসর্বস্বতা লোভ ইত্যাকার নানা সংসর্গের
জটিল সামীপ্য থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি কৈশোরে।
বিদ্যার্থীর মতো আমি যৌবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রেমকে রেখেছি বুকে শুভ্র সিংহাসনে সমাদরে,
এবং সমস্ত প্রশ্নে যৌনজিজ্ঞাসার সদুত্তর
না পেলেও মনে মনে যৌবনের প্রেমের প্রতিমা
গড়েছি রক্তের মধ্যে বার বার তীক্ষ্ণ অনুভবে।

আজ আমি বাইরের জগতে এক দারুণ নিমেষে
সব দৃশ্য পুড়ে যেতে দেখি। দেখি প্রাসাদপুরীতে
ভগ্ন হর্ম্যগুলি ; সমাকীর্ণ আগাছা জঙ্গলে
প্রাচীন তোরণদ্বার, চারদিকে নিস্তব্ধ বিষাদ।
বিশ্বাসের মূল ধরে কেউ যেন টানে মহাবলী,
চারদিকে পতনের শব্দে কাঁপে জন্মের ত্রিবলী।
অগ্রগমনের অনুভূতির সর্বদাই আমার শোণিতে
ঢেউ তোলে, আমি জানি একালের অর্জিত বিশ্বাসে
এখন সুস্থির হওয়া প্রয়োজন, এখন শপথ
বারে বারে উচ্চারিত যেহেতু হৃদয়ে নারকীয়
দৃশ্যগুলি বার বার ঢেউ তোলে ; অগ্যাস্তের মতো
একটি গণ্ডুষে কেউ যদি এসে পান ক'রে নিত

যন্ত্রণার সমুদ্রের খল খল নীলাম্ভ উজ্জ্বল
ঢেউগুলো ! আমি কোনো বোধিদ্রুমমূলে বসে' বসে'
দেখতাম বিংশশতকের এই মহাপৃথিবীর
মহাশান্তি কোথায় নিহিত। কোথায় তৃষ্ণার জল
পাহাড়ের কোল ঘেঁসে স্বচ্ছ এক নিবিড় রেখায়
ধীরে ধীরে হেঁটে যায় সমুদ্রের হৃদয়ের দিকে।
এখন বশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধে, ভয়াবহ রক্তের লড়াই
শুরু হয়ে গেছে। তাই কাল সমুদ্রের দিকে
বিক্ষুব্ধ ঘটনাবলী আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে
উৎক্ষিপ্ত উত্তপ্ত তরলের মতো ; নামে তার ঢল
উপত্যকা মাঠে জনপদে। আমি শুধু খণ্ড দৃশ্যে
ছোটো ছোট ঘটনায় সময়ের তাৎপর্য গুলো
কি রকম ধরা পড়ে তাই দেখি। সময় সমুদ্র থেকে
আকাঙ্ক্ষার পাখিগুলো উড়ে আসে কিনা। জনপদে
হাজার হাজার মাইল হেঁটে কেউ নিয়ে এলো কিনা
দুঃখজয়ী সংগ্রামের গোপন সংকেত। চতুর্দিকে
এখন কেবল ধোঁয়া, গাঢ় কালি ; অন্ধকার থেকে
আলোর পায়রাগুলো যদি ফিরে আসে কোনোদিন
সবাইকে সচকিত ক'রে। যে-রকম নোয়ার নৌকায়
যখন অতল ঢেউ অন্ধকার খলখল জলের উচ্ছ্বাস—
একটি পায়রা তার ঠোঁটে ক'রে এনেছিল শুষ্ক তৃণলতা,
অন্ধকার জলমগ্ন পৃথিবীতে দ্বীপের আশ্বাস।

আপাতত নিমেষে বিদীর্ণ হ'লে ক্ষুব্ধ দিনগুলো,
রক্ত ঝরে অবিরাম। সারাক্ষণ শব্দপুঞ্জগুলি
বারুদের মতো ফেটে পড়ে। আমি শুধু দেশপ্রেমে
অথবা মানবপ্রেমে অভিষিক্ত নব প্রেমিকের
একটি উজ্জ্বল মুখ বুকে এঁকে রাখি। একদিন
আমি যদি না-ও থাকি জনতার কোলাহল শেষে
নিয়মানুবর্তিতায় সব দৃশ্য উদ্দীপনা সংগঠিত হ'লে
অন্য কেউ দেখবে সে মুখের আভাস দিকেদিকে,
আপাতত উত্তাল সমুদ্রে যাত্রা, সঙ্গী যতো কালো ছায়াগুলি ॥

বাঁচাও : স্বদেশরঞ্জন দত্ত

আমাকে বাঁচাও
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, কি ভীষণ জ্বালা বুকে
লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তস্বর : আমাকে বাঁচাও
জ্বলে যায় বুক
মাথা ফেটে যায়
চিন্তায় কঠিন
কালো শিরাগুলি,
চুপসে যায় নরম মস্তিষ্ক।

মানুষের নিদ্রাহীন অন্ধকার গহ্বর থেকে কান্না
প্রতিহত ইট-পাথুরে দেয়ালে।
যন্ত্রণার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
একদিন
অহংকার, চক্ষুহীন অসুস্থতা,
ইট পাথুরে—দেমাক
চুরমার হয়ে যাবে।

সেদিন সবাই বাঁচব।

প্রশ্ন : সুশান্ত বসু

একদিন তোমার দুচোখ ছুঁয়ে
যাওয়া ছিল শর্তহীন
রৌদ্রের ভিতরে!

ছিল প্রখর স্বপ্নদীপিত অহঙ্কার
ভিজে বুকের মাটিতে প্রতিশ্রুতি
শস্য ফলাবার

কিন্তু সব যাওয়া থমকে যায়
পথের ধুলোয় লোটে ছিন্নমালা
বুকের গভীরে যেন কেঁদে ওঠে
অন্য কেউ, 'বকুল' 'বকুল'

ধুলোয় নিজেরই রক্ত
রক্তে ভেজা বকুলের গন্ধ আজ
যাজকের স্তোত্র ছুঁয়ে চলে যায় তৃষ্ণার শিবিরে!

এখন আমাকে তুমি
দেখাবে আলোর কোন পথ?

আমাকে বলে দাও : মণিদীপা বিশ্বাস

তোমার চোখের আর্তি
শিশিরের মত ঝরে,
বাহুর প্রতীক্ষা সপ্তর্ষিমণ্ডলের আলো থেকে তুলে আনে
আরো এক উজ্জ্বল আকাঙ্খা
কণ্ঠের কূজন ঘরফেরা পাখিদের দলছাড়া
আকাশের নীচে একলা পাখির গান যেন
আর সেই সূর্যের উত্তাপে
আমার বুকের পদ্ম পাপড়ি মেলে ফোটে
একে একে ফোটে আর ফোটে
তবু আমি
তোমার প্রদত্ত মুকুট তোমাকেই দিয়ে
পচ্ছিত অঙ্গুরীখানি আঙ্গুলে ফিরিয়ে
শেষবার চলে যাওয়ার আগে শুধু
পদতলে অশ্রুর অঞ্জলি রেখে যাব।

জানি
তোমার বুকে মুখ রাখলে
নাম ধরে ডাকতে ডাকতে হয়ত একদিন
তোমার কণ্ঠে বহু নাম একসঙ্গে বেজে উঠবে
তোমার বুকে লুকানো মুখগুলি একই শব্দে কথা বলবে
আর আমি দিবাশ্রিত ঐ মুখ তখন কোথায় রাখব
এই মুকুটহীনের অশ্রু কোথায় ঝরাবো
যতই নক্ষত্র হয়ে জ্বলো
তোমার আর্তির শিশির না ছুঁয়ে
সূর্যের উত্তাপ না মেখে
এ অহংকার নিয়ে আজ সরে যাওয়া ভালো।

অনিল ব্যানার্জি

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০

(তৃতীয় সংস্করণ)

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড,
কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

দিগ্‌ভ্রম

মহীতোষ বিশ্বাস

"ভিন্‌দেশী বন্ধুরে—ও আমার নাগর আইলা ঘরে—" এই রকম একটা গানের কলি মনে এলো কমলী-বউয়ের। গানটা কবে কার মুখে শুনেছিল মনে নাই। শুধু গানের কথাগুলো পান-খাওয়া ঠোঁটের কোণা-কিনারায় এখন চুক্‌-চুক্‌ করতে লাগল। মনের মধ্যে ভাসা-আভাসায় তার গুন্‌-গুনানি। পিছনে বাঁশের লম্বা লগি হাতে মানুষটা। কাদায় ডোবা তোবড়ানো পায়ের পাতায় থপাথপ আওয়াজ। আধ-ঘোমটার ভেতরটা চোখে একবার দেখল কমলী-বউ। হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়-তোলা গেঞ্জি-ছাপানো পাথুরে শরীর। বিল-উজানো চোখে মুখে রুখো-রুখো থমথমানি।

হাঁটুখানেক জলের পরে ভাসমান ডিঙি নৌকা। শ্যাওলা-শাপলায় জল-আগাছার আশ্বিনের ভরা বিলে জল থই-থই দামাল যুকট ই-টুসুর। ওদিকে বিলের দূর-বিস্তারে জল ঝাপানো দীঘল আমনধানের গাছে গাছে আদিগন্ত শ্যামলিমার গলাগলি। কাপড় বাঁচিয়ে কমলী-বউ গিয়ে দাঁড়াল নৌকার সামনের পাশটায়। দুইহাতের ভরা-আঁজলা জলে আলকাতরা-ছোপা নিকষ-কালো গলুই ধুলো। ভক্তিভরে গড় করল। ভরা-ভরন্ত বিলের বুকে ঘর-ঘরণী বউ মানুষের জল-স্তবণ।—মা-গঙ্গা, পাপ অপরাধ, ক্ষমা করো। মা-গঙ্গা, প্রসন্ন থেকো।

আকাশে সূর্য-ঠাকুরের এখনো কী গন্‌গনানি! পাটে বসেও হেলন্ত দেহে তাপ ছড়াচ্ছে। মুখে আঁচ লাগতে 'আঃ মরণ' বলে পানের কষে রাঙা ঠোঁট দুটো মুচকে কমলীবউ কপাল ডুবিয়ে ঘোমটা নামালো। সাবধানে নৌকার পাশ-ডালিতে ভরারেখে উঠে দাঁড়াল নৌকার উপর। জলে পা বাড়িয়ে চুপ্‌-চুপিয়ে পায়ের কাদা ধুলো। তারপর নৌকার কোলজোড়া বাঁশের পাটাতনের উপর পা গুটিয়ে প্রতিমার মত বসল। পাথর-কোঁদা মানুষটার চোখে এসব পড়ল কি পড়ল না। আন্‌-প্রান্তের গলুইয়ে বসে বাঁ হাতের বগলে লগি চেপে হাঁড়ি মুখে বিড়ি ধরিয়েছে। হু-স হু-স করে আনমনে ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

খানিক বাদে লগির ঠেলায় দোল লাগল নৌকায়। নৌকার কিনার-কাঠে হাত ঠেকিয়ে শরীর সামলাল কমলী বউ। চুরচুরে শ্যাওলার মধ্য দিয়ে মচর-মচর শব্দ তুলে নৌকা চলল ধীর গতিতে। কমলীবউয়ের চোখ দুটোতে কেমন একটা উদাস উদাস ছায়া নামল এবার। নিশিপদর ঝাঁকড়া চুলের মাথার উপর দিয়ে পিছন পানে তাকাল। গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে বাপ উমাকান্তর অস্পষ্ট খাখাড়ী-বেড়ার ঘরের আশে পাশে অনেক যন্ত্রণা আর আনন্দ আর অবসাদের জন্মমৃত্যু দেখল।

কমলী-বউ সেই উদাস চোখ দুটি মেলে সারা বিলের বুকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ভরা বিলের মধ্যিখান দিয়ে নৌকা চলেছে। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। জলের বুকে তার ছায়া ভাসে। থিরিথিরি কাঁপে। দূর-দূরান্তে ছড়ানো-ছিটোনো গ্রামগুলো এখন পটচিত্রের মত। বিলের বুকে কদাচিৎ লোকজনের আনাগোনা। কেউ বা মাছ ধরে। কেউ বা ঠ্যাকা-বাধায় এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে নৌকা-ডোঙায় পারাপার হয়। ডালিম-রাঙা সূর্যের আলো নেমেছে

বিল ছাপিয়ে। মাঝে মাঝে জল—ছাপানো আমন ধানের ক্ষেত জুড়ে হালকা হাওয়ার দোলদোলানি। আমন ধানের ক্ষেত পেরিয়ে শ্যাওলা-কচুরির দলল উজিয়ে হাপুর-হুপুর নৌকা বায় নিশিপদ।

সূর্য ডুবে গেল অস্তাচলে। লগি রেখে বৈঠা ধরেছে নিশিপদ। জলে এখানে নির্বাধ চলাচল। স্বচ্ছ তলতলে জলে নৌকা চলে ভাসমান পানকৌড়ির মত। বৈঠা টানে আর হুসহুস্ করে বিড়ি টানে নিশিপদ।

আধো-আলোর আধো অন্ধকারে কমলী-বউয়ের কপালে এখন ঘোমটা নেই। বিলের অতল জলের তরলতার ছোঁয়া লাগে বুঝি কমলী-বউয়ের দুচোখে। চোখ ফিরিয়ে তাকায় পিছনের গলুই-জোড়া মানুষটার চোখে চোখে। হাসির সঙ্গে কান্না মিশিয়ে জলের মত ছলছলায়—'মানুষের পরাণে তবে আমার কথা একটু লয় ?"

ত্যাড়াবাঁকা গলায় নিশিপদ জবাব দেয়—'হ,লয় তো বটে ! না যদি লবে তয় আসবো ক্যান তোরে নিজের হাতে ফিরায়ে নিতে।'

কমলী-বউয়ের গলায় এবার অভিমানের ঝাঁজ বাজে—'মনে তোমার ছাই লয়। ভেবে তো ছিলে বুঝি বানের জলে ভেসেই যাবো। নিতে আর আসতে হবে না তোমায়। তোমার দরদ কত সব আমি বুঝি !"

নিশিপদর বুকজোড়া চাপা আগুনটা এবার যেন দমকা হাওয়ায় উড়াল দেয়—"লাজ লাগে না তোর ? লাজ লাগে না তোর মরা ছাওয়াল বিয়োয়ে ঘরে ফিরতে ?'

শাঁই শাঁই করে মাথার ওপরে কালো আকাশের বাঁক ফেরে এক ঝাঁক বুনো হরিয়াল পাখী। বিলের জলময় সংসারে সারাদিনের ঘর-করা আহার-সংস্থানের পাট চুকেছে। এবারে কোন পাঁয়ের কোন বড় গাছের মরাডালে রাত্রিবাসের পালা।

শঙ্খের চমক নেই কমলী-বউয়ের। ঘোর লেগেছে চোখে মুখে। সর্ব শরীরে। দামাল বুকের শিরায় শিরায় কি যেন তিরতির করে। সেই তিরতিরানির স্রোতটা একবার উপরে ওঠে। একবার যেন নীচে নামে। চারপাশ এখন অন্ধকারে কালোয় কালো। আকাশ জুড়ে রূপোর ফুলের ঝিকমিকানি। কমলীবউ অন্ধকার দেখল না। আকাশ-ভরা রূপোর ফুলের ঝিকমিকানি দেখল না। শুধু বাপ উমাকান্তর বাথারী-ঘরের সেই মোচড়ানো যন্ত্রণার আচ্ছন্নতাটুকু সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করল। কাঁথার জড়ানো সেই মাংসপিণ্ডটুকু এইমাত্র যেন নড়ে উঠে নিশিপদর পরুষ হাতের ছোঁয়া লেগে আবার নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। ওটা আর নড়বে না। বিয়ের পরে দশবছরের বাঁজা শরীর কমলী-বউয়ের। ঠাকুর দেবতার মানত আর মাদুলী কবচের তো অন্ত ছিল না। কোন্ ঠাকুরের ধরায় শেষে কাজ হল কে জানে। কমলী-বউয়ের বাঁজা শরীরে ফল ধরল।

প্রথম পোয়াতি খালাস হবে। সরম-লাজের ছমছমানি। কমলী-বউ বাপের সংসারে গিয়েছিল। নিশিপদর সায় ছিল না। তবু এমন কথা তো মুখ ফুটে বলা যায় না। ধীরে ধীরে অসম্মতির ভাবটা জানিয়ে দিয়েছিল কমলী-বউকে। কিন্তু আসন্ন মাতৃত্বে গরবিনী কমলী-বউ আমল দেয়নি নিশিপদর অসম্মতিটুকু। বাবার সঙ্গে রওনা হয়েছিল বাপের বাড়ী। বাড়ী ভরতি লোক জন। শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর ননদে হুরলাপ। দিন-দুপুরে সোয়ামীর ঘরে ফাসুর-ফুসুর করা—সে বড় লজ্জার। তবু যাবার আগে কমলী বউ একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সকলের চোখ বাঁচিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। আর সাবধানে দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়েছিল। মানুষটা যে ঘরেই আছে, তা আগেই আন্দাজ করেছিল কমলীবউ। হলও তাই। কিন্তু ওমা, হল কি গো লোকটার ! এই অবেলায় অমন করে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে কেউ ঘুমোয় নাকি গো ! একটা চাপা উত্তেজনায় তখন ঝকমক করছিল কমলী-বউয়ের গা-গতর। নাকের ডগাটা

কেমন ঘেমে উঠেছিল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরেছিল নিশিপদর চোখ দুটো। ঝটকা মেরে কমলীবউয়ের হাতটা সরিয়ে দিয়েছিল নিশিপদ। মুখে আঁচল গুঁজে হাসি চাপতে চাপতে কমলী-বউ বলেছিল—'ওমা, তাই বলো। ঘুমটা তাহলি বজ্জাতির ঘুম!'

—'হ, তোকে বলেছে'—মারমুখী নিশিপদ খেঁকিয়ে উঠেছিল।

সেই রগ-রগানো মূর্তির দিকে তাকিয়ে কমলী-বউ যেন আরো মজা পেয়েছিল। ঝুপ করে বসে পড়েছিল নিশিপদর পিঠে পিঠ লাগিয়ে। সাত মাসের গাবীন পেটটার উপর থেকে কাপড়ের কসি আলগা করতে করতে বলেছিল—'তবে যে বলো—আমারে নিয়ে তোমার মন ওঠে না। এখন তবে মন ভার কেন?'

গোমরা মুখে নিশিপদ জবাব দেয়—'যানা—তোর যেদিকে মন চায়। কে তোরে মানা দেয়?'

কমলীবউ আস্তে আস্তে ফিরে বসে ভারী শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছিল নিশিপদর বুকে। চোখের পাতা দুটো কেমন যেন ভারী ভারী হয়ে এসেছিল। কান্নাবোজা গলায় বলেছিল—'সত্যি বলছ তবে, আমি যদি আর না ফিরি বুটা তোমার কাঁদবে না!'

ধমকে বেজে উঠেছিল নিশিপদর গলা—'চুপ যা কমলী-বউ—চুপ যা। মুখে তোর আটকাল না কথাটা?'

চোখ-ছলকানো জলের ধারা মুছে মুখে হাসি নিয়ে কমলীবউ সোহাগী গলায় বলেছিল—'ভয় নেই গো তোমার। মরব না আমি। কোলে তোমার ছেলে নিয়ে ফিরে আসব আবার।'

বলতে বলতে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল কমলীবউ। দোরগোড়ার কাদের যেন কথা শোনা যাচ্ছে। কাপড় চোপড় সামলে হুড়কো খুলে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর নাবার জন্য তৈরী হয়েছিল। ওদের বেরোনোর মুখে নিশিপদ কাজের ছুতোয় আশ পাশ দিয়ে ঘুরছিল। ঘোমটার আড়ালে নিশিপদর চোখের দিকে আর একবার তাকিয়েছিল কমলী-বউ। ঠোঁটের কোনাচে হাসির ঝিলিকে সুর বেজেছিল—'রাগ করো না গো। ফিরে এসে এবার তোমার কোলভরা ছেলে দেব।'

নিশিপদ বুঝি সেই খোঁটা দিল এখন কমলীবউকে। মরা ছেলে বিইয়ে ঘরে ফিরছে কমলী-বউ। ডাগর চোখের সেই হাসিটুকু মনে করিয়ে খোঁচা দিল নিশিপদ। শান-বাঁধানো মন বটে মানুষটার। কথায় বড় জলুনী'পুড়ুনী। পোহাতী-তারা উঠতে উঠতে বিল উজিয়ে রওনা দিয়েছিল। এক পহর বেলায় গিয়ে হাজির হল দু'দণ্ড সবুর সইল না। ওঠ্ বললেই ওঠ্। মায়ের চোখের জলে-ভেজা আঁচলে চোখ মুছে রওনা দিল কমলীবউ। বাপ উমাকান্তর বাখারী-ঘেরা আঁতুরঘরের পানশে বিবর্ণ স্মৃতিটাকে যাত্রাকালে আর বেসামাল হতে দেয় নি। কিন্তু মানুষটা কী গো! সেই ব্যথার আয়গাটুকুতেই মারে এমন চোয়াড় বাক্যির লগির খোঁচা!

নির্বিকার নিশিপদ নৌকা বায়। অন্ধকারে জল-বিল দিগন্তর এখন একাকার। আকাশে তারার আলো। দূরে দূরে গ্রামের ঘরে ফাঁকফোঁকরে অমনি তারার মত আবছা আলো টিমটিম জ্বলে আর নেভে। দূরের পানে নজর এখন নিশিপদর। সামনে আরো ছাড়া ছাড়া খানতিনেক গ্রাম। তার পাশ কাটিয়ে তবে বাড়ীর ঘাটে নৌকা বাঁধবে নিশিপদ। কোল-আঁধারে বিলের বুকে পথ ভুল আছে। দিক্-ভুল আছে। ভুল ভুলাইয়া বিভোলে নিয়ে শেষে বুঝি সারা বিলে ঘুরিয়ে মারে। একদিশার তাই এখন সাবধানে নৌকা বায় নিশিপদ।

নিশিপদর বৈঠার জল ভাঙে ছলাৎ ছল। শাপলাশালুকের ডাঁটায় পাতায় উথাল-পাথাল। শালুকপাতায় জল। জল তুমি টলোমলো কাঁদো। কমলী-বউয়ের দু'চোখ এখন

শালুকপাতা। শালুকপাতার চোখের পাতায় অথৈ জল টলমলায়। ভরা বিলের গহীন বুকে হঠাৎ শব্দ বাজে ঝুপ করে। পাশডালিতে হেলান খেয়ে সারা শরীরে দোল খায় নৌকাভরা রহস্যময় অন্ধকার। নিশিপদর যে চোখ দুটো এতোক্ষণ তিনতিনটে গ্রাম পেরিয়ে দূরান্তের আর একটা গ্রামের অস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে ফিরে স্থির-নিবদ্ধ ছিল, এবার তা ভুরু কুঁচকে নৌকাভরা অন্ধকারের বুক উথাল-পাথাল করল। অন্ধকারের শূন্যতায় সারা বিল ফাটিয়ে কে যেন হা হা করে হাসল নিশিপদর কাণের কাছে। হঠাৎ যেন ঘোর কাটল নিশিপদর। দু'হাতের শক্ত মাংসপেশীতে আলগা হয়ে আসে বৈঠাখানা। জলের দূর অতল থেকে ভেসে আসা বুড়বুড়ির ক্ষীণ জলতরঙ্গ লক্ষ্য করে নিশিপদও ঝাঁপ দিল। হাতে পায়ের ধাক্কায় বগ্‌বগিয়ে জল কাটিয়ে নিশিপদ নীচে আরো নীচে নেমে যেতে লাগল। সুতোর মত শালুকগাছে পা আটকাল। রোঁয়া রোঁয়া শ্যাওলার ঘষা লাগল বুকে পিঠে কয়েকবার।

নিঃশ্বাসের শেষ সীমা পর্যন্ত নিশিপদ হাতে পায়ে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজল কমলী-বউকে। বুকের পাজর জুড়ে দমবন্ধ ভারী পাথরটা পাষাণ হয়ে উঠবার আগেই ভেসে উঠল। উপরে বাতাস আর জলের নীচে মাটির আস্তরণে অনেক ব্যবধান। দম নিতে নিতে নিশিপদর বুকটা ফাটা হাঁপরের মত ফুঁসতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক সময় কাপড় আর শ্যাওলা-জড়ানো তালগোল পাকানো কমলী-বউয়ের ন্যাতানো শরীরটা হাতে ঠেকল নিশিপদর। পরম প্রার্থিত বস্তুর মত নিশিপদ যখন কমলী-বউকে উপরে তুলল তখন নিশিপদও প্রায় বেসামাল। তবু নিশিপদ বেহুঁশ হল না। ভিজে জড়ানো কাপড় টানে টানে খুলে ফেলতেই উদ্‌লা হয়ে পড়ল কমলীবউয়ের বুক পেট। একবার ইতস্ততঃ করল নিশিপদ। কিন্তু পরক্ষণেই শক্ত হাত দু'খানা পাট করে পাতল কমলীবউয়ের পেটের উপর নাভির দু'পাশ দিয়ে। সন্তান-ধারণের ফাটা ফাটা দাগগুলো হাতে লাগল নিশিপদর। মাঘমাসের আমন ধান কাটা শূন্য রিক্ত ফাল-খাওয়া ক্ষেতের মত মনে হল কমলী-বউয়ের পেটটাকে। বহুদিন রাতে ঘুমন্ত কমলীবউয়ের টান-টান পোয়াতী পেটের উপর আলগা হাতের স্পর্শ লাগাতেই কচি প্রাণের যে ধুকপুকুনিটার অনুভব নিশিপদকে রোমাঞ্চিত করেছে, তা এখন বিস্বাদ মনে হল।—আস্তে আস্তে তারপর—জোরে জোরে চাপ দিতে থাকল নিশিপদ কমলী-বউয়ের পেটে। মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে জোরে জোরে ফুঁদিল করেকবার। হড়াৎ হড়াৎ করে নাক মুখ দিয়ে হঠাৎ খানিকটে জল গড়িয়ে পড়তেই কমলীবউ লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে পাশ ফিরে শুলো।

ভিজে জবজবে শরীরে উদ্‌লা কমলী-বউয়ের পাশে অভিভূতের মত বসে রইল নিশিপদ। আকাশ ভরা তারা-গুলো ইশারায় কি জানি কি ফিসফিসায়। নিশিপদর চোখের সামনে এখন শ্বশুর উমাকান্তর উঠোন জোরা জাম-গাছের তলার আলোর-ছায়ার ঘেরা সেই ছবিটা ভাসতে লাগল। নিশিপদ মিস্তিরি যেখানে হাতুড়ি বাটালি পিটিয়ে নৌকা গড়ত আর উমাকান্তর তেরো বছরের মেয়েটা হুঁকো সাজিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলতো 'মেস্তরী দাদা তামুক খাও।'

মেয়েটার চোখের যাদু যেন টানত নিশিপদকে। হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বলত—'নামটা কি গো তোমার?'

মেয়ে তো নয় যেন কালফণী। জিভের ডগায় ছোবল হানত—'নাম শুনে তোমার কাম কি গো?'

মজা পাওয়া চোখে নিশিপদ জবাব দিত—'শুনিই না-হয় সুন্দরীর নামটা।'

এবার গম্ভীর হত উমাকান্তর মেয়ের গলা—'নাম আমার কমলী।'

—'জল কমলী—না থল কমলী?'— ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকোর টানে প্রশ্ন করত নিশিপদ।

কমলীর চোখে ঝিলিক বাজত—'গন্ধ শুঁকে ট্যার পাও না—জল কমলী না থল কমলী ?'

আর ধাঁটাতে সাহস পেত না নিশিপদ। কিন্তু কমলীর বাঁকা চোখের হাসিটুকু বুকে লেগে থাকত জোয়ান মরদ নিশিপদর। আর সেই টানে টানেই নিশিপদ আর কমলী-বউয়ের জোড় বাঁধল। এখন এই জল-উপরানো কমলী-বউয়ের নিপাট শরীরটার দিকে অন্ধকারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিশিপদ যেন সেই পুরোনো কমলীকে আবার খুঁজতে চাইল।

আর একটা দমকা নিঃশ্বাস নিয়ে পাশ ফিরে কি যেন বিড় বিড় করল কমলীবউ। সারা মাথাভর্তি চুলের রাশিতে কাদা জল মাখামাখি। চুলগুলো এক পাশে সরিয়ে দেয় নিশিপদ। কাণের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞাসা করে—'কেমন বাসিস রে এখন ?'

কমলী বউয়ের শরীর শিরশিরায়। হাত ইসারায় জানায় শীত লাগছে।

বাড়ন্ত কাপড় নেই সঙ্গে। নিশিপদ কমলী-বউয়ের অবশ দেহটাকে বুকের পাশে জড়িয়ে নেয়। দুজনের শরীর দুজনকে উত্তাপ দেয়। স্থির জলের বুকে অচল নৌকায় দোল লাগে না। ছোট্ট একটা শিশুর মত নিশিপদর বুক জুড়ে লেপটে থাকে কমলীবউ।

কখন বুঝি সম্বিৎ ফিরে পায় কমলীবউ। নিশিপদর হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসে। উদ্‌লা বুকের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পায়। হাত বাড়িয়ে ভিজে কাপড় টেনে বুক ঢাকে।

ভাম্‌ হয়ে বসে থাকে নিশিপদ খানিকক্ষণ। —'হঠাৎ এ তোর কি মতি হলো রে কমলী-বউ !'

কমলী-বউয়ের গলাটা এবার ফোঁসে—'বেশ করেছি। এ মতি হয়েছে আমার—বেশ হয়েছে।'

নিশিপদর গলাটা যেন গুন গুন করে—'তাই বলে তুই জলে ডুববি ? আত্মহত্যে করতে যাবি ?'

কমলী-বউয়ের গলা রা ফাড়ে না।

নিশিপদর কণ্ঠে এবার রুক্ষতা বাজে—'কিরে, জবাব দে।'

কমলীবউয়ের দেহে যেন কিসের দোল লাগে। অন্ধকারে সরম লাজের বালাই থাকে না। নিশিপদর বুকে ঝাঁপিয়ে মুখ ঘষে ওর রোমশ বুকে।

নিশিপদর মন তবু পাষাণ। গলায় তেমনি তার ঝাঁজ—'কি হল, জবাব দে ?'

কমলীবউ জবাব দেয় না। শুধু নিষ্পন্দের মত এলিয়ে পড়ে থাকে নিশিপদর কোলে। ভেজা ভেজা জলের গন্ধে আবিষ্ট নিশিপদও আর কথা বলে না। শুধু দূরের টাল-মাটাল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কমলী-বউয়ের জল-চোঁয়ানো জমাট বাঁধা চুলে হালকা আঙুলে বিলি কাটে। গহীন বিলের বুক কাঁপিয়ে এবার কমলী-বউয়ের কণ্ঠ বাজে।

—'খালি কোলে তোমার ঘরে ফিরে যেতে মন চায় না যে।'

কমলী-বউয়ের হা হা-করা কথার শূন্যতায় নিশিপদ আর যেন তল পায় না। কোন্‌ ভুল-ভুলাইয়ার বিভোলে সব দিগ্‌-বিদিক যেন তার একাকার। শুধু আপন মনে বৈঠা তুলে অন্ধকার তাক করে বৈঠা বায় ছপাৎ ছপ।

In any language, it's sweet

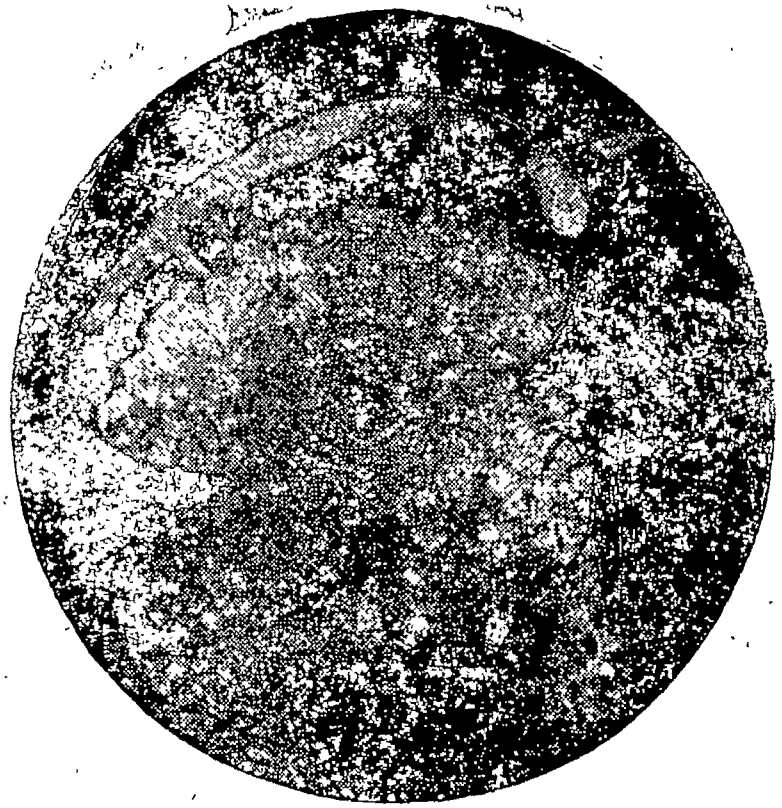

In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek.

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

কবিপত্রে কাব্যচিন্তা

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

পত্রাবলী

ওলাল্ট হুইটম্যান ১৮১৯-৯২

উইলিয়াম ডি. ও'কনরকে

ব্রুকলিন

৬ জানুয়ারি ১৮৬৫

.....আগে যেমন বলেছি 'ড্রাম-ট্যাপস' খুব সম্ভব এই শীতে প্রকাশিত হবে। এখন ঠিক করা হয়ে গেছে, এবং একটা সম্পূর্ণ কপি ছাপার জন্যে প্রস্তুত। আমি অবশেষে অনুভব করছি, এবং এই প্রথম বিনা দ্বিধায় অনুভব করছি যে এটার সম্পর্কে আমি পরিতৃপ্ত, আমি এই ভেবে তুষ্ট যে এটা এখন উপস্থিত শব্দ ও যতিচিহ্নসমেত পৃথিবীর দরবারে যেতে পারে। আমার মতে এটি 'লীভস অব গ্রাসের' চেয়ে ভাল—শিল্পকর্ম হিসেবে এটি আরো পূর্ণাঙ্গ, সব দিকে সুপরিমিত, এবং এর আবেগের সেই অপরিহার্য গুণ আছে যার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে এটা বাধাহীন উদ্বেলতা মনে হলেও প্রকৃত শিল্পী এর সংযম লক্ষ করতে পারবেন। আমি 'ড্রাম-ট্যাপসের' জন্যে সম্ভবত এই কারণে সবচেয়ে সুখী যে যে-কর্তব্য করার উচ্চাশা আমি পোষণ করেছিলাম তা এখন করা গেছে—আমি একটি কবিতার মাধ্যমে (যেমন-ভাবে পারি তেমনভাবে) আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত, পরিবর্তনমুখর, পুঞ্জীভূত, ঘূর্ণি ও উচ্চকিত স্বরে পূর্ণ এই যে সময় ও পরিবেশে আমরা ভাসছি (তবু সবার উপরে অদৃশ্য হাতের স্পর্শে যার একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ও চিন্তার রূপ আছে) তার ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ করেছি—যেখানে আহত ও বিক্ষুব্ধ সুন্দর যুবাপুরুষদের অভূতপূর্ব মনোব্যাথা, সামগ্রিক মৃত্যু ও বিমর্ষতার মাধ্যমে সব কিছুই কখনো কখনো যেন রক্তের রং, রক্তের নির্ঝর। বইটি সেকারণে অনন্ত দুঃখে ভরা (এই দিনগুলি যেমন, নয় কি ?)—কিন্তু তবু এতে শিঙার বজ্রনির্ঘোষ, দামামার উচ্চনাদ রয়েছে ও তারই সঙ্গে সুমধুর সৌহার্দ্য ও মানবিক প্রীতির অন্তর্লীন সুর এই হট্টগোলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যা প্রত্যেকটি বিরতির সময় শোনা যায়—সত্যিই, এর মধ্যে বিশ্বাস ও জয়ের ধ্বনিও রয়েছে।

—'ড্রাম-ট্যাপস'—এ 'লীভস অব গ্রাসের' বিক্ষোভগুলি নেই। আমি 'লীভস অব গ্রাস' নিয়ে পরিতুষ্ট, এর বেশি অংশই যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমনি প্রকাশ করেছে, এটি কাটা-কাটা আত্মকথনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সত্তা উন্মোচন করেছে, তা ছাড়া এটি আমেরিকায় ব্যবহারের জন্যে ব্যক্তিত্বের একটি বৃহৎ ভ্রূণ বা' কঙ্কালকে চিহ্নিত করেছে ও ছড়িয়ে দিয়েছে,—যা পশ্চিমের, দেশী আদর্শের উপযোগী —কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা আমি পরবর্তী সংস্করণে সযত্নে তুলে দেব, এবং কিছু জিনিস আমি অনেকখানি বদলে দেব।

আমি বলে ফেলেছি যে 'ড্রাম-ট্যাপস'-কে আমি 'লীভস অব গ্রাসের' চেয়ে উন্নততর মনে করি। সম্ভবত একথা

আমি বলেছি শিল্পকর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে, বিষয়ের অধিকতর সহজ ও আকর্ষক স্বভাবের কথা ভেবে, এবং আরো একটা কারণে যে এর মধ্যে থেকে আমি ইচ্ছেমত সমস্ত বাড়তি জিনিস বাতিল করতে পেরেছি, শব্দের বাড়তি ব্যবহারের কথাই বলছি, আমি তেমনি একটি কবিতা লিখতে ভালবাসি যার মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করি যে তেমন কোন শব্দ নেই যা কবিতাটির বা আমার বক্তব্যের অপরিহার্য অংশ নয়।

তবুও 'লীভস অব গ্রাস' আমার প্রিয়, সর্বদাই আমার প্রিয়তম। যেন এটি আমার প্রথম সন্তান, যেন আমার জীবনের প্রথম আশা, সন্দেহের দুহিতা, এবং এর মধ্যে আমি সেই দিনগুলির প্রয়াস ও উচ্চাশা সংহত করেছি—সত্যিই, এখন দেখি যে, এখন লিখলে এর অনেক কিছুই আমি লিপিবদ্ধ করতাম না, কিন্তু তবু সেগুলিকে আমি অবশ্যই রেখে দেখ, অন্তত এ-কারণে যে এগুলি বিগত পর্যায়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে।...

রবার্ট ব্রাউনিং ১৮১২-৮৯

রিচার্ড মকটন মিলনেসকে

গত রাতে খুব বিস্মিত ও খানিকটা বিরক্ত হয়ে যা বলেছি এখন তা লিখে দিতে চাই; এবং যে কারণে তা বলেছি, আমি সেব্যাপারে কিছুটা স্পর্শকাতর।

আমি সুইনবার্ন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না, এবং তাকে আমি খুব পছন্দ করি: সে আমাকে সম্মান দেখিয়েছে এবং শুনেছি সে আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান—একথা আমি সত্যিই বিশ্বাস করি। তার রচনা সম্পর্কে বলতে পারি যে তার প্রথম বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর তার একখানি কবিতা যা আমি রসেটির কাছে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম ও সেদিন রাতে সে নিজেই যেগুলো পড়েছিল সেগুলি ছাড়া আর একটি লাইনও আমি জানি না: সুতরাং, এইগুলো সম্পর্কেই আমার মতামত গড়ে উঠতে পারে। আমি ভেবেছিলাম ওগুলি নৈতিক ভুল যা যথেষ্ট বুদ্ধিবল প্রয়োগ করে ঠিক করা হয়েছে। ওগুলো আশুপ্রকাশ্য বইটির নমুনা অথবা কেবলমাত্র ব্যতিক্রমের উদাহরণ হতে পারে—আমি আশা করি সেরকমই কিছু হবে।

আপার ওয়েস্টবোর্নটেরাস, ডবলিউ
৭ জুলাই, ১৮৮৩

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন সুইনবার্নের ক্ষমতা সম্পর্কে যখন আমার মতামত চাওয়া হল, তখন কী করবো না জেনে বলেছিলাম "তার প্রতিভা আছে এবং সে কবিতাও লিখেছে কিন্তু আমার মতে তার মধ্যে ভাল বলে আদৌ কিছু নেই"। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরও যে মত এক একথা আমি বলেছিলাম কারণ আমার নিজের এগিয়ে গিয়ে একজন তরুণ কবিকে এই চেরি-বীচিটা ছুঁড়ে মারতে অনীহা ছিল।

ঈশ্বর জানেন আমি কেমন করে সেই অনীহা কাটিয়ে উঠেছি এবং সেই মনোভাব এত বয়সেও রাখতে পেরেছি (যে বয়স "উত্তম ও সুন্দরের সমস্ত ধারণাই হারিয়ে ফেলে")। তিরিশ বছর ধরে আমাকে নিজের একান্ত দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে সাধারণ্যে ও ব্যক্তিগত উৎসাহে যেরকম শিক্ষা দিতে হয়েছে তাতে আমি যদি কোন ছেলের হাতের ময়লা পরিষ্কার করা দরকার মনে করি ত আমার ক্ষমা করা উচিত—কিন্তু আমি তা কল্পনা করি না। দুর্ভাগ্যবশত, সত্য সত্যই, এবং

মাঝে মাঝে সেটা বলতেই হবে। এক্ষেত্রে আমার ছুটি তিনটি কবিতার ওপর বিরূপ সমালোচনাকে—যেগুলো আমি একটা অসম্ভব পুরো প্রশংসার দাবীর বিরুদ্ধে করেছিলাম—একটা সম্পূর্ণ বইয়ের ওপর, যাতে আমি যতদূর জানি হয়ত অনেক ভাল কবিতাও আছে—প্রয়োগ করে চ্যাপম্যান অন্যায় করেছেন; কিন্তু যেহেতু তিনি যেসব জিনিসগুলির পরিপোষকতা করেন সেগুলির গুণ সম্পর্কে যথাসম্ভব সত্য বাচন করাই আমার অভ্যাস এবং যেহেতু তাঁর বিজ্ঞাপনে তাদের শিরোনামাগুলি অদৃশ্য হতে দেখি নি, সেকারণে আমি এই বলে শেষ করি যে তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাস ঢাকবার জন্যে আমায় সাক্ষী মানতে চান।··· ··

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪-৮৩

রাজনারায়ণ বসুকে

কলকাতা

১৮৬১ ?

এতদিনে সম্ভবত পুরণো ডেরায় পৌঁছে গেছো। দয়া করে মেঘনাদ সম্পর্কে আমায় লিখে জানাও। আমি শ্বাস রোধ করে তোমার রায় শুনবো বলে অপেক্ষা করছি।

তুমি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমার দারুণ জ্বর হয়েছিল এবং ছ সাতদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। সে এক যুদ্ধ—মেঘনাদ আমায় শেষ করে না আমি মেঘনাদকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি জয়ী হয়েছি। তিনি মারা গেছেন, অর্থাৎ প্রায় ৭৫০ লাইনে আমি ৬ষ্ঠ সর্গ শেষ করেছি। তাঁকে মারতে আমার অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে। যাই হোক, খুব শিগ্রি তুমি নিজেই সেটা বিচার করার সুযোগ পাবে।

কাব্যটি দিনে দিনে দারুণ জনপ্রিয় হচ্ছে। কেউ বলে এটা মিলটনের চেয়ে ভালো—কিন্তু ওসব বাজে কথা—মিলটনের চেয়ে কিছুই ভাল হতে পারে না; কেউ বলে এটা কালিদাসের মত লাগে; আমার তাতে আপত্তি নেই। ভার্জিল, কালিদাস এবং টসোর সমকক্ষ হওয়া আমি অসম্ভব মনে করি না। গৌরবোজ্জ্বল হলেও তাঁরা মরণশীল; মিলটন ঐশ্বরিক।

হে বৃদ্ধ, তুমি যা ভাবো আমায় লিখে জানাও। লক্ষ লোকের উচ্চরোলের চেয়ে তোমার মত মূল্যবান।

আমি বুঝতে পারছি, অনেক হিন্দু মহিলা বইটা পড়ছেন আর চোখের জল ফেলছেন। তোমার স্ত্রীকেও বইটা পড়তে দিও।···

এমিলি ডিকিনসন ১৮৩০-৮৬

শ্রীমতী জে. জি. হল্যাণ্ডকে

১৮৭০

তোমার ছোট্ট বায়রন * কেমন আছে? আশা করি সে তার প্রতিভা না হারিয়ে যেন পা-টা সারিয়ে ফেলে। আমি অনেককে নিপুণ তর্কে বোঝাতে শুনেছি যে কবির প্রতিভা নাকি তাঁর পায়ে বিধৃত ছিল—মৌমাছির কাঁটা-পা ও গান

যেমন পরস্পরনির্ভর। তুমি কি এগুলোর চেয়ে বেশি বলশালী? এত ছোট প্রাণীকে আঘাত করা খুব খারাপ, প্রকৃতির সাজে না—কিন্তু তুষার ও ফারুর খাতির করে না। তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে বা তোমার চিঠি খুললে আমি খুশী হই। ফুলগুলি সৌমাছির সম্পদ, দরকার পড়লে 'হেবিয়াস কর্পাস' করেও।

---

* পত্রপ্রাপকের শিশুসন্তানের পায়ে একটা অস্ত্রপচারের কথা বলা হয়েছে:

টি. ডবলিউ, হিগিনসনকে

মে ১৮৭৪

ভেবেছিলাম কেউ নিজেই কবিতা হয়ে গেলে কবিতা লিখতে পারে না, কিন্তু ভুলটা অনুধাবন করুন। এটা যেন বাড়ি যাওয়ার মত, সুন্দর ভাবনাগুলিকে আবার দেখার মত, যা এতদিন নিষিদ্ধ ছিল—দেশপ্রেমিক যখন তাঁর 'জন্মভূমির' কথা বলেন তখন কি সেটা বুদ্ধিবৃত্তি? আপনি নিজে যার 'নিদারুণ মূল্য' দেন তা আমার উদ্ধৃত করতে ভয় লাগে।

আপনার পবিত্রতার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমি এটা এখনো পরীক্ষা করি নি।

জীবনধারণ করো—
জীবন থেকে নাও—
কিন্তু ছুঁয়ো না-ও-হ্রদ কখনো—

আপনি দয়া করে আমার ফুল ও বইয়ের খোঁজ করেছেন—আমি সম্প্রতি খুব কমই পড়েছি—অস্তিত্বের বোঝা বইগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে।...বড় বড় কথাগুলি এত সরু যে সেগুলিকে আমরা সহজেই পেরোতে পারি—কিন্তু যার সেতু নেই তার গভীরতর জল আছে।...

শার্ল বদল্যার ১৮২১-৬৭

মাদাম অপিককে

বৃহস্পতিবার, ৯ জুলাই ১৮৫৭

আমি তোমায় আশ্বাস দিতে পারি যে আমার জন্যে চিন্তা করার দরকার নেই; বরং তোমার জন্যেই আমার নিদারুণ উদ্বিগ্নতা, এবং তোমার দুঃখভরা চিঠিটি তা দূর করার কোন প্রয়াসই করে নি। যদি তুমি দুঃখের হাতে নিজেকে এত নিবিড়ভাবে সঁপে দাও, তাহলে তোমার রোগে ধরবে এবং তা আমার পক্ষে ভীষণ দুর্ভাগ্য ও অসহ্য ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তোমার মন যাতে অন্য কিছু নিয়ে মেতে থাকে তাই শুধু আমি চাই না, তার সঙ্গে তুমি যাতে নবতর আনন্দে ভরে থাকো তাও আমি চাই। —মাদাম অরফিলাকে অবশ্যই একজন বিবেচক মহিলা বলে আমি মনে করি।

আমার এই নিস্তব্ধতার কারণ আর কিছুই নয়, শুধুই কুঁড়েমি যা, বলতে লজ্জা করছে, আমাকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে এবং কোন কাজ, এমন কি সাধারণ কর্তব্যগুলিও, করতে দেয় না। তা ছাড়া, আমি একই সঙ্গে একটি চিঠি, তোমার প্রার্থনার বই ও আমার কাব্যগ্রন্থ পাঠাতে চেয়েছিলাম।

প্রার্থনার বইটি সম্পূর্ণ শেষ হয়নি; কারিগরেরা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমানরাও, এত বোকা। কতকগুলি ছোট ছোট জিনিসের পরিশোধন দরকার। এটা নিয়ে আমার একটু কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তোমার ভাল লাগবে।

কাব্যগ্রন্থটি (দু সপ্তাহ আগে প্রকাশিত) সম্পর্কে

আমার বক্তব্য হল যে প্রথমে তোমাকে এটা দেখাবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আবার চিন্তা করে দেখলাম যে আমার বিনয় কিংবা তোমার দুর্বিনীতভাব দুইই সমান অর্থহীন, যেহেতু শেষকালে তুমি বইটি সম্পর্কে লোকের মতামত জানতে পারবে, অন্তত যে রিভিউগুলি আমি পাঠাব সেগুলি থেকেই। সাধারণ কাগজে ছাপা ১৬ কপি ও পাতলা কাগজে ছাপা ৪ কপি আমি পেয়েছি। শেষের একটি আমি তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি, এবং এখনো যে সেটি পাও নি তার কারণ ওটি আমি বাঁধাতে চেয়েছিলাম। তুমি জানো সাহিত্য বা শিল্প যে কোন নৈতিক আদর্শ প্রচার করে এমন কথা আমি কখনও মনে করি নি এবং আমার কাছে চিন্তার সৌন্দর্য ও ষ্টাইলই যথেষ্ট। কিন্তু এই বই, যার নাম 'ফ্লর দু মাল' সব কিছু বলে দেয়, তুমি দেখবে এটা একটি শীতল ও কঠিন সৌন্দর্যে আবৃত; এটা আবেগ ও প্রয়াসের সাহায্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা ছাড়া, এ সম্পর্কে সব বিরোধী উক্তিই এর ইতিবাচক গুণেরই নির্দেশ করে। বইটি লোকদের ক্ষুব্ধ করে। সত্যিই, আমি যে ভীতির উদ্রেক করতে চলেছি তাই দেখে বিমূঢ় হয়ে আমি ছাপানোর সময়েই বইটির এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিই। ওরা বলে আমার কিছুই নেই—না কল্পনা, না ফরাসী ভাষার জ্ঞান। আমি ঐ বেজন্মাদের সম্পর্কে কিছুই ভাবি না, এবং আমি জানি যে বইটি তার দোষগুণসমেত ভিকটর হুগো, থেওফিল গতিয়ে, এমন কি বায়রনের কবিতার মতই সাহিত্য-পাঠকের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে। আমার একটি অনুরোধ: যেহেতু তুমি সর্বদাই এমন-দের সঙ্গে থাকো, দেখো যেন বইটি মাদমোজেল এমনের হাতে না পড়ে। বাজকমশাই, যাঁকে তুমি আপ্যায়ন করো, সম্পর্কে বলি যে এটি তুমি তাঁকে দেখাতে পারো। তিনি ভাববেন আমি অধঃপাতে গেছি এবং তোমাকে বলতে সাহস করবেন না। গুজব শুনছি যে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে, কিন্তু ওরকম কিছু হবে না। যে সরকারের সামনে পারীর ভয়ঙ্কর নির্বাচনের কাজ রয়েছে তার পক্ষে একজন পাগলের বিরুদ্ধে মামলা করার সময় নেই।

আমার দম্ভের শিশুসুলভ উৎসারের জন্যে সহস্র ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি হনফ্লরে যাওয়ার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেছি, কিন্তু সে-সম্পর্কে তোমার কিছু বলতে সাহস করি নি। সমুদ্রতীরে প্রভূত কাজের মধ্যে আমার কুঁড়েমিকে ছিন্ন করবো ভেবেছি—সমস্ত হালকা ব্যস্ততা থেকে দূরে, হয় এডগার পো-র তৃতীয় খণ্ডের কাজে কিংবা আমার প্রথম নাটক রচনার কাজে ডুবে যাবো।

কিন্তু আমার যা কাজ তা যেখানে গ্রন্থাগার, ছাপা বই ও যাদুঘর নেই সেখানে করা যায় না। প্রথমে আমি 'সৌন্দর্যের কৌতূহল', 'রাত্রির কবিতা' ও 'অহিফেনসেবীর স্বীকারোক্তি'টি শেষ করবো।

'রাত্রির কবিতা' (পরের নাম 'ছোট গদ্য কবিতা') 'দুই পৃথিবীর রিভিউ' পত্রিকার জন্যে; 'অহিফেনসেবন'টি পারীতে অজানা একজন বিখ্যাত লেখকের (ডিকুইনসির) রচনার নতুন অনুবাদ। এটি 'মনিটর' পত্রিকার জন্যে।...

(ক্রমশঃ)

[৫৫৪ পৃষ্ঠার পর]

সরকারের নীতি ঘোষণায় বলা হয়েছে সাত-আট লক্ষ বিঘা জমি জোতদারদের অন্যায় দখল থেকে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের অধিকারে গেছে। ফলে কম পক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ মণ ধান যা এ যাবৎ জোতদারদের গোলায় উঠতো তা এবার কৃষকের ঘরে উঠবে। কিন্তু জোতদারদের দখল থেকে উদ্ধার করা জমির ধান ছাড়াও অন্যান্য সামান্য চাষীর, আইনগতভাবে জমির মালিকদের জমির লক্ষ লক্ষ মণ ধানও ভূমিহীনেরা এবং চাষীরা কেটে নিয়ে গেছে, আরও যাবে। এদের সঙ্গে দলীয় আশ্রয় পুষ্ট জোতদারেরাও ধান লুঠের শরিক হয়েছে। সুতরাং এই খাতেও লক্ষ লক্ষ মণ ধান জবরদস্তি প্রয়োগে কাটা হচ্ছে এবং যে চাষী এই ফসল বুনেছিল, তারা ফসলের উপর তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই জবরদখল ধানের একটা অংশ দলীয় কোষে অনিবার্যভাবে জমা পড়বে, তার যে নামাকরণই হোক না কেন।

জমি জবরদখল এবং ফসল জবরদখলের ফলে একটি গুরুতর সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে। জমি জবরদখল হয়েছে, এ কথা সরকার স্বীকার করেছেন। ফসল যে জবরদখল হচ্ছে, যুক্তফ্রন্টের সভায় সেকথাও স্বীকৃত হয়েছে এবং জবরদখলী ফসল ফিরিয়ে দেবার সদিচ্ছাও ফ্রন্টের সভায় শোনা গেছে। কিন্তু কার ফসল কে দেবে? 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' গোছের একটা দায়সারা কাজ করে যুক্তফ্রন্ট তাদের কৃতকর্মের অপরাধ খালনের প্রহসন করেছেন মাত্র। অপরাধ বোধ তাদের তীব্রভাবে দহন করলেও, সেই অপরাধের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের পথে তারা অগ্রসর হতে সাহসী হয় নাই, নয় তো চান নি। তারা চান নি এই অনুমানই বোধ হয় সঙ্গত হবে। কারণ জমি ফেরৎ দেওয়া কিম্বা অপহৃত ধান ফেরৎ দেওয়া তাদের পক্ষে দুটোই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

জমি-দখল কিম্বা ধান দখলের প্রতিকারের পথ রয়েছে। যে সব ছোট জোতের কৃষকদের, ভাগচাষীদের, খাসজমির লাইসেন্সধারী কৃষকদের কিম্বা সিলিং-এর সীমানার অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের জমি দখলের ফলে তারা পুরো ফসলের উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হোলো, তাদের ফসলের একটি ভাগ দিয়েই সরকার বিদায় দিতে চাইছেন। এই ভাগও তারা কতটা পাবে সেটা সন্দেহস্থল। এই ফসলের ভাগটা শেষ পর্যন্ত মায়ায় মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তারা ভাগ পায়ও, তা হোলেও তাদের পুরো জমি চাষ করে পুরো ফসলের উপার্জন থেকে তারা যে বঞ্চিত হবে সে বঞ্চনার জন্য দায়ী কে? সেজন্য দায়ী সরকারের জমি দখলের জন্য জবরদস্তিতে প্ররোচনার নীতি। ঠিক তেমনি যারা প্রাণপণ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে ধান বুনলো, তাদের ধান জোরজবরদস্তি করে কেটে নিয়ে যাবার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো শুধু নয়, তাদের জীবিকা তারা থেকে বঞ্চিত হোলো। তাদের ধান ফেরত দেবার কাগজী সঙ্কল্পের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। ওটা ছলনামাত্র। জবরদখলের শিকারদের প্রতারণার একটি সুচতুর কৌশল।

সুতরাং উপার্জনের বঞ্চনার জন্য যে-সব আইনগত অধিকারীদের জমি জবরদখল হয়েছে, এবং আইনগত জমির অধিকারীদের জমিতে বোনা ধান জবরদস্তি কেটে নেওয়া হয়েছে, সরকারকে তাদের ন্যায্য উপার্জন থেকে বঞ্চিত করার ফলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কলকারখানা বন্ধ হলে, কিম্বা অন্য কোনো কারণে শ্রমিকদের আয়ের পথ বন্ধ হলে, তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। সেই একই কারণে কৃষকদের আয়ের পথ বন্ধ হলে তাদের ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত করবার সরকারের কোনো নৈতিক কৈফিয়ত নেই। শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, সরকারের ভূমিনীতি এমন এক জায়গায় পৌঁচেছে যেখানে শ্রমিকদের যেমন কর্মের নিরাপত্তার দাবী অলঙ্ঘনীয়, তেমনি কৃষকদের জমির নিরাপত্তা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের নিরাপত্তার দাবীও অমোঘ হয়ে উঠেছে। এই দাবীর মর্যাদাদানের নিকষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষক-দরদের বিচার হবে।

১২. ১২. ৬৯

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

10 JAN 1970

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·70
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

মাঘ
১৩৭৬

জয়শ্রী

সম্পাদিকা :
লীলা রায়

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY

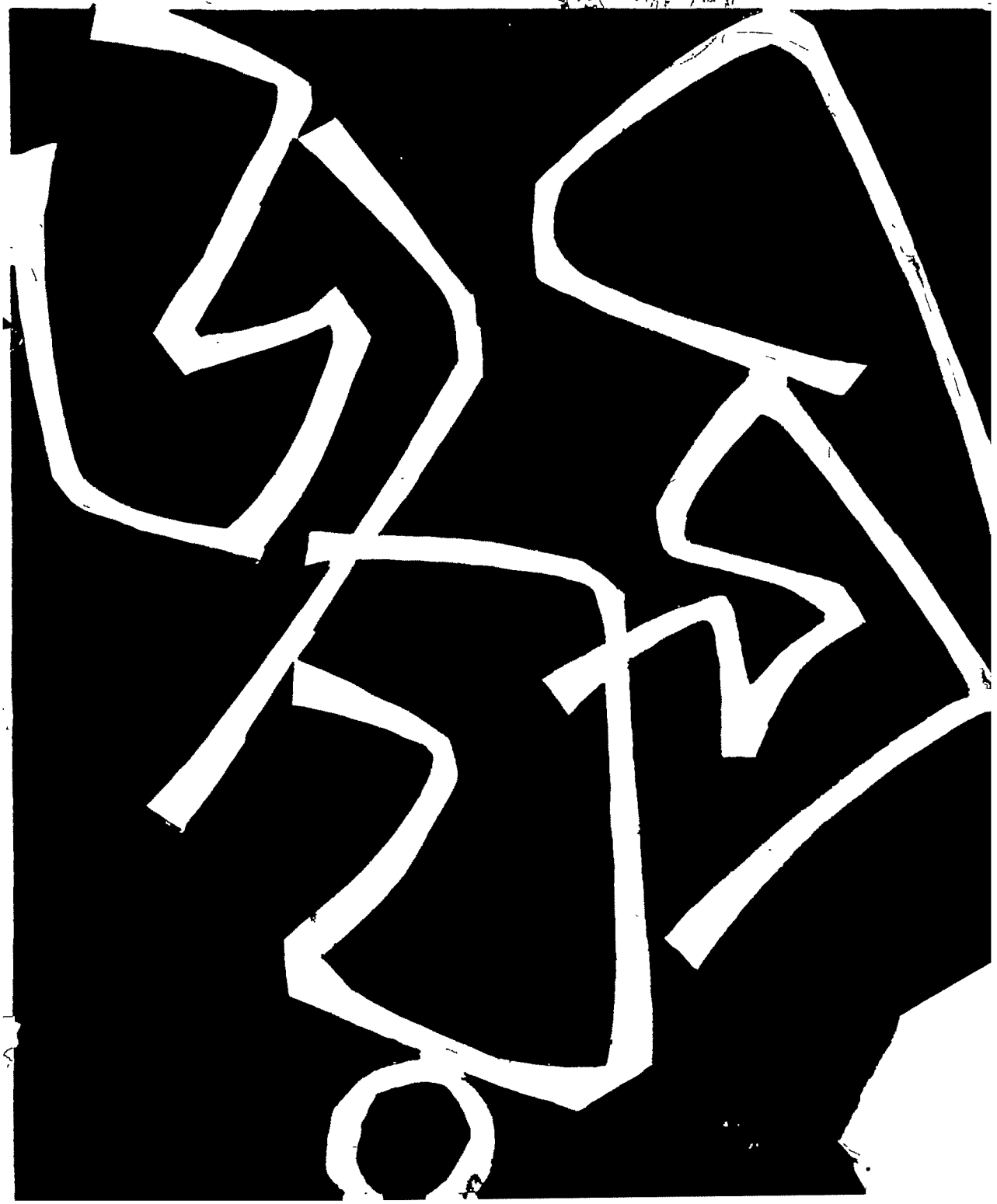

জয়শ্রী

সূচীপত্র

মাঘ—১৩৭৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুভাষবাণী	মহাকাল	৬৬১
সম্পাদকীয়		৬৬২
বিস্ফোরণ	কালীচরণ ঘোষ	৬৬৯
অহিংসা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভাবনা (অনুবাদক)		
জে. বি. এস হলডেন		
অনুবাদক :	পথচারী	৬৭৭
সাবিত্রী (ধারাবাহিক উপন্যাস—অনুবাদ)		
	পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে	৬৮৫
	অনুবাদ : পিনাকী রঞ্জন ধর	
কবিপত্রে কাব 'চিত্ত' (পত্রাবলী)		
	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	৬৯৩
কণ্ঠ ভরা বিষ (উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৭০১
জাপানের দিনগুলি	বারীন বর্ধন	৭০৯
(ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী)		
জাতীয়তার রূপায়ন (প্রবন্ধ)	দীপঙ্কর	৭১৫

সম্পাদনা : সুনীল দাস

সহযোগী সম্পাদক

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী

২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড

পোঃ নাকতলা

কলিকাতা-৪৭

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly

Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Ordinary

Full Page :	Rs. 100·00
Half Page :	Rs. 55·00
Quarter Page :	Rs. 30·00

Cover Page

Second Cover :	Rs. 175·00
Third Cover :	Rs 200·00
Fourth Cover :	Rs. 350·00

For Special Position contact *Advt. Manager*

Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm.
(8" × 6")

Contact

Manager, Jayasree

251A/32, Netaji Subhas Chandra Bose Road

Calcutta—47

Phone : 46-4116

গায়ত্রী

৩৪ বর্ষ ০ দশম সংখ্যা ০ মাঘ ১৩৭৬

সুভাষ-বাণী

"...এ মর জগতে সব বিনষ্ট হয়ে যায় বিনষ্ট হয়ে যাবেও। কিন্তু মনীষা, আদর্শ ও স্বপ্নের—'Ideas, Ideals and Dreams'-এর বিনাশ নাই, আদর্শের সাধন করতে যেয়ে ব্যক্তি লয় পেতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির অবলুপ্তির পরেও আদর্শ সহস্র আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করে। অমনি করেই যুগের বিবর্তনের চাকা এগিয়ে যায়, যুগের স্বপ্ন যুগান্তরে পুনমূর্ত হয়ে ওঠে।"

জীবনে যদি আর কোনো কাজ করতে না পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলবার সুযোগ না পাই তা হলেও আমার জীবন ব্যর্থ হবে না। মহান আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করে থাকি, কায়মন যদি সে মহান আদর্শের সুরে বেঁধে থাকি, আদর্শের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব যদি মিশে থাকে তা হলেও আমি সন্তুষ্ট, আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হলেও, আমার কাছে ব্যর্থ নয়।"....

আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, আমি কাজ করে যাব, তারপর যা হয় হবে।"

(বাংলা সরকারকে লিখিত পত্র ১৯৪০)

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের পি, জি হাসপাতালে অবস্থানের দুই বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নাই, এখনও তিনি সংজ্ঞাহীন। গত কয়েকদিন যাবৎ তাঁর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে উদ্বেগের কারণ হয়েছিল।

এই দীর্ঘ ২৫ মাস যাবৎ তাঁর নিকট আত্মীয়বর্গ, ঘনিষ্ঠ সহকর্মীগণ এবং অনুগামীরা বিধাতার আশীর্বাদে তাঁর চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার বহন করে এসেছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে তাঁর চিকিৎসার ভার বহন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবাদপত্রে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলেও, এখন পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কিম্বা তাঁর আত্মীয়বর্গের নিকট কোনো সংবাদ আসে নাই।

বিধাতার কাছে আমরা প্রতিনিয়ত তাঁর রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিচালকমণ্ডলী

জয়শ্রী

২৮, ২, ৭০

পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি

পশ্চিম বাংলার এক তাজ্জব অবস্থা চলছে। একদিকে বিধ্বস্ত যুক্তফ্রন্টকে সঞ্জীবিত করবার জন্য নূতন নূতন ফর্মূলা নিয়ে একের পর এক সংশ্লিষ্ট দলগুলি দিনের পর দিন অন্তহীন আলোচনা করে চলেছেন, অপর দিকে প্রতিনিয়তই শরিকে শরিকে সংঘাত, হানাহানি, খুনোখুনির সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রীকে সরকারী তথ্যের গোপনীয়তার শপথ ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের শাসানি দিচ্ছেন, অপর দিকে উপমুখ্যমন্ত্রী গোপনীয় শপথের আড়ালে অসাধু সহকর্মীর অপকর্ম গোপনের অভিযোগ এনে তার দপ্তরের কাজে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে শাসাচ্ছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী থানার দারোগার বদলির হুকুম দিলে, মুখ্যমন্ত্রী সেই হুকুম বাতিল করছেন এবং তার পরই উপমুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারীর সার্কুলারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রটদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রশাসনিক কাজে অপর কোনো দপ্তরের হস্তক্ষেপ যেন উপেক্ষা করা হয়। অবস্থা চরমে ওঠে গত বিধান সভায় রাজ্যপালের বিতর্কের শেষ দিনের আলোচনায়। সেদিন মন্ত্রীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ চরমে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী সেই বিতর্কে যোগ দিয়ে

বলতে দ্বিধা করেন নি: এই সরকার 'অসভ্য', কারণ জেলাশাসক, এস্ পি, এস, ডি, ও. বি, ডি, ও দের ঘেরাও করে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, শরিকে শরিকে খুনোখুনি হয়েছে, কিষাণ কিষাণদের হত্যা করছে, লোককে হত্যা করে ইউনিয়ন দখল করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন "আমরা ফ্রন্টের সভায় বসে শান্তিবজায় রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সভার বাইরে এসেই নূতন নূতন হত্যার এবং সংঘর্ষের সংবাদ পাই। জনসাধারণের জন্ম ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, কিন্তু ফ্রন্ট তাদের লাঞ্ছনা ও পীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই আর্তনাদ সত্ত্বেও হত্যা, খুনোখুনি, সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্ম কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপে তিনি দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিচ্ছেন। ডিসেম্বর মাসে হিংসার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিত, ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষের মনে যে প্রতিরোধের মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে অত্যাচারীদের মনে সংশয় দেখা দিয়ে তাদের পেছু হটিয়ে দিয়েছিলেন, অত্যাচারীরা সেদিন আত্মরক্ষার ব্যূহরচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিধাগ্রস্ততা তাদের আবার দুঃসাহসী করে তুলেছে—মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর পত্র বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে উপমুখ্যমন্ত্রীর উদ্ধত উত্তর তারই পরিণতি।

কিন্তু এই পরিণতি আরও মারাত্মক রূপ নিয়ে পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক জীবনকে কি ভয়ঙ্করভাবে পর্যুদস্ত করে তুলেছে, পশ্চিম বাংলার জনজীবন সেই আতঙ্কে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাংলার জনজীবন চৌদ্দটি শরিকের স্বার্থ দ্বারা সীমিত মনে করলে, তার অশুভ প্রতিক্রিয়ার জন্ম এই চৌদ্দটি দলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যেও আশার কথা এই চৌদ্দটি শরিকের কোনো কোনো দল পশ্চিম বাংলার জনজীবনের বৃহত্তর স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের সঙ্গে সমীকরণের বিষময় পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিপর্যয় রোধের জন্ম উদ্যোগী হয়েছেন। বিপর্যয় যে কত ব্যাপক ও গভীর, শহরের মানুষের এবং প্রচারের পাদপীঠের আড়ালে সুদূর পল্লীজীবনে সন্ত্রস্ত, লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত নর-নারীর সর্বনাশেই এ-বিপর্যয় যে আজ সীমিত নয়, কলকাতার রাস্তায় দিনের কোলাহলের মধ্যে এবং রাত্রির অন্ধকার এবং আপেক্ষিক নৈস্তব্ধের মধ্যে পথচারীর জীবনে আকস্মিক দুর্যোগের বিবরণ সেই সংবাদই বিজ্ঞাপিত করেছে। এরই মধ্যে কলকাতার রাস্তায় নারীর লাঞ্ছনা ও অসম্মান, প্রশাসনিক ও সামাজিক জীবনে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা লেপন করে কলকাতার জনজীবনকে আরণ্যক ও পাশবিক স্তরে নামিয়ে এনেছে। গ্রামীনজীবনে যখন মানবিক মূল্যের, নারীর সম্ভ্রমের, চরম অবনতির সংবাদ শহরের মানুষকে চঞ্চল করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, শহরের মানুষ যখন সে-অসম্মানকে নিজের অসম্মান বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত, ভীত বোধ করেছে, সে-অবস্থায় তাদের শুভ-বিবেক শহরে সেই অসম্ভ্রমের পুনরাবৃত্তিতে কতটা সজাগ হবে, সাহসে বলীয়ান হয়ে এই অসম্ভ্রমের পরিবেশের মুখোমুখী দাঁড়াবে, সে-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে আজ যে অসম্ভ্রম রাজপথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আগামীকাল যে তারই ঢেউ গৃহস্থের দ্বারপ্রান্তে উত্তাল হয়ে উঠবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, তাদের নৈতিক ও মানসিক বলের অপমৃত্যু, জনজীবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনিক শঠতা, সামগ্রিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্ম সরকারী শরিকদের মধ্যে যারা প্রতিশ্রুত তাদের দৃঢ়তার অভাব এবং সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনে অক্ষমতা, নাগরিকদের আত্মরক্ষার জন্ম স্বাবলম্বের অনিবার্য পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছে। এই সঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীর অধিকারের দাবীতে শিল্প-ব্যবসায়-চাকুরীর ক্ষেত্রে দৈহিক পীড়ন ও লাঞ্ছনার সন্ত্রাস, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠিদের পশ্চিমবাংলা থেকে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান

অপসারণের কিম্বা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির দপ্তর, কারখানা একে একে বন্ধ করে দেবার সুযোগ দিয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সার্থক আয়োজন করে তুলেছে। আজ যারা জনজীবনে মানবিক মূল্য, গণতান্ত্রিক অধিকার, নারীর সম্ভ্রম ধুলায় লুণ্ঠিত করছেন এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পথ সুগম করে দেবার জন্য মালিকদের হাত দৃঢ়তর করছেন, বাংলা দেশকে সেই সামগ্রিক বিধ্বংসী শক্তি-সমাবেশের বিরুদ্ধে বাঁচবার দুর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। এ-সংগ্রাম জীবনের মূল্যবোধের সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রাম, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সংগ্রাম এবং সর্বোপরি জাতীয় স্বত্ত্বা নির্বিঘ্ন করার সংগ্রাম। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী এবং আর্থিক নিরাপত্তাকামীদের কঠোর ত্যাগ, দুঃখবরণ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ করে নেবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে। কংগ্রেস্ তাদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে, চৌদ্দ দলের শাসনের আড়ালে স্বৈরতন্ত্র ও একদলীয় শাসনের দুঃস্বপ্ন তাদের সেই সর্বনাশের পথে দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাই এই সর্বনাশের প্রতিরোধের সময় সমাগত।

মুখ্যমন্ত্রী এ-পথে অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে যাচ্ছেন বার বার। যদি তিনি অক্ষম হন, ব্যর্থতাবোধ তাকে ক্লিষ্ট করে থাকে, জনজীবনের লাঞ্ছনা ও বিপদের ঝুঁকি বৃদ্ধি করবার তাঁর কোনো অধিকার নেই। এই মারাত্মক প্রশাসনিক পরীক্ষা থেকে তার অবিলম্বে নিবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। আর যদি মুখ্যমন্ত্রী মানবিক মূল্যের, গণতান্ত্রিক অধিকারের, জাতীয় স্বত্ত্বা ও নারীর মর্যাদা নির্বিঘ্ন করবার দায়িত্ব নিয়ে স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধের প্রবল সংগ্রামের আহ্বান জানান, বাংলাদেশ অক্ষুব্ধোভয়ে তাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু দ্বিধাচিত্ত কালহরণ আর নয়। অবিলম্বে পথ বাছাই একটি অনিবার্য জাতীয় কর্তব্য।

পশ্চিম বঙ্গের বাজেট

পশ্চিম বঙ্গের বাজেট নিয়েও এক পশলা রাজনীতি হয়ে গেছে। ভোট-অন-একাউন্ট বাজেট হবে, না পুরো বাজেট উপস্থিত করা হবে—এ-নিয়ে মন্ত্রীসভায় প্রবল মত-বিরোধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পুরো বাজেট-ই পেশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পরিমাণ না জানতে পারায় ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভোট-অন-একাউন্ট বাজেট এনেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এবারকার প্রস্তাবও সেইবারকার ঘটনারই অনুরূপ ছিল। কিন্তু শরিকী সংঘাত, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে একটি নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে গিয়েছিল।

পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে ৪০.৫৭ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু এই ঘাটতি পূরণের কোনো উদ্যোগ নাই। ১৯৭০-৭১ সালে রাজস্ব খাতে ২৭৯.৩১ কোটি টাকা এবং রাজস্বের বাইরে ৪৭২.৭৪ কোটি টাকা, মোট ৭৫২.০৫ কোটি টাকা অনুমিত আয় দেখানো হয়েছে এবং ঐ খাতগুলিতে যথাক্রমে ২৮৫.৪২ এবং ৪৮২.১৪ মোট ৭৬৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। ফলে বাজেট ঘাটতি ১৫.৫০ কোটি টাকার সঙ্গে প্রারম্ভিক তহবিলের ২৫.০৬ কোটি টাকা ঘাটতি মিলিয়ে মোট ৪০.৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়িয়েছে। গত বছর ১লা এপ্রিল রাজকোষে দশকোটি টাকা মজুদ নিয়ে বছর সুরু হয়। বছরের শেষে সংশোধিত বাজেটে ৩৫.২ কোটি ঘাটতি দাঁড়ানোর ফলে ১৯৭০-৭১-এর প্রারম্ভিক তহবিলে ২৫ কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়িয়েছে। এটাও পুরো হিসাব নয় কারণ ১৯৬৯-৭০ এর বাজেটে ১৯৬৯-এর ১লা এপ্রিল যে ১০ কোটি টাকার প্রারম্ভিক তহবিল নিয়ে সুরু হয়েছিল, তার কারণ রাজ্য সরকার ২৮ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় ঋণ পরিশোধ স্থগিত রেখেছিলেন। এবারও কেন্দ্রীয় ঋণ ও সুদ পরিশোধের দায়িত্ব স্থগিত রাখার

ভিত্তিতেই বাজেট-বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দের আর একটি কারসাজি বাজেটের সময় কোনো কর ধার্য না করে পরবর্তীকালে করের বোঝা চাপানোর কায়দা। নতুন পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গের ৮০ কোটি টাকার করের সংস্থান করতে হবে। ইতিমধ্যে যে করের ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সে-বাবদ নতুন বছরে ৭·২ কোটি টাকা আদায় হবে। কিন্তু ৩ একর পর্যন্ত সকল জোতের উপর ভূমি-রাজস্ব মকুব করার ফলে রাজ্য পরিকল্পনার বিনিয়োগের জন্য ৭০ কোটি টাকার বেশী পাওয়া যাবে না।

এ-রাজ্যের চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ ৩২১·৫ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য ২২১ টাকা সমেত রাজ্যের অতিরিক্ত কর আদায় বাবদ ৭০ কোটি টাকা এবং ঋণ করে সংগ্রহ বাবদ ৩০·৫ কোটি টাকা মোট ৩২১·৫ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় নিয়েই গোল বেধেছে। রাজ্যসরকারের রাজস্ব আদায় এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত স্বীকৃত-ব্যয়ের ব্যবধান ন্যূনপক্ষে ৭৩ কোটি টাকা। এর উপর কর্মচারীদের বেতন সংশোধনের ফলে পাঁচ বছরে ৪৫ কোটি টাকার ব্যয় রয়েছে। সুতরাং যতদিন এই বিরাট ফাঁক পূরণের উদ্যোগ না হচ্ছে, রাজ্যসরকারের সংগৃহীত অতিরিক্ত কর পরিকল্পনা-বহির্ভূত এই ঘাটতি পূরণেই ক্ষয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় কর থেকে প্রাপ্ত টাকা এবং পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ করে অনুদান সত্ত্বেও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ঘাটতি মেটাবার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার না করলে পরিকল্পনার পরিমাণ ৩২১·৫ কোটি টাকার অনেক নীচে নেমে যাবে। এই বরাদ্দও তৃতীয় পরিকল্পনার চাইতে মাত্র ৭০ কোটি টাকা বেশী। অথচ এই কয়বছরে মূল্যবৃদ্ধির ফলে কার্যত চতুর্থ পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনার চাইতেও আয়তনে খর্বাকৃতি হবে। বাজেটের অপর একটি নৈরাশ্যের দিক হোলো সরকারের প্রধান সতেরটি শিল্প-ব্যবসায়ের উদ্যোগে বিরাট লোকসান। ১৯৬৯-৭০ সালে এই সংস্থাগুলির লোকসানের মাত্রা এক কোটি একানব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে এক কোটি তেষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার টাকা আর ১৯৭০-৭১ সালে অনুমিত লোকসান দুই কোটি চার লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা।

পশ্চিম বঙ্গের সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতির অবনতির জন্য কেবল কেন্দ্রকে দায়ী করে রাজনীতির মহড়া নেওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে পশ্চিম বঙ্গের দায়িত্ব স্খালন হবে না। পঞ্চম অর্থ কমিশন পশ্চিম বঙ্গের জন্য পাঁচ বছরে চতুর্থ কমিশনের মোট ১৯৭ কোটি মঞ্জুরীর তুলনায় ৩৬৯ কোটি টাকায় সুপারিশ করেও পশ্চিম বঙ্গের প্রয়োজন মেটাতে পারেন নি এবং অর্থসঙ্গতির পুনর্বিন্যাস করে, এই রাজ্যের আর্থিক দুর্গতি মেটাবার অনিবার্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য আর্থিক পরিস্থিতির দুর্গতির দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের। ব্যবসায়ী অফিস, কারখানা ইত্যাদিতে হিংস্রতার ফলে মালিকেরা সেগুলি বন্ধ করে দেবার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে, এই সরকারের এক বছরের আমলে, এই রাজ্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ এই কারণেই শতকরা ২৩·৪ কমে গেছে। এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জগুলিতে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৫৫ হাজার, গ্রামীন জীবনে ধানলুঠ, জবরদখল, সন্ত্রাসের ফলে সেখানকার অর্থনীতি বিধ্বস্ত, চাষীর ঘরে খোরাকের ধান-চাল, ক্ষেতের দিনমজুরের খোরাক, বীজধানের বীজ নাই। বিপন্ন, লুণ্ঠিত চাষীর চাষে অমনস্ক দেখা দিয়েছে, ফলে ফলন বৃদ্ধি সত্ত্বেও আগামী বৎসর ভয়ঙ্কর খাদ্য সঙ্কটের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। প্রশাসনিক অব্যাবস্থার দরুণ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থ অব্যয়িত থেকে এই সরকারের প্রগতিশীলতাকে যেমন পরিহাস করছে, তেমনি সাধারণ মানুষের দুর্গতির দিনগুলিকে কালো অক্ষরে নীরবে ঘোষণা

করছে। পশ্চিম বঙ্গের বাজেট পশ্চিম বঙ্গের অর্থনীতির পশ্চাদগমনের সঙ্কেতই নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও একটি সুতীব্র বিপদ-সঙ্কেত।

অজ্ঞতা না শঠতা

সম্প্রতি কলকাতায় ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভোটাধিক্যে সুভাষবাদকে মার্ক্সবাদের ভারতীয় সংস্করণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতঃপর এই দল মার্ক্সবাদ কথাটি ব্যবহার না করে 'সুভাষবাদ' কথাটি ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শবাদের বহিরঙ্গে সুভাষবাদের আবরণে মার্ক্সবাদ প্রচারিত হবে। দলের সংখ্যাগরিষ্ঠেরা এই মত পোষণ করেন। কোনো দলের আদর্শবাদ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের পরিণত ফল। তার অসঙ্গতিগুলি সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু, কোনো ইতিহাস-পুরুষের জীবনবোধকে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দিয়ে পরিবর্তন করা যায় না। সে ধরণের উদ্যোগ, হয় তাদের অজ্ঞতার পরিমাপক নয়তো রাজনৈতিক চাতুরী। ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে ১৯৫৮ সালে মতভেদ দেখা দেয় এবং মার্ক্সবাদ ও সুভাষবাদ এই দুই আদর্শনৈতিক ভিত্তিতে ফরোয়ার্ড ব্লক দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। তারপর সুভাষবাদী অংশ সমাজবাদী সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিকায় সুভাষবাদের ভিত্তিমূলকে সম্প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়। মার্ক্সবাদী অংশও কিছুকাল বাদে পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক নাম ধারণ করে এবং আর এক অংশ কেবলমাত্র ফরোয়ার্ড ব্লকরূপে পরিচিত হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক অংশেও মার্ক্সবাদীরা নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকলেও, তাদের দলকে মার্ক্সবাদী দলরূপে চিহ্নিত করবার উদ্যোগ থেকে তারা বিরত থাকেন। কারণ, ইতিমধ্যে দলের মধ্যে অ-মার্ক্সবাদীরাও দানা বেঁধে উঠে দলে শক্তি-সঞ্চার করেছে। অ-মার্ক্সবাদীরা যখন অনিবার্যভাবে সুভাষবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকতে তখন থেকেই দলের মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে সুভাষবাদী প্রত্যয়ে যে অ-মার্ক্সবাদীরা প্রত্যাবর্তন করেছেন তাদের সংঘাত যেধে ওঠে।

সুভাষবাদ বলতে সুভাষচন্দ্রের জীবনবোধকেই বোঝায়। মার্ক্সের কিম্বা অন্য কারো জীবনবোধ নিশ্চয়ই সুভাষচন্দ্রের জীবনবোধ নয়—যদি না এই দুই জীবনবোধের গভীরে মৌলিক আবেদন অভিন্ন হোতো। কিন্তু মার্ক্স ও সুভাষ-চন্দ্রের জীবনবোধের মৌলিক আবেদন যেখানে শুধু অভিন্ন নয়, যেখানে এঁদের জীবনবোধের মূল ভিত্তিতে প্রবল বৈপরীত্য রয়েছে, সেখানে সুভাষবাদ মার্ক্সবাদেরই রূপান্তর, এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি, হয় এই দুই জীবনবোধ সম্পর্কে পর্বত-প্রমাণ অজ্ঞতাপ্রসূত নয়তো দুরন্ত আদর্শগত শঠতার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কিম্বা সুভাষবাদের ক্রমবর্ধমান গতিবেগকে মার্ক্সবাদের বালুচরে নিঃশেষিত করবার ইশারায় মূঢ়তার সঙ্গে আত্মসমর্পণ।

মার্ক্সবাদের মূলে রয়েছে সৃষ্টির গভীরে বস্তুর অসপত্ন অধিকারের স্বীকৃতি, বিশ্ববিধানের কাঠামোতে বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন অগ্রপ্রতিষ্ঠা। এ-ছাড়া চৈতন্যের উৎস-সন্ধানে নিরেট বস্তুতে উত্তরণ মার্ক্সবাদী দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রতিষ্ঠাভূমির গোড়ার কথা। মার্ক্সবাদ ইতিহাস পরিক্রমা করতে গিয়ে বস্তুর ঐকিক নিয়ন্ত্রণে ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত হতে দেখেছেন। ইতিহাসের ক্রমবিকাশে বস্তু-নির্ভরতার আতিশয্য মার্ক্সবাদী জীবনদর্শনের রূপরেখায় যান্ত্রিকতার অমোঘ ছাপ রেখে গেছে, মার্ক্সের মননায় মানবিকতার আবেদন সত্ত্বেও। মার্ক্সবাদী যান্ত্রিকতার নিকট এই মানবিক প্রত্যয়ের পরাজয়ের স্বাক্ষর রয়ে গেছে মার্ক্সবাদের রাষ্ট্রগত ও সমাজগত প্রয়োগে।

কিন্তু সুভাষ-মানসের উপাদান ভিন্নতর। বয়স যখন মাত্র পনের সে-সময় বিবেকানন্দ তাঁর জীবনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পরিপূর্ণ সমর্পণের আদর্শের সন্ধান দিলেন। 'ত্যাগমন্ত্রে

দীক্ষা, মুক্তি সাধনের এবং মানব-কল্যাণের জন্য সর্বস্বপণের আবেদন, সুভাষচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে গেলো। বিবেকানন্দের কর্মযোগ সুভাষের জীবনের বনিয়াদ, তাঁর শক্তিবাদ সুভাষচন্দ্রের প্রেরণার উৎস। তাঁর সমন্বয়বাদ সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের ভিত্তি।

সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতীয় ইতিহাস-সচেতনতা, স্বদেশ ও স্বদেশবাসী সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি ত্যাগ ও দুঃখ ব্রতের মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথ অনুসন্ধানের ভারতীয় সংস্কার তাকে অপূর্ব ভারতীয়ত্ব দান করেছিলো। এই ভারতীয় জীবনবোধ থেকে তিনি বার বার বলেছেন: "ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে।..." তাঁর এই ভারতীয় জীবনবোধ থেকে বার বার উৎসারিৎ হয়েছে: নূতন ভারতবর্ষ পুরাতন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর গড়ে উঠবে। এই আদর্শবোধ থেকেই তিনি ১৯২৯ সাল থেকে বলছেন: এখানকার পরিবেশ ও ঐতিহ্যের উপাদান নিয়ে ভারতীয় সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করবে। আর: 'এই নূতন ভারতীয় সমাজতন্ত্র কার্লমার্ক্সের পুঁথিতে জন্ম নেয় নি, এর উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষেরই যুগাগত চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মধ্য থেকে'। এ-ছাড়া, সুভাষচন্দ্র মার্ক্সবাদকে তার 'ভারতীয় সংগ্রাম' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্জন করে সমন্বয়বাদের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় মানস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে য়ুরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনন্য-সাধারণ অভিজ্ঞতার পরও যে আদৌ কোনো পরিবর্তিত হয় নাই তার পরিচয় রয়েছে ১৯৪৪ সনের টোকিও বক্তৃতায়: "অবশ্যই আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভারতীয় পথে। সুতরাং আমরা যে কাঠামো শেষ পর্যন্ত রচনা করবো তা ভারতীয় জনজীবনের উপযোগী একটি ভারতীয় কাঠামো হবে।"

ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের কথা শুনলে যারা আতঙ্কগ্রস্ত হন, কিম্বা উপেক্ষার হাসি হাসেন, তারাই মার্ক্সবাদের আস্তরণ ছাড়া নিজেদের আদর্শনৈতিক প্রাগসর ভাবতে পারেন না। এই ভারতীয় ভাবনার বিচারে জগতের মূলশক্তি বস্তু বা জড়শক্তি নয়, তাদের মতে বিশ্ববিধানের পশ্চাতে সকল কর্মের অনুপ্রেরণার উৎস অন্তরালবর্তী চিৎশক্তি। সুভাষ তাই বলেছেন: "জগতের মূলশক্তি আত্মাশক্তি।..." অথবা: 'আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে।" ...সত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে সুভাষচন্দ্র তাই বলেছেন: "...এই যে আত্মা যাহা সত্য—তাহার স্বরূপটা কি?..... আমার নিকট প্রেমই সত্যের স্বরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেছে প্রেম এবং মানবজীবনের মূলনীতি।.....সকল অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই মত আমার কাছে সর্বাধিক সত্য বলিয়া বোধহয় এবং ইহার দ্বারা চরম সত্যে পৌছানো যায়।" সুভাষচন্দ্র জীবনবোধের এই গভীরতা নিয়ে একটি সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়ে পৌচেছেন। দৈহিক ও আত্মিকের, সমাজ ও ব্যক্তির, বস্তুর সঙ্গে মানসিক প্রমূল্যের, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের—এই বহুমুখী সমন্বয় সুভাষচন্দ্রের জীবনবোধের মূলতত্ত্ব? সুভাষবাদের অপর নাম সমন্বয়বাদ যাকে তিনি 'সাম্যবাদ' বলেছেন বা Doctrine of Synthesis.

তাই জীবনবোধের বিচারে যারা মার্ক্সের ভারতীয় সংস্করণরূপে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় দিয়ে মার্ক্সবাদ ও সুভাষবাদের সমীকরণে ব্যগ্র তাদের এই প্রচেষ্টা শুধু হীনমন্যতার এবং অগৌরবের নয়, তারা ইতিহাস-পুরুষ সুভাষচন্দ্রকে তার স্বকীয় ভূমিকা থেকে সুকৌশলে অপসারিত করে জাতীয়তার ভিত্তিমূলে প্রবল আঘাত হানতে চান।

কেন্দ্রীয় বাজেট

প্রধান মন্ত্রীর কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৯৭০-৭১ সালে নূতন ১৭০ কোটি টাকার ট্যাক্স ধার্য হবার পরও ২২৫ কোটি

টাকা ঘাটতি রয়েছে। এই ১৭০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রের প্রাপ্য হবে ১২৫ কোটি এবং রাজ্যগুলি পাবে ৪৫ কোটি। এই ১৭০ কোটি টাকার মধ্যে প্রত্যক্ষ কর থেকে আয় হবে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা এবং অপ্রত্যক্ষ সূত্র থেকে ১৩৫ কোটি টাকা। অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা ক্রেতাদের উপর অনিবার্য-ভাবে আরোপিত হয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হবে এবং ২২৫ কোটি টাকার ঘাটতিও ফাঁপাই মুদ্রায় মিটিয়ে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রবল প্রবণতা সৃষ্টি করবে। অথচ মূল্যস্তরের স্থিতি বাজেট-হিসাবের একটি অনিবার্য পূর্বসর্ত। এই পরিমাণ ফাঁপাই মুদ্রা প্রয়োগ প্রধান মন্ত্রীকে উদ্বিগ্ন এই কারণে করে নাই যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও যোগানের পরিস্থিতি বর্তমানে খুবই অনুকূল। কিন্তু উৎপাদনের হিসাবের গরমিল দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অপ্রত্যক্ষ কর যে সব ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাবে তাদের মধ্যে আছে সিগারেট, খোলা বাজারের চিনি, চা, খাদ্যসরী চিনি, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি। এ-ছাড়া ইনল্যাণ্ড খাম ও পোষ্টকার্ড বাদে টেলিফোন, ফোনোগ্রাম, টেলিগ্রাম, এবং ডাকঘরের অন্যান্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আয়কর মকুবের সীমানা ৪০০০ টাকা থেকে ৫০০০ হাজার টাকায় বাড়িয়ে দিয়ে স্বল্প আয়সম্পন্নদের ক্ষেত্রে করের বোঝা কমানো হয়েছে এবং করের ক্ষেত্রে বিবাহিত ও অবিবাহিতের প্রতি সমব্যবস্থা অবলম্বন করে একটি বৈষম্য দূর করা হয়েছে।

মধ্যবিত্ত ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্তদের ওপর যেমন অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি করে তাদের আর্থিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাতে পারে, তেমনি অপেক্ষাকৃত বিত্তবানদের ওপর করের মাত্রা বৃদ্ধি করে সামাজিক ন্যায়-বিচারের উদ্যোগ রয়েছে বাজেটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ২ লক্ষ টাকার ওপরে যাদের ব্যক্তিগত আয় তাদের উর্ধতম ক্ষেত্রে শতকরা ৯৩·৫ ভাগ কর দিতে হবে। এছাড়া সম্পত্তি কর, দান কর এর সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সহরে সম্পত্তির করও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাজেট যেমন স্বল্পবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের প্রতি নির্মম, তেমনি শিল্পপতিদের উপর দাক্ষিণ্যে চিহ্নিত। সে কারণে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীমহল এই বাজেটে খুশী শুধু নয়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে; তার কারণ হোলো করপোরেট সেকটরকে এই বাজেট রেহাই দিয়েছে, কোনো নূতন কর তাদের উপর আরোপিত হয় নাই। আর মূলধন বিনিয়োগ-কারীরা তো আহ্লাদে আটখানা; কারণ ৩০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের আয়—ডিভিডেণ্ট—কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

চা-ও পাটতন্তুর উপর রপ্তানি কর হ্রাস করে—চা-এর ক্ষেত্রে পুরোপুরি উঠিয়ে দিয়ে—রপ্তানি বাণিজ্যে এই দুইটি পণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সুগম করা হলেও, আভ্যন্তরীণ ক্রেতাদের তার মাসুল বহন করতে হবে। প্রতিরক্ষা বাজেট-এর পরিমাণ মাত্র শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, আনবিক শক্তি কমিশনের ব্যয় শতকর ২৭ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্ববর্গের ভাতার জন্য ৪·৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের আঘাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্তদের উপর বোঝা বৃদ্ধি পাবার যেমন আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি আগামী দিনের নাগরিকদের ওপর ঋণের বোঝা বৃদ্ধির ভয়ঙ্কর পরিণতিও আতঙ্ক সৃষ্টি করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ঋণ (Public Debt) ১৯৬৯-৭০ সালের ১৩,৩৭৭·৩৩ কোটি টাকা থেকে ১৯৭০-৭১ সালে ১৪,৪২২·৫৩ কোটিতে বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণের ক্রমউর্ধগতি আরও উদ্বেগের কারণ হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৮০০৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৫৯০ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে তার পরিমাণ দাড়াবে ৬,১৪০ কোটি টাকা এবং ১৯৭০-৭১ সালে তা হবে ৬,৬৫৯ ৩৭ কোটি টাকা; অর্থাৎ এক বছরে ৫০০ কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি পাবে।

এ ছাড়া সরকারের আরও দায় রয়েছে। স্বল্প সঞ্চয়,

(শেষাংশ ৭১৯ পৃঃ)

বিস্ফোরণ

কালীচরণ ঘোষ

যখন সংবাদপত্রে প্রচার, সভাসমিতিতে উৎসাহ দান, ঘরোয়া আলোচনায় ও ইংরেজকে মেরে তাড়ানোর কথা চলছিল, গুপ্ত সমিতি তখন অন্তরালে বেশ ভালভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। বলাবাহুল্য গোড়ার দিকে এর সংখ্যা ছিল প্রায় শূন্য, অর্থাৎ একটি বা দুটি। পিছন থেকে তারাই বাহিরের আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করতে থাকেন।

মার খেলে ফিরিয়ে মারতে হবে, প্রয়োজন বোধে হিংসাত্মক কার্য্যবিধি অবলম্বন করে উদ্ধত ইংরেজ বা বিদেশীর সাহায্যকারী কাকে কাকেও শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় এ পর্য্যন্ত মন তৈরী হয়েছে। বিরাট জনসংখ্যার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দলই এ পথে অগ্রগামী। চিরকাল সব দেশেই তাই হয়ে থাকে এবং বাঙ্গলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

সংগ্রামী প্রতিরোধ

বিদেশী নিয়োজিত পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রতিশোধ প্রবৃত্তি গজিয়ে উঠতে দেখা যায়। তখনও স্বাধীনতা লাভের কথা বড় করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত প্রতিশোধ নেবার একটা তীব্র বহ্নি-প্রকাশ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এ অবস্থা বেশীদিন চলে নি। একদিকে যেমন পুলিশের অত্যাচার বাড়তে থাকে, অন্যদিকে তাকে প্রতিরোধ করবার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। তখন কেউ মনে করে নি যে সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে ঘুষি, হয় ত বা দু এক গাছা লাঠি সড়কি ছোরা দিয়ে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব; অতএব কিছু কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

এ চিন্তাধারা রূপ গ্রহণের মুখে সব ব্যাপারই যে নেতাদের পূর্ণ মত অনুযায়ী হয়েছে, সে কথা বলা যায় না। অবস্থা পরম্পরা যেন আন্দোলনকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। তখন ঋজুপথ ছেড়ে বিপ্লব আপনার পথ বেছে নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

পথের বিচার

যখন ডাকাতিকে অর্থ সংগ্রহ এবং তদ্বারা গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করবার পথ বলে গৃহীত হ'লো প্রায় সেই সময়ই মনে হলো কিছু অবাঞ্ছিত লোকের শত্রুতা স্বাধীনতালাভের পথে বাধাস্বরূপ, আর তখনই শ্বেতকৃষ্ণ-বর্ণনির্বিচারে তাদের সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে হত্যা করতে পারলে লণ্ডনস্থিত কর্ত্তাদের টনক নড়বে, অনেকে প্রাণের ভয়ে চাকরি নিতে চাইবে না, একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ইংরেজ যথাশক্তি প্রতিরোধ করার পর শেষ পর্য্যন্ত মিটমাটের একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

কেবল হত্যা নয়। পরিবর্তে নিহত হবার, ফাঁসীতে জীবন দেবার, মৃত্যু অপেক্ষা ঘোরতর নির্যাতন সহ্য করবার জন্য বাঙ্গালীর মন তৈরী করার আহ্বান এসে গেল। অরবিন্দ বল্লেন যে অসাড় অনড় জাত বাসি মড়ার মত পড়ে আছে

একে জাগাতে গেলে প্রচুর রক্তপাত প্রয়োজন। প্রাণ দিতেও হবে, নিতেও হবে। অত্যাচার উৎপীড়ন যত নির্মম আকার ধারণ করবে, ততই মানুষের ইংরেজ শাসনের প্রতি মমতা ছুটবে, আপন শক্তিতে দাঁড়াবার চেষ্টা হবে। সুখ শান্তির মধ্যে ডুবে থাকলে দেশ উদ্ধার চেষ্টা কেবল-কল্পনায় পর্য্যবসিত হবে; "অত্যাচার উৎপীড়ন ত চাই। তা না হলে দাসত্বের শান্তিময় সুখ ভাঙব কি করে?"

সে অবস্থায় পৌঁছুতে গেলে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবার কথা। এখানে সেখানে এক আধটা গুপ্ত হত্যা করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে সময় লাগবে প্রচুর, সরকারী নির্য্যাতনে আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং গোড়া থেকেই নেতারা একটা বোঝাপড়ার জন্য তৈরী হবার কথা ভেবেছিলেন এবং তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিছু না হলে ভারতের ভৌগলিক অবস্থান বিষয়ে পর্য্যালোচনা দ্বারা অরবিন্দ বুঝেছিলেন স্থানে স্থানে গেরিলা যুদ্ধের বিশেষ সুযোগ আছে। তার সাহায্যে অত্যাচারী ইংরেজ রাজ-শক্তিকে এ দেশে বিপর্যস্ত করা সম্ভব হতে পা'রে।

বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদ

এ সকলের জন্য প্রস্তুতি খুব খানিকটা এগিয়ে যাবার পূর্ব্বেই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। অরবিন্দ বলেছেন "স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সরকার মহলে ভয়ানক চাঞ্চল্য ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, ফলে "দমননীতি শুরু হয় ভীষণ, স্কুল-কলেজের ছেলেদের জরিমানা করা, বের করে দেওয়া, জেলে পোরা, শাস্তি দেওয়া এমন কি প্রকাশ্যে বেতমারা ইত্যাদি অত্যাচার যখন বেড়ে উঠল, তখন বিপ্লবীরা স্থির করল এর প্রতিবিধান চাই অর্থাৎ বিপ্লববাদ আস্তে আস্তে সন্ত্রাসবাদের রূপ নিল। বোমা তৈরীর কাজ আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে, এখন দমননীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে বারীনের দল স্থির করল তখনকার গভর্ণর ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোমা ছুঁড়ে মারবে" (পুরোধা, জানুয়ারী ১৯৬৮ পৃঃ ২৪)।

আপন ছন্দে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের আত্মপ্রকাশ। এর ফলাফল যে কি সেটা সামান্য সংখ্যক লোক জেনে আর প্রায় সবই না-জেনে বেড়াজালে জড়িয়ে পড়লো। অরবিন্দ বলছেন সারা ভারত ব্যাপী যে "উত্তেজনা উদ্দীপনা" দেখা গেল "তোমরা তা কল্পনাই করতে পার না।" তিনি বলেছেন, "এ সব ক্ষুদে ডাকাতি, সাহেব মারা মোটেই আমার বিপ্লবের অঙ্গ বা অভিপ্রায় ছিল না।" কিন্তু তিনি তাতে বাধা দেন নি, কারণ "যখন কোনো আন্দোলন জন-মতের ইচ্ছার অনুকূল হয়, তখন তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।"

বারীন্দ্রকুমার আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী অবস্থায় ১৯০৮ মে ৪-ঠা স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন "আমরা কখোনই বিশ্বাস করি নি যে রাজনৈতিক (গুপ্ত) হত্যা দ্বারা স্বাধীনতা আসবে। তবে আমাদের বিশ্বাস জন্মালো যে জনসাধারণ এটা চাইছে। "We never believed that political murder will bring independence. We believed the people wanted it."

কিন্তু আসল লক্ষ্য জাতীয় অভ্যুত্থান—সামগ্রিক বিপ্লব। "We are thinking of a far-off revolution and wish to be ready for it." কেবল বিপ্লবের প্রচার দ্বারা দেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। মানুষের মধ্যে বিপদের সম্মুখীন হবার যত আধ্যাত্মিক শক্তি (সম্ভূত সাহস) সঞ্চয়ে শিক্ষা দিতে হবে, "We are convinced that a purely political propaganda would not do for the country and that people must be trained up spiritually to face danger" (ibid).

একদিকে যেমন কংগ্রেস তার আপন নিরুপদ্রব পথে চলতে লাগল, তেমনি বিপ্লবের গতি গোপন রাস্তায় দ্রুত

অগ্রসর হয়ে চলেছিল। সংশ্লিষ্ট সকলেই জানত ধরা পড়লে অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, তবুও ধীরে ধীরে এই বিপদসঙ্কুল পথে বাঙ্গালী ছেলেরা পা বাড়িয়ে আছে। মহারাষ্ট্র বিদ্যুতের চমকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ম্লান হয়ে পড়েছিল। বাঙ্গলার ছেলেরা যেন ছিন্ন সূত্র জোড়া দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হ'লো। জেলের ভয় অনেকটা ভেঙ্গে গেছে স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায়। যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্র দত্ত পথটা পরিষ্কার করে দিয়ে অনুগামী অনেকের যাত্রা সুগম করে ছিলেন। এখন যে যাত্রা সুরু হ'লো সেটার বৈচিত্র্য অনেক, বিপদ অনেক। নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বলে একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে। বিপ্লববাদের সঙ্গে বঙ্গবিভাগের সম্পর্ক "দাদা আর ভাই ;" 'স্বদেশী আন্দোলন' বিপ্লব প্রচেষ্টার পরে এসেছে এবং জনগণের মন বিক্ষুব্ধ করে "দাদার" কাজের সহায়ক হয়েছে। অরবিন্দ প্রারম্ভেই বলেছিলেন যে নিপীড়িত জন সংখ্যার এক বড় অংশ অশান্ত না হলে বিপ্লব কখনই ভিত গড়তে পারবে না। এ যেন বিধির বিধান ; বিপ্লব কাজের পরিচয় পেয়েও কার্জন সাহেব বাঙ্গলা বিভাগ করে কাজটা সহজ করে দিলেন।

ডাকাতি

প্রতিষ্ঠান রক্ষা, তার প্রসার ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। প্রথম দিকটায় নেতাদের মধ্যে স্থির হয়েছিল যে দেশের ধনীদের কাছ থেকে এবং নিজেদের দলের লোকের সাহায্যে কিছুটা অর্থ পাওয়া যেতে পারে। সেটা সম্ভব হয়নি কারণ ধনী মাত্রেই টাকা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে কেউ ছিল না ; তার ওপর ছিল গভর্ণমেণ্টের কোপ-দৃষ্টির ভয়। বিশেষ করে গভর্ণমেণ্টের তাবেদারি করে যে সুখ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা সেটা তখনই বন্ধ হবার কথা, উপরন্তু নির্য্যাতনের সম্ভাবনা। এটাও একটা কথা যে এভাবে যে পরিমাণ অর্থ আসতে পারে সেটা প্রায়ই সাহারার বুকে গণ্ডুষমাত্র জলছিটিয়ে, তার তৃষ্ণা মেটাবার প্রয়াস বলেই মনে হবার কথা। নিজেদের মধ্যে থেকে টাকা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি কারণ কর্মী বা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গতি নিতান্তই সীমিত; পাওয়া যাচ্ছে বা কটা টাকা ? সে অবস্থায় অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, না কি, আনন্দ মঠের নজির তুলে লুণ্ঠনের পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে নানা অসুবিধার কথা বড় করে ওঠে। প্রথম দিকেই চিন্তা, যাত্রা ঠিক রেখে ডাকাতি করা যায় কিনা, বাধ্য হয়েই উদ্দেশ্যের বাইরে এমন কিছু ঘটতে পারে যার শেষ ফল, পরিতাপ। সাধারণ লোকের সহানুভূতি হারাবার সম্ভাবনা আছে। আর আছে, মামলা মোকদ্দমার হাঙ্গামা, অর্থনাশ, দুশ্চিন্তা এবং সাহসী কর্মীদের দীর্ঘ কারাবাস। অনিচ্ছুক বা সহানুভূতিহীন অভিভাবকদের পক্ষে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্রয় নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং সকলে একবাক্যে ডাকাতির সমর্থন জানাতে পারেনি। কতকাংশের মিললেও সমস্ত কাজটা এমন কি সকল বিপ্লবীর সমর্থন পাওয়া যায়নি। সরকারী ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের ফলে লেখা হয় :

"The principle of raising money by dacoity has all along had many hot opponents in persons otherwise in full sympathy with political outrage. Still it was the part of the plan of campaign preached by the Yugantar and had more advocates than opponents in the revolutionary party." হেঁয়ালী পরিত্যাগ করলে বলা যায়, সরকারী তহবিল লুঠ করায় কারো আপত্তি ছিল না, উপরন্তু সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেবার সুযোগ হিসাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সরকারী না হলেও বিদেশী কোম্পানী এমন কি গভর্ণমেণ্ট-ঘেঁষা ধনীর ক্ষেত্রেও

এ নীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ধনী গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থ গ্রহণে আপত্তি ছিল বহু বিপ্লবীর। অবস্থার গতিকে সকলটাই উপেক্ষিত হয়েছে, হয়ত কতকটা ক্ষোভের সঙ্গে। সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের ইঙ্গিত ছিল "আনন্দমঠ" এর যুগ থেকে (১৮৮২); সুপ্ত ছিল ভাবটা, যুগান্তর পত্রিকা তাকে সাধারণ পাঠকের মধ্যে চালু করে দিয়েছে, সে পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

ডাকাতি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অন্য একটি কারণে। ছেলেরা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়বে বলে এসে জমায়েত হচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনের একতরকা কর্মপদ্ধতি তাদের সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তাদের অনেকেই চায় কোনো বিপজ্জনক কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিচয় রাখতে। ভবিষ্যতের বিপদসঙ্কুল কাজের উপযুক্ত করবার জন্য গোড়ার দিকে ছোটো খাটো ডাকাতিতে তাদের পাঠাতে হয়েছে। ক্রমে ব্যাপারটা একটু সংক্রামক হয়ে পড়ে। অনেক স্থলে স্থানীয় "নেতা" নিজ পসার প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরিপক্কবুদ্ধি যুবক নিয়ে গিয়েছেন। এ রকম বহুক্ষেত্রে ফল প্রতিকূলই হয়েছে।

বিপ্লবী আন্দোলনে ডাকাতি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছিল। রাজপুরুষরাও ঘটনা পরম্পরায় ক্রমে ত্রস্ত হয়ে পড়েন। বাঙলার ছোট লাট (William Duke) উইলিয়াম ডিউক ১৯১৩ ডিসেম্বরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে এই রাজনৈতিক ডাকাতির ভিতর দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে। অতি সতর্কতার সহিত স্থাপিত সুবিস্তৃত সংস্থার সঙ্কেত দিচ্ছে এবং ডাকাতদের বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে সফলতার প্রমাণও দিচ্ছে। পেশাদার ডাকাতরা সাধারণতঃ ভুল করে বসে এবং অল্প পরিমাণ টাকার জন্য দীর্ঘকারাবাস তারা ভয় করে। কিন্তু "স্বদেশী" ডাকাতরা অদ্ভুতভাবে তাদের লক্ষ্য স্থির করে। বহু টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং প্রায়ই তারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

ইংরেজিটা এই রূপ:

They (the dacoities) are important because of the spirit of violent opposition to all settled Government which they display, of the widespread and carefully prepared organisation of which they gave evidence and of the enterprise and success with which they are carried out. Ordinary dacoits usually make bad shots and risk long terms of imprisonment for the sake of a handfull of rupees, but the political variety have been wonderfully successful in spotting out likely subjects and have frequently netted large sums indeed." (Amrita Bazar Patrika, December 5, 1913)

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকাতিতে অনেক ক্ষেত্রে ভুলক্রমে কিছু কিছু অনাচার যে হয়েছে সেকথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তবু এক একটি ঘটনার পিছনে যে সতর্কতা পালিত হয়েছে, স্বার্থশূন্য হয়ে বিপদকে উপেক্ষা করতে হয়েছে সে বিষয়ের কিছু সংবাদ নিয়ে রেখে দেওয়া মন্দ নয়। বহু বিপ্লবী নেতা এবং এককালে ডাকাতির অংশভাগী লোকের মুখ থেকে বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত তথ্য থেকে একটি 'এ্যাকসন' বা ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

প্রস্তুতিপর্ব

কলকাতা বা অন্য শহরের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের ডাকাতি করবার তোড়জোড়ে অনেক পার্থক্য আছে; আর ডাকাতির সংখ্যা পূর্ব্ববঙ্গে অনেক বেশী। সেখানে নদী নালা দিয়ে যাতায়াত রক্ষা করতে হয়, সুতরাং ডাকাতির প্রস্তুতিপর্বে

নৌকা, কখনও কখনও স্টীমারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সুবিধা থাকলে রেল বা পায়ে হেঁটে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছান গেছে।

যে সকল নৌকা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল (লম্বা সরু এবং দ্রুতগামী) প্রচলিত নাম "এক মাল্লা ডিঙ্গী।" অপর শ্রেণীর জলযানের নাম ছিল "ঘাসী" নৌকা এবং এর সংখ্যাও ছিল অনেক।

সাধারণতঃ যে সকল বিত্তশালী লোক জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য ত করেনইনি, উপরন্তু গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচরের কাজ করতেন তাঁরাই ছিলেন প্রথম লক্ষ্য। তা ছাড়া উৎকট সুদখোর, অধমর্ণের প্রতি অত্যাচারের বদনামধারী, পরস্বাপহারী, স্বার্থপর, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা বিপ্লবীর নিকট অন্য কারণে "অপরাধী" প্রধানতঃ তাদের বাড়ী লুঠ হয়েছে। বহুক্ষেত্রে বিশেষতঃ মধ্যবিত্তঘরের ডাকাতিতে গৃহস্বামীকে বলা হয়েছে যে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তাঁর সঞ্চিত উদ্বৃত্ত অর্থ ঋণ স্বরূপ গৃহীত হচ্ছে ; দেশ স্বাধীন হলে সে ঋণ পরিশোধ করা হবে। বলা বাহুল্য কার্য্যক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

কোনো একটি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হলে গ্রামবাসীদের সংখ্যা, শিক্ষা, অর্থসঙ্গতি, উপজীবিকার ক্ষেত্র প্রভৃতি তথ্য সংগৃহীত হ'তো। কোন্ দিক থেকে বিপদ আসতে পারে, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সবল লোক বাধা দিতে আসতে পারে কি না, পোষ্ট টেলিগ্রাফ অফিস, হাট বাজার স্কুল প্রভৃতির দূরত্ব, থানার অবস্থান প্রভৃতি সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ লওয়া ছিল ডাকাতির জন্য প্রস্তুতির সর্ব প্রথম পর্য্যায়।

কার্য্যোদ্ধারের পর পলায়নের পথের সন্ধান একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। পথে নিরাপদ গোপন আশ্রয় স্থল, জল রেলপথের দূরত্ব কত, নৌকা প্রভৃতি কোনো যান নিকটেই পাবার সম্ভাবনা প্রভৃতি অনুসন্ধান হলো পরের পর্য্যায়।

সবিস্তারে সংবাদ সংগ্রহের পর শেষ অধ্যায় উপস্থিত। চৌদিকে ঘুরে ফিরে বাড়ীর ঘর দালান জানালা দরজার একটি সুস্পষ্ট ধারণা করার প্রয়োজন। অনেক সময় আক্রান্ত বাড়ীর যুবক একার্যে সহায়তা করেছে। উপধায় অবস্থিত কাজটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ; অভিজ্ঞ চতুর লোক ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়ার কথা নয়। তার জন্যে নানা অছিলার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কখনও কখনও নিকটস্থ আত্মীয় বন্ধু-বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ, নিকটেই দোকান খোলা, ক্লান্ত পথিক-রূপে জল বা অন্ন গ্রহণ উপলক্ষে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার একটি ধারণা করে নেওয়ার সুযোগ অবশ্য প্রয়োজন।

এইবার কর্ম্মী নির্ব্বাচনের পালা। স্থানীয় লোক সঙ্গী হ'লে কাজের সবিশেষ সুবিধা। তার সঙ্গে আগ্রহশীলতা ও সাহস এই দুই গুণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য রাখা হ'য়েছে কাছাকাছি কোনো সহানুভূতি সম্পন্ন বাড়ীর দিকে। তাহলে পূর্ব্ব হ'তেই সেখানে অস্ত্র-শস্ত্রাদি, যেমন হাতুড়ি, ছেনি, ডাণ্ডা আক্রমণ ও প্রতিরোধের অস্ত্র প্রভৃতি জমা রেখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। হয়ত ডাকাতদল সেখানে এসে জমায়েত হয়ে এক সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে। কাজ সেরে ফেরবার পথে আশ্রয় স্থল হ'তে নানা রূপ সাহায্য পাওয়ার সুবিধা খুব। আরও প্রয়োজন বোধ হয়েছে দূর পাল্লার, হয়ত অন্তর্জেলার, লোককে সাময়িকভাবে রাখার জন্য। এটা সম্ভব হলে ভারি যন্ত্রপাতি, টাকার অংশ কিছুটা রেখে হাল্কা হয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

যত সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা হলো, ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। সুপক্ষে দুর্ভাগ্যক্রমে ছোট বড় সংঘর্ষ হয়েছে ; আক্রমণকারী ধরা পড়েছে, গ্রামবাসীর হাতে নিগৃহীত নিহত হয়েছে। তারপর ছিল বিচারে দীর্ঘ কারাবাস, দীপান্তর ও ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ বলিদান।

তাহলেও বলতে হবে একবারে শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত

ডাকাতি পেয়েছিল বিপ্লবীদের কর্ম্মতালিকায় একটা প্রধান অংশ। যতদূর সম্ভব বড় ঘটনাগুলির অসম্পূর্ণ হলেও একটা তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। আক্রমণ দ্বারা বিদেশী রাজপুরুষ, বেতনভুক দেশীয় রাজকর্মচারীর উপরে হামলা ও হত্যা উচ্চ-পর্য্যায়ের ঘটনা। তার পরিচয় দিতে না পারলে বাঙলার বৈপ্লবিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বাঙলার বৈপ্লবিক ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে কিছুটা চলবার আগে মহারাষ্ট্রের হিংসাত্মক আক্রমণ একটিই হয়েছে এবং অভাবনীয়রূপে সফলতার সঙ্গে। বাঙলা তাই থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। তিলকের সঙ্গে অরবিন্দর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দ বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা মহারাষ্ট্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

বাঙলার কথা লেখবার পূর্বে মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ "বিস্ফোরণ" অধ্যায়ের নান্দীরূপে লিখিত হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে বিস্ফোরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। স্তূপীকৃত বারুদে পুণার প্লেগ-রূপ অগ্নি কণা যোগ হয়ে অভাবনীয় এক কাণ্ড ঘটে গেল।

দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেও সকলেই 'হরি' চাপেকর, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। দামোদর ১৮৯৫ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করার কাজে কিছুটা সফল হয়েছিলেন। তাঁর ভাই এবং নিজ সঙ্গী যুবকদের মধ্যে দেশের আগামী সংগ্রামের জন্যে চরিত্র ও স্বাস্থ্য গঠন, সংগ্রামী মনোবৃত্তির উন্মেষের জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই রকম একটি দল সৃষ্টি তাঁর সফল সাধনা। গণপতি ও শিবাজী উৎসব তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছে; সবটাই যেন ছাইচাপা আগুন। এমন সময় ১৮৯৬ ডিসেম্বরে পুণায় প্লেগের আবির্ভাব। লোক মরছে অজস্র; দলে দলে লোক উপদ্রুত অঞ্চল ছেড়ে পালাচ্ছে। বে-সরকারী প্রচেষ্টা রোগ প্রসার রোধে অসমর্থ।

১৮৯৭ ফেব্রুয়ারী ৪ঠা সংক্রামক ব্যাধি নিরোধক আইন (Epidemic Diseases Act) পাশ হলো আর তার বিধি-বিধান প্রয়োগের জন্য নিযুক্ত হলেন র‍্যাণ্ড নামে এক জবরদস্ত সাহেব। তাঁর কর্মজীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস ছিল অবিবেকিতা, ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুর আচরণ।

উত্যক্ত, বিপন্ন, বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লো পুণাবাসী। রোগ ও মৃত্যু অপেক্ষা র‍্যাণ্ডে'র রোগ নিবারণ ব্যবস্থার 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়তে লাগলো বিপন্ন নরনারী। রোগগ্রস্ত লোকের সন্ধানে গৃহস্থের বাড়ী ঢুকে সব তছনছ করতে লাগলো? দক্ষযজ্ঞনাশের ভূত-প্রেত-দানব-দৈত্যের মত। পাকশালা, দেবতার ঘর কিছুই বাদ পড়লো না তাদের অত্যাচার থেকে। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের দেহ পরীক্ষা ব্যবস্থায় শালীনতা লজ্জার নিজেই ঘটনাস্থল পরিত্যাগ করে অদৃশ্য হলো। প্রকাশ্য সদর রাস্তায় দিন দুপুরে নারী ও পুরুষদের সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের পরিহিত বস্ত্র এমনভাবে সরিয়ে ধরে রাখার আদেশ দেওয়া হলো যাতে গলা, বগল, কুঁচকি, অর্থাৎ রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রমণের গ্রন্থিগুলি অনাবৃত থাকে। স্ত্রীলোকদের আদেশ হ'লো উত্তমাঙ্গের কোর্ত্তা সরিয়ে দেবে এবং নিম্নাঙ্গের ঘাঘরা দুহাতে এমন উঁচু করে ধরে থাকবে যাতে পরীক্ষনীয় স্থানগুলি উন্মুক্ত থাকে; তা না হলে রোগ পরীক্ষকদের অযথা সময় নষ্ট হবে। হাঁসপাতালের দুরবস্থা অবর্ণনীয়।

প্রতিবাদে দেশ গর্জ্জে উঠলো। আবেদন, নিবেদন, পত্রিকায় প্রচার, সভাসমিতিতে আস্ফালন সবই বিফল। তখন চাপেকরদের সমিতিতে র‍্যাণ্ডকে ইহজগত থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮৯৭ জুন ২২-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বছর সাম্রাজ্য পরিচালনার পূর্ত্তি। সারাবিশ্বেও বলা চলে উৎসবের ধুম লেগেছে। র‍্যাণ্ডের পদাধিকারী কর্মচারী অবশ্যই তাতে যোগদান করবে। চাপেকর সমিতি ঐদিনই তাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা স্থির করলো। ইতিমধ্যে

তাঁরা র‍্যাণ্ডকে নিঃসন্দেহে চিনে নেবার সমস্ত সতর্কতা গ্রহণ করেছেন।

সন্ধ্যা থেকেই তোড়জোড় চলছে কিন্তু তাক্ মাফিক র‍্যাণ্ডকে ধরা যাচ্ছে না। দামোদর, বালকৃষ্ণ ও তাঁদের বন্ধু মহাদেব বিনায়ক রাণাডের আর স্বস্তি নেই; শিকারের লোভে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত ঘুরছেন। রাত্রি ১১-৩০ মিনিটের সময় র‍্যাণ্ড ঘোড়ার গাড়ী করে গভর্ণমেণ্ট হাউসের ফটক পার হয়ে পড়লেন রাস্তায়; পিছনেই আর একটা গাড়ীতে লেঃ আয়ার্স্ট আসছিলেন সপত্নীক।

লক্ষ্য স্থিরই ছিল। র‍্যাণ্ডের গাড়ীর পিছনে উঠে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলভার হ'তে গুলি ছোড়েন দামোদর এবং র‍্যাণ্ড গুরুতর রূপে আহত হয়ে গাড়ীর মধ্যেই লুটিয়ে পড়েন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে রানাডের গুলিবিদ্ধ হয়ে আয়ার্স্ট গাড়ীর মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

র‍্যাণ্ড কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জুলাই ৩-রা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নানা অবস্থার মধ্যে আসামীরা গ্রেপ্তার হন; ক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেবকে এর মধ্যে টেনে জড়িয়ে ফেলা হয়। বিচারে সকলেরই ফাঁসীর হুকুম হয়। এক মায়ের তিনটি সন্তান দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। দামোদরকে য়েরোয়াদা সেণ্ট্রাল জেলে ১৮৯৮ এপ্রিল ১৮-ই, বাসুদেওকে মে ৮-ই (১৮৯৮) রানাডেকে মে ১০-ই ও বালকৃষ্ণকে মে ১২-ই বলি দেওয়া হয় সেই জেলেই। ভারতের প্রথম উদ্যোগের সফল পরিসমাপ্তি এই ভাবে ঘটেছিল।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৭·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃ ১৫ কলেজ স্কোয়ার ঃ কলিকাতা—১২

জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী]

(৮নং রুল দ্রষ্টব্য)

১।	যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার	ঠিকানা : ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।
২।	প্রকাশের কাল :	মাসিক
৩।	মুদ্রাকরের নাম, জাতি,	কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,
		ঠিকানা : ১০।৬৯এ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩
৪।	প্রকাশকের নাম, জাতি,	কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,
		ঠিকানা : ১০।৬৯এ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩৩
৫।	সম্পাদকের নাম, জাতি,	লীলা রায়, ভারতীয়,
		ঠিকানা : ১৫১এ।৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড কলিকাতা-৪৭
৬।	স্বত্বাধিকারীর নাম	লীলা রায়,
		ঠিকানা : ২৫১এ।৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড কলিকাতা-৪৭

আমি, কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। স্বাঃ

কিরণচন্দ্র মিত্র

প্রকাশক

২।৩।৭০

অহিংসা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভাবনা

জে. বি. এস. হলডেন

অনুবাদক : পথচারী

ধাত-প্রকৃতিতে ও শিক্ষাদীক্ষায় আমি সহিংস মানুষ। পিতৃ-ধারায় আমাদের পরিবারকে ক্ষত্রিয় বলা যায়। ১২৫০-এর পূর্বে আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১২৫০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত আমরা একটা ক্ষুদ্র দুর্গের অধিকারী ছিলাম। দুর্গটা ছিল স্কটল্যাণ্ডের একটা গিরিবর্ত্মের মুখে। ঐ পথটা পাহাড় থেকে সমতল ভূমির দিকে চলে গেছে। আমাদের প্রধান কাজ ছিল পাহাড়ে লোকেরা চড়াও হলে তাদের ঠেকানো। তারা সমতল-বাসীদের গরুমোষের ওপর হানা দিত। কিন্তু ইংরেজ আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য একপুরুষে একবার হয়ত আমাদের দক্ষিণে যেতে হত। এ কাজ করতে গিয়ে আমার সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্তত দুজনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। রাজবংশে বিয়ের ফলে স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড যুক্ত হয়ে গেলেও এবং পাহাড়ে লোকেরা শান্ত হলেও, এই ধারা চলে আসছিল। আমি যখন ছোট ছিলাম বাবা আমাকে টেল্‌জ্‌ অব অ্যা গ্র্যাণ্ডফাদার (ঠাকুরদার গল্প) পড়ে শোনাতেন। ঐ গল্পগুলো হল স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশের সামরিক কীর্তি-কাহিনী। তিনি আমাকে সাহসিকতার শিক্ষাও দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো তিনি আমায় যুদ্ধে নিয়ে যেতেন না, নিয়ে যেতেন খনিতে। আমার মনে হয় আমাকে প্রথম যখন তিনি ভূগর্ভে খনিতে নিয়ে গেলেন তখন আমার বয়স মাত্র চার বছর। আর আমার বয়স যখন প্রায় বিশ বছর হবে তখন আমি তাঁর সঙ্গে এক খনিতে অনুসন্ধানে (exploration) যেতাম। কিছুদিন আগেই সেখানে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। আর বিষাক্ত গ্যাস, ছাদ পড়ে যাওয়া এবং বিস্ফোরণের বিপদও সেখানে ছিল। কাজেই ১৯১৫ সালে আমি যখন শত্রুর কামান থেকে গোলাবৃষ্টির মাঝে পড়লাম তখন আমার প্রথম ভাবনা হল বাবা এই গোলাবর্ষণ কতই না উপভোগ করতেন।

ভারতীয় মহাকাব্যের বীরপুরুষদের দোষ-গুণ আমি বেশ বুঝতে পারি এবং সহানুভূতির সঙ্গে তা অনুধাবন করি। গীতার দ্বিতীয় শব্দটি হল 'ধর্মক্ষেত্রে'। ১৯১৫ সালে আমি প্রথমবার পরিখার ভেতরে যাই। তখন আমার যে অনুভূতি হয়েছিল তার হুবহু বর্ণনা রয়েছে গীতার ঐ 'ধর্মক্ষেত্রে' শব্দটিতে। আমি বেশ জানতাম যে এই সমতল বৈচিত্র্যহীন মাঠে আমার মৃত্যু হতে পারে। আর মানব প্রমূল্যের যে বিরাট অপচয় ওখানে ঘটছে, তাও অবগত ছিলাম। তবুও ঐ অভিজ্ঞতা আমার অত্যন্ত উপভোগ্য মনে হয়েছিল, আমার কমরেডরা কিন্তু তেমনটা মনে করি নি। এক প্রবল ধর্মবোধ যেন আমাকে পোষণ করছিল। নানাপ্রকার নীচাশয়তার প্রতি তীব্র ঘৃণা (detestation) এবং রক্ষণোপায়হীনের প্রতি হিংসাচরণকে ঘৃণা করা য়ুরোপীয় ক্ষাত্রধর্মের অন্তর্গত। আর য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের অন্যতম পাপাচার দ্যূতাসক্তি। যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিভঙ্গি আমার দুর্বোধ্য নয়। ক্ষত্রিয়ের নিরাপদ বোধ করা কখনো উচিত নয়। তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে এবং প্রয়োজনে মুহূর্ত মধ্যে সে প্রাণ হারাতে পারে,

এজন্য তাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে—এই তার ধর্মের নির্দেশ। কাজেই বিত্তনাশের ঝুঁকিও তাকে নিতেই হবে। যুধিষ্ঠির যে তাঁর স্ত্রী ও ভাইদের পণ রেখেছিলেন তাতে আমার সহানুভূতি আরো কম, এ কথা আমি স্বীকার করি।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে কয়েকবারই আমি ব্যক্তিগত-ভাবে শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিলাম। একই ধরণের অস্ত্রশস্ত্র, পরিখা, মর্টার, রাইফেল নিয়েই আমাদের লড়তে হয়েছিল। আর প্রত্যেকের সাহায্য করছিল একটি দল। মহাকবিরা এরকম যুদ্ধের গানই করেছেন। সৌভাগ্যবশে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল।

এবার আমাদের দুটি তথ্যের বিচার করতে হবে। গান্ধী অহিংসার প্রকাণ্ড প্রবক্তা। গীতা তাঁর অতি প্রিয়। এই গীতা অর্জুনকে হিংসাচরণে প্রণোদিত করেছিল। আমার জীবিতকালে যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আধুনিক যুদ্ধের দুটি প্রধান রূপ। একরূপের বৈশিষ্ট্য: পারমানবিক বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা অরক্ষিত অসামরিক জনতার সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন। অন্যরূপ যুদ্ধ চলেছে আলজিরিয়া, মালয়, কেনিয়া, সাইপ্রাস ও অন্যান্য অঞ্চলে; এর বৈশিষ্ট্য হল ওঁৎ পেতে থাকা, স্বল্পায়ুধ পক্ষের ব্যক্তিগত হত্যা এবং অস্ত্রসজ্জার প্রবলতর পক্ষের বন্দিহত্যা ও সমগ্র জনতাকে বন্দীকরণ।

এক সাহস সঞ্চার ছাড়া আর কোনো ক্ষত্রিয়োচিত গুণই আধুনিক লড়াই উদ্দীপিত করে না। তবু আধুনিক জীবনে এই সব গুণেরই একান্ত প্রয়োজন; গান্ধীজি তাই বুঝেছিলেন। হিন্দু পুরাণে এ বিরোধ অবশ্য অন্তর্নিহিত হয়ে আছে। শুধু রাম ও কৃষ্ণই নয়, অহিংসার প্রখ্যাত প্রচারক বুদ্ধও ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর অন্য অবতার, জামদগ্ন্য পরশুরাম ঐ ক্ষত্রিয় জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য জীবন-পণ করেছিলেন। তবে ক্ষাত্র-ধর্মের সঙ্গে অহিংসার সামঞ্জস্য বিধান করব কী করে? গান্ধী এ প্রশ্নের একটি উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীর উত্তরের সঙ্গে মিল হয় এমন অন্যতর উত্তর আছে, তবে সে উত্তর ভিন্ন ক্ষেত্রে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠির দ্বন্দ্বই ছিল গান্ধীর সর্বক্ষণের চিন্তা (concerned); তিনি তাদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ নির্মূল করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

আরেক রকমের দ্বন্দ্ব আছে। ইফিসিয়ানদের কাছে সন্ত পল-এর চিঠির উদ্ধৃতি দিচ্ছি, গ্রীক ভাষা থেকে (স্মৃতির সাহায্যে) তর্জমাটা আমার:

"আমাদের দ্বন্দ্বটা রক্ত-মাংসের বিরুদ্ধে নয়; দ্বন্দ্বটা মূলনীতির বিরুদ্ধে, শক্তির বিরুদ্ধে, কলিযুগের লোকপালের বিরুদ্ধে, স্বর্গে পাপের আত্মিক উৎসের বিরুদ্ধে।" আমি তাঁর 'কস্‌মোক্রেটর' (cosmocrator) বা বিশ্বপাল শব্দটির তর্জমা করেছি 'লোকপাল'। যে-বাক্যাংশের তর্জমা করেছি 'কলিযুগ' তার আক্ষরিক মানে 'এ-যুগের অন্ধকার'। আমি মনে করি লোকপালের ধারনাটি সন্ত-পল-এর সময় বৌদ্ধ উৎস থেকে পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে; ভারতে ঐসব শক্তি প্রায়ই গৌণ দেবতারূপে পূজা পায়, যেমন কলেরা, বসন্ত। আমার বাবার আগ্রহ ছিল কারখানা ও খনিতে বায়ু চলাচল এবং অনুরূপ বিষয়ে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিস্ফোরণ নিবারণে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কয়লা খনির বিস্ফোরণে দেহে অক্ষত থেকেও যেসব লোক মারা গেল, তারা কেন মারা গেল তা অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তখন তিনি ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণের পর মৃত মানুষ ও ঘোড়াকে পরীক্ষা করে এই প্রত্যয় লাভ করলেন যে, কার্বন মনক্সাইড-এর বিষক্রিয়ার ফলে তাদের মৃত্যু ঘটেছে। তারপর তিনি ঐ গ্যাসের বিষ নিজের ওপর প্রয়োগ করলেন। অর্থাৎ যাবৎ অজ্ঞান না হয়ে পড়ছেন তাবৎ জ্ঞাত পরিমাণ বিষ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং এক সহকর্মী তাঁকে গ্যাস চেম্বার

থেকে টেনে বার করলেন। এমনি করে তিনি আবিষ্কার করলেন এই গ্যাসের নির্দিষ্ট পরিমাণ কতক্ষণে একটি লোককে কাবু করে। তিনি এটাও আবিষ্কার করেছিলেন যে, একটা ছোট পাখি মানুষের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি কাবু হয়ে পড়ে (আর অনেক তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠে)। কিন্তু যে পরীক্ষণ ব্যথা বা ভয় সৃষ্টি করে সে—পরীক্ষণের প্রতি তিনি বিমুখ ছিলেন (কার্বন মনক্সাইড বিষে ব্যথা বা ভয় কোনোটাই সৃষ্টি করে না)। নিজের ওপর অথবা অন্য যে-সব লোকের ব্যথা বা ভয়কে উপেক্ষা করেও পরীক্ষণে প্রবল আগ্রহ আছে তাদের ওপরই পরীক্ষা চালানো তিনি বেশী পছন্দ করতেন। তাপের ফল সম্বন্ধে পরীক্ষণকে বোধ হয় তপস্যা বলা যায়। ৩০০ ফারেনহাইট তাপাঙ্কের শুষ্ক বায়ুতে তিনি প্রাণ ধারণ করতে পারেন এটা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রায় এই তাপমাত্রায় তাঁর চুল ঝলসে যেতে থাকলে তিনি তখন চুল সরিয়ে নিতেন।

কিন্তু আমার মনে হয়, তপস্যারত সন্ন্যাসীর প্রণোদনা (motivation) তাঁর ছিল না। তিনি এমন একটা অবস্থা লাভ করেছিলেন যাতে ব্যথা সম্পর্কে তিনি অনেকটা উদাসীন হয়ে যেতেন। কিন্তু এ অবস্থা লাভ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই জ্ঞান লাভ করা যাতে অন্য লোকের প্রাণ রক্ষা পায়। সন্ন্যাসী স্বেচ্ছায় বেদনা স্বীকার করেন, তাঁর মনোভাব এরকম সন্ন্যাসীর চেয়ে বরং অনেকটা সু-সৈনিকের মতো ছিল—যে জয়লাভের জন্য জীবন বিপন্ন করবে এবং ক্ষত সহ্য করবে। সৈনিক স্বেচ্ছায় আহত হয় না; আমার বাবাও তাঁর কাজে বেদনাকে আহ্বান করতেন না। তবে যে ব্যথায় কোনো কোনো লোক কাতরায় এবং গোঙায় তিনি হাসিমুখে সে-রকম বেদনাকে সাদরে গ্রহণ করতেন। আমার মনে হয় তাঁর আত্মা বা বুদ্ধি অহংকারকে উপহাস করত—এই সূত্রাকার বিবৃতির (formulation) সঙ্গে হয়তো তাঁর মতৈক্য ছিল।

আমি তাঁকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি। নানা রকম বিষ বেশী পরিমাণেই পান করেছি বা নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছি—কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে-মাত্রায় মৃত্যু ঘটায় তার চেয়ে ঢের বেশী মাত্রায়ই গ্রহণ করেছি; আর আমার স্ত্রী সহ অন্যান্য মানব-স্বেচ্ছাব্রতীর ওপর অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়েছি। এই কারণে শিবের মন্দিরে না ঢুকতে দিলে আমি কিছু বিরক্ত বোধ করি, যে হেতু প্রখ্যাত কাহিনী অনুসারে, শিব অন্যান্য দেবতাকে বাঁচাবার জন্য নিজে বিষ পান করেছিলেন। শিবের যদি অস্তিত্ব থাকে, তবে লাখো মন্ত্র উচ্চারণের চেয়েও এ রকম কাজেই তাঁর বেশী প্রীতি লাভের সম্ভাবনা।

আমার বিশ্বাস এই পরীক্ষামূলক জীব-বিজ্ঞানের প্রতি এই অহিংস মনোভাব (approach) ফলদায়ক মনোভাব বটে। যাঁদের পরীক্ষা জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মাঝারি রকমের বা অ-তীব্র বেদনা প্রদান করে তাঁদের আমি নিন্দা করি না। কিন্তু আগে কিম্বা পরে নিজের ওপর যে-পরীক্ষা আমি করিনি তেমন পরীক্ষা কখনো কোনো প্রাণীর ওপরও চালাইনি। আমি মৃত জীবের শব ব্যবচ্ছেদ করেছি। কিন্তু এই নির্দেশও রেখে গিয়েছি যে, চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষার্থীরা যেন আমার শব-দেহেরও ব্যবচ্ছেদ করে। আর ভারতে আমার মৃত্যু হলে, আমি আশা করি একজন য়ুরোপবাসীর শব-ব্যবচ্ছেদ করবার অভিজ্ঞতা কোনো ভবিষ্যৎ ভারতীয় ডাক্তার লাভ করবেন—যা সচরাচর ঘটে না।

নিজের বা বন্ধুর ওপর পরীক্ষা চালানোর একটা বড়ো সুবিধা এই যে, প্রাণীদের ওপর পরীক্ষায় সচরাচর যত নিখুঁত হওয়া যায় ওতে তার চেয়ে বেশী নিখুঁত হওয়া সম্ভব। ধরুন, একটি প্রাণী যদি ব্যথা বা ভয় পায় তবে তার হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুততর চলবে এবং তার শ্বাসের হারও বৃদ্ধি পাবে। ফলে ওটার নাড়ীর বা শ্বাসের গতির হারও খুব নির্ভুলভাবে মাপা অসম্ভব হবে। কিন্তু নিজের ওপর বার কয়েক পরীক্ষা করলে

এই আস্থা নিয়ে প্রাণীর ওপরে পরীক্ষা চালানো যায় যে, এর ফলাফল মানুষের ওপর পরীক্ষার ফলাফলের মতোই নির্ভুল হবে।

১৯৫৪ সালে আমি ও আমার স্ত্রী যখন ভারতে ছিলাম তখন কই মাছের ওপর বার কয়েক এরকম পরীক্ষা করেছিলাম। প্রায় অক্সিজেন-হীন নোংরা জলে কইমাছ রাখলে ওগুলো জলের ওপরে ভেসে ওঠে এবং নিশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া টেনে নেয়। জলে দ্রবীভূত গ্যাসের ও তার ওপরকার বায়ুর উপাদান-মিশ্রণ পালটে আমরা নানাভাবে ওগুলোকে উত্যক্ত করেছিলাম। এমন কথা বলিনে যে মাছের তাতে আদৌ কষ্ট হয় নি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করে বলা যায় ওগুলোও কয়েক মিনিট প্রবল মাথাধরায় ভুগেছিল। কিন্তু মাছগুলোর গুরুতর ক্ষতি এতে হয় নি, কারণ তিনটেই বেঁচে আছে এবং এখন লণ্ডনে ভালোই আছে।

আমি ব্যক্তি হিসেবে আদৌ সাধুসন্ত নই। আমি প্রাণিহত্যা করেছি, মাংস খেয়েছি; অবশ্য খুব বেশী খাইনি। এসব লেখার পর থেকে মাংস বা মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। জীবের প্রতি আমার মনোভাব অনেকটা যুধিষ্ঠিরের মতো। তিনি অনেক মৃগ বধ ও আহার করেছিলেন। কিন্তু মহা-প্রস্থানে যে কুকুরটি তাঁর সঙ্গী হয়েছিল তাকে ছেড়ে স্বর্গে যাবার কথা বললে তিনি হয়ত সবিস্ময়ে উপলব্ধি করেছিলেন, অমন কাজ ক্ষত্রিয় হয়ে তিনি করতে পারেন না। আমি বা আমার স্ত্রীও তেমনি যে-কইমাছটিকে দুমাস নজরে রেখেছিলাম তাকে মেরে খাবার জন্য অন্যের হাতে তুলে দিতে পারিনি।

আমি এ কথাই জোর দিয়ে বলতে চাই যে, প্রাণীর প্রতি এই মনোভাব ভারতীয় প্রাণি-বিজ্ঞানীদের অনুমোদন লাভ করবে। দুর্ভাগ্যবশত এ-মনোভাব বেশ বিরল। আমি কিন্তু মনে করি এটাই নিয়ম হওয়া উচিত। কিন্তু আমার পরিচিত ভারতীয় প্রাণি-বিজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি এর কাছাকাছি এসেছেন বলে মনে হয়, তিনি হলেন একজন মুসলমান—আপনাদের শ্রেষ্ঠ পক্ষিবিজ্ঞানী শ্রীসলিম আলী। একথা স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত যে কখনো-কখনো গুলি করে পাখি তিনি মেরেছেন, কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায় ওদের নিরীক্ষাই (study) তিনি ঢের বেশী পছন্দ করেন।

খোলাখুলিভাবে এই মনোভাবকে আমি হিন্দু প্রাণি-বিজ্ঞানীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করি। ভারতে অহিংসভাবে প্রাণিতত্ত্ব পর্যালোচনার বিরাট সুযোগ রয়েছে; আর এর চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এজন্য জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। কী করা যেতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, অনুমতি করুন। ডিম্বাবস্থা থেকে আপনাদের গায়ক পাখিকে যদি মানুষে লালন করে তবে ওরা কি গান গায়? অথবা, মানুষ যেমন করে ভাষা শেখে তেমনি করে ওদের কি গান গাওয়া শিখতে হয়? য়ুরোপে ও উত্তর আমেরিকার কোনো কোনো পাখির গান গাইতে শিখতে হয় বলেই আমরা জানি; অন্য পাখিরা আবার না শেখালেও দিব্যি গান গেয়ে থাকে—যেমন হিন্দুপুরাণের কোনো কোনো চরিত্র বেদজ্ঞান নিয়েই জন্মেছিলেন। শিখতে হলে কোনো পাখী বাপের কাছেই গান শেখে। আমাদের দেশের অর্থাৎ ইংলণ্ডের রবিন পাখি ডিমে তা দেবার ও নবজাত শাবকদের খাওয়ানোর কাজে যখন স্ত্রী-পাখিকে সাহায্য করে তখন গান প্রায় করেই না। কিন্তু শাবকরা উড়তে শেখামাত্র কয়েক সপ্তাহ ধরে সে আবার গান গাইতে থাকে। এটা পিতৃ-গরবের প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু এতেই তার ছেলেরা তার কাছে গান শেখার সুযোগ পায়। অন্যান্য পাখি প্রায় এক বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত শেখেনা, ঐ বয়সে অন্য পুং-পাখির কাছে তারা গান শেখে। এক বছর পর্যন্ত পাখির ছানাকে লালন-পালন করবার জন্য তারা উড়তে পারে এমন বড় খাঁচা বা পক্ষিশালা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন প্রচুর

নিষ্ঠার। নিষ্ঠার অভাব ভারতে নেই, তবে প্রাণি-বিজ্ঞানীদের চেয়ে অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকের মাঝেই তা বেশী দেখা যায়।

যদি কখনো ভারতে বসতি করি তবে প্রাণি-সুপ্রজনন নামে প্রাণি-বিদ্যার যে অহিংস শাখা আছে তারই চর্চা করব, আশা করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি হাঁস পালন করতে চাই, তবে তার জন্য ভারতের বহু অঞ্চলে আদর্শ অবস্থা রয়েছে; পশ্চিম বঙ্গের অনেকাংশ তার অন্তর্গত। দরকার হবে অবাঞ্ছিত সহবাস রোধ করার জন্য কিছু তারের জাল, আর হয়ত একটি দাড়িপাল্লা, মাপের ফিতে, রঙের চার্ট; এ ছাড়া আর কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু—ছোট পুকুর সমেত কিছু জমি, সর্বোপরি এমন জনকয়েক সহকারী যারা হাঁসের খুব যত্ন করবে। এ রকম কাজে জীব-বিজ্ঞানের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে, আর আপনাদের হাঁসের ডিমের ফলনও হয়ত এতে বাড়বে। সুপ্রজনন অবশ্য সম্পূর্ণ অহিংস নয়। আমার পরীক্ষাগারে মাছির চাষ আমরা করে থাকি—এমন জাতের মাছি যারা জখমী গাছের রস খেয়ে সাধারণত প্রাণ ধারণ করে। বাড়তি মাছিগুলোকে যদি লণ্ডন শহরে ছেড়ে দিই সে-গুলো মরে যাবে। কাজেই আমরা ওদের অসাড় করে দিয়ে অসাড় অবস্থা কাটিয়ে উঠবার আগেই ওদের তেলের মধ্যে ছেড়ে দিই। কীটের প্রতি হিন্দুদের অহিংস আচরণ আমি অভ্যাস করি না, কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করি। শেষ পর্যন্ত যে-কোনো ভাবেই হোক ওগুলো মরবেই, কিন্তু তাদের কষ্ট ভোগের প্রয়োজন নেই। কীটকে কষ্ট দিতে আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু ব্যথা না দিয়ে মেরে ফেলতে লজ্জা বোধ করিনে। জৈনদের সংস্কারে আঘাত না দিয়েও কীটের সুপ্রজনন চর্চা পুরোদস্তুর সম্ভব। কিন্তু এ-দ্বারা প্রাণীদের মুক্তি দেওয়া হয়; ওদের বেশীর ভাগই অনাহারে মারা যেত।

প্রাণীর প্রতি অহিংস আচরণের দায় যে মানুষের আছে গান্ধীজীর এ বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। আর গান্ধী-নীতি অনুসরণ করে ভারতে প্রাণি-বিজ্ঞানের গবেষণা কেন চলবে না তার কোনো যুক্তি নেই। অপর পক্ষে এ গবেষণা বেশীর ভাগই যে ঐ নীতিতেই চলা উচিত তার সুযুক্তি আছে। যে-পরীক্ষা নিজেদের ওপর করতে পারেন প্রাণীর ওপরে তা চালাতে ভারতীয় শারীরবৃত্ত-বিদ্‌রা যদি লজ্জা বোধ করতেন তবে আমার মতে ভারতীয় শারীরবৃত্ত-বিদ্‌রা আরো বেশী সফল হতেন। মশা-নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হল মশা না মেরে ডিম পাড়বার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা। আপনাদের যদি খুব বেশী গাই থাকে তবে এমন গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত যারা বাছুর হবার পর এক বছরের বেশী সময় দুধ দেবে—ইউরোপে কোনো কোনো জাতের গাই যেমন দিয়ে থাকে। তাতে গাইয়ের সংখ্যা কমবে এবং প্রত্যেকটি গাই বেশী করে ঘাস খেতে পারে। আপনাদের লাঙল চালানোর ব্যবস্থাটা যদি-ভবিষ্যতে যান্ত্রিক হয়ে যায় তবে আপনাদের কম-বলদের দরকার হবে। আমার স্ত্রীর একটি পুংমাছ আছে, তার ঔরসে শুধুই কন্যা জন্মেছে। পরীক্ষা করবার আগেই এটা আগাম বলা হয়েছিল। এ-রকম ষাড় উৎপাদন করাও একেবারে অসম্ভব নয়—যাদের থেকে গাই-গরুই পাওয়া যাবে। তবে একাজে সিদ্ধিলাভ করতে বহুজন্ম গবেষণা করতে হতে পারে।

কি-বছর সাপের কামড়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়। কিন্তু গোখরো সাপ অতি সুন্দর প্রাণীদের অন্যতম। এদের একটাকে মারতে হলে আমার খুবই দুঃখবোধ হয়। ভারতে গ্রামবাসীদের ধারে কাছেই সাপের বাস। বসন্তের আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের টীকা দিয়ে রক্ষা করা যায়। তেমনি সম্ভব বিষাক্ত সাপের হাত থেকে তাদের বাঁচানো। কিন্তু নিরাপদে ও ব্যাপকভাবে একাজ করবার পদ্ধতি আজও

উদ্ভাবিত হয় নি। এটা ভারতীয় অহিংস জীববিজ্ঞানীদেরই কাজ। এ পন্থা আবিষ্কারের পূর্বে তাঁদের দু তিনজনকে মৃত্যু বরণ করতে হতে পারে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এ মৃত্যু বৃথা হবে না। পরে হয়ত এমন গোখরোর উৎপাদন সম্ভব হবে যার বিষে মানুষ মরবে না, অথবা গোখরোর কামড়ে মানুষের কোনো ক্ষতিই হবে না। ইতিমধ্যে আমি চাই—এমন একজনও জীব বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যিনি নিজেকে সাপের বিষ থেকে নিরাপদ করেছেন এবং টেলিফোনে ডাকলে সাড়া দিতে তৈরি আছেন এবং কোনো বাড়ি থেকে না মেরে অবাঞ্ছিত গোখরোকে দূর করতে প্রস্তুত আছেন।

অনেক য়ুরোপবাসীর কাছে এরূপ ধারণা নিশ্চয়ই বোকামি বলে মনে হবে। হিন্দুদের কাছেও যদি তাই মনে হয়, তবে বুঝতে হবে আধুনিক হিন্দুধর্মেও কিছু গুরুতর গলদ ঢুকেছে। আমার মতে, কোনো কোনো বিষয়ে গুরুতর গলদ এ ধর্মে আছেই। বিশেষ করে আপনাদের ধর্মশাস্ত্রে ও আর্টে যে সর্বজীবে প্রেমের অভিব্যক্তি আছে, তার স্থান আনুষ্ঠানিক নিষেধ পরম্পরা অধিকার করেছে। গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের প্রতি অহিংসাচরণ কার্যকর হতে হলে, সাহস ও বুদ্ধির প্রয়োজন। তাঁর এদুটি গুণ প্রচুর ছিল। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি জীবের প্রতি মানব-প্রেম নির্ভর এবং বহু ক্ষেত্রে মানুষের স্বার্থে জীব-প্রেম-ভিত্তিক করতে হয়, তবে সাহস ও বিচার-বুদ্ধির দরকার।

রাজনীতিকদের এ-প্রবন্ধ নাও পছন্দ হতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন, এজন্য উত্তমকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র থেকে অ-প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরিয়ে নিতে হয়। ও-কথায় আমার সায় নেই। আমার অভিজ্ঞতায় মানুষের প্রতি দয়া ও জীবে দয়া সাধারণত একসঙ্গে চলে। প্রাণীর দুঃখকে যাঁরা উপেক্ষা করেন তাঁদের পক্ষে মানুষের দুঃখকে উপেক্ষা করা আরো সহজ। আর এর বিপরীত ব্যাপারও তেমনি সহজ। আমার মনে হয়, যে-সব ভারতবাসীর প্রাণীর প্রতি দরদ আছে তাঁরা প্রায়ই হতবুদ্ধি বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, কারণ তাঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না কী করে এই দরদকে কাজে ফলাতে হবে। আমি কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছি, আর সাহসে ভর করে এমন আশাও পোষণ করি যে, তার কয়েকটি গৃহীত হবে। ভারত বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বহু দান করেছে। সম্ভবত, অহিংসার আদর্শই তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দান হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যদি দু'য়ের মিলন ঘটানো যায়, তবে এই মিলন প্রসূত ফল মানবজাতিকে নতুন স্তরে উন্নীত করতে পারে। *

---

* জে. বি. এস হলডেন-এর লেখা Some Reflections on Non-violence' প্রবন্ধের অনুবাদ। অহিংসাচরণ যদি সদর্থক হতে হয়, যদি সর্বক্ষেত্রে জীবের প্রতি

আর এখন
ছেলে নয়

তিনের পরে
কখনও নয়

davp 69/470

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

'...আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত এবং স্কুল কলেজে সুভাষের মহান জীবন জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত।'

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু

...'সুভাষচন্দ্র' প্রথম খণ্ড পাঠের ফলশ্রুতি কেবল সমুদ্র স্নানের চরিতার্থতার সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। সমুদ্র সন্তরণ নিছক শারীরিক ব্যায়াম নয়, মানসিক সাহস ও বীর্যেরও উদ্দীপক। পবিত্রকুমারের সাধনার মধ্যে যে-কোনো পাঠক যুগপৎ সে ব্যায়াম ও বীর্যে নিষ্ণাত হতে পারার সজীবতাটুকু সংগ্রহ করতে পারবেন'—

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

'... এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।' —যুগান্তর

...'বিস্মিত হয়েছি লেখকের গভীর গবেষণায় আর অনুভূতির তীব্র মাধুর্যে, তাঁর ঐতিহাসিক সমীক্ষায় আর রাজনীতিক দূরাবগাহনে, পুলকিত হয়েছি তাঁর প্রসাদ-গুণসমৃদ্ধ ভাষার সাবলীল শ্রীমণ্ডিত ব্যবহারে, গভীর শ্রদ্ধার অকৃত্রিম আন্তরিকতায়।'

—যুগবাণী

দাম : নয় টাকা

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন : ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক। জয়শ্রী প্রকাশন : ২৫১-এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

সাবিত্রী

মূল রচনা ঃ পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে

অনুবাদক ঃ পিনাকীপ্রসাদ ধর

তেরো

অধ্যাপক যোশী (যাঁর কথা তোমাকে একবার লিখেছিলাম) গতকাল নির্মল ঘুরে আমাদের এখানে এসে পৌঁছেছেন। আমি তাঁকে তোমার ব্যাঙ্গালোরের ঠিকানা দিয়েছি। তুমি গুরুপদস্বামীর সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিও কিন্তু। তুমি অধ্যাপক গুরুপদস্বামীর ছাত্র শুনে উনি তোমার সঙ্গেও দেখা করতে খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

গতকালের চিঠিতে অভিযোগ করেছো যে আমি নিজের কথা বেশী লিখি না। কিন্তু আমার মনে হয় আমি মাঝে মাঝে শুধু নিজের কথাই বলতে থাকি, আর তখন তুমি আমাকে কি ভাবছো মনে করে কেমন অস্বস্তি লাগে।

আমার কথা কি লিখবো বলো? ঠিক এক্ষুণি আমি পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করছি। (তুমি ১৬ তারিখ 'তার' করবে কথা দিয়েছো)। তোমার মতো আমিও বি. এ,তে দর্শন পড়বো, কেননা দর্শন না পড়লে যথেষ্ট গম্ভীর আর চিন্তাশীল হওয়া যায় না। এই মুহূর্তে বীণা বাজানো প্রায় বন্ধ আছে। কিছুদিন আগে আমি নিয়ম করে বাজাতাম, আগামী শুক্রবার থেকে আবার আগের মতো বাজাতে শুরু করবো, প্রত্যেক সপ্তাহে আমি চিঠি লিখবো তোমাকে। প্রত্যেকদিন তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করবো।

এর পরের চিঠিতে কেবল আমার নিজের কথাই থাকবে।

চৌদ্দ

তুমি তাহলে আসছো শেষ পর্যন্ত! শুনে খুব আনন্দ হয়েছে আমার। এবার গতবারের মতো সবকিছু আগে থেকে ঠিক করে রাখবো না একবার শিক্ষা হয়ে গেছে তো।

তুমি কি টেনিস খেলো? যদি না খেলো তাহলে তোমাকে শেখাবার ব্যবস্থা করা হবে।

আজ সোমবার, আগামীকাল মঙ্গলবার, আর বুধবার হচ্ছে তারও পরের দিন।

পনেরো

এই দিন পনেরো কিভাবে উড়ে চলে গেল তা বুঝতেও পারি নি। তুমি এসে এক হিসেবে খুব ভালো করেছো। আমাকে খুব কাছ থেকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাগুলির সঠিক কোনো ভিত্তি আসলে নেই। সেই সঙ্গে আমার কোনো ভুল হলেও তুমি জানিয়ে দেবে।

তোমাকে এজ্‌ওয়ার্থের খুব ভালো লেগে গিয়েছে। ওঁর ইচ্ছে তুমি বিলেতে যাবার আগে অন্তত একবার চিঠি লিখবে। উনি তোমাকে কিছু নির্দেশ দেবেন।

আপ্পার সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গতা হতে দেখে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি। পুরো দু'দিন ধরে তোমরা দু'জন কি গল্প করেছিলে তা সময় পেলেই আমাকে লিখবে কিন্তু।

তোমার সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম তুমি ঠিক তাই, ওদের মতে কোনো মানুষেরই এত শান্ত হওয়া উচিত নয়···কিন্তু তাহলেও এই শান্ত প্রচ্ছদ তোমাকে দারুণ মানিয়ে গিয়েছিল।

ষোলো

দু'একদিনের মধ্যেই বৃষ্টি আসবে। আমি পরীক্ষার ফলের জন্ত অপেক্ষা করছি। প্রথম হবার আশা আমার নেই কাজেই বলা যেতে পারে যে ফল একরকম বের হয়েই গেছে। যাই হোক্ আমাকে কথামত 'তার' কোরো কিন্তু।

কখনো কখনো মনে হয় আমি তোমার মন একটুও বুঝতে পারি নি। তোমার চিঠি বার বার পড়ি আর প্রত্যেকবারই একটা নতুন অর্থ খুঁজে পাই। সেদিন তুমি বলেছিলে যে প্রতিটি মুহূর্তই অপূর্ব। তার মানে কি এই যে বিভিন্ন মুহূর্তে তোমার কথার অর্থও বদলে যায়? তুমি হয়তো বলবে আসলে সেরকম কোনো 'অর্থ' নেই। ভাষার গঠন আর কোনো একটি বিশেষ সময়ের অনুষঙ্গ একটি অর্থের আভাস গড়ে তোলে কেবল। আমি চাই এ সমস্ত কথা প্রতিদিনের ভাষায় বলা হোক। নিজের মনকে বুঝে নিতে হবে আমার, আর তাহলেই তোমাকেও বুঝতে পারবো।

আমি এখনো যেন গত সপ্তাহেই রয়ে গেছি। কত ভালো হোত যদি অতীতের স্মৃতি না থাকতো আমাদের—আর ভবিষ্যতের জন্ত কোনো আকাঙ্ক্ষাও। যদি তাই হোত তাহলে আপ্পার 'অভিজ্ঞতার' সমস্যাও আর থাকতো না।

সতেরো

দশদিন আগে তোমার খবর পেয়েছি। তুমি অবশ্য সময় মতই 'তার' পাঠিয়েছি। আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি যে প্রথম হবো। মনে করেছিলাম তারের পরেই তুমি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠাবে। সেটা কি মাঝপথে কোথাও হারিয়ে গেছে?

মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যেন বহুদিন আগে এখানে এসেছিলে।

এজওয়ার্থ গতকাল আবার এসেছেন। বাবা বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওঁকে। কোনো অভিমত শুনে সহজে টলেন না—এমন একজন মানুষকেই আপ্পার মাঝে মাঝে দরকার হয়। আর এজওয়ার্থই ওঁর মনের মতো। কোনো একটা লেখা শেষ হলে আপ্পা সমস্তটা ওঁকে পড়ে শোনান। এজওয়ার্থ সমস্তটা শুনে খাঁটি ইংরেজদের মতো হঠাৎ একটি চতুর প্রশ্ন করে বসেন। এ সব ক্ষেত্রে আপ্পা প্রথমে একটু বিচলিত বোধ করলেও পরে উত্থিত প্রসঙ্গের সূত্রেই নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সম্পূর্ণ পথটা তিনি চোখের সামনে তুলে ধরেন। কখনো কখনো তাঁর যুক্তি ঈষৎ দুর্বল বলে মনে হলে তখুনি সে কথা লিখে রাখেন। আপ্পা তাঁর বইয়ের নাম রেখেছেন 'অভিজ্ঞতা' এবং বিকাশ'। এজওয়ার্থের ধারণা, বইটি বৈপ্লবিক হবে।

আঠারো

তোমার দুটো চিঠি এক সঙ্গে পেয়েছি। খামের ওপরে ডাকঘরের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে প্রথম চিঠিটি পরে পোষ্ট করা হয়েছিল।

এতো ভালো চিঠি লিখোনা তুমি। তাহলে আমার আর লিখতে ইচ্ছে করে না। নিজের চিঠিগুলিকে শুকনো প্রতিবেদন বলে মনে হয়। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কবিতা নেই। আসলে তোমার মন একটি গভীর জলাশয়ের মতো। আকাশে ভাসমান নানা রঙের মেঘের প্রতিভাস তার ওপরে পড়লেও জলের রং সম্পূর্ণ আলাদা থেকেই যায়। একটি রং চিনতে শিখবার আগেই দেখি সেটি অচেনা হয়ে গেছে তার জায়গায় নতুন আরেকটি রং এসে পড়ে।

তোমাকে কি লিখবো বলো তো? প্রেম, স্নেহ, আকাঙ্ক্ষা—এই শব্দগুলি আমার একটুও ভালো লাগে না। মনে হয় আমরা কোথাও সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যই শব্দগুলিকে পতাকার মতো ব্যবহার করি। বস্তুত অনেক আগেই তারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট —এ কথাটির অর্থ আসলে কি? আমি তোমাকে আমার নিজের আর আমাকে একান্তই তোমার করে তুলেছি। এর বেশী আর কি থাকতে পারে? এই বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আমরা আরো বেড়ে উঠবো না কি নতুন দেয়াল গড়ে তুলবো নিজেদেরই চারপাশে?

তুমি যদি আমার মনের গড়ন বুঝতে পারো তাহলে আমাকে পুরোপুরি নিজের করে নিতে তোমার অসুবিধে হবে না। তোমার সারল্য, আত্মবিশ্বাসের দীনতা, অন্যদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কি কথা বলার সময়েও ন্যায় বিষয়ে তোমার তীব্র সচেতনতা, যা ঘটেছে আর যা ঘটবে তাদের সঠিকভাবে মিলিয়ে নিছক একটি ছাপ দেবার চেষ্টা —এ সমস্তই এখন আমার হয়ে গেছে। আমি নিজে কি তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি?

কলেজ তাড়াতাড়িই খুলবে, কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে ফিরে আবার ক্লাশ করা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। আপ্পা জাপান থেকে একটি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। তিনি গেলে আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। অবশ্য কিছুই এখনো ঠিক হয়নি।

তোমার দ্বিতীয় চিঠির প্রশ্নগুলির জবাব আমি একে একে দেবো।

উনিশ

এই চিঠিটা লিখতে একটু দেরী হয়ে গেল। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বছর শুরু হয় অক্টোবরে। তুমি কি এখন এই জুলাই মাসের মাঝামাঝি সেখানে যাবে? অক্সফোর্ডে ভর্তির ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে না, এ ছাড়া এজওয়ার্থ ইতিমধ্যেই তাঁর পরিচিত এক শিক্ষককে চিঠি লিখেছেন। দু' সপ্তাহের মধ্যেই সব কিছু জানতে পারবো। মানলাম, স্বয়ং এখুনি গেলে ব্যাপারটা হয়তো তাড়াতাড়ি হবে। তুমি কি খুব শিগ্‌গিরই তোমার প্ল্যান মতো নেমে পড়তে চাও?

তুমি কি এখনো তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব চাও?

কুড়ি

আমরা তাহলে সত্যি-সত্যিই চল্লাম। আপ্পা শেষ পর্যন্ত জাপানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই ঠিক করেছেন। কিয়োটোতে আনন্দ মিশন নামে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে; যদিও ওটাকে ঠিক ধর্মীয় বলা উচিত হবে না। এই মিশন আসলে সন্ধানীদের একটি কেন্দ্র। পৃথিবীর সব দেশের মানুষই এখানে জ্ঞান অর্জন আর চিন্তা-ধারণা বিনিময়ের জন্য আসেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে একজন সিংহলী সাধু মিশনটি তৈরী করেছিলেন। মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক নামুরা আর আপ্পার মধ্যে প্রায়ই চিঠি লেখা-লেখি চলতো। সম্প্রতি আপ্পা নামুরার কাছে নতুন বইটার কিছু অংশ তাঁর মন্তব্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলি পড়ে তিনি জানিয়েছেন যে প্রকাশ করার আগে মিশনের বার্ষিক বক্তৃতার অনুষ্ঠানে বইটির মূল বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা আপ্পার পক্ষে উচিত হবে। গত বিশবছর আপ্পা খুব একটা বেড়ান নি কোথাও। সুতরাং প্রথমটায় নতুন একটা ব্যাপার শুরু করতে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। শেষটায় এজওয়ার্থই তাঁকে রাজি করালেন।

অধ্যাপক যোশীও এখন এখানে, বিশেষ করে আমাদের চলে যাবার খবর শুনেই তিনি নেমে এসেছেন। ছুটি নিয়ে উনি জাপানে অন্তত কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলেছিলেন। তিনি জাপানী আর চীনা ভাষা মোটামুটি

জানেন সুতরাং প্রথম কয়েকদিন উনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। আমি তোমাকেও আসতে বলতাম। তুমি কি আসবে? মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত কাজ না করাটাই দারুণ মজার ব্যাপার হয়ে ওঠে কিন্তু।

তোমার প্রশ্নের জবাব দেবার কথা আমি ভুলিনি। শুধু অপেক্ষা করছি—তুমি যদি এর মধ্যেই উত্তরগুলি পেয়ে যাও।

একুশ

দুই শঙ্খে ভরা তার চিঠি যেন। প্রায়ই যায় হারিয়ে। কোথায় সব রাস্তা মিশে গেল, কেমন করে? কারা, কোন্ পাখিরা স্বরগুলিকে বেঁধেছিল একটি গুচ্ছে?

দিন তার কাছে বিস্ময়, রাত্রি ফুলের নক্‌শা। তার মন শঙ্খের কোনো নির্ণীত অলংকার তবু সহ্য করতে পারে না।

ও বলেছিল; 'আমি কখনো আসবো'—ঠিক এভাবেই। দিন গেল চলে, সে তবু এল না।

পার্কে সেদিন তবে কার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গিয়েছিল? কে কার জন্য রওনা হয়েছিল?

একসঙ্গে হেঁটেছে ওরা, পা তবু কখনো পিছলে যায় নি। চোখ সরেনি অন্য দিকে। পথ হলো চেনা, গাছগুলি গড়ে দিল ছায়ার ঘের; পায়ের নিচের শুকনো পাতায় ছিল না প্রাচীন স্মৃতির অবশেষ।

ও যখন জলের পাড়ে বসত, জলে আচমকা নুড়ি ছুঁড়ে কাউকে বিব্রত করতো না। তীরের ঘাসে হাল্‌কা ডানায় নামতো সারস। জলে তার ছায়া ছিল নিস্পন্দ।

প্রথম বর্ষণ নামলে ও ভিজত, জল গড়াতো তার গা বেয়ে। মন্দিরের ভিতরে যাবার সময় সে হঠাৎ কেমন উৎসব-নৃত্যের ধরণের বাঁক নিয়ে দাঁড়াতো। কোথাও বাদ্যযন্ত্র নেই, অথচ সারা জায়গা স্পন্দিত হতে থাকতো।

ও যখন বাড়ির উঁচু সিঁড়িতে বসে মালা গাঁথতো, তার মালায় শুকনো অবজ্ঞাত ফুলগুলোও জায়গা করে নিতো।

কোথায়, কেমন করে, এসব ঘটেছিল?

কারো অতিপ্রিয় ষাটটি প্রশ্নের মাত্র পাঁচটির এই হলো সুসংলগ্ন উত্তর।

বাইশ

সায়ামা মারু ২২শে জুলাই, ১৯৩৯

জাহাজ থেকে অভিনন্দনের একটি পংক্তি, আবহাওয়া ভীষণ মনস্থন-ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। অধ্যাপক যোশী, যিনি দাবী করেছিলেন সমুদ্রে তাঁর কখনো গা-বমি বমি লাগেনা, নিজেই এই চারদিন কেবিন থেকে একবারও বেরোতে পারেন নি। আপ্পা খুব খুশী আছেন। জাহাজে ব্রীজ খেলা জমে কি না তা দেখবার ইচ্ছে আছে আমার। জাহাজের খাবার আমার খুব ভালো লাগছে। এজওয়ার্থকে একটা চিঠি লিখতে হবে—কেবলি মনে হচ্ছে গত জন্মে আমি জাপানী ছিলাম।

এই চিঠিটা তুমি কোথায় পাবে? ব্যাঙ্গালোরে, সিনুহাচলমে, নাকি লণ্ডনে?

ভ্রমণ…আরো ভ্রমণ: কোথা থেকে কোথায়! আমি ভীষণ, ভী-ষণ খুশী।

তেইশ

কিয়োটা; জাপান, আগষ্ট ১৯৩৯—অক্টোবর ১৯৪১

এখানে এসে দেখলাম তোমার তিনটি চিঠি জমা হয়ে আছে। অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়ে গেছো—তার মানে তুমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। এজওয়ার্থের সঙ্গে আবার দেখা করেছো জেনে আনন্দিত হয়েছি। বাইরেটা একটু রুক্ষ মনে হলেও তিনি আসলে কিন্তু সবার কথাই ভাবেন। উনি তোমাকে নিজের ওভারকোট দিয়েছেন—এটা বেশ

ভালো খবর। এজওয়ার্থের স্পর্শে যেন যাদু আছে আর তাঁর কথা ঠিক আশীর্বাদের মতো। ওঁর বিশ্বাস যে নিজের ব্যবহার করা একটা জিনিস কাউকে না দিলে তার প্রতি স্নেহ ঠিক যথার্থ হয়ে ওঠে না। এজওয়ার্থ ওঁর হাটবার সব চেয়ে পুরোণো লাঠিটা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। আপ্পার সঙ্গে বেড়াবার সময় আমি এখনো ওই লাঠিটা নিয়ে যাই।

আনন্দ মিশনের বাড়িটা আসলে একটা পুরোনো সাধুগাই রাজপ্রাসাদ। মিশনের কাজের জন্য সেটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া হয়েছে। একটা বড় বক্তৃতা দেবার ঘর আছে আর তার পাশেই লাইব্রেরী আর পড়বার ঘর। নামুরা আর তাঁর সহকর্মী দুজন প্রাসাদেই থাকেন। প্রাসাদের এলাকার মধ্যেই একটা ছোট ঘরে তাঁরা আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রাসাদ আর প্রাসাদের চারপাশটা খুব সুন্দর দেখতে, এর বাইরেই শহর। চারদিক খুব খোলামেলা বলে মনে হয়।

আমার ভয় হয়েছিল এখানকার আবহাওয়া আপ্পার হয়তো সহ্য হবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এখানে ওঁর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতিই হবে।

যোশী এখানে বেশ সুখেই আছেন। এখানকার ভাষা তিনি জানেন, আর সেটা একটা বাড়তি সুবিধে। পড়াশুনোর সুবিধে হবে বলে তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হষ্টেলেই আছেন। রবিবার তিনি আমাদের কাছেই কাটান কিংবা আমাদের সঙ্গেই কোথাও বেরিয়ে পড়েন।

মিশন দেখাশোনার ভার রয়েছে মিসেস নামুরার ওপরে। মনে হচ্ছে অধ্যাপক নামুরার একজন সহকর্মী. মিঃ ইমোতো খুব তাড়াতাড়িই তার জন্য একজন সঙ্গিনী জোগাড় করে দেবেন। অধ্যাপক নামুরার অন্য সহকর্মী একজন তিব্বতী লামা। আমরা তাঁকে 'সুধামা' বলে ডাকি।

মিশনে এখন আটজন ছাত্র পড়াশুনো করছেন, পাঁচজন জাপানী, একজন নরওয়ের লোক, একজন ইংরেজ আর একজন সিংহলী। আমি এখনো ওদের সঙ্গে খুব একটা আলাপ করে উঠতে পারি নি। বাইরের অনেক মানুষই মিশনের সাধারণ অনুষ্ঠান আর বক্তৃতায় উপস্থিত থাকেন।

নামুরা খুব ভালো লোক। তাঁর চোখ দুটি শিশুর চোখের মতো স্বচ্ছ। মনের সামান্যতম চিন্তার প্রতিফলনও সেখানে পড়ে। নিখুঁত জাপানী পোষাক, বাদামী আর ধূসর দাড়ির জন্য উনি খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। ইংরেজী খুব ভালো জানেন অধ্যাপক নামুরা। কিন্তু ওঁর জাপানী আরো অনেক বেশী জোরালো মনে হয়। এর কারণ বোধহয় এই যে বিদেশী কোনো ভাষা শুনবার সময় আমরা তার ধ্বনি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকি। আমার নাম খুব ভালো লেগেছে ওঁর। কিন্তু সাউ-এর বদলে উনি শা—উ উচ্চারণ করেন। আপ্পা ওঁর নতুন নাম রেখেছেন সন্দীপনী (যে আলো জ্বালায়)। যখন ওঁকে খুব সহজে জ্ঞানের আলো জেলে দিতে দেখি, তখন মনে হয় নামটা খুব সঙ্গত হয়েছে।

তুমি বলবে আমি নিজের কথা কিছুই লিখছি না। আসলে আমি এখনো নিজের চারদিকটাই দেখে বেড়াচ্ছি।

কাগজ দেখে জানলাম ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। তোমার জন্য খুব চিন্তা লাগে—আর সেই সঙ্গে ভাবি তা হলে আমাদের সবারই প্রত্যেকের জন্য চিন্তা করা উচিত।

আমি তোমার থিসিসের একটি কপি পেয়েছি। ভূমিকায় আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছো কেন?

চব্বিশ

অনেকদিন তোমার কাছ থেকে কোনো চিঠি পাই নি; আর আজ যেটা এসেছে সেটিও বড়ো ছোট। তুমি এখন নিশ্চয়ই যুদ্ধের একেবারে মাঝখানে পড়ে গেছ। আমি

খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম তোমার জন্যে, চিঠি পেয়ে একটু কমলো। এ অবস্থায় দেশে ফিরে না এসে ওখানে থেকেই কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত খুব ঠিক হয়েছে। যা ঘটতে চলেছে তা যে কোনো জায়গাতেই ঘটতে পারতো।

এখানকার পরিমণ্ডলও বিশেষ আশাব্যঞ্জক নয়। কেউ বলতে পারে না কখন কি ঘটবে। কিন্তু আপ্পাকে এখানেই বেশ আনন্দিত মনে হচ্ছে। তাঁর স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এ ক'দিনে।

অধ্যাপক যোশী বলছেন যে তিনি ডিসেম্বরের শেষে ভারতে ফিরে যাবেন। এখানে তিনি জাপানী ভাষার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে এখানকার প্রধান জায়গাগুলি দেখে বেড়াচ্ছেন তিনি। তাঁর এ ব্যাপারটি আমার খুব ভালো লাগে। অধ্যাপক যোশী খুব ছোট ব্যাপারেও ভীষণ উৎসাহী, সেখানেও যেন তাঁর গভীর চিন্তা আর পড়াশুনোর মতোই মনোযোগ,—কিংবা হয় তো আরো একটু বেশীই। কোনো সুযোগই তিনি হেলায় হারাতে রাজি নন। তোমাদের তো আলাপ হয়েই গে'ছ। ওঁর পড়াশুনো আর বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা তোমার খুব কাজে লাগবে।

আপ্পা এজ্‌ওয়ার্থের কাছ থেকে একটি খুব দুঃখের চিঠি পেয়েছেন। ওঁর ভয় যে যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলবে আর ধ্বংসও হবে প্রচুর। গত যুদ্ধে এজ্‌ওয়ার্থ ডি, এস্, ও পেয়েছিলেন। আজ আর তাঁর কিছুই করার নেই। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে মানুষ কেন বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির পথে একত্র না হয়ে দিন দিন এত দূরে সরে যাচ্ছে। ভারতেও যে কোন সময়েই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সব জায়গাতেই ভাইসরয় আর গভর্ণরেরা শাসনের ক্ষমতা সমস্তই নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলেছেন। দেশের অর্থনীতি আর যন্ত্রবিদ্যা বৃটেন এখন যুদ্ধের জন্য ব্যয় করবে। প্রথম থেকেই এজ্‌ওয়ার্থ তাঁর দেশবাসীর শাসনপ্রণালী আর সামাজিক রীতিনীতি মেনে নিতে পারেন নি। ভারতে কুর্গের একটি কোণায় তাঁর বসতি। আমাদের দেশের লোকেরা তাঁকে কখনো বিদেশী মনে করে নি। কিন্তু এখন সর্বত্রই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা দিয়েছে। কার পক্ষে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব যে এখনো সবাই বোধসম্পনের মতো ব্যবহার করবে? এজ্‌ওয়ার্থ নিজের জন্য চিন্তিত নন। আত্মীয়তা আর বন্ধনের প্রত্যেকটি সূত্রই তিনি রক্ষা করতে চান। সবচেয়ে ভালোবাসেন তিনি বন্ধুত্বকে। যদিও চিঠিতে স্পষ্ট করে লেখেন নি তবুও এ মুহূর্তে আপ্পার অভাবই তিনি সবচেয়ে বেশী অনুভব করছেন। তিনি শুধু আভাসে জানিয়েছেন যে আপ্পা এখন ফিরে গেলে খুব ভালো হোত। আপ্পার বক্তৃতা শুরু হতে এখনো দু'মাস দেরী। তিনি নিজেও ঈষৎ দ্বিধান্বিত কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আপ্পার মন সাধারণত সহজে টলে না। হাল্‌কাভাবে কিছু করেন না তিনি আর মাঝপথে কোনো কাজ ছেড়েও দেন না।

আমি অনুভব করতে পারছি যে এই মুহূর্তের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে ভয় পেয়ে বা চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। আমাদের লাভ ক্ষতির মাপকাঠি দিয়ে বড় বড় সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। এ ছাড়া আমি একটু অদৃষ্টবাদী। (এই অদৃষ্টবাদ এজওয়ার্থ এতদিন যা বলে আসছেন তার প্রভাব অথবা আমার ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার।) আমাদের আশার ফলে জাপানে নিশ্চয়ই কোনো বিপ্লব হবে না। কিন্তু যা ঘটছে তার ফলে আমার নিজের পরিচিতিই আরো হারিয়ে যাবে।

এই দীর্ঘ চিঠিটি এবার শেষ করবো। চিঠি পাওয়া আর তাদের নিজের কাছে রাখা দিন দিন যেন আরো কঠিন হয়ে উঠছে। কেবল যদি একটি কথাই থাকতো—আমি তোমাকে চাই, আমি তোমার—তাহলেই বোধহয় যথেষ্ট হোত। যদি সাউ এর গল্প বলতে গিয়ে কাউকে কাক আর চড়ুইয়ের গল্প বলতে হোত তাহলে আমাদের চটপটে

কর্মকুশলীরা হয় তো অদ্ভুত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন।

এ কথা ঠিক যে আমি তোমায় ভুলিনি।

পঁচিশ

গত সাতদিন আমি অসুস্থ ছিলাম। জ্বর এখনো কমেনি, তাহলেও ডাক্তার বলেছেন যে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আমি নিজে অবশ্য বেশ ফুর্তিতেই আছি। মিসেস ইমোতো সম্প্রতি এখানে এসেছেন। তিনিই আমার শুশ্রূষা করছেন এখন। সুতরাং আপা নিজে আর একটুও চিন্তিত নন।

সাধারণত আমার অসুখ করে না। আর যখন অসুখ করে তখন সবাই মিলে আমার খুঁটিনাটি কাজগুলি করে দিচ্ছে দেখলে আমি একটুও সহ্য করতে পারি না। যখন খুব জ্বর ওঠে তখন যেন মিলিয়ে যেতে থাকি···মনে হয় আমি যেন কোথায় একটা বিন্দু অথবা বালির কণার মতো। আস্তে আস্তে সেটা বড় হতে থাকে। ছড়িয়ে যেতে যেতে সমস্ত বিশ্বকে ঢেকে ফেলে; কি মজা লাগে তখন। শরীরের মধ্যে উথাল পাথাল চলতে থাকে—শাদা আর লাল রক্ত কণিকার মধ্যে যেন শ্রেণী সংগ্রাম বেঁধে যায়। রোগের বীজাণুগুলোকে হত্যা করবার জন্য রক্ত নিজেরই তাপ বাড়িয়ে একেবারে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শরীরের তন্তুরা কূটনীতির চরমে পৌঁছে যায় আর ঈশ্বর জানেন তখন তারা কি করে। কিন্তু আমি এ সমস্ত কিছু কোনো এক সময়ে পড়েছিলাম আর পরীক্ষকদের কাছে ব্যাখ্যাও করেছি। অসুখ সেরে যাবার পর মাথা আর শরীর খুব হালকা হয়ে যায়—ব্যাপারটা আমার বেশ ভালোই লাগে।···এই চিঠিটা লিখতে লিখতেও আমি অনেকটা ভালো বোধ করছি।

তুমি লিখেছো যে বোদলেইনে কাজ নেবার সুটো সুবিধে আছে; কিন্তু সত্যি সত্যিই কি একজন লাইব্রেরীয়ান পড়বারও সময় পান? আমার কেবলি মনে হয় যে এত বইয়ের সংস্পর্শে থাকেন বলেই তাঁর হয়তো আর পড়তে ইচ্ছে করে না।

আপার বক্তৃতা দেবার দিন এসে গেল। মিশনে একই সময়ে একটি ফাংশনও হবে। আমি সেজন্য একটা ছোট নাটক তৈরী করছি। ওটা আমার নিজেরি লেখা, কিন্তু সেকথা গোপন থাকবে। রাজাম্মার একটি গল্প (লাকি আর ময়ূরেরটা নয়) অল্প বদলে নিয়েই নাটকটার গল্প দাঁড় করিয়েছি। গল্পটা অধ্যাপক নামুরার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি প্রথমে নিজের ইংরেজীতে লিখবো পরে উনি নাটকটিকে জাপানী ভাষায় অনুবাদ করবেন। বড্ড ঘোরালো ব্যাপার, ভাগ্য ভালো যে নাটকটা বেশ ছোট-খাটো আর কথাও অল্প। বাকীটুকু আমি চরিত্রদের চলা ফেরা, ভাবভঙ্গী, শব্দের কাজ, চীৎকার আর রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল (suspense) দিয়ে ভরিয়ে রাখবো। জাপানী নাটক আর আমাদের বকগণের খুব ভয় আছে কিন্তু এবার।

অধ্যাপক যোশী এতদিনে নিশ্চয়ই ভারতে পৌঁছে গেছেন। ওঁর কোনো খবর এখনো পাইনি।

অধ্যাপক গুরুপদস্বামী এত তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে চলে গেলেন কেন? তুমি ওঁর সম্বন্ধে নিতান্ত সাধারণভাবে লিখেছো। তা থেকে বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না।

এ সমস্ত কিছু লিখবার পর আমার সত্যিই বেশ ভালো লাগছে। মিসেস ইমোতো বলছেন যে জ্বর কমে গেছে।

ছাব্বিশ

লোরে নামে একটি সুইডিশ মেয়ে কিছুদিন হোল এখানে এসেছে। অসুখের সময় ও আমার মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতো। ওর বাবা ওসাকায় একটি জাহাজ কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। লোরের ইচ্ছে কিছুদিন জাপানে থেকে তারপর ভারতবর্ষে যাবে। ও আমার বয়সী কিন্তু

ভীষণ মিষ্টি। খুব ছোট ছোট ঠোঁট ওর আর চোখ দুটো বিরাট বড়। আমি ওকে বলেছি আমাদের সঙ্গেই ভারতে যেতে। ভারতীয় শিল্পের ও দারুণ ভক্ত। শুরুতে একটু ঘাবড়ে দেবার জন্য আমি ওকে তোমার থিসিস্‌টা পড়তে দিয়েছি। মনে হয় লোরেকে তোমার বেশ ভালোই লাগবে।

এক্ষুণি খবর পেলাম যে অধ্যাপক যোশী নিরাপদে দেশে পৌঁছেছেন।

সঙ্গের ছবিটা থেকে লোরেকে বের করো তো। ইমোতো হচ্ছেন ডানদিক থেকে দ্বিতীয়, চিবুকে হাত ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে আছে ওলাফ।' আর তুমি যদি লোরেকে চিনতে না পারো তাহলে নীচের লেখাটা উল্টে পড়ে দেখো :

আমরা আমাদের পোষাক বদলে নিয়েছি।

[উল্টো করে লেখা]

আমার নাটকটার রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। ওলাফ রাজার ভূমিকায় অভিনয় করবে। এ ব্যাপারে ওর দাড়ি একটা বড় গুণবিশেষ। পাখী হবার জন্য প্রতিবেশী কিছু ছেলেমেয়েকে আমি জোগাড় করেছি। নাটকটিতে একটি গাছের ভূমিকা আছে। অধ্যাপক নামুরা নিজেই গাছ হবেন।

আমি জানতে পারলাম অধ্যাপক গুরুপদস্বামী এবার থেকে সিমহাচলমেই থাকবেন। একথা কি ঠিক?

এখন আমার সত্যিই ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এখানে থেকে আমি কি করছি? কিন্তু তখনি ভাবি এখানে না এলে এসব কিছুই হোত না। লোরের সঙ্গে দেখাই হোত না আমার।

তোমার কথা সব লিখো। ভীষণ সাধারণ ব্যাপারগুলো বাদ দিতে পারো।

(ক্রমশঃ)

অনিল ব্লাক্সেল

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০

(তৃতীয় সংস্করণ)

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

কবিপক্ষে কাব্যচিন্তা

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

পত্রাবলী

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ১৮০৬-৬১

মেরি রাসেল মিটফোর্ডকে

৫০ উইমপোল ষ্ট্রীট

২০ জানুয়ারি ১৮৪২

…গত তিন চার দিন ধরে প্রত্যেকদিনই তোমাকে লিখবো-লিখবো করছি ; কিন্তু অন্য চিঠি লিখতে ব্যস্ত ছিলাম…যে চিঠিগুলি লেখা দরকার ছিল—তার মানে এই নয় যে তোমাকে লেখার দরকার নেই। সেটা হৃদয়ের চাহিদা। কিন্তু একসঙ্গেই তা আমার পক্ষে করা সম্ভব হয় নি—তার ওপর আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি এই গ্রীক কবিরা আর এ্যাথিনিয়ম পত্রিকা আমায় টানাটানি করছে ! …ম্যাগাজিনের লেখা কিংবা উঁচুজাতের গদ্য লিখে কবিতাকে যেন বর্জন না করি একথা তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি শুনে সুখী হবে যে সে কাজ আমি চেষ্টা করলেও করতে পারতাম না। আমার যেটুকু ক্ষমতা তা ঐ কবিতাতেই—ওতে আমার ব্যক্তিগত সুখ, তার চেয়ে বেশি আমার ভালবাসা নিহিত। এমন কোনদিন আমার মনে পড়ে না যখন একে ভালবাসি নি—সেই ন বছর বয়সে শুয়ে-জেগে-থাকা ধরণের আবেগ দিয়ে আর তারও পরে প্রবল অনুভূতি দিয়ে একে ভালবেসেছি—যা আমার জীবন আন্দোলনকারী সমস্ত দুঃখও নাড়া দিতে পারে নি। এই মুহূর্তে একে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসি—এবং সম্ভব হলে এর জন্যে আমি আগের চেয়েও দিনরাত কাজ করতে প্রস্তুত…জনপ্রিয়তার জন্যে নয়, আমার যেটুকু ক্ষমতা তারই প্রকাশের জন্যে। আমার মননশীলতার এটাই লক্ষ্য—যদি বেঁচে থাকি এটা করবোই। যেরকম পরিশ্রম করিই না কেন কর্মপদ্ধতিতে তিক্ততা থাকবে না… কারণ জনপ্রিয়তার জন্যে বা কোন উন্নত ধরণের যশের জন্যে আমি এটা করতে যাচ্ছি না, এটা কবিতারই জন্যে করতে যাচ্ছি—বরং আরো নম্র ও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে এটা আমি ভালবাসি বলেই করতে যাচ্ছি। প্রেম সব ব্যাপারেই সবচেয়ে নিরাপদ ও অক্লান্ত গতির নিয়ামক—এ বীরের কাজ করে।

ধর্মীয় কবিতা সম্পর্কে আমাদের কিছু মত পার্থক্য থাকতে পারে…যদিও যে নমুনাগুলো এখন আছে সেগুলো সম্পর্কে নয়। তোমার সাহিত্যচিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার স্থির মতবাদ হল যে অল্পই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে…এবং শাতোব্রিয়াঁর পরিকল্পিত খৃস্টবাদের প্রতিভার মহত্তর প্রকাশ এখনো কাব্যিক মহিমা ও আলোকে বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ধর্মীয় কবিদের ব্যর্থতা তাঁরা ধার্মিক বলে নয়, তাঁরা কবি নন বলে। খৃস্টের ধর্ম একান্তই কবিতা—মহিমান্বিত কবিতা। তোমার মতে মত মিলিয়ে আমি যেমন বলি যে কাব্যিক উৎসাহের জন্যে মানবিক উৎসাহের প্রয়োজন, তেমনি আমি আরো ধরে নিই যে

মানবিক উৎসাহকে পরিপূর্ণ করতে গেলে ধর্মীয় উৎসাহের প্রয়োজন—যা বিশ্বের মানবতার মহান ও সদাপ্রভাবশীল উন্নতি ও কিরীট হিসেবে গণ্য।···

ইতিমধ্যে, এই যে 'এ্যাথিনিয়ম'।···একমাত্র একটি জিনিস নিশ্চিত যে আমি কবিতার ওপর নিরুৎসাহ হবো না। আর একটা জিনিসও নিশ্চিত—তা হল 'এ্যাথিনিয়ম'ও তাই। তুমি ঠিকই বলেছ—আমি বিজ্ঞান এড়িয়ে ধৈর্যধারণ করেছিলাম—কিন্তু তা আমি নিতে ও রাখতে পারি নি যখন আমি ওদের প্রত্যেককে রেড ইণ্ডিয়ান, ইংরেজ ভ্রমণকারী, বন্যজাতি, ষ্টীম-ইঞ্জিন ও সঙ্গীতযন্ত্র ইত্যাদি ব্যাপারে গভীর মনোযোগী দেখলাম,···এবং সবাই এক সঙ্গে ওপরের ঠোঁট বেঁকিয়ে—নিরুৎসাহ, উদাসীন, একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে গেল যখন একজন প্রকৃত কবি বা বিয়োগান্ত নাট্যকার প্রকৃতির অবদান সেই মহৎ চিন্তাগুলিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করতে লাগলো। এটা আগেও যেমন এখনো তেমন মন ভেঙে দেয়, মাথা নিচু করে দেয়। কেন না এখন সাহিত্যের মতই প্রকৃত কবি আছেন। মিঃ ব্রাউনিংকে ঐরকম হাল্কা, অর্ধ হাস্যকর, করুণ হাস্যকর নিচু ধরণের সমালোচনার চেয়ে অনেক বেশি ভালো সমালোচনা করা যেত।···ওর চেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে কি কিছু বলা যেত না? —সমালোচকের বা তাবৎ পৃথিবীর শ্রদ্ধার সমান! আমি নিচু স্বরেও মিঃ ব্রাউনিং সম্পর্কে ওরকম বলতাম না—ওরকম কথা নিজেকে বলতেও সাহস করতাম না।···

১। 'এ্যাথিনিয়মে' ওঁকে কয়েকটি লেখা লিখতে হয়েছিল। তার মধ্যে একটি গ্রীক খৃষ্টীয় কবিদের সম্পর্কে প্রবন্ধ ছিল।

২। ব্রাউনিং-এর 'পি া পাসেন' সম্পর্কে অনতিবিরূপ সমালোচনা।

জন কীটস ১৭৯৫-১৮২১

জন টেলরকে

হ্যাম্পষ্টেড ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮

আপনার অদলবদলে লেখাটির প্রভূত উন্নতি হয়েছে বলে আমি মনে করি। এখন আপনার উল্লিখিত যতিচিহ্নের কথা ধরা যাক। 'সোবারলি' শব্দটির পরেই কমা হবে, এবং অন্য অংশটিতে 'কোয়ায়েট' শব্দটির পরে কমা বসবে। এই পরিবর্তন ও পরের সাবধানবাণীর জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। আমার কবিতা পড়তে কাউকে যদি সংস্কারমুক্ত হতে হয় ত সে আমার পক্ষে বড় দুঃখের কথা। কোন একটি অংশের মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনার চেয়ে এটি আমায় বেশি আঘাত করে। 'এণ্ডিমিয়নে' সম্ভবত আমি এক শিক্ষানবিশী থেকে আর এক শিক্ষানবিশীতে উপনীত হয়েছি। কবিতায় আমার কয়েকটি মূলসূত্র আছে, এবং আপনি দেখবেন আমি তাদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কতদূরে আছি।

১ম, আমি মনে করি কবিতা অসাধারণত্ব নয়, সূক্ষ্ম অতিরেকের সাহায্যেই চমকে দেবে; পড়লে পাঠকের মনে হবে যে তিনি তাঁর মহত্তম চিন্তার ভাষাই শুনছেন, যেন এটি তাঁর স্মৃতিরই প্রকাশ।

২য়, এর সৌন্দর্যের স্পর্শ কখনোই মধ্যপথে থেমে যাবে না যাতে পাঠক বিস্মিত হয় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। চিত্রকল্পের উদয়, অগ্রসর ও অস্ত তার কাছে সূর্যের মতই স্বাভাবিকভাবে আবির্ভূত হবে, তার ওপর কিরণসম্পাত করবে এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে, যদিও মহত্ত্বের বশে গোধূলি আলোয় তাকে আপ্লুত করে যাবে। কিন্তু কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা কেমন হবে সেকথা চিন্তা করা অনেক সহজ। এই থেকেই

আমার আর একটি মূল সূত্র হল—গাছের পাতার মত স্বাভাবিকভাবে যদি কবিতার আবির্ভাব না হয়, তাহলে তার আবির্ভাব আদৌ না হওয়াই ভালো। আমার রচনায় যাই থাক না কেন, আমি নতুন কোন রচনায় "আগুনের কবিতা তুমি জাগো" না বলে থাকতে পারি না। যদি 'এণ্ডিমিয়ন' আমার পথিকৃৎ হয়, তাহলে আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি শেক্সপীয়র পড়তে পারি এবং তাঁকে তাঁর গভীরে বুঝতে পারি; এবং আমি নিশ্চিন্ত জানি যে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা আমার ব্যর্থতায় আমার জীবন ও মেজাজের যে কোন পরিবর্তনে গর্ব নয়, নম্রতাকেই দায়ী করবে—দায়ী করবে আমি যে মহৎ কবিদের পায়ের তলায় মাথা নিচু করে আছি তার জন্যে, আমার কবিতার প্রশংসা হয় নি বলে সেই তিক্ততার জন্যে নয়। "এণ্ডিমিয়ন" ছাপাবার জন্যে আমি উদগ্রীব যাতে ওর কথা ভুলে গিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। তৃতীয় অধ্যায়টি কপি করেছি, চতুর্থে হাত দিয়েছি। আমি দেখবো যাতে মুদ্রাকর আমায় বেশি জড়িয়ে না ফেলে। পার্সি স্ট্রীটকে আমার কথা বলবেন।···

পুঃ খুব শিগ্রি আপনাকে একটি ছোট ভূমিকা লিখে পাঠাচ্ছি।

উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৭৭০-১৮৫০

লেডি বোমোণ্টকে

প্রাসমিয়ার ৩ জুন ১৮০৩

গত রবিবারের আগের রবিবার এই সুন্দর প্রাসমিয়রে এসে পৌঁছেছি; অর্থাৎ দশ দিন আগে পৌঁছেছি, ফলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কেমন করে এলাম সেকথা আপনাকে বলার আগে আমি নিঃশ্বাস ফেলার সময় নিয়েছি; কিন্তু আমি জানি এসব ব্যাপারে স্যার জর্জ ও আপনার কাছ থেকে আমি অবাধ আস্কারা পেয়ে থাকি। সকলেই ভাল আছে, ছোট্ট ডরোথি সবচেয়ে বেশি বদলে গেছে—আমি বলবো ওর উন্নতি হয়েছে—সে আগের চেয়ে অনেক সুন্দর কইয়ে-বলিয়ে হয়েছে; সব দু মাসেই শিখেছে: একটা নতুন খেলনার চেয়ে আমাকে যে তার বেশি ভাল লাগে সেটা কম সুপারিশ নয়, এবং সহজও নয় যখন সে চোখের সামনে থাকলেও নাগালের বাইরে।

বাড়িতে পৌঁছোনোর পর আমার বেশির ভাগ সময়ই ঘরের বাইরে কেটেছে, অনেকটাই লেকের ধারের এক বনে যে-জায়গাটা আপনার ভাল লাগবে। আমি প্রেমগুঞ্জন না করলেও কাব্যলক্ষ্মী সেখানে একদিন সকালে আমার কাছে এসেছিলেন এবং কয়েকটি কবিতা আমাকে গুণগুণ করে শুনিয়েছিলেন যাতে আমি প্রোসভেনর স্কয়ারকে ভুলতে পারি নি, কারণ আপনি জানেন ওটা শেষ হয়নি বলে আমি আবার ধুয়ো ধরতে পারি। সরাইখানা সম্পর্কে আমাদের অনেক কথা হয়েছে; বসবার ঘরটা ভাল নয়, এর সামনেটা খোলা নয় বলে আপনার খারাপ লাগবে: লেকের পাশেই একটা ছোট কুটিরে লেকমুখী দুটি সুন্দর বসার ঘর আছে, এর দুপাশে ও উপরে দুটি ভদ্রগোছের ওকগাছ আর এই ঘর দুটি গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক; কিন্তু বাড়িটাতে শোবার ঘর ভাল নেই; আমার বোন এর কথা আপনাকে জানাবে ও আপনি বিচার করে দেখবেন।

মিঃ প্রাইস আমাকে অত্যন্ত বিনীত একখানি চিঠি লিখেছেন, মহৎ ('সাব্লাইম') সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে।···তিনি আমাকে ফক্সলিতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, এবং ওয়াই নদীর পার্শ্ববর্তী দৃশ্যাদি বর্ণনা করে প্রলুব্ধ করেছেন?

পার্সি বিশি শেলি ১৭৯২-১৮২২

জোসেফ সেভার্নক

পিসা ২৯ নভেম্বর ১৮২১

বেচারা কীটসের ওপর শোকগাঁথাটি পাঠালাম—এবং আমার ইচ্ছে এটি আপনি গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। ভূমিকা পড়েই বুঝতে পারবেন তার শেষ সময়ের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়ার আগেই আমি এটি লিখেছিলাম; এখনো পর্যন্ত আমি যা জানি তা সবই এক বন্ধুর কাছে শুনেছি যে কর্নেল ফিনচের কাছ থেকে সব খবর সংগ্রহ করেছে; তার প্রতি আপনার আচরণ যেমন দাবী করে তেমনি আমার অনুভব অনুযায়ী আমি শ্রদ্ধা ও স্তুতি প্রকাশ করতে সাহস করেছি।

তার অলৌকিক প্রতিভা সত্ত্বেও কীটস কখনো জনপ্রিয় কবি হয় নি, হবেও না; তার মনের আশ্চর্য ফসলগুলি এখনও পর্যন্ত যেরকম অবহেলার অন্ধকারে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন তা সেই লেখকের পক্ষে দূর করা অসম্ভব যার কবিতা যদিও কয়েকটি বিশেষ গুণে কীটসের কবিতা থেকে আলাদা, তবু অন্তত একটি আকস্মিক ব্যাপারে মেলে—তা হল জনপ্রিয়তার অভাব।

সেকারণে আমার অল্পই আশা যে যে-কবিতাটি পাঠালাম তা আদৌ কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করবে কি না, তার রচনার বিদগ্ধ আলোচনা যে একটি পাঠকও পড়বে তা আমার মনে হয় না। এই বাধাগুলি না থাকলে তার অবশিষ্ট রচনাগুলি নিয়ে তার জীবনী ও সমালোচনাসহ একটি সংকলন বার করার ইচ্ছে আমার ছিল। সে কি কবিতা বা যে কোন ধরণের কোন লেখা রেখে গেছে, সেগুলো কার কাছে আছে? এসম্পর্কে খবর দিয়ে আপনি আশা করি আমাকে বাধিত করবেন।

যে ছবিটি আপনি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত তার জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই: আমি সেটিকে অতীতের পবিত্রতম স্মারক বলেই মনে করবো। আমার কথা বলি, আমি যখন শেষবার কীটসকে বন্ধুবর লে হান্টের ওখানে দেখি তখন আমি ভাবি নি যে আমি তারও পরে বেঁচে থাকবো।...

জর্জ নোয়েল গর্ডন বায়রন ১৭৮৮-১৮২৪

পার্সি বিশি শেলিকে

র‍্যাভেনা ২৬ এপ্রিল ১৮২১

...কীটসের সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তা পড়ে আমি মর্মাহত—ব্যাপারটা কি সত্যি? আমি জানতাম না সমালোচনা এত প্রাণঘাতী হতে পারে। তার কৃতি সম্পর্কে আপনার ও আমার মতামতের মূল পার্থক্য থাকলেও, আমি অপ্রয়োজনীয় বেদনাকে এত ভয় করি যে আমি তাকে এরকমভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে পার্নাসাসের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন দেখতেই চাইতাম। হায় বেচারা! অপরিমিত আত্মপ্রীতির জন্যে সে সম্ভবত খুব সুখী ছিল না। আমি 'কোয়ার্টারলি'তে 'এডিমিয়নের' রিভিউ পড়েছি। লেখাটা তীক্ষ্ণ,—কিন্তু ঐ পত্রিকা ও আরো অনেক পত্রিকায় আরো অনেকের সম্পর্কে যেরকম তীক্ষ্ণ রিভিউ বেরোয় সেরকম তীক্ষ্ণ অবশ্যই নয়।

আমার প্রথম কবিতা সম্পর্কে 'এডিনবার' বক্তব্যে আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল মনে পড়ছে; দারুণ

ক্রোধ, তারপর প্রতিরোধ এবং মনের মুক্তি জন্মেছিল—কিন্তু অসহায়তা বা নৈরাশ্য জন্মায় নি। স্বীকার করি ওগুলি সৌহার্দ্যের অনুভূতি নয় কিন্তু এই হট্টগোলের পৃথিবীতে, বিশেষ করে লেখার ব্যাপারে আখড়ায় প্রবেশের আগে একটি লোককে তার প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিমাপ নিতে হবে।...

আপনি ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যধারা সম্পর্কে আমার মতামত জানেন। আপনার কাব্যসম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণার কথাও আপনি জানেন.—কেন না আপনার কাব্য কোন গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। আমি 'সেনসি' পড়েছি—কিন্তু বিষয়বস্তুটি একান্তই অনাটকীয় মনে করা ছাড়াও আমি আমাদের পুরনো নাট্যকারদের আদর্শ বলে প্রশংসা করতে পারি না। এযাবৎ ইংরেজদের যে আদৌ কোন নাটক ছিল একথা আমি অস্বীকার করি। যাই হোক, আপনার 'সেনসি'তে শক্তি ও কাব্যগুণের পরিচয় আছে। আমার নাটক সম্পর্কে একথাই বলবো যে আপনার নাটক সম্পর্কে আমি যেমন খোলাখুলি আলোচনা করেছি আমার সম্পর্কেও তেমন আলোচনা করে শোধ নিন।

আপনার 'প্রমিথিউস' আমি এখনো পাই নি, যদিও সেটি দেখতে ইচ্ছে করছে। আমার বই সম্পর্কে কোন কথা শুনি নি, এবং জানিও না এখন প্রকাশিত হয়েছে কি না। আমি পোপ-বিতর্কের ওপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি যেটি আপনার পছন্দ হবে না। যদি আমি জানতাম যে কীটস মারা গেছে—কিংবা সে জীবিত আছে ও অত অভিমানী—তাহলে তার কবিতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আমি বাদ দিতাম, পোপের ওপর তার আক্রমণের ফলে এবং তার লেখার ধরণ আমার পছন্দ না হওয়ার জন্যে আমি যা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আপনি আমাকে একটি মহৎ কবিতা লিখতে বলেছেন—কিন্তু আমার সেরকম কোন ইচ্ছে বা ক্ষমতা নেই। যতই বয়স বাড়ছে, ততই আমার জীবনের উৎসাহব্যাঞ্জক শক্তির ওপর—জীবনের প্রতি নয়, কারণ এটিকে আমরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ভালবাসি—ঔদাসীন্য বেড়ে চলেছে। তাছাড়া ইটালিয়ানদের সাম্প্রতিক পরাজয় নানাকারণে আমাকে নিরাশ করেছে—কতকগুলি কারণ সামাজিক, কতকগুলি ব্যক্তিগত। শ্রীমতী শেলিকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।...

ক্যামব্রিজ
১৭ মার্চ ১৭৭১

টমাস গ্রে ১৭১৬-৭১
(ওয়ালপোলকে

...ভলটেয়ারের 'ফ্র্যাঙ্ক রেককটা'[১] যিনি হজম করতে পারেন তাঁর উদর নিশ্চয়ই খুব সুস্থ। নাস্তিক্য কুৎসিত খাদ্য, যদিও ফ্রান্সের সমস্ত রাঁধুনীই একযোগে এর থেকে নতুন আহার্য তৈরি করছেন। আত্মা বলতে যা বোঝায় তা সম্ভবত কন্টিনেন্টে নেইই; কিন্তু আমি মনে করি আমাদের সে-জিনিস ইংল্যাণ্ডে আছে। উদাহরণস্বরূপ, আমার বিশ্বাস শেক্সপীয়রের সে-জিনিস অনেকগুলিই ছিল। ইহুদিদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য (যদিও তারা শুয়োরের মাংস খায় না) হল, আমি তাদের ভালবাসি কেন না তারা ভলটেয়ারের চেয়েও ভালো খৃস্টান।...

১ জুভেনাল, ৭,১৫৪

উইলিয়ম কুপার ১৭৩১-১৮০০

জন জনসনকে

পয়েটন, ১৬ মার্চ ১৭৯০

তুমি ঈর্ষার যোগ্য, কেন না তুমি কখনো পৃথিবীর অন্যতম মজার গল্পগ্রন্থ 'ওডিসি' পড়ো নি। লংগিনাস এর বিরুদ্ধে যাই ইংগিত করে থাকুন না কেন, এর মধ্যে পৃথিবীর সূক্ষ্মতম কাব্যের অনেকটাই পাওয়া যাবে। তাঁর ইলিয়াড ও ওডিসির সঙ্গে মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নের তুলনা চমৎকার হলেও, আমার মতে সঠিক নয়। এর চমৎকারিত্বের বোধই তাঁর বিচার নষ্ট করেছে, না হলে তাঁর মত বিবেচক হোমর-পাঠকের এমন করা সম্ভব ছিল না। শেষ গ্রন্থটিতে (ওডিসিতে) আমি কোন নষ্ট-যোগ্যতার আভাস পাই নি, বয়সের ছাপও দেখি নি; অপর পক্ষে, আমি নিশ্চিত যে হোমর যদি যৌবনে ওডিসি লিখতেন তাহলে এর চেয়ে ভালো কখনোই লিখতে পারতেন না; এবং ইলিয়াডও যদি বৃদ্ধ বয়সে লিখতেন, তাহলে যা লিখেছেন তাইই লিখতেন।...

য়োহান ভোলফগাং ফন গোয়েটে ১৭৪৯-১৮৩২

ফ্রিডরিক শিলারকে

হ্বাইমার ২২ জুন ১৭৯৭

আমার বর্তমান অস্থৈর্যের মধ্যে যেহেতু কিছু করা একান্ত দরকার, সেকারণে আমি 'ফাউস্ট'এর কাজে লাগবো মনস্থ করেছি—শেষ না করলেও অন্তত যেটুকু ছাপা হয়েছে সেটুকু ভেঙে ফেলে সদ্যসমাপ্ত বা উদ্ভাবিত অংশের সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় খণ্ডে সেগুলি সাজাবো; আমি নিশ্চিত যে ঐভাবেই আমি নাটকটিকে—যা এখন শুধু একটি চিন্তা মাত্র—বাস্তবে রূপায়িত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমি এখন এই ভাবধারা গ্রহণ করেছি এবং সেটিকে প্রকাশ করবো ভেবেছি। আমার ইচ্ছে তুমি ব্যাপারটা তোমার কোন বিনিদ্র রজনীতে আগাগোড়া ভেবে দেখো ও সবটা থেকে তুমি কী চাও আমায় জানিও—এভাবেই তুমি এক প্রকৃত ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত আমার স্বপ্নগুলিকে বিরত করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারো।

যেহেতু এই কবিতার বিভিন্ন অংশ—মেজাজের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের হবে, যদিও তারা সমস্ত কবিতাটির মূল সুর ও বক্তব্যের অধীন হবে, এবং এ ছাড়া সমস্ত রচনাটিই যেহেতু মন্ময়, সেকারণে আমি যখন তখন এটা লিখতে পারি এবং সেভাবেই আমি কিছুটা কাজ করতে পেরেছি।

আমাদের গাথা-পাঠ আমাকে আবার এই কুয়াশাচ্ছন্ন পথে নিয়ে গেছে এবং একাধিক অর্থে পরিবেশ আমাকে আরো কিছুদিন এই পথে বিচরণ করার উপদেশ দিয়েছে।

রবার্ট বার্নস ১৭৫৯-৯৬

হেনরি এস কিনকে ?

ইলিসল্যাণ্ড ২২ জানুয়ারি ১৭৮২

আমার বিশ্বাস যে-আঘাতে আমার অস্তিত্ব নির্মূল হয় একমাত্র সেই আঘাতেই দুটি জিনিস ধ্বংস হতে পারে: কবিতার প্রতি আমার সহজপ্রবণতা ও আন্তরিকতা এবং আপনার উদারতার প্রতি আমার ঋণবোধ।...মানুষ

সাধারণত যা খুব প্রিয় বলে মনে করে তাই উপহার দিয়ে নিজের আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব অথবা প্রীতি জানায়। কবির চরিত্র সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞানও আছে সে জানে কবি তার কবিতার চেয়ে পৃথিবীতে আর কিছুর ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে না—আমিও আমার সেরকম কিছু রচনা আপনাকে পাঠাচ্ছি।....প্রজ্ঞালব্ধ সামঞ্জস্য ও অনায়াস সৌকর্যের মিথ্যা আত্মম্ভরিতায় আমার তেমন আস্থা নেই। চারু লেখনের কর্কশ উপাদান অবশ্যই প্রতিভার অবদান; কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে শিল্পকর্ম বেদনা, মনোযোগ ও পৌনঃপুনিক পরীক্ষার সম্মিলিত প্রয়াস।....

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের ১৭৭২-১৮৩৪

জোসেফ কটনকে

এপ্রিল ১৭৯৭

'মানথ্‌লি রিভিউ'-এ ওরা যে সাদের কবিতা ও অমার ওডের রিভিউ করেছে তা আমি দেখেছি। রিভিউগুলি সত্ত্বেও, আমি, যে কি না রবার্ট সাদের প্রশংসায় অন্তরের গভীরে ঈর্ষাবোধ করি, এই সংখ্যাটির প্রকাশে দুঃখিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঠিকই দুঃখ করেছেন যে সাদে অনায়াসে খুব লেখে—সে কদাচিৎ 'তার আচ্ছন্নকারী দেবতার নীচে তার ভারনম্র বুকের ওঠানামা অনুভব করে'। যেরকম অবাধ-গতিতে সে লেখে ও যেরকম সহজে সে নিজেকে খুশী করে তাতে সে অবশ্যই সাহিত্যকে নিজের কাছে লাভজনক করতে পারবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা, ভবিষ্যতের কাছে তার মালা খুব বেমানান লাগবে—এই এখানে একটা সদ্যপ্রস্ফুট পারিজাত, আবার এর পাশেই কোন আগাছা, যার আয়ু এক ঘণ্টা, শুকনো, হলুদ, কিম্ভূতকিমাকার—প্রথমটির অপরূপ সৌন্দর্য খারাপ সঙ্গের ফলে অর্ধেক সৌন্দর্য হারাবে। তা ছাড়া আমার ভয় যে সে তার কবিতা খুব বেশি কাহিনী ও ঘটনার ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করবে, সেই মহৎ কল্পনাগুলিকে অবহেলা করে যেগুলি কবির বৈশিষ্ট্য ও কবিকে চিহ্নিত করে। মিলটনের কাহিনীগুলি দু পাতায় বলা যেতে পারে—এই গুণেই মহাকাব্য (এপিক কবিতা) ছন্দে রচিত রোমান্স থেকে পৃথক। মিলটনের পদক্ষেপ দেখুন—তাঁর কঠিন প্রয়োগ, শ্রমসাধ্য পালিশ, গভীর আধিভৌতিক অনুসন্ধান, তাঁর মহান কবিতার প্রারম্ভে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা, যা কিছু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতো সবই তাঁর নিত্যপ্রয়োজনীয় ছিল। কোন মহাকাব্য লিখতে আমি যে কুড়ি বছরের কম সময় নেব তা মনে হয় না। দশ দশ বছর ও উপাদান সংগ্রহ করতে ও আমার মনকে বিশ্ব-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করতে লাগবে। আমাকে একজন চলনসই গণিতবিদ হতে হবে, খুব ভাল করে যন্ত্রবিদ্যা, তরলপদার্থ-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র জানতে হবে—তারপরে সমস্ত ভ্রমণকাহিনী, সমুদ্রযাত্রা ও ইতিহাস থেকে একজন ও বহু মানুষের মন জানতে হবে। এভাবে আমার দশ বছর কাটবে—পরের পাঁচবছর যাবে কবিতাটি লিখতে—এবং শেষ পাঁচবছর যাবে এটি সংশোধন করতে।

এভাবেই আমি হয়ত সেই ঐশ্বরিক ও সঠিক-উচ্চার ধ্বনি না শুনে লিখবো না, সেই বিশাল মানসিকতার সঙ্গেই কথা বলে যাবো যার জন্যে নক্ষত্রখচিত ও অম্লান মালাগুলি পূর্ব নির্ধারিত।

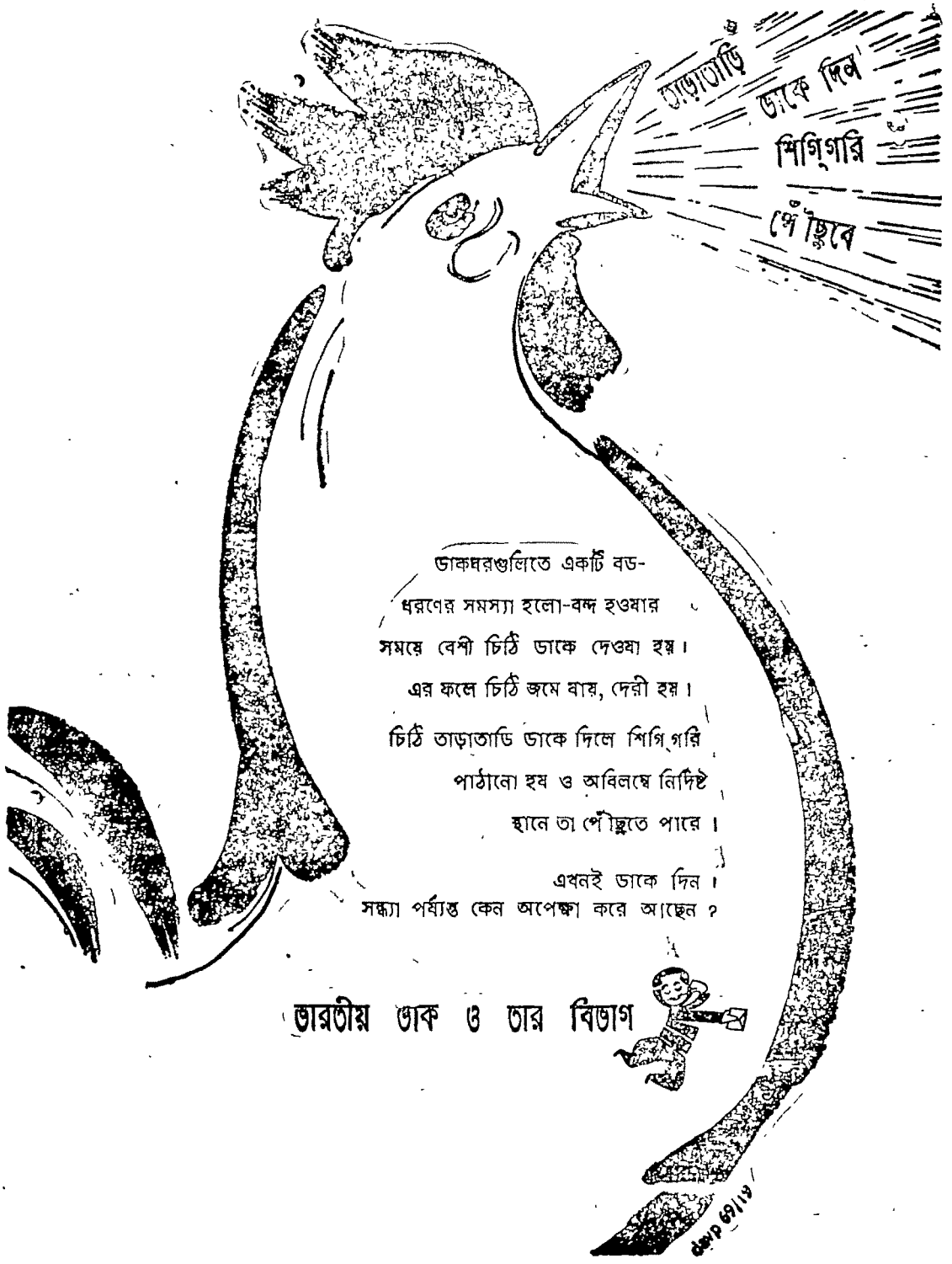

ডাকঘরগুলিতে একটি বড়-
ধরণের সমস্যা হলো-বন্ধ হওয়ার
সময়ে বেশী চিঠি ডাকে দেওয়া হয়।
এর ফলে চিঠি জমে যায়, দেরী হয়।
চিঠি তাড়াতাড়ি ডাকে দিলে শিগ্‌গির
পাঠানো হয় ও অবিলম্বে নির্দিষ্ট
স্থানে তা পৌঁছতে পারে।
এখনই ডাকে দিন।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেন অপেক্ষা করে আছেন ?

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

: উপন্যাস

কইতরা বিষ

উত্তরখণ্ড

মিহির মুখোপাধ্যায়

তেরো

চৈত্র মাস শেষ হয়ে এল। এর করেকটা দিন বাকি। বাংলা এগারো শ পঞ্চাশ সাল চলে যাচ্ছে।

অরো একটা বছর গেল। বয়স বাড়ছে। সময় চলে যাচ্ছে। অথচ এখন পর্য্যন্ত কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারা গেল না; উপার্জনের কোন স্থায়ী উপায় স্থির হ'ল না।

ঘর সংসারের ব্যবস্থা করাতো পরের কথা। ভুরশুট রাজবাড়ির ছেলে শেষকালে কি শ্বশুড়বাড়ির গলগ্রহ হয়ে কিংবা ভায়রাভাই-এর আশ্রিত হয়ে থাকবে, থাকতে বাধ্য হবে।

বিকেলবেলা সারদাগ্রামে শ্বশুরবাড়ির পুকুরঘাটে বসে সাতপাঁচ ভাবছিল ভারতচন্দ্র।

আজ চারদিন হ'ল শ্বশুববাড়ি এসেছে সে। পুত্রমুখ দর্শনে নাকি সর্ব ক্লেশ দুর হয়। বলেছিলেন শিবদাস মুখুজ্জে। কিন্তু ক্লেশ দুর হওয়া দুরের কথা। দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেছে।

রাধা চিরটাকাল এই বাপের বাড়িতেই পড়ে থাকবে। আর পাঁচটা কুলীন মেয়ের মত, খুড়তুতো বোন ওই সাবিত্রীর মত বাপ ভাইএর সংসারে মুখ বুজে খাটবে। ভাইপো ভাইঝিদের মানুষ করবে। অথচ নিজের ঘর, নিজের সংসারের জন্ত কত আগ্রহ, কত উৎসাহ রাধার।

সেই আগ্রহ, সেই উৎসাহের কোন মূল্য আজ পর্য্যন্ত দিতে পারল না ভারতচন্দ্র।

কিন্তু একটি বিষয়ে রাধা খুব সুখী, মনে মনে গর্ব। অন্ত অনেক কুলীন মেয়ের মত তার কোন সতীন কাঁটা নেই। তার স্বামী বিষয়বুদ্ধিহীন হতে পারে, নিরাশ্রয় ভবঘুরে হতে পারে। কিন্তু যেমন কন্দর্পকান্তি, তেমনি মধুর স্বভাব; যেমন নম্র, তেমনি চরিত্রবান। অন্ত পাঁচটা কুলীন বামুনের ছেলের মত বিয়ের ব্যবসা করার জন্ত ছোটে নি। শহরে বন্দরে যারা থাকে, তাদের নাকি অনেক রকম চরিত্রদোষ ঘটে, ঘটতে পারে। কই তার স্বামীর নামে সেরকম কোন কথা কখনো শোনে নি রাধা। 'এর আগেরবার যখন শ্বশুরবাড়ি এসেছিল ভারতচন্দ্র, সেবার, সেই অঘ্রাণ মাসে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল রাধা—এখানে সবাই আপনার খুব সুখ্যাতি করে, আমার সৌভাগ্যের কথা বলে—

—কি বলেন তারা—

—এতকাল আপনি যে আর বিয়ে করেন নি, কুলীনের কুলরক্ষা করার জন্ত আমার কোন সতীন জোটান নি, এটাই নাকি আমার ভাগ্য—

—কুলীনের কুলরক্ষার অবসর পেলুম কোথায়, নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত, তা'ছাড়া তোমার কথাই অনেক সময় মনে পড়েছে, অন্ত কারো কথা ভাববারও ফুরসৎ পাই নি—

—কিন্তু আপনি তো আমাকে আঠারো বছর চোখেই দেখেন নি, কি করে মনে থাকল—মুখ টিপে হেসেছিল রাধা।

—কেন, সেই যে প্রথম তোমাকে দেখেছিলুম আচার্যিমশাইর টোলের সামনে বকুলতলায় ফুল কুড়োতে, তোমার সেই

বালিকা বয়সের চেহারাই মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছিল, বিয়ের সময় তোমার ঘোমটা দেওয়া মুখখানিও আবছা আবছা মনে ছিল—তারপর হাসতে হাসতে নিজের বুকে হাত দিয়ে বলেছিল ভারতচন্দ্র—এখানে তুমিই ভারতেশ্বরী অখণ্ড সাম্রাজ্য তোমার—

—আহা, যান. কি যে বলেন—ঘোমটা টেনে বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিল রাধা।

এবার রাধার সঙ্গে নিরিবিলি কোন কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না। ভালভাবে দেখাই হ'ল না। এখনো আতুর ওঠে নি। বাড়ির ভেতর উঠোনে একপাশে আতুর ঘর।

প্রথম দিন বিকালে এসে আর ওদিকে যেতে পারে নি ভারত। সারারাত একা-একা বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেছে। এত কাছে এসেও রাধার সঙ্গে দেখা হ'ল না, কোন কথা বলতে পারল না। শেষরাতে আবছা ঘুমের মধ্যে যেন কচি গলার কান্না শুনতে পেয়েছিল।

পরের দিন সূর্যোদয়ের পর শুভসময় দেখে আতুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলের মুখ দেখেছিল ভারতচন্দ্র। ঠানদিদি ছেলেকে কোলে করে সামনে ধরেছিলেন। ফোকলা মুখে হেসে হেসে বলেছিলেন—ছাখো জামাই, ঘর আলো করা ছেলে, কি চোখ, কি নাক, কেমন ভুরু, হবে না কেন, কেমন বাবা-মার ছেলে দেখতে হবে তো—

চোখ বন্ধ, হাত মুঠ করা, পুতুল-পুতুল গড়ন। দশ দিনের শিশু। নাক-চোখের কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ল না। ঠানদিদি আপন মনেই রূপের প্রশংসা করে বললেন—কার মত হবে বলো ত জামাই, মায়ের মত না তোমার মত—

পেছন থেকে বললো সাবিত্রী—বাপের মত হবে,

ছাখো না, নাকের গড়ন ঠিক জামাইদাদার মত, আর গায়ের রঙ—

—না না—আপত্তি করলেন ঠানদিদি—চোখ ভুরু কপালের গড়ন ঠিক রাধির মত হয়েছে, মাতৃমুখী ছেলে খুব সুখী হয়—

তখন ভাবছিল ভারতচন্দ্র, তাঁর জীবনের পরীক্ষার মধ্যে ও এসেছে। তার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

ওর নাম রাখবে পরীক্ষিৎ। রাধাকে কথাটা বলার সুযোগ হ'ল না। আতুর ঘরের ভেতর একপাশে সমস্ত শরীর মুখ ঢেকে, বোধ হয় চোখ বুজে কেমন জড়োসড়োভাবে লজ্জিত ভঙ্গিতে শুয়েছিল রাধা।

পরের দিনই গোন্দলপাড়ায় ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল ভারতের। পাঠশালা কামাই করে এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু এরা ছাড়ছেন না। মাধবী, ঠানদিদি, সাবিত্রী। বিশ্বনাথ মুখে কিছু বলছে না বটে, তবে দু'চার দিন থেকে গেলে খুশি হয়। মোক্ষম যুক্তি দিয়েছেন শ্বশুরমশাই স্বয়ং।

নরোত্তম আচার্য বলেছেন—সামনে সংক্রান্তি, এখন আর যেও না, একেবারে সংক্রান্তি পার করে যাও—তারপর আরো দুটো দিন কেটেছে। আজ চতুর্থ দিন। সংক্রান্তির আরো দিন তিনেক বাকি।

এই সারদাগ্রাম একবারে অজ পাড়াগাঁ। এখানে এই গাঁয়ের মধ্যে পড়ে থাকলে দেশের কোনো অঞ্চলের কোনো খবরই কাণে আসে না। ফরাসডাঙায়, গোন্দলপাড়ায় প্রতিদিন দেশের নানাদিক থেকে নানা ধরণের লোকজনের আনাগোনা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাটনা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কলকাতা নৌকোয় করে লোক আসছে, লোক যাচ্ছে। সকাল বিকেল গঙ্গার ঘাটে গেলে কতরকমের খবরাখবর শোনা যায়, জানা যায়। আর সে সব খবর থেকে দেশের হালচাল বোঝা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-কূটনীতির হদিশ মেলে। আর এখানে এই চার-পাঁচদিন কোন খবরই পাচ্ছে না ভারত। অথচ মনে মনে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। বর্গীদের সঙ্গে নবাব আলীবর্দী

খাঁন আপোষের চেষ্টা চালাচ্ছেন, শুনে এসেছিল সে। সেই আপোষ আলোচনার ফলাফল কতদূর কি হ'ল।

যদি ভাগোয় ভাগোয় সন্ধি হয়, মিটমাট হয়ে যায়, তবে হয় তো মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তি পেয়ে যাবেন। নতুবা আরো কতদিন যে তাকে কয়েদ থাকতে হবে কে জানে, আর সেই সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ভাগ্যও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঝুলে থাকবে।

হয় তো গোলকপতির প্রস্তাব মতো কাশিমবাজার চলে গেলেই তার পক্ষে ভাল হ'ত।

হয় তো সে ভুল করেছে। সেই চাকরিটা এখনো আছে, না যদু বিশ্বাসমশাইর ভাগনে শশধর সেখানে বহাল হয়েছে, কে জানে। হয় তো শশধর এতদিনে কাশিমবাজার রওনা হয়ে গেছে। এখানে শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকার জন্য কোন খবরই জানতে পারছে না ভারতচন্দ্র। মনে মনে সে অস্থির হয়ে উঠেছে।

সেদিন দুপুরবেলা নবাব আলীবর্দী খাঁনের দু'জন প্রতিনিধি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলেন।

এ খবর আরো কয়েকদিন পরে জানতে পেরেছিল ভারতচন্দ্র। সেই প্রতিনিধি দু'জনের একজন হিন্দু, রাজা জানকীরাম। অপরজন মুসলমান, আফগান সর্দার মুস্তাফা খাঁ। তারা নাকি গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করে, খোদাতালার নামে কসম খেয়ে ভাস্কররামকে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন। কোন ভয় নেই, কোনরকম বেইমানী হবে না। বর্গীদের সর্দার স্বচ্ছন্দে নবাব বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন। সাক্ষাতের স্থান নির্দিষ্ট হ'ল গঙ্গার পূর্বতীরে মানকরার ময়দান। নবাব বাহাদুরের নির্দেশে সেখানে জমকালো বড় বড় সব তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা হ'ল।

আর একটা-দুটো নয়। বেশ কয়েক শত তাঁবু। বর্গী সর্দারদের উপহার উপঢৌকন দেবার জন্য দামীদামী সব জিনিষপত্তর সংগ্রহ শুরু হল। সাক্ষাতের দিন ধার্য হয়েছে দোসরা বৈশাখ।

এসব সংবাদ বরাবরই দু'তিন দিনের মধ্যে ফরাসডাঙ্গা পৌঁছে যায়। প্রতিদিন ফরাসীকুঠি, ডাচকুঠিতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ডাক-হরকরা আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু সারদাগ্রামে থাকার জন্য গত চারপাঁচ দিনের কোন খবরই তখন পর্য্যন্ত জানতে পারে নি ভারতচন্দ্র। চৈত্রসংক্রান্তির এখনো তিনদিন বাকি।

সন্ধ্যার মুখে শ্বশুরবাড়ির সামনে পুকুরঘাটে বসেছিল ভারত। ঘাটের পাশে সেই মহানিম গাছ। পুকুরের ওপারে একটা আমগাছে প্রচুর আম ধরেছে। এতদূর থেকে এখন আর নজরে পড়ছে না। গাছের পাতায় পাতায় একটু একটু করে অন্ধকার জমছিল। আকাশে গোধূলির আলো।

এখুনি আহ্নিকের জায়গা করে ডাক দেবে মাধবী। দুপুরে গুমোটের পর এখন ঠাণ্ডাঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল পুকুরের পাশ দিয়ে মাটির রাস্তা ধরে দু'জন লোক আসছে।

সামনের জন এ বাড়ির পুরনো চাকর শ্রীহরি। পেছনে এক হাতে লাঠি, আরেক হাতে কাপড়ের পুটুলি নিয়ে আরেক জন। কাছাকাছি আসতেই উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ভারতচন্দ্র। এ যে রঘুনাথ।

—একি, রঘু, তুই এ সময়, খবর কি?

মাথা নিচু করে পায়ের ধুলো নিল রঘুনাথ। তার পর মুখ তুলেই কেঁদে ফেলল।

তাড়াতাড়ি রঘুকে প্রায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল ভারতচন্দ্র—কিরে, কি হয়েছে, কাঁদছিস কেন?

—রাণীমা নাই—

—সেকি, কি হয়েছিল—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ভারতচন্দ্র।

—অনেকদিন খিকা ভুগতাছিলেন, তার পর আইল সাত-

দিন—চোখের জল মুছতে মুছতে ভাঙা ভাঙা গলায় জবাব দিল রঘুনাথ—শেষকালেও আপনার নাম করছিলেন, আপনারে খোঁজবার জন্যি খানাকুল গেলাম, সেখান থেকে এখেনে আসতিছি—

আর কোন কথা বলতে পারল না ভারতচন্দ্র। পুকুর ঘাটের পাশে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

চারপাশে সন্ধ্যার আবছায়া আলো দ্রুত নিবে যাচ্ছিল। মহানিমগাছের পাতায় পাতায় অন্ধকার জমছিল। পুকুরের জলে শেষ বেলার ম্লান ছায়া।

মা নেই। আর কোনদিন মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না। আ-শৈশব পরিচিত মায়ের সেই মধুর কণ্ঠস্বর আর কোনদিন শুনতে পাবে না। সে হয় তো আরো বহুদিন বাঁচবে, বহুজনের সঙ্গে পরিচিত হবে।

কিন্তু সেই মুখখানি আর কোনদিন দেখতে পাবে না। এতকাল সে যেখানেই থাক, যত দূরেই থাকুক, সবসময় মনে হয়েছে, ভুরশুটের বাড়িতে মা আছেন, মা তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন।

যে কোন দিন, যে কোন সময়, যে কোন অবস্থাতেই গিয়ে দাঁড়াবে সে, মা তাকে কখনো ফেলতে পারবেন না। আজ সেই মাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রায় সাত বছর আগে বর্ধমান রওনা হবার দিন মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা। যাবার আগে পায়ের ধুলো নেবার সময় বলেছিলেন—সাবধানে থাকিস বাবা, মধ্যে মধ্যে রঘুকে পাঠিয়ে খবর দিস, আমি কিন্তু দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকবো—

মা আর কোনদিন তাঁর এই হতভাগ্য ভবঘুরে ছোটছেলেটার জন্য দুশ্চিন্তাবোধ করবেন না।

সেদিন পেছন পেছন অন্দরমহলের সীমানা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। যেতে যেতে বলেছিলেন—এতদিন পরে তুই ফিরে এলি, আমার এমন কপাল, আর ক'টা দিন তোকে কাছে রাখতে পারলুম না—

মা আর কোনদিন তাকে কাছে রাখতে চাইবেন না, কাছাকাছি আর আসতেও পারবেন না।

মা এখন দূরের মানুষ। তাদের দু'জনের মধ্যে এখন অসীম শোকের সমুদ্র, অনন্ত রহস্যময় মৃত্যুর ব্যবধান।

শ্রীহরি বোধহয় বাড়ির ভেতরে খবর দিয়েছিল। সাবিত্রী, মাধবী এবং নরোত্তম আচার্য এসে রোয়াকে দাঁড়িয়েছেন। রঘুনাথের হাত ধরে তাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল ভারতচন্দ্র। সবাই নির্বাক। কারো মুখেই কোন কথা নেই। শুধু রঘুর ফোঁপানীর শব্দ। দমবন্ধ কয়েক মুহূর্ত পরে কান্নাভেজা গলায় বললো মাধবী—আপনি ভেতরে আসুন, আপনার আহ্নিকের জায়গা করে রেখেছি—

—না বৌমা, আমি আহ্নিক করতে পারবো না, আমার অশৌচ হয়েছে—মাথা নেড়ে আপত্তি করল ভারতচন্দ্র—তুমি বরং একখানা কুশাসন পেতে দাও, শুধু গায়ত্রীটা পড়ব—

তারপর নরোত্তম আচার্যকে লক্ষ্য করে বললো—আপনি অনুমতি দিন, কাল সকালেই আমি গোন্দলপাড়ায় ফিরে যেতে চাই—

—অশৌচের ক'টা দিন এখানে থেকে গেলে হ'ত না—কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন নরোত্তম—ওখানে গেলে, কে তর্পণের ব্যবস্থা করবে, হবিষ্যের যোগার করে দেবে, বরং এখানে—

—না, ওখানে গঙ্গার ঘাটে মায়ের শেষ কাজ করব, রঘু আমার সঙ্গে থাকবে, তা'ছাড়া ওখানে মেজদিদি আছেন, শিবদাসদাদা রয়েছেন, রামেশ্বর মুখুজ্জেমশাই আছেন, আমার কাজের কোন অসুবিধা হবে না—ছোটকর্তার এমন ধীরস্থির অবিচলিত ভাব দেখে, ঠাণ্ডা গলার কথাবার্তা শুনে রঘুনাথের কান্না থেমে গেল। উপস্থিত নিঃশব্দ, নির্বাক।

পরের দিন খুব ভোরে গোন্দলপাড়া রওনা হ'ল ভারতচন্দ্র। অশৌচের বেশ। খালি পা, পরনে শাদা থান ধুতি, গায়ে

উত্তরীয়, হাতে কুশাসন। পেছন পেছন রঘুনাথের হাতে লাঠি আর কাপড়ের পুটুলি। বিশ্বনাথ নদীর ঘাট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। যেতে যেতে মনে পড়ল ভারতের, অনেকদিন আগে বিশুদাদার অসুখের খবর পেয়ে এমনি এক সকালবেলা রঘুনাথের সঙ্গে দেবানন্দপুর থেকে ভুরশুট রওনা হয়েছিল সে।

চৌদ্দ

নবাব আলীবর্দী খাঁন এবং পণ্ডিত ভাস্কররাম কোল্‌হট্‌কর এবার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আলাপ-আলোচনা করবেন। সন্ধির শর্তাবলী পাকাপাকি হবে।

ভাগীরথীর পূর্বতীরে মানকরার ময়দান। নবাব বাহাদুরের হুকুমে এই ময়দানে বড় বড় তাঁবু খাটানো হ'ল। বর্গী সর্দারদের উপহার দেবার জন্য ভালোভালো জাতের ঘোড়া, উট, হাতি যোগাড় হতে লাগল। যুদ্ধের কোন উদ্যোগ নেই, কোন সতর্কতা নেই। অন্ততঃ নবাব-পক্ষের আয়োজন দেখে, ব্যস্ততা দেখে, সেই রকমই ধারণা হ'ল বাইরের লোকের।

নবাব-পক্ষের প্রধান শক্তি সেই আফগান গোলন্দাজ বাহিনীও যেন নিরুদ্যম, নির্বিকার। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান আফগান সর্দার মুস্তাফা খাঁ নিজে গিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে ভরসা দিয়ে এসেছেন, কথা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেওয়ান রাজা জানকীরাম। নবাব আলীবর্দী খাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। এই দুই দায়িত্বশীল রাজপুরুষ আশ্বাস দিয়েছেন, কথা দিয়ে গেছেন।

তাঁদের কথার খেলাপ হবে না নিশ্চয়ই, হওয়া উচিত নয়।

তথাপি নিশ্চিন্ত ছিলেন না ভাস্কররাম। সমগ্র রাঢ়বঙ্গে করেকশত গুপ্তচর আর সংবাদবাহক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিদিন প্রহরে প্রহরে দণ্ডে দণ্ডে দিগনগরের বর্গী শিবিরে সংবাদ আসছিল। নবাব বাহাদুরের তরফ থেকে লড়াই করার কোন উদ্যম, কোন আয়োজন, কোন সতর্কতার নিদর্শন কারো নজরে পড়েনি। আলীবর্দী খাঁনের কথা ও আচরণের কোন বৈষম্য নেই, কোন চাতুরীর চিহ্নমাত্র নেই। অন্ততঃ ভাস্কর পণ্ডিতের ধূর্ত গুপ্তচরেরাও কিছু আন্দাজ করতে পারেনি।

রঘুজী গায়কোয়াড় কিন্তু বরাবর সন্দিহান ছিলেন। এই আপোষ-রফার আয়োজনকে আগাগোড়া অবিশ্বাস করেছেন তিনি এবং এই অবিশ্বাসের কথা, সন্দেহের কথা স্পষ্টভাষায় প্রকাশও করেছেন।

অথচ ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর কোন পরামর্শ, কোন উপদেশই শুনলেন না। আলীভাই-র যোগ্যতার উপর, বুদ্ধিমত্তার উপর পণ্ডিতজীর অগাধ আস্থা।

শেষ পর্য্যন্ত রঘুজীর প্রস্তাব ছিল, সব কয়জন সর্দার একসঙ্গে নবাব শিবিরে না গিয়ে অন্ততঃ দশজন অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক সর্দার নিরাপদ ব্যবধানে প্রস্তুত হয়ে সতর্কভাবে অবস্থান করবেন। অপর অর্ধেক ভাস্কররামের সঙ্গে মানকরার নবাব-শিবিরে যাবেন।

কিন্তু এই প্রস্তাবও নাকচ করে দিলেন ভাস্কররাম এবং সদলবলে কাটোয়ার কাছে গঙ্গা পার হলেন। নিরুপায় রঘুজীও এলেন, আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলেন, কিছুতেই অন্য সকলের সঙ্গে মানকরায় নবাবের শিবিরে যাবেন না তিনি।

আশ্চর্য অনুভূতি শক্তি রঘুজীর। কোন দিক থেকে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই। তথাপি তার মনে হয়েছিল, কিছু একটা বিপদ ঘটবে। নির্দিষ্ট নিয়তি যেন ভাস্কররামকে বধ্যভূমির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

গঙ্গা পার হয়ে পলাশীর প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করলেন বর্গীবাহিনীর অধিনায়ক।

এখান থেকে মানকরার ময়দান নয়ক্রোশ উত্তরে। সেদিন পয়লা বৈশাখ।

সেদিন চন্দননগরের গঙ্গার ঘাটে বসে মায়ের শেষ কাজ করছিল ভারতচন্দ্র।

বাঁধানো ঘাটের পাশে শ্রাদ্ধের উপকরণ সাজানো হয়েছে। কিছুদূরে রঘুনাথ আর ভগীরথ বসে আছে। আর আছে মহাদেব। রামেশ্বর মুখুজ্জের ভাগনে মহাদেব চক্রবর্ত্তী। পাঠশালার এই বয়স্ক ছাত্রটি অশৌচের কটা দিন ছায়ার মত ভারতের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। নিঃশব্দে সাধ্যমত সাহায্য করেছে।

শুধু মহাদেব নয়। আজ প্রায় সাতমাস গোন্দলপাড়ায় এসেছে ভারতচন্দ্র। এই সাতমাসে এখানে যাদের সঙ্গেই কিছু আলাপ পরিচয় হয়েছে, কিছু জানাশোনা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তারা সকলেই এই অসময়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন।

শিবদাস মুখুজ্জে বলেছিলেন—তুমি কিছু ভেবোনা ভায়া, আমরা পাঁচজন যখন রয়েছি, আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেবো—

যমুনা বলেছিল—আপনি মনে কোন খেদ রাখবেন না, রায়-মশাই, আপনার মায়ের কাজ, যেরকম মন চায় তেমনিভাবে করবেন, খরচপত্তরের কথা ভাববেন না—

—আপনাদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না—ম্লান হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল ভারতচন্দ্র

অশৌচের বেশ, হাতে কুশাসন, খালি পা, থান কাপড় রুক্ষ চুল; একগাল দাড়ি।

বিষণ্ণ স্বরে বলেছিল—বলছেন তো দিদি, কিন্তু আমার হাতে টাকাকড়ি নেই বলতে কিছুই নেই, একেবারে কপর্দকশূন্য নিঃস্ব অবস্থা—

—আহা টাকার কথা তুমি ভাবছ কেন—বাধা দিয়েছিলেন শিবদাস—সেজন্য তো আমরা রয়েছি—

শেষ পর্য্যন্ত টাকার ব্যবস্থা করলেন শিবদাস। টাকা দিলেন রামেশ্বর মুখুজ্জে।

পঞ্চাশটি টাকা ভারতচন্দ্রের হাতে দিয়ে বললেন—তুমি নিশ্চিন্ত মনে মায়ের কাজ করো ভায়া, যদি লাগে আরো দেব—

নম্রভাবে বলেছিল ভারতচন্দ্র—আপনার এই উপকারের ঋণ কখনো শোধ দিতে পারবো না, কিন্তু একটি কথা, যদি আপনাদের আশীর্বাদে কখনো আমার সামর্থ্য হয়, তখন এই টাকা কয়টি আপনাকে অনুগ্রহ করে ফেরত নিতে হবে, কারণ মাতৃদায়ের ঋণ আমি রাখতে চাই না—

—সেতো নিশ্চয়ই, খুব খাঁটি কথা বলেছ তুমি—সায় দিয়েছিলেন রামেশ্বর মুখুজ্জে—ঠিক আছে, যখন তোমার সামর্থ্য হবে, ফেরত দেবে—

—আপনার উপকারের ঋণ শোধ দেবার নয়, অর্থ দিয়ে তার পরিমাপ হয় না, আপনার আশ্রয়ে আছি, আপনার অনুগ্রহে পাঠশালা খুলতে পেরেছি—ভারতের কথা শুনে বলেছিলেন রামেশ্বর—আহা ও সব কথা এখন থাক, আর এই অসময়ে তোমাকে সাহায্য করা তো আমাদের কর্তব্য, তুমি আমাদের স্বগোত্র, ভরদ্বাজ বংশের সন্তান, তিনরাত্রির জ্ঞাতিভাই আমরা, চৌধুরীমশাইর কাছে গেলেও তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য পেতে, কিন্তু তাঁর কাছে তোমাকে আমরা যেতে দেব কেন, হাজার হোক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তো আর আমাদের স্বগোত্রের কেউ নন, কি বলো হে শিবদাস—

—সে তো নিশ্চয়ই, একশোবার—সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিলেন শিবদাস—আমরা তোমাকে সেখানে যেতে দেব কেন, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ গতি—

রামেশ্বর মুখুজ্জের সব কথায় সায় দেবার জন্য সব সময় তৈরী থাকেন শিবদাস।

এ কথা মনে পড়তে সামান্য হাসির রেখা ফুটল ভারতের ঠোঁটে।

গঙ্গার ঘাটে পুরুতঠাকুর তখন মন্ত্র পড়াচ্ছেন—ভরদ্বাজ গোত্রাং মাতরম, মায়ের নাম বলুন—

ভারত বললো—ভবানী দেবী—

—হ্যাঁ, তা'হলে বলুন, ভরদ্বাজ গোত্রাং মাতরম্ ভবানীদেবীং এতৎসতিলোদকং তর্পয়ামি—

ঠাকুরমশাইর সংস্কৃত উচ্চারণ তেমন সুবিধের নয়। কানে কানে খট খট করে বাজছে।

কিন্তু কিছু বলা উচিত হবে না। কারণ এই পুরুতঠাকুরটি শিবদাসের প্রিয়পাত্র। তাদের বাড়ির ক্রিয়াকর্ম সব করেন। মাথার উপর বৈশাখের খাড়া রৌদ্র।

গঙ্গার জলে ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় রোদদুর চমকাচ্ছে। পাল তুলে মহাজনী ভড় উজান বেয়ে চলেছে। ওপার থেকে একখানি যাত্রী বোঝাই খেয়া নৌকো এসে এপারে ভিড়ল।

মায়ের সিঁদুর পরা মুখখানি চোখের সামনে এক একবার ভেসে উঠছিল। আবার আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বৈশাখের রৌদ্র, ওই আকাশ, ওই বহতা গঙ্গা, গঙ্গার ওপারে সবুজ বনরাজির মধ্যে মায়ের ম্লান মুখের ছবি যেন মিশে আছে।

ভুরশুটের বাড়িতে এখন নিশ্চয়ই বড়দা', মেজদা', ছোড়দা' শ্রাদ্ধের উপকরণ সাজিয়ে কাজে বসেছেন।

নিশ্চয়ই সেখানে খুব জাঁকজমক করে আয়োজন হয়েছে। পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

রঘুর মুখে যেটুকু খবর পেয়েছে, তা'তে মনে হ'ল, আগের অবস্থা না থাকলেও বড়দা' খুব ঘটা করেই মায়ের কাজ করবেন।

আর এখানে, মায়ের এই হতভাগ্য কনিষ্ঠ পুত্র ভিক্ষে করে, ঋণ করে সামান্য উপকরণে শুদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। ভাবতের চোখ দুটি জ্বালা করে উঠল।

পুরুত ঠাকুরমশাই হঠাৎ বলে উঠলেন—আহা, চোখের জল ফেলবেন না, এ সময় চোখের জল ফেলতে নেই, মনে মনে মায়ের চেহারা চিন্তা করুন, কল্পনা করুন, মা যেন আপনার কাজে তৃপ্ত হয়েছেন, হাসিমুখে আপনার শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করছেন, এখন বলুন আমার সঙ্গে সঙ্গে, ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—

ঠাকুরমশাইর সামনের দুটি দাঁত নেই। ফোকলা মুখের অশুদ্ধ উচ্চারণে বলছেন বটে, কিন্তু মন্ত্রটি ভারী সুন্দর।

বাতাস মধু বহন করছে, সিন্ধু মধু ক্ষরণ করছে, সূর্য মধুময়, পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা মধুমাখা।

(ক্রমশঃ)

In any language, it's sweet

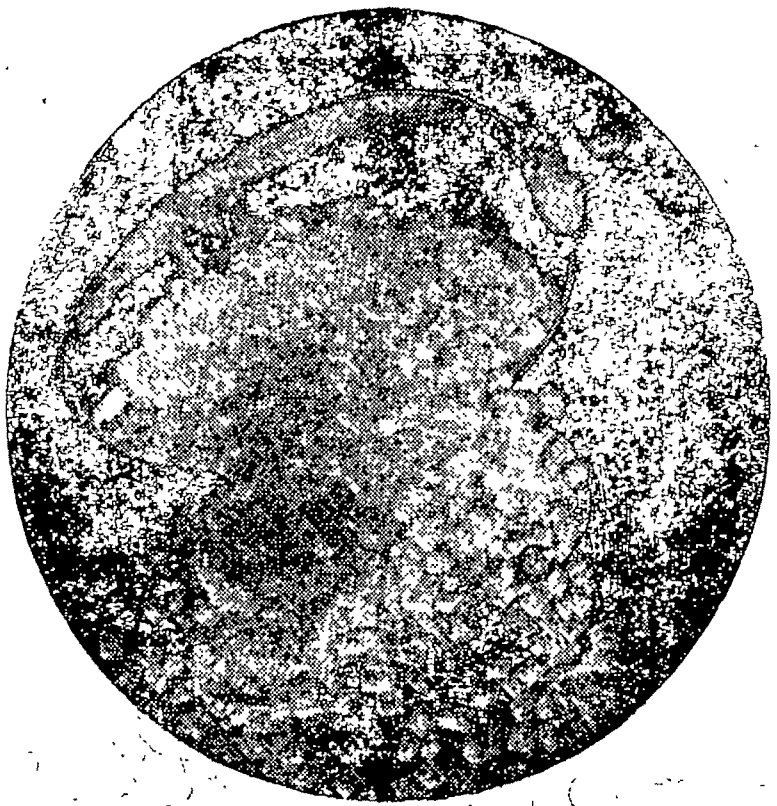

In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek.

One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other has been known to mankind from the neolithic age.

Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

Issued by :

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PVT. LTD.

Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

জাপানের দিনগুলি

বারীন বর্দ্ধন

এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে জাপানীরা খাদ্যের পর্যায়ে এনে ফেলেছে সি উইডস্ আর মাশরুমকে। এক বাটি ভাত এরা লাঞ্চে নিয়ে নেয় চল্লিশ ইয়েন দিয়ে। অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় তখনকার দিনে ছিল বার আনা। তার উপর ছড়ান সরাবিনের সস্ আর নয়ত সি উইডস। সঙ্গে যদি অক্টোপাসের চাটনী থাকে তো কথাই নেই। মহা উপাদেয় সেই খাদ্য। নয় ত নিয়ে নিল রেষ্টুরেণ্ট্ থেকে এক বাটি 'সোবা'। মাশ্রুম আর সুডলসে ভর্ত্তি। বার আনাতে হয়ে গেল পুরো লাঞ্চ্। খাবারের বিবরণ শুনলে হয় ত অনেকেই নাক সিঁটকে উঠবেন। কিন্তু খাবারের পরিমাণ যে দেশে অতিরিক্ত মাত্রায় অপ্রচুর সেখানে বাধ্য হয়ে সবাইকে এ অভ্যাস করতে হয়েছে; আরীমা সেন্সেই তাঁর বাড়ীতে খাওয়ালেন একদিন। একটি পদ দিয়ে খেতে হল ভাত। সুকিয়াকি বা চিনি দিয়ে তৈরী মাংসের ঝোল। এক পদ দিয়ে বাইরের লোককে বিশেষ করে বিদেশীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান ব্যাপারটা ভাবতে গেলেও অনেকে আঁৎকে উঠবেন। ভাববেন এ তো ডেকে এনে না খেতে দেওয়া। কিন্তু সবার মূলে রয়েছে ঐ এক কথা। অপ্রয়োজনীয় জিনিষ ছেঁটে ফেলে বাঁচবার চেষ্টা। তাই ভারতের জাপানী দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী দেশে ফিরে পাঁচ শ টাকায় সংসার চালিয়ে নেন। তাই ওনো সেনসেই ভাবেন তিন শ টাকা রোজগার করলে আরামটা হবে চরম এবং জীবনযাত্রা হবে ভাবনাহীন।

এই ২০শে নভেম্বরে আবার ফিরে আসা যাক। এই দিনটি নিয়ে কল্পনা হচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। আমাদের কোনই ধারণা ছিলনা এ সম্বন্ধে। তাই আমরা গুটিকয়েক বিদেশী ছিলাম পরম নির্বিকারে। আর জাপানীরা পারত-পক্ষে কাউকে কিছু বলে না। তাই জিজ্ঞাসা না করে জানবারও উপায় ছিল না। আমাদের ক্লাশ ঘরের ঠিক নীচেই ছিল বাদ্যযন্ত্রের ঘরটি এবং কয়দিন ধরে লাঞ্চের পর থেকেই শুনতে পাওয়া যেত বেহালা আর হারমোনিয়ামের সুর। অনেক সময় আবার শুনতাম সবাই মিলে কোরাস্ গান অভ্যাস করছে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল লেখাপড়ার ফাঁকে এরা নিজেদের একটু ভারমুক্ত করে নিচ্ছে বেহালা আর হারমোনিয়াম সহযোগে। কিন্তু সেই থেকে প্রতিদিনই সেই সুর, সেই গান কানে ভেসে আসতে লাগল।

কৌতূহল চাপতে না পেরে তাই একদিন আরীমা সেন্সেইকেই জিজ্ঞাসা করলাম—সেন্সেই, 'গাই গো'তে আবার গানের ক্লাশও রয়েছে নাকি?

সেদিনও যথারীতি গান বাজনা চলছে। প্রশ্নটার উৎস খুঁজে পেতে সেন্সেইর দেরী হল না।

তক্ষুণি বইপত্র বন্ধ করে বললেন—তোমরা হয়ত শুনে

থাকবে ২০শে নভেম্বর হচ্ছে 'গাই গোর' জন্মদিন। প্রতি-বছরই বেশ কয়দিন ধরে নানা রকমের আমোদ আহ্লাদ করা হয়। আমোদের একটা প্রধান অঙ্গ নাটক, থিয়েটার করা। প্রতি ক্লাশের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে অভিনয় করে এই দিনটিতে। ফরাসীভাষার ছাত্ররা অভিনয় করে ফরাসী নাটক। রুশীয় ভাষার ছেলেরা করে রুশ নাটক। অধ্যাপকরাও এতে পিছিয়ে নেই। আমরা এবার করছি গগল নিকলের লেখা ইনস্পেক্টর জেনারেল জাপানী অনুবাদ থেকে একটা অংশ।

বলেই আরীমা সেন্‌সেই একজনকে পাঠালেন প্রফেসর-দের ঘর থেকে কুবোতা সেনসেইকে ধরে আনবার জন্ত। সকালের ক্লাশ শেষ করে কুবোতা সেন্‌সেই কাগজপত্র ফুরোশিকিতে বেঁধে নিচ্ছিলেন। আরীমা সেনসেইর ডাক শুনে পণ্ডিতীয় ভঙ্গীতে ফুরোশিকি নিয়েই এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে।

আরীমা সেন্‌সেই এগিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে কি যেন বললেন। পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—২০শে নভেম্বর জাপানী বিভাগের ছেলেরা কি করবে?

—কেন, আমরাও থিয়েটার করব। সবাই সমস্বরে বলে উঠল। অন্ত ছেলেরা যদি বিদেশী ভাষায় নাটক করে তবে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? —অকাট্য যুক্তি।

সেদিনই টীচার দু'জনে খুঁজতে বেরোলেন সহজ সরল জাপানী নাটক। জাপানের মাটিতে প্রথম বিদেশী ছেলেরা জাপানী নাটক অভিনয় করছে। উৎসাহটা আমাদের চেয়ে টীচার দু'জনেরই ছিল অত্যধিক।

পরদিন কুবোতা বা আরীমা—কারুরই ক্লাশ ছিল না তবুও দু'জনেই এলেন বিকেলের দিকে এবং সবাইকে জানিয়ে গেলেন যে বাজারে উপযুক্ত নাটক পাওয়া যায় নি বলে আরীমা সেন্‌সেই নিজেই নাটক লিখবেন।

এই মহিলাটি চিরদিনই উৎসাহে স্ফূর্তিতে ভরপুর। এবং কথাবার্তার ফাঁকে রসিকতা করতে অদ্বিতীয়া। কাজেই তাঁর উৎসাহের প্রাবল্য কতটুকু তা আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাছাড়া এর আগে নিজেও অনেক নাট্যাভিনয় করেছেন। বিশেষ করে 'গাইগো'র জন্মদিনটিতে আরীমা সেনসেই ছাড়া কোন নাটকই জমে না। এবারেও নাকি একটা প্রধান স্ত্রীচরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন। কাজেই তাঁর উৎসাহের জোয়ারে নাটক তৈরী হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু লাজুক কুবোতা সেনসেই। নাটকের তিনিই হবেন পরিচালক আর আমরা সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল। ক্লাশে পড়াতে গিয়ে ঘেমে ওঠেন বহুবার। নাটকের পরিচালনা এবং তার আনুষঙ্গিক কাজকর্মগুলো কি করে সামলিয়ে উঠবেন এই কুবোতা সেনসেই। বিশেষতঃ অধ্যাপকদের প্রধান কুবোতা সেনসেই। নূতন খ্রীষ্টান তিনি। পিউরিটান ধরণের চলাফেরা। সুরুতেই পড়াশুনা ছেড়ে নাটক নভেল—তাঁর কাছ থেকে সাড়া আসবার কথা নয়। আর ছিলেন সাতো সেনসেই। তিনিও নিজের কাজে ব্যস্ত। শুধু পড়াতেই আসতেন কলেজে। রুশ ভাষায় পণ্ডিত। নিজের গবেষণাতেই ব্যস্ত। নাটক করবার ফুরসৎ কোথায়?

কিন্তু দু'দিনেই ধারণা পাল্টাতে হল। আরীমা এবং কুবোতা সেন্‌সেইর কার্য্যকলাপ দেখে বুঝলাম অসহযোগ যতই চলুক না কেন, এদের কাজ এরা গুছিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। তাছাড়া উৎসবদিনের প্রোগ্রামেও ছাপা হয়ে গিয়েছে বিদেশী ছাত্রদের নাট্যাভিনয়। যে ঘটনা জাপানের মাটিতে আর কোনদিন হয় নি।

সুরু হল রিহার্সাল। বিকেলে দৈনিক দু'ঘণ্টা। চারটি একাঙ্ক নাটক নিয়ে তৈরী হল প্রোগ্রাম। সবই বিদেশী ছেলেদের নিয়ে লেখা। কেবল 'ওচা নো ইউ' ছিল পুরোপুরি জাপানী জীবনের ধারারক্ষী। প্রথম অঙ্কে ছিল 'কাসানাশি রিউসাকুসেই'র একটা টুকরো ঘটনা।

বৃষ্টির দিনে ছাতা না নিয়ে বেরিয়ে বিদেশী ছেলে পথে কি করেছিল তারই বিবরণ। ফিলিপাইনের একটি মেয়ে অভিনয় করল প্রধান চরিত্রে আর ভিয়েৎনামের একটি ছেলে হল রিউগাকুসেই—বিদেশী ছাত্র। ঘটনার বহু উত্থানপতনের মধ্যে সে দৃশ্যটা শেষ হল আর সেই সঙ্গে দর্শকদের মাঝ থেকে উঠল হাততালির ঝড়।

আমাদের কারুরই নজরে পড়ে নি যে সারা হল ভরে গিয়েছে এই আনাড়ী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জাপানী নাটক দেখবার লোভে। হলের মাঝখানে বসান আছে একটা বিরাট টেলিভিশন ক্যামেরা। তা দিয়ে সারা সহরে দেখান হচ্ছে আমাদেরই অভিনয়। জেনে পুলকিত হবারই কথা। কুবোতা সেনসেই পরিচালনা করছেন আলোর প্রতিফলন এবং মিউজিক। ষ্টেজের দায়িত্ব নিয়েছেন আরীমা সেন্‌সেই। তাঁকে সাহায্য করছে 'গাইগোর'র কয়েকটি ছেলে। "কাসানাশি রিউগাকুসেইর" ঠিক পরেই ছিল 'ওচা নো ইউর" দৃশ্যটি।

ড্রপসিন্ উঠল ধীরে ধীরে। হাততালির ঝড় থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। প্রোগ্রাম যদিও রয়েছে সবাইর কাছে, তবু উন্মুখ হয়ে রয়েছে জনতা পরের দৃশ্যটির জন্য। কয়েকজন বিদেশী ছাত্রছাত্রী বিদেশের মাটিতে রূপায়িত করছে সে দেশেরই অতি প্রিয় এবং পুরোনো ঐতিহ্যবাহী একটি মুহূর্ত।

'ওচা নো ইউর' সাদা অর্থ হল চায়ের গরম জল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী এর মর্মার্থ। কেটলির মধ্যে চায়ের পাতা আর গরম জল ছেড়ে দিয়ে তৈরী হয় সবুজ চা। সঙ্গে থাকে নানা রকমের খাবার। সমস্ত রীতিনীতি মেনে পালন করা হয় আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং নগণ্য কাজটি। সবাই গোল হয়ে বসে তাতামি মোড়া মেঝের উপর। ঘরে ঢুকতে হবে মাথা নীচু করে। ঘরটি আকারে সাধারণত নয় ফিট্ লম্বা এবং চওড়া। তার মাঝখানে থাকে একটা উনোন যার পুরোটাই রয়েছে মেঝের ভিতরে। এর উপরেই কেটলিতে গরম করা হয় চায়ের জল। অনেকটা নীচু হয়ে সবাই ঢুকতে হয় একটা খোলা জায়গায় যেখান থেকে একটা সরু রাস্তা বাগানের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে জলে ভর্ত্তি চৌবাচ্চার কাছে। হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে সবাই এবার ঢুকবে আসল ঘরে যেখানে সব সাজান রয়েছে পরিপাটি করে। সেখানেই স্থির নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে উৎসবোন্মুখী জনতা।

পাশাপাশি বসে রয়েছে চারটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। ষ্টেজের উপর ব্যবস্থা হয়েছিল বলে এদিক সেদিক একটু পরিবর্ত্তন করা হয়েছিল। কিন্তু মূল উৎসবের কোথাও অঙ্গহানি করা হয়নি। তাই কিমোনোর বদলে ছেলেরা পরেছিল বিলেতী পোষাক। যদিও মেয়েটির পরনে ছিল দামী জাপানী কিমোনো। চুপ করে হাঁটু গেড়ে জাপানী কায়দায় বসে আছে পাঁচটি প্রাণী। ভারতের মিস্ ফিলিপস্ এবং মিষ্টার শা, সিলোনের মিষ্টার গুণতিলক, বর্মার মিষ্টার তানউইন এবং ভিয়েৎনামের মিষ্টার রিউ। সামনে সাজান রয়েছে পরিপাটি করে প্রত্যেকের জন্য একজোড়া চপ্‌ষ্টিক। আর রয়েছে সুদৃশ্য পালার প্লেটে কয়েক টুকরো কেক্।

মেয়েটি পরিপাটি করে চপ্‌ষ্টিক্ দু'টো আঙুলের দু ফাঁকে ধরে প্লেট থেকে তুলে নিল এক টুকরো কেক্ এবং পরক্ষণেই এগিয়ে দিল থালাটি বর্মার তানউইনের দিকে। প্রতিবারই এক একজন চপষ্টক দিয়ে কেক তুলে নিচ্ছে এবং সযত্নে এগিয়ে দিচ্ছে থালাটি পাশের সঙ্গীকে। থালাটি একবার সবাইকে ঘুরিয়ে আনতেই বাইরের দরজায় টোকা পড়ল। কে যেন ভিতরে আসতে চাইছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে চপ্‌ষ্টিক দু'টো এক পাশে রেখে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। কোন তাড়া নেই চলনভঙ্গীতে। দরজা দুফাঁক করে আগন্তুকের প্রতি সম্ভ্রম দেখাতে গিয়ে মিষ্টি হেসে হাঁটু গেড়ে ঐখানেই

বসে পড়ল। আগন্তুক আর কেউ নয়। ঐ বাড়ীরই পরিচারিকা।

কিন্তু তা হলে কি হয়! সম্মান দেখাতে গিয়ে কোনই ত্রুটি নেই পরিচারিকা হওয়ার দরুণ। পরিচারিকা কথাটির জাপানী প্রতিশব্দ—ও যোচুসান। কথাটা যোচু। ও এবং সান্—আগে পিছে দু'টো সম্ভ্রমার্থক শব্দ জুড়ে পরিচারিকাকে জাপানীরা দিয়েছে আপনারই পদমর্য্যাদা। তাই সে পরিচারিকা যদি ওচার কেটলি এবং কাপ্ নিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখে কর্ত্রীঠাকুরাণী ঐ রকম নতজানু হয়ে দরজার গোড়ায় বসে রয়েছে, তবে পাল্টা সম্মান দেখাতে গিয়ে দু'হাত আবদ্ধ থাকলেও উর্দ্ধাঙ্গ আনত করতে হবে বই কি। সেরকম করেই ওচার কেটলি এবং কাপ্ নিয়ে ষ্টেজে এসে ঢুকল ফিলিপাইনের মিসেস্ গাবোর্ণে—যিনি পরিচারিকার অভিনয় করছিলেন।

সযুজ চায়ের পেয়ালাতে কোন হাতল নেই। পেয়ালার বদলে বাটি বললে মানায় ভাল। হয়ত একটা বাটির উপর আরেকটা চাপিয়ে একবারেই পরিচারিকা কাজটি শেষ করতে পারত। কিন্তু, সৌন্দর্য্যপিপাসু, কলাকুশলী জাপানী জীবনে এ হেন রুচি বিগর্হিত কাজ কল্পনা করা যায় না। তাই পাঁচজনকে বাটি সাজিয়ে দিতে গিয়ে পরিচারিকাকে পাঁচবারই বাইরে যেতে হল। যতবারই বাইরে যাচ্ছে ঐ রকম নতজানু হয়ে দরজা বন্ধ করছে ধীরে, নিঃশব্দে। মিসেস্ গাবোর্ণে পরিচারিকার নিখুঁৎ অভিনয় করে গেল।

এই নতজানু হয়ে দরজা খুলে দেওয়া বা দরজা খুলে যাওয়া আসা—জাপানী এ আরেকটি গুণ যা এখনও মেনে চলে জাপানী সমাজ খাঁটি জাপানী পরিবেশে। বাড়ীঘর ঝকঝকে পরিষ্কার। তাতামি ঢাকা মেঝের উপর ধুলো কোথাও জমে নেই। তাই অম্লান বদনে দামী কিমোনো পরে বাড়ীর মেয়েরা তাতামির উপর বসে পড়ছে। কিন্তু ভঙ্গীটি বড় ভাল লাগল খুঁটিয়ে বিচার করতে গিয়ে। কোন জড়তা সঙ্কোচ নেই আগন্তুককে ঐ করে সম্মান জানাতে গিয়ে। শুধু যে নিজের বাড়ীতেই জাপানী মেয়েরা এই ভঙ্গীতে অভ্যর্থনা জানায় তা নয়। আরীমা সেনসেইকে দেখেছি হোটেলে খেতে গিয়েও নতজানু হয়ে দরজা খুলে দিচ্ছেন পরিচারিকাকে।

কয়দিন থেকে কথা হচ্ছিল আমরা যাব গিন্‌জার কোন এক বিশুদ্ধ জাপানী হোটেলে বা সরাইখানায় জাপানী খাবার খেতে। খাব জাপানের বিশিষ্ট খানা—তেন্‌পুরা। বাদ্যযন্ত্র তানপুরার সঙ্গে ধ্বনিগত মিল থাকার দরুণ অনেকে হয়ত সন্দেহ করবেন তেনপুরা খেতে হলে আগে থেকেই জিহ্বার স্বাদ তৈরী করতে হয় কিনা। যেমন কানকে আগে থেকে তৈরী করে নেন শ্রোতার দল তানপুরা সহযোগে মার্গসঙ্গীত শুনতে যাবার আগে। কিন্তু সেরকম কোন ভয়াবহ ব্যাপার ছিলনা তেনপুরা আস্বাদনে। এই অভিযানে নেত্রী ছিলেন আরীমা সেনসেই।

নিতান্তই নিরীহ ছিল এই খাবার এবং ততোধিক সাদাসিধে তার পাকপ্রণালী। নির্দিষ্ট দিনে বিকেলে আমরা সবাই গিয়ে জড় হলাম টোকিও ষ্টেশনে, দাইমারু ডিপার্টমেণ্ট্ ষ্টোরের ঠিক নীচে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হল মিনিট পনর। গিয়ে পৌঁছুলাম হোটেলের দরজায়। বাইরে শুধু আছে একটা তোরাফ্ টি বা বামনগাছ। জাপানীরা যাকে বলে বন্‌সাই। ছোট্ট টবে দু'তিন হাত উঁচু গাছটি। তবু ধরে আছে অগণিত ফুল আর ফল। প্রতি হোটেলের সামনেই আছে বামনগাছ। ছোট্ট হোটেল। অবস্থিতিও ছিল এক অতি সরু গলির মধ্যে। মনটা দমে গেল সুরুতেই।

আরীমা সেন্‌সেই বোধহয় প্রায়ই আনাগোনা করেন এই হোটেলে। তাই তাঁকে ঢুকতে দেখেই সাড়া পড়ে গেল ওযোচুসানদের মধ্যে। একটু পরেই এক সুবেশা তরুণী এসে নতজানু হয়ে এগিয়ে দিল ঘাসের চটি। আর সবার

হাত থেকে নিয়ে গেল বাড়তি জিনিষের বহর—ওভারকোট, ছাতা ইত্যাদি।

এক কোণে জিনিষগুলোকে রেখে ওযোচুসান্ এবার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে অতি পরিচিত গন্ধ নাকে ভেসে এল। যেন বাংলাদেশেই কোন রান্নাঘরের পাশ দিয়ে চলেছি আমরা। ওযোচুসান্ আমাদের নিয়ে এল সোজা ড্রইং রুমে। ড্রইং রুমের মধ্যিখানে চিরাচরিত প্রথায় রাখা হয়েছে একটা জলচৌকি। তার চারদিকে আছে খানকয়েক গদী। সুবেশা তরুণী আমাদের পৌঁছে দিয়ে ঐ রকম নতজানু হয়ে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল এবং বাইরে থেকে আবার নতজানু হয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল। বসে বসে আমরা এদিক সেদিক দেখছি। একই ধরণের জাপানী ঘর। যেন ঘর তৈরী করতেও এরা মেনে চলে পুঁথিগত কোন বিধি। হঠাৎ বাইরে থেকে টোকা পড়ল বন্ধ দরজার উপর। আরীমা সেনসেই কিমোনো পড়ে এসেছিলেন। উঠে গিয়ে ওযোচুসানের ভঙ্গীতেই দরজাটি খুলে পাশে নতজানু হয়ে বসে রইলেন যতক্ষণ না ওযোচুসান কেটলি এবং পেয়ালা হাতে ঢুকল। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখেছিলাম ওচা নো ইউ উৎসবে। তেনপুরার মধ্যে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে এর পরিবেশটি ছিল বড় অদ্ভুত।

পাঁচজন আমরা খেতে বসেছি মেঝের উপর। সামনে উঁচু টেবিলে চীনেমাটির বাটিতে ভাত বেড়ে দিল পাচক। দু'হাত দূরেই পাচক ঠিক ইওরোপীয় বাবুর্চির কায়দায় মাথায় সাদা টুপী পরে বিরাট কড়াইতে ভাজছে ছোট ছোট আয়ুমাছ। দেখতে অনেকটা বাটামাছের মত। বেশন দিয়ে ভাজছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁঝরী হাতা দিয়ে চেলে দিচ্ছে আমাদের প্লেটে। সাদা ভাতের ডেলা মুখে পুরে দিচ্ছি আর কামড়ে নিচ্ছি গরম ভাজা মাছের অর্দ্ধেক। খাওয়া চলল কিছুক্ষণ। বহুদিন পর নোনাজলের মাছের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আমরা ভারতীয় কয়জন গোগ্রাসে গিলছিলাম ভাতের মণ্ড। মিষ্টি জলের মাছ বলেই নাকি এরা সব অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। খেয়েই চলেছি আমরা মুখ না তুলে। হঠাৎ ভোজবাজীর মত পাচক তার উনোন কড়াই, হাঁড়ী, খুন্তি সমেত সেকেণ্ডে কোথায় মিলিয়ে গেল ঠাহর করতে পারলাম না। তার বদলে সামনে এসে দাঁড়াল দুটো প্রকাণ্ড জাপানী ডল। হাতে তাদের পাখা। খেতে খেতে যাতে আমাদের শ্রান্তি না আসে তারই জন্য গেইসা দু'জন পাখা নিয়ে হাওয়া করতে ব্যস্ত। আমরা সবাই থমকে গেলাম এই হঠাৎ পটপরিবর্তন দেখে।

প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে তাই জিজ্ঞাসা করলাম—সেন্‌সেই, এ ভোজবাজীটা বুঝলাম না তো?

আরীমা সেনসেই মাত্র মাছের মুড়োটা আধেক চিবিয়েছেন। ইসারায় অপেক্ষা করতে বলে মুড়োটা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করলেন। পরে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বললেন—সরাইখানার পাচকের বসবার জায়গাটা ইচ্ছামত ঘোরান চলে। আমাদের যতটা খাবার দেবার কথা ছিল, তা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাই পাচক চলে গিয়েছে পাশের ঘরে অপেক্ষারত অতিথিদের পরিবেশন করতে। সময়ের মূল্য আছে তো?

কলিকাতার নাটঘরে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ দেখেছিলাম। দৃশ্যপট বদলাতে সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে তাদের সৃষ্টি। তারই চেহারা এখানেও। ঐ পাচকচক্রকে ঘিরে আছে অন্ততঃ পাঁচ ছয়টি খাবার ঘর। এবং তাতে এসে জড় হয়েছে তেনপুরালোভী আমাদের মতই দেশীবিদেশী পাঁচ-মেশালী ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। তাই পাচক তার মালমসলা নিয়ে চলে গেল লাইনের দ্বিতীয় দলের তদারকে। যাবার আগে মৌখিক বিদায় সম্ভাষণ করা হল না, যা জাপানী সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু তারজন্য রেখে গেল মনোমুগ্ধকর সুবেশা গেইসা দু'জনকে। সন্ধ্যাটা মনে গেঁথে রয়েছে চিরদিনের মত। (ক্রমশঃ)

আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে, সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী. এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

পূর্ব প্রকাশিতের পর

জাতীয়তার রূপায়ন

দীপঙ্কর

এইটাই হইল একদিক। অপর আরেকটী দিকও রহিয়াছে। ইহা সর্বকালের সর্বদেশের ইতিহাস। একদিকে ভারতের মঠ-মন্দিরে বহু সাধকের সাধনা চলিয়াছিল অপরদিকে চলিয়াছিল রাজা-বাদশার রাজত্ব। কয়েকশত বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, মুঘল বাদ্‌শাহেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। পর পর বংশানুক্রমে তাহাদের রাজত্ব চলিল, বাবর-আকবর-ঔরঙ্গজেব। সে-সময়ও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ধর্মরক্ষার্থে ভারতের বীর যোদ্ধাগণ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে অসি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে রাণা প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য এবং চাঁদরায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব শেষে বাংলার শেষ নায়ক সিরাজদৌল্লা পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হইলেন ইংরাজের কাছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের বুকের রক্তেরাঙা পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হইল স্বাধীনতা-সূর্য। তখন হইতেই ভারতের মাটিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন,—লর্ড ক্লাইভের শাসন। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজ্য বিস্তার। সাত সমুদ্র তের নদী পারের শ্বেত বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। কিন্তু তাহাতেও ভারতবর্ষের মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যু না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন: সনাতনী ধর্ম্মাবলম্বী আর্যজাতির মধ্যে সেই সনাতনী উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে সঞ্জীবনী সুধাধারা নির্গত হইয়া জাতির প্রাণরক্ষা করিত। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম সেই অমৃত সিঞ্চন করিয়া মরণাহত ভারতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। [ধর্ম্ম ও জাতীয়তা, পৃঃ ৭৩]

ইংরাজ রাজত্বের এই সময়কে ভারতীয় জনজীবনের সুসময় বলিয়া অভিহিত করা যায় না। বিশাল এ-দেশ, বহু আছে রাজ্য। অরবিন্দ বলিয়াছেন: এক দেশে নানা ভাষা ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়।

[ধর্ম্ম ও জাতীয়তা পৃঃ ৭৪]

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আবার বলিয়াছেন: তথাপি ভয় নাই; এক দেশ এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্টি হইবেই হইবে, হয় বর্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নূতন ভাষা ব্যবহার করিবে। এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না, মায়ের প্রয়োজন মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না। তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ অতিক্রম করে বিনষ্ট করে জয়ী হয়।

[ধর্ম্ম ও জাতীয়তা পৃঃ ৮০-৮১]

ছিন্ন ভিন্ন ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে প্রথম জাতীয়তাবোধের ভাবকে বীজরূপে বপন করা তাই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু কাজ যতই দুরূহ হউক, শক্তিমান মানুষই অসীম শক্তি নিয়া সে মহান পবিত্র কাজের গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায়

মহাশয় তাহার 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগরিত হইবার বাধা কোথায় এবং কি ভাবে সেই বাধা দূর করিয়া ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একটি অখণ্ড শক্তিশালী জাতিরূপে সুসংবদ্ধ করা যাইতে পারে সে ভাবনা রামমোহনের মধ্যেই প্রথম উদ্ভাষিত হইয়াছিল।

[পৃঃ ১২]

রাজনৈতিক চেতনায় অনগ্রসর ভারতীয়গণ শোষিত হইয়াও শাসকশ্রেণী সম্বন্ধে তেমন কোন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন বোধ করে নাই। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার মুক্তি সংগ্রাম পুস্তকে বলিয়াছেন, "আমাদের পূর্ববর্তীদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রান্তি এবং মূঢ়তা ছিলো এই যে ভারতে আগত ব্রিটিশদের চরিত্র এবং কী ভূমিকা তারা গ্রহণ করবে তা তাঁরা গোড়াতেই বুঝতে পারেনি। অতীতকালে অসংখ্য উপজাতি ভারতবর্ষে এসে প্রবেশ করেছে এবং ভারতবর্ষকেই তাদের দেশ বলে গ্রহণ করেছে। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা হয়তো ভেবেছিলেন যে, ব্রিটিশরাও ঠিক এমনই আর একটি উপজাতি। অনেক পরে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটিশরা শুধু রাজ্য জয় আর লুণ্ঠন চালাতেই এদেশে এসেছে, বসবাস করতে আসেনি। সারাদেশের লোক সে কথা বুঝতে পারামাত্র ১৮৫৭ সনে একটি বিরাট বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাকে "সিপাহী বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সত্যের বিকৃতি ঘটেছে। ভারতবাসীরা মনে করেন যে, এই বিপ্লবই হলো তাঁদের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম।"

[পৃঃ ২]

ইংরাজ কর্তৃক আখ্যায়িত সিপাহীবিদ্রোহ যে প্রকৃত পক্ষে শুধু সিপাহীদেরই বিদ্রোহ নহে উহা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়, সুভাষচন্দ্রের এই দৃঢ় প্রত্যয়ই অনেকের বিশ্বাস। অবশ্য এই সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিতে পারেন। তবে ইহাও ঠিক যে ভারতের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তখনও শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায় নাই। জাতীয়তাবোধের এ-নবজাগরণ আমাদের দেশের তৎকালীন নেতা বা দেশপ্রেমিকদের চোখেও ধরা পড়িয়াছিল। আমাদের দেশের দেশপ্রেমিকদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় বৈদেশিক দুই একজনও তৎকালীন পরিবেশে ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবোধকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। Sir John Seelly'র 'Expansion of England' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "There is then no Indian Nationality though there are some germs out of which we can conceive an Indian Nationality developing itself. It is this fact and not some enormous superiority on the part of the English race that makes our Empire in India possible.....Now if the feeling of Common Nationality began to exist then only feebly, if without inspiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion that it was Shameful to assist him in maintaining his dominion, from that day only almost our Empire would cease to exist."

[স্বরাজের পথে: অধ্যাপক অনিলবরণ রায়, পৃঃ ৫]

অর্থাৎ তখনকার দিনে, সেই পরিবেশেও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে মানুষ সচেতন ছিল কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি তেমন করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। ইংরাজ লেখকের চোখে তাহা ধরা পড়িয়াছিল বলিয়াই তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আগত দিনের যে ক্ষণে ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিরাট আকার ধারণ করিবে এবং মনে মনে উপলব্ধি করিবে যে, তাহাদের দেশে প্রভুত্ব করিতে ইংরেজদের কোন

প্রকার সহায়তা করা তাহাদের পক্ষে লজ্জাকর সেই দিনই ভারতের বুকে ইংরাজের রাজত্ব করা শেষ হইবে।

দৃষ্টান্ত মানুষকে শিক্ষা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহ স্তিমিত হইলেও দেশপ্রীতির অন্তরালে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ তখন হইতে ক্রমবর্দ্ধমান। অপরদিকে অন্ত আর একটি কুফল প্রকট হইয়া দেখা দেয়। ইংরাজ দেশের প্রভু, ভারতবর্ষ তাহাদের রাজত্ব। দেশবাসী অনেকেই তৎকালীন সময়ে প্রভুদের অনুকরণ করিবার মানসে একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল। এদেশে শিক্ষার আলো বিস্তার করিবার জন্ত তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজীভাষাকে আমাদের দেশে শিক্ষার বাহনরূপে প্রচলিত করিত। আমাদের দেশে মহামতী ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টাকে কোন প্রকারেই দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই কিন্তু তাহা বলিয়া সমগ্রভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্ত ইংরাজ জাতির চেষ্টাকে উদ্দেশ্যবিহীন বলা চলে না। তাহাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে খৃষ্টধর্মের বহুল প্রচার করা আর সেই সঙ্গে ভারত-বাসীর মনে ইংরাজের উপর একটা অনুরাগ জন্মান। তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষে খৃষ্টান-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কম নহে এবং ইংরাজী পুস্তকের এক-পৃষ্ঠা শিখিয়া প্যাণ্ট-কোট পরিধান পূর্বক সাহেবের সাজে সজ্জিত হইবার একটা প্লাবন দেশে তখন সত্যই আসিয়াছিল।

কিন্তু দাঁড়কাকের সর্বাঙ্গ ময়ূরের বর্ণাঢ্য পুচ্ছদ্বারা আবৃত করিলেও দাঁ কাক কখনও ময়ূরে রূপান্তরিত হইতে পারে না। কালো-আদমী শ্বেত হইবে কি করিয়া? সাহেব সাজার বৃথা চেষ্টায় যে সময় অতিবাহিত করিয়াছে সে-সময়কে ভারতবর্ষের মহামূল্য সময়ের অপব্যয় হইয়াছে বলিয়াই ধরা যায়। অবশ্য এই অনুকরণ প্রিয়তা যে সর্বভারতীয় সমস্যা বা ভারতবাসীর প্রত্যেকের জীবনেই দেখা দিয়াছিল তাহা নহে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ তেজ-বীর্য লইয়া মুক্তিকামী বা স্বাধীনতা প্রয়াসী আমাদের দেশে তখনও ছিল। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালের ইতিহাস তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ছোট-খাট দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলেও প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল সম্রাট আকবরের বিরাট, বিশাল রণকৌশলী সৈন্তের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচশত সৈন্ত লইয়া রাণা প্রতাপ তাহার মাতৃভূমি চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত হলদিঘাটার গিরিপথে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাণাপ্রতাপ পরাজিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরাজিত হইয়াও পরাজয়ের গ্লানিমা লিপ্ত না হইয়া ভারতের ইতিহাসে রাণা প্রতাপের নাম স্বর্ণাক্ষরেই লিখিত রহিয়াছে। ইহার পর ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতের বুকে আমরা অপর আর একজন স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমিকের আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই। তিনি মহারাষ্ট্র নায়ক দেশপূজ্য শিবাজী। তাঁহার কল্পনা, স্বপ্ন এবং আজীবন সাধনা ছিল অসীম ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী মুঘল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ভারতের বুকে স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্য স্থাপন করেন। শিবাজী ঔরঙ্গজেবের সংগে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর এই অভ্যুত্থান ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে পরিগণিত। রাণা প্রতাপ এবং শিবাজী এই দুই দেশ-প্রেমিকের জীবনে ঐ সব যুদ্ধের ফলাফল বিচার্য নহে,—বিচার্য বিষয় হইল তাহাদের দেশপ্রেম, দেশপ্রীতি যাহার উন্মাদনায় মহান শক্তির বিরুদ্ধে সীমিত শক্তি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে তাহারা পশ্চাদপদ হন নাই। এখানেই স্বাধীনতাকামী বীরের বীরত্ব, জাতীয়তাবোধের প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

মুঘল যুগের পরবর্তীকালে ইংরাজ রাজত্বের সময় সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের প্রান্তে প্রান্তে তাই মানুষের মনোরাজ্যে নূতন চেতনার উষালগ্ন দেখা দেয়। কাজের বিচারে, ধর্মে কর্মে এবং জাতীয়তাবোধের সাধনায় ১৮৫৬

সন হইতে ১৮৭০ সন পর্যন্ত সময়কে স্বর্ণপ্রসবিনী কাল বলা যায়। ঠাকুর পরিবারের মহান ঋষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে পূর্ণ উদ্যমে তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং সংগঠন করেন। প্রাতঃস্মরণীয় সমাজ সংস্কারক, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একাধারে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে মন-প্রাণ নিয়োজিত করেন এবং অন্য দিকে 'না জাগিলে বঙ্গ ললনা এ-ভারত কভু জাগে না জাগে না' এই সিদ্ধান্তকে স্থির সিদ্ধান্ত ও একান্ত কর্তব্য মনে করিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষার আলোবিস্তারে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। কারণ ভারতবর্ষের মঙ্গল স্ত্রীজাতির জাগরণ না হইলে সম্ভব নহে। নীল নীলিমায় উড়িবার জন্য পক্ষীর দুই খানা পক্ষই প্রয়োজন, এক পক্ষে পক্ষীর উড্ডীন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই মতে বিশ্বাসী স্বামী বিবেকানন্দও নারী জাগরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

এই সময় নীল চাষের প্রসার হয় এবং নীলকর সাহেবদের সংগে বিবাদ ও হাঙ্গামা সংঘটিত হইয়া দেশের বুকে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়। সে-সময়ের দৈনিক সংবাদ প্রভাকর কাগজে ১৮৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল, "পাবনা জেলার কোন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে (সম্প্রতি) যে বিবাদ হয়, তাহা অতি ভয়ানক। উভয় পক্ষ রণস্থলে হস্তি পর্যন্ত উপস্থিত করিয়াছিলেন, অস্ত্রপাণি ও যষ্ঠিধারী বহুলোক রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, শান্তিরক্ষকগণ তাহাদিগের কিছুই করিতে পারেন নাই। এই বিবাদ বহুদিবস অবধি চলিয়াছিল কৃষকেরা ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্ত হয় নাই।" এই সব বিবাদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হিন্দু প্যাট্রিয়ট নামক কাগজে। অশিক্ষার অন্ধকারকে চিরতরে বিদূরিত করিয়া সেখানে শিক্ষার আলো বিস্তারের আকাঙ্খায় কলিকাতা মহানগরীর বুকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জনপদবাসী এবং শহরবাসীগণের সত্য এবং ন্যায় বিচারের আকাঙ্খিত জায়গা কলিকাতা হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক বিরাট দিকপালের আবির্ভাব দেখা যায়। ইনি কপোতাক্ষীর পুণ্যতোয়া বিধৌত অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক সাগড়দাড়ির মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

উপরোক্ত এই সময়কে ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ অথবা মহেন্দ্রক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিলেও দোষ ত্রুটীর অভাব ছিল না। দেশবাসীর অবস্থা তখন যেন অসহায় অবস্থায় হতাশায় ম্লান। চক্ষুর সম্মুখে ইংরাজ, ইংরাজের রাজত্ব এবং ইংরাজের স্বদেশ প্রেম। স্বদেশ প্রেমই তাহাদের জীবনে একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাহারা ব্যক্তিগত জীবনে সংসারে সংসারী হইয়াও নিজস্ব জীবন ও সংসারের কথাকে স্বদেশপ্রেমের কাছে তুচ্ছ মনে করে। অধ্যাপক অনিল বরণ রায় তাহার 'স্বরাজের পথে' গ্রন্থে ইংরাজদের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "মানুষ হইয়া মনুষ্যত্বের দাবী ভুলিতে পারে, তাহারা খৃষ্টান হইয়া মঙ্গলময় যীশুখৃষ্টকে ভুলিতে পারে তথাপি তাহারা স্বদেশের কল্যাণ ভুলিতে পারে না। দেশের জন্য নেলসন সৈনিক হইয়াও সেনাপতির আদেশ অবহেলা করিয়াছিলেন, দেশের জন্য ক্লাইভ ও ওয়ারেণহেষ্টিংস্ সয়তানেরও উপাসনা করিয়াছিলেন।" [পৃঃ ২০]

অথচ আমাদের দেশের নাগরিকদের চরিত্রকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে স্বামী বিবেকানন্দের মতে দেখা যায়, "চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই আছে প্রবল ঈর্ষা স্বজাতি বিদ্বেষ।"

[বিবেক-রশ্মি. রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, পৃঃ ৩৫]

এই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাহার 'বিবেকানন্দ চরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—যখন আমরা সংস্কারের আবর্তে পড়িয়া কোন পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত হইতেছিল, সমগ্রজাতির সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পর সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, বিজাতীয় পথে স্বজাতির সংস্কাররথ যখন আর চলিতে না পারিয়া প্রায় থমকিয়া যাইতেছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কার ফল চিন্তা করিয়া যখন আমরা একরূপ হতাশভাবে বসিয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই, তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোড়িত ও মথিত বাঙালী-সমাজের জঠর হইতে আবির্ভূত হইলেন—স্বামী বিবেকানন্দ।" [পৃঃ ৩৩]

স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিভ্রান্ত দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "তোমাদের প্রাণে কি একবারও ইহা জাগে যে, এই দেশের কোটী কোটী নরনারী কতকাল ধরিয়া ঘৃণিত পশুর মত চরম দারিদ্র্য ও চরম দুর্দশা ভোগ করিতেছে? সে চিন্তা কি তোমাদের অস্থির করিয়া তোলে—আহার নিদ্রা ত্যাগ করায়? দেশের এই দুর্গতি মোচনের জন্য তোমরা কেহ কি নাম-যশ, ধন, জন, পুত্র-পরিবার এমন কি নিজের দেহের প্রতিও মমতা ত্যাগ করিতে পার? এই জীবন্মৃত অভাগাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন উপায়, কোন পন্থা কি তোমরা স্থির করিয়াছ? সেই বজ্রকঠিন সংকল্প কি তোমাদের আছে, যাহার বলে পর্বতপ্রমাণ বাধাও নিমেষে অপসারিত হয়? সমস্ত জগৎ যদি তরবারি হস্তে তোমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় তথাপি তুমি যাহা সত্য মনে করিয়াছ, তাহা সাধন করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হইবে না—মনের এই বল ও প্রাণের সেই প্রেম যদি থাকে, তবে তোমাদের যে-কেহ অতিশয় অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে পারিবে।

[বিবেক-রশ্মি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর পৃঃ ৫৩]

(ক্রমশঃ)

(সম্পাদকীয়—৬৬৮ পাতার পর)

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পি, এল ৪২০র টাকা থেকে বিনিয়োগ বাবদ, বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা, ডিপ্রিসিয়েশন এবং সুদবাহক রিজার্ভ ফাণ্ড এবং আয়কর, সুপার ট্যাক্স খাতে আমানতের দায়ও সরকারকে মেটাতে হবে। সরকারী ঋণ (Public Debt) এবং এই দায় মিলিয়ে ১৯৭০-৭১-এর শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮,৮৫৪·৮২ কোটি টাকা। পাকিস্তানের কাছ থেকে ৩০০ কোটি টাকা গত ২২ বছর যাবৎ দেশ বিভাগের ঋণের খাতে বাজেটে ধরা হয়ে থাকলেও, এই টাকার কোনো কিস্তিই পাকিস্তান আজ পর্যন্ত পরিশোধ করে নাই। সুতরাং এই ঋণ কার্যত ভারতসরকারের উপর বর্তাচ্ছে।

১৯৭০-৭১ এর শেষে বৈদেশিক ঋণের দেশ-ওয়ারী পরিমাণ দাঁড়াবে আমেরিকা: ৩৬৩৪·৬৮ কোটি টাকা, রাশিয়া: ৩৫৪·৭৫ কোটি টাকা, পশ্চিম জার্মানী ৩১৬·৪১ কোটি টাকা। ব্রিটেন: ৫৫৭·৬৯ কোটি টাকা, জাপান: ২২৫·৫৫ কোটি টাকা। বাজেটের উচ্চাদ্ব বিন্যাসের আড়ালে সামগ্রিক ঋণের বোঝা অর্থনীতির সঙ্কটের ইসারা বহন করছে।

রেল বাজেট

দুইবারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী, এককালের জবরদস্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ক্যাবিনেটের দুই নম্বর মন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ মন্ত্রীদের সারিতে আরও নিম্নস্থানে রাজী হয়ে ক্যাবিনেটে

রেল মন্ত্রীরূপে যোগ দেবার সপ্তাহখানেকের মধ্যে রেলওয়ে বাজেট নিয়ে লোকসভায় হাজির হয়েছেন। নন্দ মন্দভাগ্য। যেখানে যান সেখানেই নিন্দা কুড়োতে হয়। অপরের রেল বাজেটের দায় নিয়েও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কারণ, ভাড়া বাড়িয়ে, মালের মাশুল বাড়িয়ে, স্লিপারের ব্যয় বাড়িয়ে রেল বাজেটে ৩৯ কোটি টাকার নূতন রাজস্ব আদায় করে ২৩-৩৮ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেছেন। এ-যাবৎ ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের জন্য ২০ থেকে ৮৫ পয়সা ভাড়া দিতে হোতো, নূতন হারে কম পক্ষে এক টাকা ভাড়া দিতে হবে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বেতে তৃতীয় শ্রেণীর মাসিক টিকিটের ভাড়া বাড়ছে, দূরপাল্লার যাত্রীদের ভাড়া বাড়ছে, তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ গাড়ীতে (তিন শ কিলোমিটার) ৭-৫০ টাকার পরিবর্তে ৭-৮০ টাকা, এক্সপ্রেস কিম্বা মেইলে ৯-৬০ এর স্থলে ১০-৪৮ বাড়ছে। রাত্রিতে ঘুমাবার তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপারে ন্যূনপক্ষে ৮ টাকা দিতে হবে। মালের ভাড়ার মধ্যে রেজিষ্টার্ড সংবাদপত্রের ভাড়া প্রতি কুইন্টালে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ২-৫৭ টাকা থেকে বেড়ে ৩-০২ হবে। প্ল্যাটফরম টিকিট বাবদ ৫ পয়সা বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে।

রেল বাজেটের টিকিটের ও মাশুলের মূল্যবৃদ্ধির দায় স্বল্পবিত্তদের ওপর বর্তিয়ে একদিকে যেমন তাদের জীবনমান নিম্নগামী করবে অপর পক্ষে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বৃদ্ধি করবে। সমাজতান্ত্রিক রেল বাজেটের ধাক্কায় তাদের ত্রাহি রব উঠবে।

লাওসে সঙ্কট

লাওসের পরিস্থিতি আবার সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে। লাওসের মধ্যবর্তী ষ্ট্র্যাটেজিক অঞ্চল 'প্লেইন অব জারস' উত্তর ভিয়েৎনামীরা ২১ ফেব্রুয়ারী দখল করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আর একটি ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৪ সালে এবং পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে জেনেভা সম্মেলনে লাওসসমস্যার মীমাংসার পর আবার নূতনভাবে লাওস সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৬২ সালে সকল সংশ্লিষ্ট শক্তির মতৈক্যে এবং সোভিয়েট রাশিয়া ও ইংলণ্ডের যৌথ সভাপতিত্বে লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। উত্তর ভিয়েৎনামীদের 'প্লেন অব জার' দখলে সেই অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং অতঃপর লাওস পুনরায় চীন-উত্তর ভিয়েৎনামের প্রবল রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাবের সম্মুখীন হয়ে আর একটি ভিয়েৎনামী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। জেনেভা সম্মেলন আহ্বান করে এই সঙ্কট-মোচনের আবেদন লাওস কর্তৃপক্ষ জানালেও সোভিয়েত রুশ-এর এ-ধরণের সম্মেলন ডাকবার আগ্রহ আদৌ নেই, ইংলণ্ডের তো নেই-ই। ১৯৫২ সালে সোভিয়েতের যেটুকু প্রভাব এই অঞ্চলে অবশিষ্ট ছিল, ভিয়েৎনাম সংঘাত বিস্তার রোধে অক্ষমতার মধ্য দিয়ে সেই প্রভাব নির্মূল হয়ে গেছে। সুতরাং জেনেভা সম্মেলন একটি কাগজী-সংস্থার পরিণত হয়েছে মাত্র। বিভিন্ন শক্তিবর্গের পর্দার আড়ালের রাজনীতি যদি এই সঙ্কট মীমাংসার সহায়ক না হয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় লাওসকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ভিয়েৎনাম সঙ্কটের পুনরাবৃত্তি হবে এবং থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, বর্মা সেই সঙ্কটের আগুনে ঝলসে যাবে। সেই সঙ্কট থেকে ভারতবর্ষের দূরত্বও দ্রুত হ্রাস পাবে।

৩. ৩. ৭০

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

20 MAR 1970

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৫

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

SBC-1/65

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·7(
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

১৩৭৬
ফাল্গুন

জয়শ্রী

সম্পাদিকা :
লীলা রায়

সূচীপত্র

ফাল্গুন—১৩৭৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুভাষবাণী	মহাকাল	৭২১
সম্পাদকীয়		৭২২
বিস্ফোরণ : ১৯০৬-০৭	কালীচরণ ঘোষ	৭২৯
ডায়িয়ঃ বি, ঈয়েট্‌স্ (প্রবন্ধ)	পথচারী	৭৩৫
কবিতা :	সুনীথ মজুমদার	৭৪১
মুহূর্ত যুথিকা : তার-সংযনাদ		—৪২
মনস্তাপ		
শান্তি		
নিঃসঙ্গতার গান		
নির্বাচনের দায়িত্ব		
আর যেখানেই যাও		
ডাকাডাকি		

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা :	বিজয় কুমার দত্ত	৭৪৩
কথামুখ		
আভিধানিক		
সাবিত্রী (ধারাবাহিক উপন্যাস : অনুবাদ)		
	পুরুষোত্তম রেগে	
অনুবাদক :	পিনাকীরঞ্জন ধর	৭৪৫
কণ্ঠ ভরা বিষ (উপন্যাস)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৭৫৩
জাপানের দিনগুলো	বারীন বর্দ্ধন	৭৫৯
(ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী)		
জাতীয়তার রূপায়ণ	দীপঙ্কর	৭৬৫
পুস্তক পরিচয়		৭৭০

যে ক'টি সন্তান স্বচ্ছন্দে লালন পালন করতে পারবেন, ততটি সন্তানই হওয়া উচিত

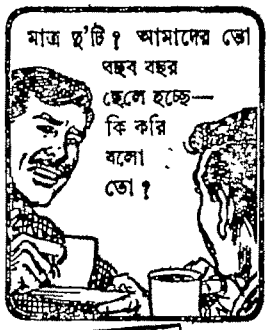

জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনার হাতেই রয়েছে।

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্য

উন্নত ধরণের রাবারের তৈরী অনবিরোধক 15 পয়সায় 3টি

সরকারী সহায্যে হ্রাস মূল্যে

এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

মুদীর দোকানে, ওষুধের দোকানে, সাধারণ ব্যবসায়ী, সিগারেটের দোকান—সবাইকার কাছ থেকে কিনতে পাওয়া যায়।

ভারতী

৩৪ বর্ষ ০ একাদশ সংখ্যা ০ ফাল্গুন ১৩৭৬

সুভাষ-বাণী

"আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিতেই আমরা নতুন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলবো। আজকের দিনে আমাদের বাঁচতে হবে এবং আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যারা আধুনিকতার অত্যুতসাহে অতীতের গৌরবকে ভুলে যায় আমি তাদের দলে নেই। অতীতকে ভিত্তি করেই আমাদের দাঁড়াতে হবে। ভারতের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে—নিজের বিশেষ ধারায়ই এ সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধন করতে হবে। বেদের যুগে ফিরে যাও, একদিকে এই আহ্বান, অপরদিকে পাশ্চাত্য জীবনের বিলাস ও নিত্য নুতনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে।"

[কলিকাতা যুব কংগ্রেস, ১৯২৮ সন]

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

আজ প্রায় ছাব্বিশ মাস হতে চললো শ্রীযুক্তা লীলা রায় পি, লি, হাসপাতালের ক্যাবিনে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছেন। চিকিৎসকগণ, নার্স, আয়া নিয়মিতভাবে তাঁদের সাধ্যানুযায়ী কাজ করে গেলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে যেমন অবনতি হয়ে আবার সে-অবস্থা সামলে ওঠেন, গত ২০শে মার্চ বিকেলবেলা সেরকম অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। সেদিন তাঁর বমি হয়, গলা থেকে জোরে জোরে গোঙানির আওয়াজ বার হয়, মুখের চেহারা কালো হয়ে যায়। খবর পেয়ে অনেকেই ছুটে আসেন এবং ইনজেকসন ও অক্সিজেন দেবার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। সারা রাত অক্সিজেন দিতে হয়।

বিধাতার কাছে আমরা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা জানাচ্ছি।

৩১শে মার্চ, ৭০

পরিচালকমণ্ডলী,
জয়শ্রী

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

অবশেষে গত ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের নিকট তার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তার আগের দিন বাংলা কংগ্রেসের অপর তিন মন্ত্রীর পদত্যাগ পত্রও রাজ্যপালের নিকট পাঠিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রত্যাশিত পদত্যাগ আরও কিছুদিন মুলতুবী রাখবার জন্য নানা মহল থেকে প্রবল চেষ্টা হয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে সুরু করে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন শরিকেরা তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য উপরোধ, অনুরোধ, যুক্তি, তর্ক, আবেদন-নিবেদন এবং শেষ পর্যন্ত কটূক্তি করেও বিফল হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ ছিল একদিকে বিধান সভায় পশ্চিম বাংলার বাজেট মঞ্জুরী শেষ হয় নাই; অন্যদিকে রাজ্য সরকারের পরিবর্তন ঘটলে কেন্দ্রে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে উঠবে। কারণ, সে অবস্থায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থন প্রধানমন্ত্রীর সরকার থেকে প্রত্যাহৃত হবে। অপরপক্ষে এই রাজ্যে তেরদাসে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যেভাবে পদদলিত, ধিক্কৃত এবং বিধ্বস্ত হয়েছে এবং মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি যে ভাবে দ্রুত তাদের বিরোধীদের ভীতি-প্রদর্শন করে, অবরদস্তি উচ্ছেদ করে একতান্ত্রিক শাসনের দিকে এগিয়ে গেছে, সেই মুখে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির শাসন আরোপ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যত বেশীদিন সম্ভব পিছিয়ে রাখতে আগ্রহী ছিল। যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন শরিকেরাও, তাদের শাসন

ক্ষমতা যত বেশীদিন দীর্ঘায়িত করা যায়, তারই জন্ত তাদের উদ্বেগ, ছুটোছুটি, বৈঠক অনুনয়-বিনয়। শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও যুক্তফ্রন্টের বন্দীশালায় অজয়বাবুকে আরও কিছুদিন আটক রেখে যুক্তফ্রন্টের শেষের দিনগুলি পিছিয়ে দেবার জন্ত স্বরাষ্ট্র বিভাগের ওপর খবরদারী করতে সর্বদলীয় কমিটির প্রস্তাব আলোচনায় রাজী হয়েছিলো। কিন্তু গত কয়েকমাসের টানাপোড়েনে এবং মার্কসবাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীকে উপেক্ষা করে গুরুতর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে দলীয় স্বার্থ সাধনের উন্মত্ত প্রয়াসে এবং মন্ত্রীসভার উপর তদারকী ক্ষমতার আরোপে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক অধিকারকে শুধু অস্বীকারই নয়, প্রকাশ্যে সেই অধিকারকে খর্ব করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সাংবিধানিক অসম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদীদের আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ও আচরণ সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব অপরিবর্তনীয় বিরূপতায় পরিণত হয়ে গেছে। তাই বিশ্বাসের যেখানে পরিপূর্ণ অভাব, যেখানে আস্থার লেশ মাত্র অবশিষ্ট নেই এবং মুখ্যমন্ত্রীর অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে মার্কসবাদী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং অন্ত মন্ত্রীরা কাজ আরম্ভ করে প্রতিটি গুরুতর প্রশাসনিক পদক্ষেপের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শের প্রতিশ্রুতি দেবার পর পদে পদে যখন সেই অধিকার ও প্রতিশ্রুতি লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কেবলই প্রতিকারের দিন গুণে জনসাধারণের, দলের এবং সহকর্মীদের গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে, সেখানে আরও পরীক্ষার প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেছে। ক্ষমতার লোলুপতা, দপ্তরের নানা সুযোগের প্রলোভন, ভবিষ্যতের অনিশ্চিতি কোনো কিছুই মুখ্যমন্ত্রীকে আর বিরত করতে পারে নি। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের সিদ্ধান্তে অটল থেকে অনিবার্য নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক জীবনকে অবক্ষয়ের ও অপমৃত্যুর পরিণতি থেকে মুক্তি দিলেন; তাই শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে তার সাহসিকতার জন্ত এবং বিলম্বে হলেও পদত্যাগ করে গ্লানি মুক্ত হবার জন্ত আমরা তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সেই সঙ্গে একটি প্রশ্নও থেকে যায়। ১৯৬৭ সালে যে সময় মার্কসবাদীরা সংখ্যায় বর্তমানের বিধান সভার চাইতে অর্ধেক ছিলেন, যে সময় তাদের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তর ছিল না, সে-সময় এই দলের আচরণে, তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার গতি-পরিণতিতে অজয়বাবুর মনে যে গুরুতর উদ্বেগ ও আশংকা তাঁকে পদত্যাগের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলো, তাদের গুরুতর শক্তিবৃদ্ধির পর তাদের হাতে সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তর তুলে দিয়ে প্রায় নামেমাত্র মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে তিনি সম্মত হলেন কি করে সেই প্রশ্ন আজ স্বভাবতই দেখা দিয়েছে। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে যেমন সে গাছের উজ্জীবন সম্ভব নয়, তেমনি গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতির ধারাকে উচ্ছিন্ন করে গণতান্ত্রিক জীবনে প্রত্যাবর্তন এক কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্টের এই সর্বনাশা পরীক্ষা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির আত্মবিলোপের পথে এগিয়ে দিয়েছে। সমভাবাপন্ন গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধ আজ পশ্চিমবাংলার দাবী। অজয়বাবুকে গণতান্ত্রিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের এই অমোঘ দাবী স্বীকার করে নিয়ে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত ব্যূহ রচনা করে একতান্ত্রিক শক্তিকে প্রতিহত করবার জন্ত রুখে দাঁড়াতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ সুরু করতে হবে, বিলম্বে সর্বনাশ হবে।

রাজ্যপালের রাজনীতি

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর কয়েকদিনের জন্ত তাকে তদারকী সরকার চালিয়ে যাবার অনুরোধ জানিয়ে রাজ্যপাল বিকল্প সরকার গঠনের আলোচনা

শুরু করে বিধান সভায় সর্বাপেক্ষা পরিষ্ঠদলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। এই আলোচনার সূত্রপাতে দশটি দল রাজ্যপালকে পত্রযোগে জানিয়ে দেয় শ্রীবসুকে তারা সমর্থন করেন না এবং তাদের অসমর্থন সত্ত্বেও শ্রীবসুকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া অনৈতিক এবং সংবিধান বিরোধী কাজ হবে। প্রসঙ্গত এই দশটি দলের সমবেত শক্তি বিধান সভার ২৮০ জনের মধ্যে ১৬৫ জন। এই পত্রগুলি পাওয়ার পরও শ্রীজ্যোতি বসুকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দিলে সে কাজ অনৈতিক এবং সংবিধান বিরোধী হবে কেন তার কারণ জানতে চেয়ে রাজ্যপাল এই দশটি দলকে চিঠি দিলে তারা জানায় সরকার গঠনের ভার পেলে মার্ক্সবাদীরা তাদের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ভয় দেখিয়ে, অনেক প্রলোভন দিয়ে এবং নানা ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেষ্টা করবে। শ্রীজ্যোতি বসুও স্বীকার করেন তাকে সরকার গঠন করতে দিলে অন্যান্য দলের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ দলীয় নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে দলত্যাগী হয়ে তার মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করবার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু তাদের রাজ্যপালের কাছে হাজির করানো কিম্বা তাদের নোট রাজ্যপালের কাছে প্রকাশে তিনি অক্ষম। রাজ্যপাল অবশ্যি বিধান সভার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের ভবিষ্যত নেতাকে প্রকাশ্যে সমর্থনের সৎসাহস দাবী করেন এবং সেই সৎসাহস দেখাতে শ্রীজ্যোতি বসুর গোপন সমর্থকরা অসমর্থ হবার ফলে শ্রীজ্যোতি বসুকে রাজ্যপাল সরকার গঠনের দায়িত্ব দিতে অস্বীকার করেন।

শ্রীজ্যোতি বসুকে কেন দায়িত্ব দেওয়া হবে না, এই মর্মে বিভিন্ন দলের নিকট রাজ্যপালের চিঠি, কতকটা "কারণ দর্শাবার" নোটিশের আকার নিয়ে এসেছে। শ্রীজ্যোতি বসুর প্রকাশ্য সমর্থকদের সংখ্যা যেখানে ১০১ জনের বেশী নয়, সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল শ্রীজ্যোতি বসুকে দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টায় অহেতুক কালহরণ করে তার 'বিবেচনার' (discretion) সাংবিধানিক প্রয়োগের অমর্যাদা করেছেন—লোকসভায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই মর্মে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যপাল এই বিষয়ে 'কারণ দর্শাবার' চিঠি দিয়ে সাংবিধানিক মুন্সিয়ানা দেখাতে চেয়েছিলেন কিম্বা ক্ষমতার মুরুব্বীয়ানী দেখাতে চেয়েছিলেন তা বোঝা না গেলেও যেক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা স্পষ্টতই সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং ভবিষ্যত গরিষ্ঠতার কোনো তথ্যও তাদের হাতে নেই সেখানে সরাসরি তাদের দাবী অগ্রাহ্য করাই তার সাংবিধানিক, কর্তব্য ছিল যাই হোক আরও অপপ্রয়োগের হাত থেকে যে পশ্চিমবাংলা রক্ষা পেয়েছে, সেটাই তার ভাগ্য এবং এ-বিষয়ে কয়েকজন সংবিধানবিদের মতামত বোধহয় রাজ্যপালকে সঠিক পথে আনতে প্রভাবিত করে থাকবে। এদের মতে: A Governor is not bound to invite automatically the leader of the largest single party in a legislature to form a government without ascertaining whether he is in a position to command a majority in the House." আইনজ্ঞদের এই মত রাজ্যপালকে প্রভাবিত করে তাকে সংবিধানবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিরত করে থাকবে।

রাজ্যপালের বেতার ভাষণ রাজনীতির প্রবণতাদ্বারা চিহ্নিত। যুক্তফ্রন্টের পুনরুদ্ধারে রাজ্যপাল উদ্যোগী হবেন এই বক্তব্য তাঁকে যুক্তফ্রন্টের প্রতি পক্ষপাতপুষ্ট করে তুলেছে। তাছাড়া প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেও তার প্রশাসনিক সীমানা লঙ্ঘন করেছেন। কারণ, যে-মুখে তিনি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক কুশলতার প্রশংসা করেছেন সেই মুখেই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা কঠোর-হস্তে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্যপাল সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে আইন-শৃঙ্খলা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আমলে

বিভাগীয় পুলিশী-নীতির প্রয়োগে বিধ্বস্ত হয়ে সমগ্ররাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও তাই রাজ্যপালের অবিবেচনাপ্রসূত বাক্যাড়ম্বরের জন্য তাকে মৃদু ভৎর্সনা না করে পারেন নাই।

মার্ক্সবাদীদের রাজনীতি

যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি রক্তপাতের হুমকী দিয়ে আসছিল কিছুদিন যাবৎ এবং অজয়বাবু ও বাংলা কংগ্রেসসহ অন্যান্য কয়েকটি দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে মিনি-ফ্রন্টের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তহীন প্রচার করে চলেছিল। অজয়বাবুর পদত্যাগের পরদিনই ফ্রন্টের এবং ফ্রন্টের বাইরের সকল দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ই মার্চ তারিখে মার্ক্সবাদীরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। ইতিপূর্বে পশ্চিম বঙ্গের কোনো ধর্মঘটে এতো লোক আহত কিম্বা নিহত হয় নাই। মার্ক্সবাদীরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সপ্রমাণ এবং বিস্তারের জন্য শ্রমিকে শ্রমিকে সংঘাত সৃষ্টির সহায়ক হয়ে বহু শ্রমিকের প্রাণহানির কারণ হয়েছে। কোনো সাধারণ ধর্মঘট ইতিপূর্বে এতো প্রবল বিরোধিতারও সম্মুখীন হয় নাই। এই ধর্মঘটে সরকারী হিসাবে ২৪ পরগণায় ১১, হুগলীতে ৮ কুচবিহারে ২, বর্ধমানে ৩, কলিকাতায় ১, আসানসোলে ১ নিহত হয়েছে। এই সংখ্যার অনেক বেশী লোক নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যা কয়েক শত হবার সম্ভাবনা। এরমধ্যে বর্ধমানে সাঁই পরিবারে তিনজন যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা ও মৃতদের রক্ত দিয়ে তাদের মায়ের শরীর লিপ্ত করা, একটি শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ, সাঁই পরিবারের এক এডভোকেটের চোখ উপড়ানো এবং বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, ডি, ও, ও পুলিশ সুপার এবং সহকারী পুলিশ সুপারের সামনে সমর্থকদের সহস্রাধিক মার্ক্সবাদী দুই ঘণ্টা ব্যাপী পৈশাচিক তাণ্ডব সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা একটি পরিবারের নির্মম হত্যার নীরব দর্শক হয়ে রইলেন। মার্ক্সবাদীদের সমর্থকদের ভূমিকার চাইতে এদের ভূমিকার তফাৎ এই যে এই কর্মচারীরা পৈশাচিক তাণ্ডবে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু তাঁরা এই বর্বরতা প্রতিরোধের দায়িত্ব বোধ করেন নাই। সেদিনও রাষ্ট্রপতির শাসন সুরু হয় নাই। হয়তো এই সব কর্মচারীরা ভেবেছিলেন মার্ক্সবাদীদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, সরকারী কর্মচারী এবং পার্টি সদস্য ও সমর্থকের ভূমিকায় যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে, বর্ধমানের ঘটনায় সে সীমারেখা মুছে গিয়েছিল। সরকারী কর্মচারীরা ও পার্টি কর্মী-সমর্থকের চাইতে কোনো সুস্থ আচরণের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়ে পরোক্ষে হত্যার সহায়তা করেছেন। আসানসোল শ্রীপুর কয়লাখনিতে মার্ক্সবাদীরা তাদের বিরোধীদের পল্লী আক্রমণের পর মানুষ গুম করে নিয়ে গেছে; তাদেরই একজনের মৃতদেহ দূরে একটি নির্জন এলাকায় কবর থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছিল, আরও মৃতদেহের কঙ্কাল এবং মুণ্ডহীন দেহ সেখান থেকে পাওয়া গেছে। ত্রিবেণীতে সাঁওতালদের তীরবিদ্ধ হয়ে একটি শ্রমিক নিহত হয়েছে এবং তারপর আর একটি নিহত শ্রমিকের মৃতদেহ কয়েক টুকরো করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, দক্ষিণদারীতে একটি শ্রমিকের মাথায় পেরেক ঠুকে তাকে হত্যার বিবরণ পাওয়া গেছে। এতোগুলি শ্রমিকের ও অন্যান্যদের নৃশংস হত্যার মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদীরা তাদের দলীয় প্রভাব নিরঙ্কুশ করতে উদ্যত হয়েছিল, প্রবল প্রতিরোধের সামনে তাদের সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু হত্যার প্ররোচনায়, হত্যাকারীদের সাবাসী দেবার প্রকাশ্য ঔদ্ধত্যে, বাংলার রাজনীতিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভূমিকা তৈরী করতে মার্ক্সবাদীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বর্ধমানের ঘটনায় সমগ্র দেশ যে সময় উদ্বেল হয়ে এই নৃশংস বর্বরতাকে ধিক্কার দিয়েছে, সে সময় সাঁই পরিবারের নিহত

যুবকেরা গুণ্ডা, সুতরাং বর্বরভাবে তাদের হত্যার মধ্যে কোনো অপরাধ নাই— মার্ক্সবাদী মঞ্চ থেকে ঘটনার অব্যবহিত পরেই এই প্রচার সুরু হয়ে গেছে; নিহত অপর যুবক জিতেন রায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এই মর্মে ঘোষণায় মার্ক্সবাদীদের মিথ্যাভাষণের মুখোস অবারিত হয়েছে। আর এক মার্ক্সবাদী নেতা হত্যাকারীদের 'বাহাদুর' আখ্যায়িত করে নিজেকে এবং দলকে এই হত্যার সমর্থকরূপে চিহ্নিত করেছেন। যারা প্রকাশ্যে হত্যার সমর্থন করে, অপ্রকাশ্যে তারাই হত্যার প্ররোচনা যোগায়। মার্ক্সবাদী নেতার এই হঠকারি উক্তি দুর্বার প্রতিরোধের সামনে দলীয় দুর্বৃত্তদের ক্রমক্ষীয়মান মনোবলে সাহস সঞ্চারে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে কিন্তু নৃশংস হত্যার প্রকাশ্য সমর্থনের সুদূরপ্রসারী পরিণতির দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে। যুক্তফ্রন্টের কয়েকমাসের শাসনে আইনের শাসননির্বাসিত হয়েছিল, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বহুক্ষেত্রে দলীয় লেজুড়ে পরিণতহয়ে আইনের ঘরে চুরি করে সকলপ্রকার আইনবিগর্হিত কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। রাষ্ট্রপতির শাসনে এই শোচনীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন আশু এবং অব্যবহিত কর্তব্য এবং প্রশাসনের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি দলীয় লেজুড়ে পরিণত হয়ে প্রশাসনকে দলের স্বার্থে প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়ে দলের কর্মীর ন্যায় আচরণ করেছে, তাদের প্রশাসনের জরুরী দায়িত্ব থেকে অপসারিত করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের পুলিসী নীতি পুলিস কর্মচারী-দের কর্তব্যসাধনে অন্তরায় হয়েছে, যারা সৎ সুদক্ষ, নিরপেক্ষ কর্মচারী তাদের নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তা না হলে যুক্তফ্রন্টের পুলিসী নীতি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শ বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার, অসামাজিক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও মানুষের মনে দ্রুত নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসা, সম্ভব হোতো না। মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ এবং আইনের শাসনের প্রত্যাবর্তনের জন্য যুক্তফ্রন্টের তেরমাসের শাসনে যে রাজনৈতিক নির্যাতন চলেছে যা হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ, ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার ব্যাপক তদন্তের প্রয়োজন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তাই প্রয়োজন একটি সামগ্রিক অপরাধ তদন্ত কমিশন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিম বাংলার জনমানসে গণতান্ত্রিক জীবনের মূল্যবোধগুলি ফিরিয়ে আনতে হবে। পশ্চিম বঙ্গের সংগ্রামী গণতান্ত্রিক মানুষ একাজে সর্বতোমুখী সহায়তা করবে।

রাজ্যসভার নির্বাচন

সাম্প্রতিক দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের পর রাজ্যসভার বিভিন্ন দলের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির একটা হিসাব পাওয়া গেছে। হিসাবটি নিম্নরূপ:

	নির্বাচনের পূর্বে	নির্বাচনের পরে
কংগ্রেস (শাসন)	৯৭	৮৩
কংগ্রেস (সংগঠন)	৪২	৪১
জনসঙ্ঘ	১০	১৫
স্বতন্ত্র	১৩	১৩
সি. পি. আই	৯	১০
এস. এস. পি	৮	৮
মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট	৫	৮
পি. এস. পি	৫	৬
ডি. এম. কে	৫	৭
মুসলীম লীগ	৪	৪
আকালী দল	৩	৩
বি. কে. ডি	২	৩
নির্দল এবং অন্যান্য	২৫	২৭
মনোনীত	১১	১১
	২৩৯	২৩৯

এই দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে কয়েকটি রাজ্যে শাসক দলের ভরাডুবি বিপর্যয় হয়েছে। উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং তামিলনাড়ু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। উত্তর-প্রদেশে বি কে ডির সঙ্গে সমঝৌতা সত্ত্বেও শাসক কংগ্রেস আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও আটবারের পর গণনায় সঞ্জীবারা নির্বাচিত হয়েছে, তামিলনাড়ুতে সুব্রহ্মণিয়ম সর্বোতভাবে চেষ্টা সত্ত্বেও এক ভোটে পরাজিত হয়েছে এবং উড়িষ্যায় বিজু পট্টনায়কের বিরোধিতার ফলে শাসক কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে এবং সংগঠক কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও সংগঠক কংগ্রেস প্রার্থীর প্রত্যাশিত জয় হয়েছে। শাসক কংগ্রেসের এই বিপর্যয় দলের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, দলের প্রতি আনুগত্যহীনতার দ্যোতক। যে বিবেকের তাড়নায় ইন্দিরাগান্ধী দলীয় প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত করেন, রাজ্যসভার নির্বাচনে সেই বিবেক-পন্থা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সুব্রহ্মণিয়ম জয়ী হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান লাভ করতেন। সে গুড়ে বালি পড়েছে। অর্থব্যয় এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা সত্ত্বেও বুদ্ধির খেলায় কামরাজ সুব্রহ্মণিয়মকে পরাস্ত করেছেন।

প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করে দলের চেয়ারম্যানকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত করতে পেরেছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র শাসক কংগ্রেসের অসম্মতির ফলে এই চুক্তি বাতিল হবার উপক্রম হলে প্রজা সোসালিষ্ট দলের পক্ষ থেকে শাসক কংগ্রেসকে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করে একদিকে বিহারে দারোগা মন্ত্রীসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দেয়া হয় এবং অপর পক্ষে তামিলনাড়ুতে সুব্রহ্মণিয়মকে ভোট দিতে অস্বীকার করে। চ্যবনকে ডিঙিয়ে জগজীবন রাম মহারাষ্ট্র দলের উপর এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার ফলেই এই সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো। অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে এই চুক্তি অনুযায়ী প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান, শাসক কংগ্রেসের ২২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচনে প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির কোনো গৌরব বৃদ্ধি পায় নাই। নিজ দলের ৭ ভোট এবং শাসক কংগ্রেসের ২২ ভোট, মোট ২৯ ভোটে তাদের চেয়ারম্যানের জয়ে নৈতিক পরাজয় নিহিত রয়েছে। কারণ এ-জয় ২২ ভোটের জয়, নিজেদের সামর্থ যেখানে অকিঞ্চিৎকর, সেখানে দলের চেয়ারম্যানের মত একজন পদস্থ ব্যক্তির পরাশ্রয়ী জয়ে, পরমুখপেক্ষিতা বৃদ্ধি পাবে। এই নির্বাচনে প্রজা সোসালিষ্ট দলকে অবশ্যম্ভাবীরূপে শাসক কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল করে তুলে দলের স্বকীয়তায় অবক্ষয় ঘটাবে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনেও অঘটন ঘটেছে। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ৮৩ ভোটের জোরে দুইজন প্রার্থীকে জয়ী করিয়েছে, তাদের সমবেত প্রথম প্রেফারেন্স ভোট ফল ৯৩। অর্থাৎ অপরের দশ ভোট তারা সংগ্রহ করেছে। শাসক কংগ্রেস ও ঐক্যপন্থী কংগ্রেসের ৪৪ ভোট সত্ত্বেও আরও ৩ ভোট তারা সংগ্রহ করেছেন। অপরপক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর ৪২ ভোট ষ্ট্রাগ পেয়ে ৩৮ ভোটে দাঁড়ায় এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির ৪২ ভোট ৫০ ভোটে বৃদ্ধি পায় ফলে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী পরাজিত হয়। অপরপক্ষে নির্দল প্রার্থী ৫০ ভোট পান, যদিও যে নয় পার্টির ভোট থেকে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাদের ভোট সংখ্যা ৪৫-এর বেশী নয়। সংগঠক কংগ্রেস, শাসক কংগ্রেসের প্রার্থীকে পরাজিত করতে প্রতিশ্রুত থাকলেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন। শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এই নির্বাচনেও ভোটের ভারসাম্যের তারতম্য ঘটেছে। একজোটের ভোট আর জোটে পৌঁছে বিভিন্ন জোটে পারস্পরিক সংশয় সৃষ্টি করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর পরাজয়ে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের অমার্ক্সবাদী দলগুলির পার্শ্বপরিবর্তন হবে কিনা সে সম্পর্কেও গুঞ্জন সুরু হয়েছে।

জ্যোতি বসুর প্রাণনাশের চেষ্টা

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর প্রাণনাশের চেষ্টায় গত ৩০শে এপ্রিল সকালবেলা হাওড়া-দিল্লী এক্সপ্রেসে শ্রীবসু পাটনা ষ্টেশনে পৌঁছলে তাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষিত হয়। সেই গুলি শ্রীবসুর ডানদিকে অবস্থিত আলি ইমাম নামক লাইফ ইন্সুরেন্স করপোরেশনের এক কর্মচারীর বুকে বিদ্ধ হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই শ্রীইমামের মৃত্যু ঘটে। গুলিটা শ্রীবসুর ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ঘেঁসে গিয়ে আঙ্গুলটিকে জখম করে দেয়। আততায়ী পলায়ন করে।

হিংসার প্রয়োগে রাজনৈতিক মতান্তরের মীমাংসা কোনোদিনই সম্ভব নয় এবং হিংসা সর্বদা নিন্দনীয়। শ্রীবসুর উপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণেও তীব্রভাবে নিন্দনীয়। বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষভাবে পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতিতে যে হিংস্রতার আবেদন সৃষ্টি হয়েছে, হিংস্রতা যে ভাবে প্ররোচিত হয়ে রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেই অবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিম্বা হিংস্রতার বিরুদ্ধে অনন্যোপায় হয়ে প্রতিকারের পথ খুঁজতে লাঞ্ছিত মানুষ একক কিম্বা দলবদ্ধভাবে হিংস্রতার আশ্রয় নিতে পারে। যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, মানুষের মৌল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সর্বতোভাবে তাদের হিংস্রতার প্রতিরোধে দৃঢ়পণ হতে হবে এবং আততায়ীদের উদ্যত হস্তকে প্রতিহত করতে হবে। হিংস্রতার প্ররোচনা কিম্বা হিংস্রতার বিরুদ্ধে আরও হিংস্রতার উস্কানি গণতন্ত্রের শ্মশান রচনা করে স্বৈরতান্ত্রিকদের পথ সুগম করে তুলবে।

চতুর্থ প্ল্যান

অবশেষে চতুর্থ প্ল্যানের একটা কাঠামো দানা বেঁধেছে। গত ২২শে মার্চ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে চতুর্থ প্লানের জন্য ২৪,৮৮২ কোটি টাকার বিনিয়োগ বরাদ্দ হয়েছে। চতুর্থ প্ল্যানের এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় বছরও সুরু হয়ে গেছে। প্ল্যানের কাঠামো স্থির করতেই এই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হবার ফলে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়েল কাঠামো অন্তরাল থেকে ক্রমশই সদরে এগিয়ে এসেছে এবং কেন্দ্র রাজ্যগুলির মধ্যে বরাদ্দের টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় প্ল্যান-বহির্ভূত ব্যায়ের চাহিদা মেটাবার জন্য ৮০০ থেকে ৮৫০ কোটি টাকার একটি বিশেষ ভাণ্ডারের বরাদ্দ নিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে টানাটানি দেখা গেছে। ৮টি কিম্বা ৯টি রাজ্যে এই বিশেষ বরাদ্দের সুযোগ প্রসারিত হবে এবং গোটা পাঁচবছরের মেয়াদে রাজ্যের আর্থিক স্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অব্যাহত নজর রাখার পর এই সাহায্য দেওয়া হবে। রাজ্যের নিকট কেন্দ্রের পাওনা ঋণ মেটাবার ব্যবস্থারও পুনর্বিন্যাস করে রাজ্যগুলিকে কিছু হাঁফ ছাড়বার সুযোগ দেওয়া হবে। পশ্চিম বঙ্গের ১৯৭০-৭১ বাজেটে কেন্দ্রীয় ঋণশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে কিছুটা হাঁফ ছাড়বার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য 'বিশেষ সুযোগে'র (special accommodation) বরাদ্দ রাজ্যগুলিকে বেশী দূর নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ ১৯৬৯-৭০ সালে এই তহবিল থেকে আনুমানিক ২৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং ১৯৭০-৭১ সালের জন্য ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়ে আছে। সুতরাং অবশিষ্ট তিন বছরের জন্য এই তহবিলের অর্ধেকেরও কম উদ্বৃত্ত থাকবে।

আসল কথা উন্নয়নের হার শতকরা ৩ অথবা ৩·৫০ ভাগ থেকে শতকরা ৫ কিম্বা ৬ ভাগে বৃদ্ধি করতে হবে; প্ল্যান-বহির্ভূত ব্যয় হ্রাস করতে হবে এবং বাজেটের আয়-ব্যয়ের ফাঁক ক্রমশই বৃদ্ধির দিকে না ঠেলে দিয়ে কমাতে হবে। বেতনবৃদ্ধির যেমন অনিবার্যতা রয়ে গেছে, তেমনি বেতনবৃদ্ধির

(শেষাংশ ৭৪৪ পৃষ্ঠায়)

বিস্ফোরণ : ১৯০৬-০৭

কালীচরণ ঘোষ

১) 'হাতে খড়ি',—২) জামালপুর দাঙ্গা,—৩) বাঁকুড়া ; হাঁসা-ডাঙ্গা.—৪) ঢাকা জন্মাষ্টমীতে খুন,—৫) সাহীন মেডিক্যাল হল,—৬) চন্দননগরে বোমা,—৭) ওয়ারি দাঙ্গা,—৮) নিতাইগঞ্জ,—৯) এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টা,—১০) চিংড়িপোতা ডাকাতি,—১১) নারায়ণগড় হামলা,—১২) বৈপ্লবিক রীতি, ১৩) সরকারী প্রতিরোধ : সভা সমিতি,—১৪) প্রেস।

বাঙ্গলার যখন বড় রকম হিংসাত্মক কাজের চেষ্টা আরম্ভ হ'লো, তখনও কর্মীদের মধ্যে বড রকম দল ভাগ হয়নি। পরে যুগান্তর পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট যুবকরা কিছু স্বতন্ত্র হয়ে কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে, আর বড় অংশটি (পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনুশীলন নামে পরিচিত) পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলে কাজে নেমে পড়লো।

বড় অর্থাৎ নিছক বিপ্লবাত্মক ঘটনার তালিকায় যা পড়ে না এমন ছোটখাটো ঘটনা কড়েয়া, তারকেশ্বর ও কলকাতার উপকণ্ঠে ঘটেছে। সে সবের বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র বসুর বিবৃতি : পৃঃ ১৮২) এসকল ব্যাপারে পুলিশী অনুসন্ধান যা হ'য়েছে, সে সবই সাধারণ "রাহাজানি" পর্য্যায়ে পড়েছে বলে মনে করা যেতে পারে ; বিপ্লব সংক্রান্ত পুলিশী নথিপত্রে স্থান পায়নি।

(১) হাতে খড়ি

কলকাতার দিকে বড় কেন্দ্র মাণিকতলা বাগান ১৯০৭-এ একেবারে গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়। তার আগে যুগান্তর পত্রিকার আড্ডা 'কানাই ধর লেন' চাঁপাতলা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহাত্মক আলোচনা চলতো। ১৯০৬ সালেই "হাতে খড়ি" বলা চলে। কেন্দ্র, উত্তর বঙ্গ—আগষ্টের প্রথম দিকে রংপুর (মাহিপুর গ্রামে) ডাকাতির চেষ্টা হয়। তখন অত্যন্ত "কাঁচা অবস্থা, গ্রামে এক দারোগা বাস করে শুনেই চলে আসতে হয়। পরেরটা হয় ১৯০৬ অক্টোবর ২৪-এ ঢাকার শেখরনগরে। এবার লোহার সিন্দুক ভাঙ্গা গেল না ; প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল ; ভাগ্যে ঘটল বদনাম। ১৯০৬ সালে আর কোনও প্রচেষ্টা হয়নি। কিন্তু দলগুলি নিরুৎসাহ হলনা, উদ্যম চল্লো সমানে। পরের বৎসর উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাস বোমা তৈরী করতে সমর্থ হলেন, আক্রমণের ধারা পাল্টে গেল।

(২) জামালপুর দাঙ্গা

ঢাকা জেলায় অনুশীলন দল বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। (১৯০৭) এপ্রিল ২১-এ জামালপুর (ময়মনসিংহ) ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে এবং বিপ্লবীরা তাতে অংশ গ্রহণ করে। কলকাতা থেকে তিন চারজন প্রসিদ্ধ "লাঠিয়াল" এবং অপর এক জন একটি বন্দুক নিয়ে এই দাঙ্গায় উপস্থিত ছিলেন। এতে দাঙ্গার প্রকৃতি বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত

হয়। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, শিশির কুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বসু (মীর্জাপুর স্ট্রীট), ইন্দ্রনাথ নন্দীকে কার্য্যবিধি ১০৭ ধারা অনুসারে জামিন মুচলেকা দিতে হয়। ব্যাপারটিকে গভর্ণমেণ্ট খুব ভাল চোখে দেখেনি কারণ এদের কৃতিত্বে গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হাঙ্গামায় ভয়ত্রস্ত হিন্দুনারীদের উদ্দেশ্য করে কামিনী ভট্টাচার্য "আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো" (মাতৃ-মন্ত্র পৃঃ ১১৮) এবং হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "আজি মাগো খুলে রাখ মণিময় হার, গলে পর নরমুণ্ডমালা" (মাতৃ-মন্ত্র পৃঃ ১১৬) যে গান রচনা করেছিলেন সে দুটি পাঠ করলে আজও দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

(৩) বাঁকুড়া : হাঁসা-ডাঙ্গা

আগষ্ট মাসে হাসাডাঙ্গা (বাঁকুড়া)র ডাকাতির চেষ্টা হয়; এতে সরকারী তালিকা স্ফীত করা ব্যতীত কোনো লাভ হয়নি।

(৪) ঢাকা জন্মাষ্টমীতে খুন

১৯০৭ সেপ্টেম্বর ৪-ঠা জন্মাষ্টমীর (Janmastami Stabbing Case) খুন রাত্রি আটটায় "মোহন গোপ" (ডাকনাম 'বোসা') পৃষ্ঠে ছুরিকাহত হয়। দুই দলের বিদ্বেষের পরিণতি এই আক্রমণ। বিপ্লব আন্দোলনে এই হত্যাপ্রচেষ্টা এক নতুন ধারা এনে দেয়। এর পরে বহু গুপ্ত হত্যার উদাহরণ পাওয়া যাবে।

(৫) সাহীন মেডিক্যাল হল

ঐ তারিখেই ঢাকা পটুয়াটুলি সাহীন মেডিক্যাল হল (Saheen Medical Hall) এর বারান্দায় সন্ধ্যা সওয়া সাতটার সময় শশীকুমার দে নামে এক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শশী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাকে পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল।

(৬) চন্দননগরে বোমা

অক্টোবর মাসে (১৯০৭) চন্দননগরে ছোট লাটের ট্রেন উড়িয়ে দেবার মতলব চলে। পরিকল্পনায় এ দুটির পরিসমাপ্তি ঘটলেও এখন থেকে শুরু করে দেশী ("কালী মায়ীর") বোমা বিপ্লবাত্মক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরের ঘটনা হচ্ছে, খড়্গপুর থেকে এসে বেণাপুর আর নারায়ণগড়ের মধ্যে লাইনের তলায় বোমা বসিয়ে বৈদ্যুতিক তার সাহায্যে তাকে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা হয়। বোমা ফেটেও ছিল কিন্তু লাটের গাড়ীর কোনো ক্ষতি হয় নি। সে সম্পর্কে বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে।

(৭) ওয়ারি দাঙ্গা

ঢাকার ওয়ারি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির ফলস্বরূপ এক ছোটখাটো দাঙ্গা হয় ১৯০৭ নভেম্বর ১৭-ই। কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতি এসে পড়ে কারণ অনুশীলন সমিতির পুলিনচন্দ্র দাস ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী এতে অংশ গ্রহণ করেন। সুতরাং পুলিশ চেষ্টা করে পুলিনকে এক মামলায় জড়িয়ে ফেলে। অনুশীলন সমিতির সম্পর্ক ছাড়া পুলিন তখন স্থানীয় ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক। ১৯০৮ জানুয়ারী ১৩-ই আসামীর তিন সপ্তাহ সশ্রম কারাবাস, নগদ পনেরো টাকা জরিমানা ও সচ্চরিত্রতার রক্ষাকবচ স্বরূপ ২৫০ টাকার জামীন মুচলেকা মেনে নিতে হয়।

(৮) নিতাইগঞ্জ

অক্টোবর মাসে ঢাকা নিতাইগঞ্জে একটি লোক কিছু টাকা একটি পুঁটলির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। 'সমিতির'

ছেলেরা সন্ধান পেয়ে সেটা ছিনিয়ে নেয়। তখনকার দিনে হয় তো কিছু সার্থকতা ছিল, কিন্তু না হলে ক্ষতি ছিল না।

(৯) এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টা

ঢাকার জেলা হাকিম (ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) মিঃ এ্যালেন ছুটিতে দেশে যাচ্ছিলেন। গোয়ালন্দ ষ্টেশনে তিনি আততায়ীর হাতে রিভলবারের গুলিতে পৃষ্ঠদেশে গুরুতরভাবে আহত হন ডিসেম্বর ২৩-এ। ভাগ্যক্রমে এ্যালেনের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। যতদূর শোনা গেছে আলিপুর বোমার মামলার বিভূতি ভূষণ সরকার বলেছেন তিনিই এ গুলি ছোড়ার বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত ছিলেন।

(১০) চাংড়িপোতা ডাকাতি

যখন বেণাপুর ও নারায়ণগড়ের মাঝে ছোটলাটের ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা হচ্ছে, সেই রাত্রেই (১৯০৭ ডিসেম্বর ৬) ২৪ পরগণার সোণারপুর থানার অন্তর্গত চাংড়িপোতা ষ্টেশনে এক ডাকাতি হয় ভোর সওয়া চারটা নাগাদ। পোর্টার খুব জখম হয়েছিল ; পরিমাণ সামান্য হ'লেও কিছু টাকা ষ্টেশনের লোহার সিন্দুক ভেঙে 'ডাকাত দল' নিয়ে চলে যায়। স্থানীয় যুবকদের দ্বারা এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (M. N. Roy) প্রভৃতি কয়েকজনকে আসামী করে মামলা রুজু হয়েছিল। ১৯০৮ ফেব্রুয়ারী ১২-ই সকল আসামীকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দেওয়া হয়।

(১১) নারায়ণগড় ট্রেন হামলা

আলিপুর মামলার যে সকল তথ্য বাইরে প্রকাশিত হ'তে লাগল তাতে ভারতে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শাসক ভয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। একটা ঘটনা থেকে তার আভাষ পাওয়া যাবে।

ছোটলাট বাহাদুর এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার (Andrew Fraser) ১৯০৭ ডিসেম্বর ৫-ই কটক ছেড়ে কলকাতায় আসছিলেন। ট্রেন যখন মেদিনীপুরে বেণাপুর ও নারায়ণগড়ে (৬-ই ডিসেম্বর) ভোর ২-৪৫ এর সময় এসে পৌঁচেছে তখন গাড়ীর নীচে বিকট শব্দে এক বিস্ফোরণ ঘটে তাতে ট্রেনের কোনো ক্ষতি হয়নি, সময় মত সেটা কলকাতায় এসে পৌঁচেছিল।

ভোরে পরীক্ষায় দেখা গেল লাইনের তলায় মাটিতে ৫।৬ ফুট ব্যাস ও ঐ রকম গভীর এক গর্ত্ত হয়েছে এবং সেইখানের লাইন বেশ খানিকটা বেঁকে গেছে। আশেপাশে কিছু সংবাদপত্র (২৪ ডিসেম্বরের ইংলিশম্যান) ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বোমার বিদারণ ভঙ্গী থেকে আন্দাজ করা স্বাভাবিক ছিল যে ওটা বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকের কাজ। কিন্তু তাদের খুঁজে বার করতে সময় যাবে ; এতদিন পুলিশ একেবারে বে-ইজ্জত হয়ে থাকতে পারে না। তদন্ত সুরু হয়ে গেল।

ঘটনাস্থলের কাছেই রঘুনাথপুর গ্রাম এবং শিবদাস নামে এক কুলীর বাড়ী। মাটি খুঁড়ে তার ভিতর থেকে পাথর বার করা তার কাজ। তার বাড়ী তল্লাসী হ'ল ডিসেম্বর ১৬-ই (১৯০৭) এবং কিছু বারুদও পাওয়া গেল। পাথরকাটা লোকের কাছে বারুদ থাকায় অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না।

শিবুকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করলে সে ১৯ তারিখে এক "স্বীকারোক্তি" করে এবং তার দেওয়া তথ্য মত গোপাল, উমেশ, ফকির, তরু, অপি, কুমেদ, নেপাল ও অযোধ্যা পাহাড়ীকে গ্রেপ্তার করা হল। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকারোক্তির ও একরার করার ধুম লেগে গেল ; পুলিশ হেফাজতে এবং তাদের কৃপার উপর থাকলে এ ব্যাপারটার ব্যতিক্রম হবার ফারণ খুব সামান্যই বিদ্যমান। অযোধ্যা পাহাড়ী ১৯-এ ডিসেম্বর বল্লে সে শিবুকে বারুদ বিক্রী করেছিল। কুমেদ ২০-এ তারিখে অপরাধ স্বীকার করে নিল।

নেপালের ব্যাপার একটু ভিন্ন রকমের বলে মনে করা যেতে পারে। এক দারোগা সাহেব ২০-এ তারিখে তাকে প্রথমে নারায়ণগড়ে দেখতে পান এবং আটক করেন। ২১-এ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির করলে সে সমস্ত সংস্রব অস্বীকার করে এবং পরের দিন তাকে পুলিশ হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচ দিন অর্থাৎ ২৭-এ পর্য্যন্ত পুলিশের কবলে থাকার পর তাকে পুনরায় হাকিমের কাছে হাজির করা হয় এবং সে অপরাধ কবুল করে। তখন তাকে পুলিশ হাজত হতে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ কদিন তার যেভাবে কেটেছে এবং "সত্যের" প্রতি তার কেন এত অনুরক্তি হল, সেটা কল্পনাগ্রাহ্য বস্তু বলে বোঝানো কষ্টসাধ্য বিষয়।

তখন সকল আসামীকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হ'লো ১৮-ই ফেব্রুয়ারী (১৯০৮) এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক মামলা অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক তথ্যানুসন্ধান শুরু হলো। শিবু দাসের অকপট স্বীকারোক্তির ফলে (pardon) "ক্ষমা" করে তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে দেখা গেল আসামীদের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, এবং অপরাধের গুরুত্ব বিধায়, তারা জজ কর্ত্তৃক বিচারের উপযুক্ত। তখন আর কাল বিলম্ব নেই ; ম্যাজিস্ট্রেট মতামত দিলেন ৯-ই মার্চ (১৯০৮), দায়রা আরম্ভ ৩১-এ মার্চ, মাত্র কটা দিনের ব্যবধানে।

বিচারে আসামী পক্ষ প্রমাণ দিলে বেশীর ভাগ কুলিই দাঁতনে কাজ করেছিল ঘটনার দিন, আর দাঁতন নারায়ণগড় থেকে ২৫ মাইল দূরে। শিবু আর নেপাল ৫-ই ডিসেম্বর বেলা ২-৪৫ মিনিটে তাদের মজুরি নিয়েছে, সুতরাং তাদের পক্ষে নারায়ণগড় থেকে পরদিন সকালেই দাঁতন ফিরে এ.স রেল লাইনে কাজে, লেগে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিচারের রায় প্রকাশিত হ'ল। দুজন এ্যাসেসরই নেপাল দলুইকে দোষী সাব্যস্ত করলেন সুতরাং তার ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। অপর আসামী সম্বন্ধেও জজ সাহেব অনুকম্পা প্রকাশ করেন নি। ফলে গোপাল, তরু ও ফকিরের প্রত্যেকের পাঁচ ও কুমেদ ও অপর প্রত্যেকের সাত বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। রেলের গেটম্যান উমেশ মুক্তি লাভ করেছিল।

হাই কোর্ট আপীল দায়ের হয়েছে ১৯০৮ জুন ১৬-ই। ইতিমধ্যে এক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ৪-ঠা মে তারিখে আলিপুর বোমার আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও পরদিন বিভূতি সরকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একরার করেছেন যে এই ঘটনা তাঁদের দ্বারা সংসাধিত হয়েছিল। প্রফুল্ল চাকীও সঙ্গে ছিলেন। বিশদ ভাবে তাঁরা বিবরণ প্রকাশ করেন। বোমার অংশ, উপকরণ, নির্ম্মাণ ব্যবস্থা কিছুই অপ্রকাশিত রাখেন নি। তাঁদের বোমা ছোড়া হয়েছিল ইংলিশম্যান ও বন্দে মাতরম্ পত্রিকাতে। পূর্ব্বে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থলে ইংলিশম্যানের একখান পাতাও পাওয়া গিয়েছিল।

এ দোষ স্বীকার করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে নিরীহ লোক কষ্ট না পায়। কিন্তু আসামীদের কপালে দুঃখ আছে, খণ্ডিত হবার উপায় নেই। জজ সাহেব বল্লেন বিচার্য্য মামলাতে স্বীকারোক্তি এবং অপরাপর সাক্ষ্য দ্বারা আসামীদের অপরাধ প্রমাণিত হ'য়ে গিয়েছে, সুতরাং অপরে কে কোথায় কি বলেছে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯-এ আগষ্ট সব আপীল নাকচ করা হ'ল, পূর্ব্ব দণ্ডাদেশ বহাল রয়ে গেল। ভাবতে লজ্জা হয় যে এটা দেশের সর্ব্ব প্রধান বিচারশালা এবং সেখানে এত বড় ব্যাভিচার। আসামীরা সব জেলখানায় প্রেরিত হলো। ঘানি টানা থেকে সব গুরু কাজই "সশ্রম" দণ্ডে পালিত হতে লাগলো। বিবেক বলে যে বস্তু আছে, সেটা শাস্তি দিতে চাইলে না। ভিতরে ভিতরে খুব ফাইল চালাচালি হ'তে লাগলো। হঠাৎ ১৯১০ মে ১৮-ই কমবেশী কুড়ি মাস দণ্ডভোগ করবার পর সরকারী আদেশে আসামীরা মুক্তি পেল। ভূমিষ্ঠ হবার

পরেই বিধাতাপুরুষ খাগড়ার কলমে তাদের কপালে কারাবাস লিখেছিলেন, সুতরাং খণ্ডিত না হয়ে বিনা অপরাধেই তাদের কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হ'লো।

(১২) বৈপ্লবিক নীতি

বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার পর বিপ্লবীদল ক্রমে অধিক সতর্ক হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের তরফে সমস্তার প্রতিবোধ কল্পে চণ্ডনীতি প্রচণ্ড বেগে নেমে আসে। এখন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত হিংসাত্মক কার্য্যে গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করার নানা উপায় অবলম্বনের-পালা। সুখ শান্তি যশঃ পদমর্য্যাদা এমনকি জীবনকে উপেক্ষা করে যুবকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ সময় নেতৃত্ব এক কেন্দ্রে নিবদ্ধ ছিলনা। ছোট ছোট দলের মধ্যে কর্মী বেরিয়েছে, কর্মপন্থা স্থির হয়েছে, তাদেরই মধ্যে একজন নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বাঙ্গলায় যখন নানা রকম আক্রমণ আরম্ভ হ'লো, তখন দূরে সহরে বসে এক জনের পক্ষে সমস্ত পরিচালনা করা আর সম্ভব ছিলনা। কিন্তু তখনও মোট দল দুটি, অনুশীলন আর যুগান্তর—তার মধ্যে "গ্রুপ" বা দল, মাদারিপুর, হাওড়া, ঢাকা, চাংড়িপোতা, ময়মনসিংহ, রায়পুর প্রভৃতিতে নানা কেন্দ্র করে কাজ চলতে লাগল। সহর বা সহরতলীতে অস্ত্র সংগ্রহ বা বোমা তৈরীর (টেকনিক) প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো। এই সব "হাতিয়ার" সজ্জিত হয়ে, হয়ত আদর্শের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে খুন জখম, লুট-পাঠ চলতে থাকে। পরে যে সকল পন্থা অবলম্বিত হয়েছে তার প্রায় সব রকম নমুনা ১৯০৮-এ পাওয়া যায়। বিস্ফোরক তৈরী করতে প্রাণ বিসর্জ্জন এই সময়ই দেখা যায়। (পরে অবশ্য মোটর নিয়ে ডাকাতি একটা নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল) বৈপ্লবিক নিজে মরেছে, অপরকে মেরেছে এবং সে সংখ্যা পরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১৩) সরকারী প্রতিরোধ : সভাসমিতি

বিপ্লবী ঘটনার তালিকা দীর্ঘ হয়ে উঠছে সুতরাং গভর্ণমেণ্ট থেকে তার বিস্তার রোধ করার চেষ্টাও চুটিয়ে আরম্ভ হ'লো। প্রথম নজর পড়লো সভাগুলির ওপর। বঙ্গ বিভাগের পর এর প্রাচুর্য্য ছিল খুব, কিন্তু তাতে যে সকল বক্তৃতা হ'তো তাতে মোটামুটি অর্থনীতি, নিজেদের অসহায়তা এবং তার প্রতিবিধানের কথা থাকতো। তাতে গভর্ণমেণ্টের খুব বিচলিত হবার কারণ ছিল না। যারা একটু 'গরম' কথা বলেছে ছলছুতায় গভর্ণমেণ্ট বিচারের প্রহসনে তাদের সাজা দিয়েছে। না হয় লাঠিবাজি করে, হুমকি দিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছে। রাজদ্রোহোদ্দীপক 'আপত্তিকর' বক্তৃতা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

এখন 'রাজদ্রোহ'র সঙ্গে সক্রিয় প্রতিরোধের বক্তৃতা যুক্ত হয়েছে। সুতরাং কড়াকড়ি আরও বেড়ে উঠ্‌লো। ১৯০৭ নভেম্বর ১-লা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 'অসন্তোষ' বা বিদ্বেষ প্রসার বন্ধ করার জন্য আইন (Prevention of Seditious Meetings Act) বিধিবদ্ধ হয়েছিল। প্রকাশ্য সভার ত কথাই নেই। বিশ জন লোকের সমাবেশের জন্য ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করা হ'লে সেটা 'সাধারণ সভা' বলে এখন থেকে গণ্য করা হবে এবং সে সভায় পুলিশকে উপস্থিত থাকতে দেবার অধিকার দিতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের রিপোর্টের ওপর যে কোনও মিটিং বন্ধ করে দেবার অধিকার লাভ করে এবং ওয়ারেণ্টে বক্তাকে সরাসরি গ্রেপ্তার করার শক্তি প্রদত্ত হয়।

(১৪) প্রেস

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও কঠোরতর করা হ'লো। ১৯০৭ জুন ৩-রা তারিখের আগে কোনো সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে হ'লে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কারণ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হ'তো। এখন যে ব্যবস্থা হ'লো

তাতে গভর্ণমেণ্টের কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। যদি প্রাদেশিক সরকার মনে করেন যে আইনের সীমা লঙ্ঘন করে কোনো পত্রিকা কিছু লিখেছে, তাহ'লে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখের দিকে চেয়ে না থেকে প্রাদেশিক সরকার সরাসরি মামলা রুজু করবার অধিকার পায়। এখন থেকে সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রেসের মালিক প্রভৃতি ত বটেই, বিক্রেতা, হকার, প্রচারক প্রভৃতি সকলকেই জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হ'তে লাগলো। মনে রাখতে হবে, এ আইন কেবল সংবাদপত্র নয়, প্রচার পত্র, পুস্তিকা, পুস্তক, অর্থাৎ ছাপার অক্ষর যাতে বেরিয়েছে তার সকলগুলিই এই আইনের এলাকায় বাধা পড়ে গেল।

অসুবিধা খুবই হ'লো বটে, কিন্তু এর ফলে যেন বাঙ্গালী নূতন উৎসাহ সঞ্চয়ে মনোযোগ দিয়েছিল।

JAYASREE

Socio-Cultural Bengali Monthly

Founded in 1931

Advertisement Rate Schedule

Ordinary

Full Page :	Rs.	100·00
Half Page :	Rs.	55·00
Quarter Page :	Rs.	30·00

Cover Page

Second Cover :	Rs. 175·00
Third Cover :	Rs. 200·00
Fourth Cover :	Rs. 350·00

For Special Position contact *Advt. Manager* Jayasree.

Advertising Space 20·5Cm × 15·24Cm. (8" × 6")

Contact

Manager, Jayasree

251A/32, Netaji Subhas Chandra Bose Road

Calcutta—47

Phone : 46-4116

ডাব্লিয়ু. বি. ঈয়েট্‌স্‌

পথচারী

মার্কসবাদী সমালোচনা একটা জিনিস করতে পারে নিঃ সেটা হল "প্রবণতা" ও সাহিত্য-রচনাশৈলীর সম্বন্ধ নির্ণয়। কোনো বইয়ের বিষয়বস্তু ও বাক্-প্রতিমাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তার অঙ্গবিন্যাসের (texture) ব্যাখ্যা করা যায় না বলেই মনে হয়। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক কিছু থাকতেই হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সবাই জানেন যে একজন সমাজ-বাদী চেস্টার্টন-এর মতো বা একজন টোরি সাম্রাজ্যবাদী বার্নার্ড শ র মতো লিখবেন না —যদিচ কী করে তা বোঝা যায় তা বলা সহজ নয়। ঈয়েটস্-এর বেলা তাঁর বেঢপ, এমন কি বাঁকাচোরা রচনা-শৈলী এবং অলক্ষুণে জীবন-দর্শনের মধ্যে কোনো একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। মিঃ মেনন ঈয়েট্‌স্-এর রচনায় নিহিত গুহ্য দর্শন নিয়েই ব্যাপৃত। কিন্তু তাঁর চমৎকার বইটির সর্বত্র বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলিই স্মরণ করিয়ে দেয় ঈয়েট্‌স্-এর রচনা-ভঙ্গি কত কৃত্রিম। সাধারণত এই কৃত্রিমতাকে 'আইরিশিয়ানা' (Irishism) বলেই গ্রহণ করা হয়, অথবা ঈয়েট্‌স্‌কে সরলতাগুণের অধিকারী মনে করা হয়। কারণ, তিনি ছোট ছোট শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর পদ্যে পর পর ছয়টি পংক্তিও পাওয়া যায় না— যাতে আর্ষপ্রয়োগ বা অস্বাভাবিক বাগ্‌ভঙ্গি নেই। একটি নিকটতম উদাহরণ নেওয়া যাক্ :

"Grant me an old man's Frenzy, / My self must I remake / Till I am Timon and Lear / Or that William Blake / Who beat upon the wall / Till Truth obeyed his call."

অপ্রয়োজনীয় 'that' শব্দটি কৃত্রিমতার ভাব প্রকাশ করে, আর ঈয়েট্‌স্-এর শ্রেষ্ঠ রচনাংশ বাদে সর্বত্র অনুরূপ প্রবণতা বর্তমান। একে সেকেলে-অদ্ভুত বলে সন্দেহ হয়, এই সন্দেহের হাত কদাচ কেউ এড়াতে পারেন। আর এই অদ্ভুত ভাবটা যে শুধু '৯০-এর গজদন্ত মিনারের সঙ্গেই যুক্ত তা নয়, এর যোগ র‍্যাকহ্যাম-এর (Rackham's) চিত্রাবলী, ...এবং পিটার প্যান-এর 'হেথা নয়, অন্য কোন্ খানে'র সঙ্গেও। এই শেষোক্তের একটি রুচিকর উদাহরণ হল 'দ্য হ্যাপি টাউনল্যাণ্ড'। এতে অবশ্য কিছুই এসে যায় না, কারণ, মোটের ওপর, এতেও তিনি উত্‌রে যান। আর, তাঁর চমৎকারিত্ব লাভের কসরৎ দেখে যদিও সময় সময় গা জ্বলে যায়, তবু এমন বাক্যাংশও তিনি রচনা করতে পারেন যা অকস্মাৎ আমাদের অভিভূত করে—যেমন লোকে অভিভূত হয় ঘরের ওধারে একটি মেয়ের মুখ দেখে। কবিরা কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করেন না—এ নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি :

"How many centuries spent / The sedentary soul / In toils of measurement / Beyond eagle or mole, / Beyond hearing or seeing, / Or Archimedes' guess, / To raise into being / That loveliness ?" এখানে 'loveliness'-এর মতো

মওকার স্থূল শব্দ ব্যবহারে তিনি সংকুচিত ন'ন, আর মোটের ওপর এই চমৎকার বিস্ময়কর রচনাংশের এতে কোনো গুরুতর ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এধরনের ঝোঁক এবং তার সঙ্গে ইচ্ছাকৃত একরকমের ন্যাড়ামুড়ো ভাব তাঁর 'এপিগ্রাম' (epigrams) ও বিতর্কমূলক (polemical) কবিতাগুলোকে দুর্বল করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ (স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি), 'The Playboy of the World'-এর আত্মশ্রাদ্ধ করেছেন যে-সব সমালোচক তাঁদের বিরুদ্ধে 'এপিগ্রামটি' :

"Once when midnight smote the air
Eunuchs ran through Hell and met
On every crowded street to stare
Upon great Juan riding by ;
Even like these to rail and sweat,
Staring upon his sinewy thigh."

ইয়েটস্-এর অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁকে সদ্য তৈরী উপমা (analogy) যোগায় এবং শেষ পংক্তির প্রচণ্ড বিদ্রূপ সৃষ্টি করে। তবু এই ছোট, কবিতাটিতেও দু'-সাতটি অনাবশ্যক শব্দ রয়েছে। আরেকটু পরিপাটি হলে কবিতাটি হয়ত আরো মারাত্মক হয়ে উঠত।

মিঃ মেনন-এর বইটি প্রসঙ্গত ইয়েটস্-এর ক্ষুদ্র জীবনী, কিন্তু সর্বোপরি তাঁর আগ্রহ ইয়েটস্-এর দর্শনতন্ত্রে (philosphical "system")। আর তাঁর মতে, যা সাধারণত স্বীকৃত তার চেয়ে ঢের বেশী ইয়েটস্-এর কবিতার বিষয়বস্তু তাঁর এই দর্শনতন্ত্র থেকে পাওয়া যায়। এই দর্শনতন্ত্র বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে আর সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে প্রকাশিত 'A Vision' বইটিতে। বইটি আমি কখনো পড়িনি, কিন্তু তার থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন মিঃ মেনন। আর ইয়েটস্ এর উৎসের পরস্পর-বিরোধী সব বিবরণ দিয়ে মিঃ মেনন বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিতই করেছেন যে, যে-সব দলিল এর লোক-দেখানো ভিত্তি, তা কাল্পনিক। মিঃ মেনন বলেন, "ইয়েটস্-এর দর্শন-তন্ত্র প্রায় শুরু থেকেই তাঁর বুদ্ধি-ভিত্তিক জীবনের পেছনে ছিল। তাঁর কবিতা এই দর্শনে ভরপুর। এটাকে বাদ দিলে তাঁর পরবর্তী কবিতা প্রায় সম্পূর্ণ অবোধ্য হয়ে পড়ে। এই তথাকথিত দর্শনের বিষয় পড়তে শুরু করলেই আমরা ঢুকে পড়ি মহাচক্রের (Great Wheels) মায়াজালের মধ্যে—মহাবর্ত, চন্দ্রের কলাচক্র, জন্মান্তর, বিদেহ আত্মা, জ্যোতিষ এবং আরো অনেক কিছুর মধ্যে। এসবই যে তিনি সরল মনে বিশ্বাস করতেন সে কথাটা আড়ালে রেখেছেন, কিন্তু তিনি অধ্যাত্মবাদ ও জ্যোতিষ নিয়ে নিশ্চিত ঘাঁটাঘাঁটি ও অনধিকার চর্চা করতেন এবং প্রথম জীবনে কিমিয়া-বিদ্যায় (alchemy) পরীক্ষাও চালিয়েছিলেন। তাঁদের কলাবৃত্তির দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার তলায় চাপা পড়ে থাকলেও এই দর্শন-তন্ত্রের কেন্দ্রগত ভাবটি মনে হয়, আমাদের প্রাচীন বন্ধু সংসারচক্র—যাতে সবকিছুরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইয়েটস্ কে তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী (mystical) বিশ্বাসের জন্য উপহাস করবার অধিকার বোধ হয় আমাদের নেই, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, ভোজবাজিতে খানিকটা বিশ্বাস যে সর্বজনীন তা দেখানো যায়। কিন্তু এসব ব্যাপারকে গুরুত্বহীন খামখেয়ালি বলে উড়িয়ে দেওয়াও উচিত নয়। এ বিষয়ে মিঃ মেননের অনুভূতিই, (perception) তাঁর বইয়ের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। "উৎসাহ ও প্রশংসার প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বলেছেন, বিরাট ও অদ্ভুত বুদ্ধিবৃত্তির যে মূল্য দিতে হয় সেই মূল্য-স্বরূপই কিম্ভূতকিমাকার (fantastical) দর্শনকে সবাই বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি যে কী বলতে চাইছেন একথা কেউ ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। আর পাউণ্ড (Pound) এবং সম্ভবত এলিয়ট-এর মতো যাঁরা তা বুঝেছিলেন তাঁরা তিনি যে দার্শনিক মতের ওপরে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন তাকে অনুমোদন করেছিলেন। আশা করা যেতে পারত যে,

এর প্রথম প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন তরুণ ইংরেজ কবিদের থেকে আসবে; তা কিন্তু আসে নি। তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ 'A Vision'-এর চেয়ে কম অনম্য-কঠোর বা কৃত্রিম দর্শনতন্ত্রে ইয়েট্‌স্-এর শেষ জীবনের মহৎ কাব্য সৃষ্টি হয় ত সম্ভব হত না।" হয়তো হতনা, তবু ইয়েট্‌স্-দর্শনের কতকগুলি খুবই ক্ষতিকর তাৎপর্য আছে; মিঃ মেনন তা নির্দেশ করেছেন।

রাজনীতির ভাষায় তর্জমা করলে, ইয়েট্‌স্ এর ঝোঁকটা ফ্যাসিবাদী। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় এবং ফ্যাসিবাদের নাম শোনার বহু পূর্বেই তাঁর ছিল তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি, যারা আভিজাত্যবাদের পথে ফ্যাসিবাদে উপনীত হয়। তিনি ছিলেন ঘোর গণতন্ত্র-বিদ্বেষী, আধুনিক জগৎ, বিজ্ঞান, যন্ত্র, প্রগতিবোধ, সর্বোপরি মানব-সাম্যের একান্ত বিরোধী। তাঁর রচনার অধিকাংশ বাক্ প্রতিমাই সামন্ত-তান্ত্রিক, আর স্পষ্টতই তিনি সাধারণ উন্নাসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। পরে তাঁর এইসব ঝোঁক আরো স্পষ্টাকারে দেখা দেয় এবং "একমাত্র সমাধানরূপে সার্বিক-বাদের (totalitarianism) উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতির" দিকে তাঁকে চালিত করে। "এমন কি, হিংসা ও অত্যাচারও প্রয়োজনবোধে অশুভ নয়, কারণ কল্যাণ এবং অকল্যাণের জ্ঞান নেই বলে জনসাধারণ অত্যাচারকে সম্পূর্ণ মেনে নেবে।...ওপর তলা থেকেই সব কিছু আসতে বাধ্য। জনগণের থেকে কিছুই আসতে পারে না।" রাজনীতিতে বেশী আগ্রহ নেই তাঁর, অত্যল্পকাল জনসেবা-ব্রতীর জীবনে প্রবেশ করেও বিরক্ত তিনি, তবু ইয়েট্‌স্ রাজনৈতিক বাণী ঘোষণা করে থাকেন। উদারমতবাদের মোহের অংশীদার হওয়ার পক্ষে অনেক উঁচু ঘরের লোক তিনি, আর ১৯২০ সালেই এক বিখ্যাত রচনাংশে ("The Second Coming") তিনি আগাম বলে দিয়েছিলেন আমরা সত্যই কী রকম দুনিয়ায় প্রবেশ করেছি। কিন্তু এই আগামী যুগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি, এ-যুগ হবে পদক্রমিক (hierarchical) পুংভাবাপন্ন (masculine), কঠোর (harsh), অস্ত্রোপচারমুখী (surgical)" এবং এজরা পাউণ্ড ও বিভিন্ন ইটালীয় লেখকদ্বারা প্রভাবিত। তিনি আশা ও বিশ্বাস করেন এই নতুন সভ্যতা আসবে: তার বর্ণনাও তিনি করেছেন—"একান্ত পূর্ণাঙ্গ অভিজাত-ভিত্তিক সভ্যতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্রমিক (hierarchical), প্রত্যেক বড় লোকের দোরে প্রার্থীদের ভিড়, মাত্র গুটি কয়েক লোকের হাতে বিপুল অর্থ সম্পদ, ঐ ক'জনের ওপরেই স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত সকলের নির্ভর, সম্রাট দেবতা, আরো বড়ো দেবতার অধীন তিনি, আর সর্বত্র—বিচারালয়ে, পরিবারে বিধিবদ্ধ অসাম্য।" এ বিবৃতির নিরীহ ভাবটা যেমন আকর্ষণীয় তেমনি উন্নাসিক। শুরুতেই একটিমাত্র বাক্যাংশে—"গুটিকয়েক লোকের হাতে বিপুল ধনসম্পদ" ইয়েট্‌স্ ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রীয় স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন; আর এই স্বরূপটি ঢেকে রাখবার উদ্দেশ্যেই এর সমস্ত প্রচার। নিতান্ত রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদীরা ন্যায়ের খাতিরে লড়াই করছে বলে সর্বদা দাবি করে থাকে: কবি ইয়েট্‌স্ কিন্তু এক নজরেই দেখতে পান যে ফ্যাসিবাদ মানে অন্যায় এবং সেই কারণেই তার তারিফ করেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি দেখতে পান না যে, নতুন কর্তাভজা (authoritarian) সভ্যতা যদি আসে তবে সে সভ্যতা অভিজাত-প্রধান হবেনা বা তেমনটি হবেনা যাকে তিনি অভিজাত-প্রধান মনে করেন। ভ্যান ডাইকের (Van Dyck) আঁকা চেহারার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এ সভ্যতা শাসিত হবে না; তাকে শাসন করবে নাম-গোত্রহীন কোটিপতিরা ও খুনে অপরাধীর দল। অন্যান্য ব্যক্তি একই ভুল করে' পরে তাঁদের মত বদলেছেন। আর এটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, আরো বেশী দিন বেঁচে থাকলে ইয়েট্‌স্ সম-মর্মিতায়ও তাঁর বন্ধু পাউণ্ডকে অনুসরণ করতেনই। কিন্তু ওপরে যে-রচনাংশ আমি উদ্ধৃত করেছি

তার ঝোঁকটি সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ এবং গত দু'হাজার বছরে অর্জিত যাবতীয় শুভফল সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া একটি অস্বস্তিকর লক্ষণ।

ঈয়েট্‌স্-এর রাজনৈতিক ধারণা তাঁর অতি-প্রাকৃতবাদের (occultism) ঝোঁকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল কেমন করে? পয়লা নজরে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় কেন 'গণতন্ত্র-বিদ্বেষ' এবং 'নখ-দর্পণে' বিশ্বাস-প্রবণতা একই সঙ্গে চলে। মিঃ মেনন অতি সংক্ষেপে এর আলোচনা-মাত্র করেছেন, কিন্তু এবিষয়ে দুটি অনুমান সম্ভব। সভ্যতা যে কল্পে-কল্পে আবর্তিত হয়—এই তত্ত্বই মানব-সাম্যবিদ্বেষীদের বেরিয়ে আসার একটি পথ। যদি সত্য হয় যে 'এসবই' বা 'এর মতো কিছু' পূর্বে ঘটে গেছে তবে বিজ্ঞান ও আধুনিক দুনিয়া এক সঙ্গেই নস্যাৎ হয়ে যায় আর প্রগতি চিরদিনের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণীর লোক যদি ওপরে উঠে আসতে থাকে তবে তাতে কিছুই এসে যায় না, কারণ শেষ পর্যন্ত আমরা জুলুমবাজির (tyranny) যুগে শীঘ্রই ফিরে যাব। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে ঈয়েট্‌স্-এর একার তা নয়। বিশ্ব যদি চক্রেই আবর্তিত হয় তবে ভবিষ্যৎটা নিশ্চয়ই আগেই দেখা যাবে এবং হয়ত কতকটা ভাগে-ভাগেও দেখা যাবে। আদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেমন সৌরজগৎ আবিষ্কার করেছিলেন এটাও তেমনি এর গতির নিয়ম আবিষ্কারেরই প্রশ্ন মাত্র। ওটা বিশ্বাস করুন, তবে জ্যোতিষ বা অনুরূপ কোনো তন্ত্রে (system) বিশ্বাস করতে আর অসুবিধা হবে না। যুদ্ধের এক বছর আগে ফরাসী ফ্যাসিবাদী সাপ্তাহিক Gringoire-এর একটি সংখ্যা পরীক্ষা করে আমি আলোকদর্শনের (Clairvoyance) কম করে আটত্রিশটি বিজ্ঞাপন দেখতে পেলাম। দ্বিতীয়ত, অতি-প্রাকৃতবাদের (occultism) ধারনার সঙ্গে এই ধারনাও জড়িত যে, জ্ঞান মূলে একটি দীক্ষিত গোষ্ঠিতে সীমাবদ্ধ একটি গুহ্য ব্যাপার। কিন্তু ঐ একই ধারনা ফ্যাসিবাদেরও সার্বজনীন ভোটাধিকার, লোকায়ত শিক্ষা, চিন্তার স্বাধীনতা, নারীমুক্তির সাফল্য-সম্ভাবনায় যাঁরা আতংকিত গুহ্য ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিয়েই তাঁদের যাত্রা শুরু হবে। ফ্যাসিবাদ ও জাদুবিদ্যার আরেকটা যোগসূত্র আছে খ্রীস্টীয় নীতিশাস্ত্রের প্রতি উভয়ের ঘোরতর বিরোধিতার মধ্যে।

নিঃসন্দেহে, ঈয়েট্‌স্ তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকতে পারেন নি, নানা সময়ে নানা মত অবলম্বন করেছেন। এই সব মত ও বিশ্বাসের কোনোটা কুসংস্কারমুক্ত, কোনোটা নয়। মিঃ মেনন এলিয়ট-এর দাবির পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, কবিদের মধ্যে ঈয়েট্‌স্-এরই পরিণতি লাভ করতে সবচেয়ে বেশী সময় লেগেছে; কিন্তু আমি তাঁর যত রচনা স্মরণ করতে পারি অন্তত সেগুলোর মধ্যে একটা বিষয় ধ্রুব। আর সেটি হল আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ এবং ব্রোঞ্জ যুগে অথবা সম্ভবত মধ্যযুগে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। এরকম সব লেখকের মতো তাঁর ঝোঁক অজ্ঞতার প্রশস্তি লেখার দিকে। তাঁর অপূর্ব নাটক The Hour-Glass-এ জড়বুদ্ধিব্যক্তিটি ('the Fool'), হ'ল একটি চেস্টারটনীয় চরিত্র, 'ঈশ্বরের ভাঁড়' ('God's fool') সাক্ষাৎ 'শুকদেব' ("the natural born innocent"),—যে কিনা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির চেয়েও সর্বদা প্রাজ্ঞতর। সারাজীবনের যত ভাবনা সবই ব্যর্থ হয়েছে—এই জ্ঞানলাভেই নাটকের দার্শনিকটির মৃত্যু (আবার স্মৃতি থেকেই উদ্ধার করছি):

"The stream of the world has changed the course, | And with the stream any thoughts have run | Into some cloudy, thunderous spring | That is its mountain-source; | Ay, to a frenzy of the mind, | That all that we done's undone | Our speculation but as the wind."

সুন্দর কথাগুলো, কিন্তু এর গূঢ়ার্থ ঘোরতর প্রতিক্রিয়া-সূচক এবং অজ্ঞতার ইঙ্গিতবহ (obscurantist); কারণ, একথা যদি সত্য হয় যে দার্শনিকের চেয়ে একটি গেঁয়ো জড়বুদ্ধি আহাম্মক বেশী বুদ্ধিমান, তবে বর্ণমালার আদৌ আবিষ্কার না হলেই ভালো হত। অবশ্য অতীতের যশঃ-কীর্তন কতকটা ভাবালুতা, কারণ অতীতে আমরা জীবন ধারণ করি না। দরিদ্র লোকেরা দারিদ্র্যের প্রশংসা করে না। যন্ত্র আগে আপনাদের পশুর খাটুনি থেকে মুক্তি দিয়েছে, তবেই যন্ত্রকে আপনারা অবজ্ঞা করতে পারছেন। কিন্তু একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, আরো আদিম, আরো hierarchical যুগের জন্য ঈয়েট্‌স্-এর ব্যাকুলতা আন্তরিক ছিল না। কিন্তু এ-সবের কতটা শুধু তাঁর উন্নাসিকতা-জনিত—সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। অভিজাত শ্রেণীর একটি দরিদ্র ক্ষীয়মান উপশাখার পরিণত ঈয়েট্‌স্-এর নিজের অবস্থারই ফল তাঁর এই উন্নাসিকতা। তাঁর এই সংস্কার-বিমুখ মতামত ও 'উদ্ভট' ভাষার প্রতি ঝোঁকের মধ্যে যোগ-সূত্রটি আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে; মিঃ মেনন এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও প্রায় করেন নি।

মেননের বইটি খুব ছোট; আমার একান্ত আগ্রহ যে, তিনি এ কাজে আরো অগ্রসর হোন এবং ঈয়েট্‌স্ সম্বন্ধে আরেকটা বই লিখুন; বর্তমান বইটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই ওটার শুরু হোক। "আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ কবি যদি সোল্লাসে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে ফ্যাসিবাদী যুগের আবাহন করেন তবে তাকে অস্বস্তিকর লক্ষণ বলেই মনে করতে হয়"—বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। এটা একটা অস্বস্তিকর লক্ষণ বটে, কারণ-এ ঘটনা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের যুগের সেরা লেখক অনেকেই ছিলেন প্রবণতায় প্রগতিশীল, আর যদিও ফ্যাসিবাদ অতীতে ফিরে যাবার যথার্থ সুযোগ দিচ্ছে না তবু যারা অতীতের জন্য ব্যাকুল তারা সম্ভাব্য বিকল্পের চেয়ে ফ্যাসিবাদ গ্রহণে অধিকতর তৎপর হবে। কিন্তু অন্যান্য দিক থেকেও বিষয়টি আলোচনা করা যায়; গত দু'তিন বছরে আমরা তা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ফ্যাসিবাদ ও শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবীর (literary intelligentsia) মধ্যে সম্পর্কটা খতিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন, আর ঈয়েট্‌স্ থেকেই তা শুরু হতে পারে। মিঃ মেননের মতো যাঁরা কবিকে মুখ্যত কবি বলেই দেখতে চান অথচ যাঁরা এ ও জানেন যে, লেখকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস উপহাস-যোগ্য অবাস্তব বস্তু (excrescences) নয়, কিন্তু এমন কিছু যা তাঁর রচনার ক্ষুদ্রতম খুটিনাটির ওপরও ছাপ রেখে যাবে—তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে কবির বিচার-আলোচনা করতে পারেন। *

* জর্জ অরওয়েল লিখিত W. B. Yeats নামক প্রবন্ধের অনুবাদ। প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯৪৩ সালে।

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

'...আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত এবং স্কুল কলেজে সুভাষের মহান জীবন জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত।'

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু

...'সুভাষচন্দ্র' প্রথম খণ্ড পাঠের ফলশ্রুতি কেবল সমুদ্র স্নানের চরিতার্থতার সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। সমুদ্র সন্তরণ নিছক শারীরিক ব্যায়াম নয়, মানসিক সাহস ও বীর্যেরও উদ্দীপক। পবিত্রকুমারের সাধনার মধ্যে যে-কোনো পাঠক যুগপৎ সে ব্যায়াম ও বীর্যে নিষ্ণাত হতে পারার সঞ্জীবতাটুকু সংগ্রহ করতে পারবেন'—

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

'... এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।' —যুগান্তর

...'বিস্মিত হয়েছি লেখকের গভীর গবেষণায় আর অনুভূতির তীব্র মাধুর্যে, তাঁর ঐতিহাসিক সমীক্ষায় আর রাজনীতিক দূরাবগাহনে, পুলকিত হয়েছি তাঁর প্রসাদ-গুণসমৃদ্ধ ভাষার সাবলীল শ্রীমণ্ডিত ব্যবহারে, গভীর শ্রদ্ধার অকৃত্রিম আন্তরিকতায়।'

—যুগবাণী

দাম : নয় টাকা

বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন : ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক। জয়শ্রী প্রকাশন : ২৫১-এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪৭

সুনীথ মজুমদার

মুহূর্ত যুথিকা : তার সংঘ নাদ

মুহূর্ত যুথিকা, তার এই সংঘনাদ, যার খুশি
শুনুক, যার খুশি কান ফিরিয়ে থাক, আমি
জানব কেউ একজন ঘরের নির্জন কোণে, রাত্রিগভীরে
হয় তো শুনেছে, ভেবেছে, মৃতসঞ্জীবনী সুধা
পেয়েছে এর থেকে মনে মনে ; স্মৃতির স্বরলিপিতে গলা সেধে
বুঝেছে, এলোমেলো হাজার ভাবনারাও একটি সুতোয় বাঁধা।

মনস্তাপ

সমস্ত বিশ্বাসে ধুলো, অতিরিক্ত ভালোবাসার
সুযোগ নিয়ে বিশ্বের সমস্ত অধিকার
শিশুর মত চেয়েছিলে বলে
তোমার করুণ-মূর্তির দিকে চেয়ে
করুণা ছাড়া কিছু নেই।

সমস্ত বিশ্বাসে ধুলো, এতকাল পরে
স্বরচিত মেঘমালা মনস্তাপের বিদ্যুৎ লিখনে
তোমারেই ডাকে,
প্রহরী-প্রকৃতিকে ডেকে প্রার্থনা রাখে :
পুনর্জীবন সম্ভব নয়, আমি বহুকাল সাধনায় ছিলাম,
কিন্তু তোমার গোপন মন্ত্র তার কানে কানে কিছু দিও।

শান্তি

শান্তি নেব মনে মনে। সূর্যাস্তের অভিঘাতে
ছড়ানো ছায়া আর রঙের পাপড়ি মাড়িয়ে
হেঁটে যাব। শুরু মুহূর্তের ঝাঁকে ঝাঁকে

পুরোনো আবেগের সারি সন্ধ্যার মায়ায়
উড়ে যাবে। শান্তি নেব মনে মনে।
এভাবে বেলা যাবে। বিষাদে হরষে উদাসী নিখিল
নিয়ে যাবে বাঁকে বাঁকে।

শান্তি এই। অন্য কোন্ শান্তি আছে এর চেয়ে ?
উদাসী নিখিল যতবার বলে, 'ভুলে যাবার মত
আনন্দ কিছুতে নেই, আমি সেই মন্ত্র
তোকে দিতে চাই,—'
আমি ততবার শান্তি নি' মনে মনে।

নিঃসঙ্গতার গান

১.

পথের ধুলোয় তোমাকে পেয়েছি
যাবার বেলায়
রেখে যাব পথের ধুলোয় ;
এই পথ, এই ধূলি, তোমার প্রহরী, তোমার সেবক।

২.

ভালোবাসার কথামালা
স্মৃতির স্বরলিপিতে আজ গান
দুঃখ বল, সুখ বল
গোধূলি গগনে যেন ইতিহাস ফেরে
অন্তরা সঞ্চারী আভোগে
মিহিজালসম এ নিখিল যেন
থোকা থোকা কথায় ছেয়ে ॥

নির্বাচনের দায়িত্ব

খুঁটিনাটি নিয়ে এত খুঁত খুঁত, সইবে না, সইবে না,
অশেষ দুঃখ আছে
তোর কপালে ; কপাল ফেটে রক্ত ঝরবে ;
রক্তের মাটিতে দোপাটি অপরাজিতা

ফুটবে নারে, তুই ফুলহীন মাটিতে দাঁড়িয়ে শেষে স্মৃতিচারণে
কত সুখ পাবি ?
আরো দূরের দিকে নজর দিলি না, এত ছোটখাট
বিষয় নির্বাচনে ব্যক্তিত্বের যে অপমান
তা-কি বুঝেও বুঝলি না ? আরো দূরের দিকে নজর
দিলি না কেন, দূরে
শ্বেতপাথরে বাঁধানো বিশ্রামের টিবি, টিবির ওপর ঝাউ ছায়ার
শান্ত এলোচুল
তৃপ্তির গন্ধে এলিয়ে রয়েছে, তৃপ্তি তো পথ পেরিয়েই,
পথের টুকিটাকি ঝুলিতে কুড়িয়েই ॥

আর যেখানেই যাও

আর যেখানেই যাও, দরদী আবেগে
কঠিন মুহূর্ত ভুলে থাকার সময় মিলবে না—
যে বিশ্বাসে খুব সহজে
অন্ত নির্ভরতায় নৌকো ভাসাতে নিরুদ্দেশে
সে-সব খুঁজে নিতে
নতুন ক'রে জন্ম নিতে হবে।

নতুন জন্ম নেবে ব'লে তুমি আবার
নতুন স্বার্থে শরীর পোঁহাবে ?
পুরোনো সাক্ষীচিহ্ন
যদি আচমকা নিসর্গ ফেটে বেরিয়ে আসে
চোখের ক'ফোঁটা গোপন জল
জমে উঠবে না
শেষ বেলার জন্ম ?
আসলে যে কিছুই মিলল না
এসব নতুন ক'রে জেনে
হাতের ছাপে পায়ের ছাপে
সারারাত্রি একা একা খেলা ॥

যখনই তাকাই দূরে

এই খোলা জানালা খুলে যখনি তাকাই দূরে, ওই দূর
মেঘমন্তরকের
ভাঁজে ভাঁজে তোমারি শরীর যেন ভেঙে পড়ে, যতদূর চাই,
বিশ্বের শুরুতায়
দেখি দুই চোখ, এক মুখ
সমস্ত নিখিল ছেপে যেন জলস্রোত—
ফিরি যখনই ওই স্রোতের উৎসন্ধানে, ভেসে যাই,
দেখি দূরে, আরো দূরে
আরেক বিমর্ষ মুখ, শিকের ভেতরে এমনি গর্জায়—
দুই জানালার মধ্যে দৃশ্যমান কিছু নেই, স্রোতের পারাপার—
ঠাণ্ডা হাওয়া পাঁজর কচলায়, আমি অনন্তোপায়ে বাঁ হাতে
খাটের ওপর থেকে উপহার পাওয়া সিল্কের শেঞ্জি তুলে এনে
শরীরে উত্তাপ নি', খুব সতর্কে, যেন কেউ টের না পায়।

ডাকাডাকি

দূরে চ'লে যাবার পরও শিরায় শিরায়
ডাকাডাকি ;
এই অশান্তি শূন্যকে ভোগায়।
ছিলে উপদ্রবের মত, তোমাকে চাই না
মানসিকতায় অমিল ব'লে
চুপচাপ থেকেছি, চেয়েছি সান্ত্বনাও—
পালাও, পালাও, মেঘপাহাড়ের ছবি
দেখতে চাই না ;
কি ক্লান্তি তুমি হীন, কি শক্তি মায়ায়
শূন্যতা তোমাতেই উন্মনা।

রাখতে চাই জড়িয়ে প্যাঁচিয়ে, এ কথা বললে
বিবেক বিবেচনার যথার্থ অপমান ;
আসলে রাখতে চাই কাছেই, চাই না ছুঁতে
ছুঁলেই ক্লান্তি,
প্রেমের প্রতিমা ঘটনাচক্রান্তে অনির্দিষ্ট

দূরে চ'লে যাবার পরও শিরায় শিরায়
ডাকাডাকি
এই অশান্তি, এই বিরক্তি, যাত্রা চড়ায়।

কথামুখ

বিজয়কুমার দত্ত

কলমের মুখে, নতুন কথারা আর
বেরোতে চায় না।
বরং কালির ভার
মস্তিষ্কের আরক্ত প্রবাহে
যতটুকু পাপ আর কলঙ্কের বিচিত্র কাহিনী
জমা আছে, তার
খুঁটিনাটি বিবরণ মেলে ধরতে চায়।
পাপী আর দাগী আসামীর
স্বীকারোক্তি, এখন দারুণ প্রয়োজন।
আমরা সবাই, কখনো কখনো এক
ক্ষমাহীন পাপে, ডুবুরীর কুশলী সজ্জায়
নীচে, আরো নীচে—কতদূরে
কোথায় অতলে যাই তলিয়ে সহজে।

কলমের মুখে তাই, প্রাচীন কথারা
ফুটে উঠতে চায়
প্রাচীন? অর্থাৎ অতি পরিচিত সেই চাপা পাপ
জীবনের নানা রঙে,
নিঃশ্বাস বাতাসে, স্বপ্নে
আধো জাগরণে
ভালোবাসা আলো নিয়ে, মুগ্ধতার ফিল্মরোল খুলে
কেবলি বুকের মধ্যে ছায়াছবি হ'য়ে উঠতে চায়।

আভিধানিক

চতুর্দিকে শব্দ ওঠে, "ছুটির সময় এল'—নিজেকে প্রস্তুত
ক'রে রাখো— তাঁবুর বাঁধন
খুলে দাও, যা কিছু সঞ্চয়
এতকাল ক'রেছিলে, ফেলে দিয়ে এসো
যাবার সময় কেন পিছনে তাকানো।"

বাতাসে নিঃশ্বাস যেন থেমে যায়—যায়
বুকের ভিতরে রাখা হৃদয় যন্ত্রের সব ওঠানামা থেমে,
কা'কে ডেকে ব'লব আজ?
মানুষের কাছাকাছি ঘনিষ্ঠতা—প্রেম
এবং সেই সব শব্দ, যার জন্য মানুষ নিজেকে
অনায়াসে দিত বিসর্জন—
তারা সব জীবনের অভিধান থেকে, ছাঁটাই হবার ভয়ে
কেঁপে মরছে দেখি,
অস্তিত্বের যেটুকু আশ্বাস
এই বিভীষিকাময় দারুণ দুর্যোগে
পুঁথির অক্ষরে ছিল একান্ত স্বরাট
তারা সব মানুষের মুখ থেকে,
লেখনীর দায় থেকে
মুছে গেছে আজ।

[সম্পাদকীয়—৭২৮ পাতার পর]

ফলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটলে বেতন কেবলই দ্রব্যমূল্যের পেছনে ছুটবে। তাছাড়া ব্যয়ের উপর এবং রাজস্ব আদায়ের উপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। এবারকার পরিষদের সভায় বস্ত্রশিল্প, তামাক এবং চিনির উপর কেন্দ্রীয় শুল্কের পরিবর্তে রাজ্য বিক্রয়কর প্রবর্তনের দাবী উঠেছিল। এই দাবী সঙ্গত এবং পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

তাছাড়া অর্থ কমিশনের বৈষম্যও পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক স্থিতি পঙ্গু করে রেখেছে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে পশ্চিম বঙ্গের দাবী দীর্ঘদিনের। এই বৈষম্যের মূলে প্ল্যানিং কমিশনের আর্থিক বরাদ্দে বৈষম্য, কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিম বঙ্গের প্রতি উপেক্ষা আরও তীব্র করে তুলেছে। এবার পশ্চিম বঙ্গের জন্য ৩২২·৫০ কোটি টাকার প্ল্যান মঞ্জুর হয়েছে অথচ উত্তর প্রদেশের জন্য ৯১৫ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রের জন্য ৮৯৮·১২ কোটি টাকা, তামিলনাড়ুর জন্য ৫১৯·৩৬ কোটি টাকা এবং বিহারের জন্য ৫৩১·২৮ কোটি টাকা মঞ্জুরী হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের এই মঞ্জুরী তৃতীয় পরিকল্পনার চাইতে মাত্র ৭০ কোটি টাকা বেশী। অথচ এই কয়েক বছরে মূল্য-বৃদ্ধির ফলে কার্যত চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ, তৃতীয় পরিকল্পনার চাইতে আয়তনে হ্রাস পাবে। তাছাড়া, চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দের মধ্যে ২২১ কোটি কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া গেলেও রাজ্যসরকারের রাজস্ব আদায় এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত স্বীকৃত-ব্যয়ের ব্যবধান কমপক্ষে ৭৩ কোটি টাকা এবং কর্মচারীদের বেতন সংশোধন বাবদ পাঁচ বছরে ৪৫ কোটি টাকার ব্যয় মেটাতে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত কর বাবদ যে ৭০ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে তা ক্ষয়ে যাবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় কর থেকে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ এবং পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনুদান সত্ত্বেও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ঘাটতি মেটাবার অন্য কোনো ব্যবস্থার অভাবে পশ্চিম বঙ্গের যোজনার বরাদ্দ ৩২২ কোটি টাকার নীচে নেমে যাবে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিম বঙ্গে উন্নয়নের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই।

পরলোকে ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শেষরাত্রে ৭৮ বৎসর বয়সে বাংলার কৃতী সন্তান, সুপণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সুসাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি কয়েকমাস রোগ ভোগের পর লোকান্তরিত হন। ডঃ ব্যানার্জি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় কলেজে তাঁর শিক্ষকতা আরম্ভ করলেও, শিক্ষকতার উপান্তে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু প্রফেসাররূপে প্রায় ৯ বছর আসীন ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে 'বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা,' 'বাংলা সাহিত্যের কথা' এবং 'রবীন্দ্র সৃষ্টির সমীক্ষা' উল্লেখ্য। বাংলাদেশে কৃতবিদ্যের লোকান্তর আমাদের জাতীয়জীবনে ক্রমশই শূন্যতার সৃষ্টি করছে। ডঃ ব্যানার্জীর পরলোকগমনে সেই শূন্যতা আরও গভীরতর হোলো। লোকান্তরিতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ধারাবাহিক উপন্যাস

সাবিত্রী

মূল রচনা ঃ পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে

অনুবাদক : পিনাকীপ্রসাদ ধর

সাতাশ

নাটকের প্লটটা যে খুব একটা বড় নয় এ কথা তো তোমায় আগেই বলেছিলাম। সবশুদ্ধ মাত্র তিনটি দৃশ্য আছে।

পর্দা উঠবার আগে থেকেই পাখিদের কাকলি শোনা যাবে। আর যবনিকা ওঠার পরে একটা বিরাট বড় প্রাচীন গাছ দেখতে পাবো চোখের সামনে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নানা পাখির মুখোশ পরে মঞ্চে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। একটু নাচবার পরেই ওদের প্রস্থান। পাখির ডাক তখনো শোনা যাবে।

হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো একটা প্রচণ্ড আওয়াজ—একমুহূর্ত মনে হবে গাছটাও বুঝি কাঁপছে। তারপরেই রাজা ঢুকবেন মঞ্চে, শিকার পালিয়ে গেছে বলে একটু ক্ষুব্ধ তিনি,—চারপাশে মন্ত্রীর দল। পাখিদের চেঁচামেচিতেই তাঁর শিকার পালিয়েছে, তাই ওদের মেরে ফেলবার আদেশ হল মন্ত্রীদের ওপর। চারজন মন্ত্রী চারটি পৃথক প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রথমজন বল্লেন একটা বিরাট আগুন জ্বালো। দ্বিতীয় জন বল্লেন গাছটার গোড়ায় বিষাক্ত সার দেওয়া হোক্। তৃতীয়জন বল্লেন না, না আগে গাছে চড়ে সমস্ত ডিম আর বাচ্চা পাখিগুলোকে মেরে ফেলতে হবে। আর সব শেষের জন বল্লেন গাছটাকে কেটে ফেলো। প্রত্যেকেই নেচে নেচে নিজেদের ইচ্ছের কথা বল্লেন। রাজা নিজে তখনো কিছুই ঠিক করেন নি। একদিকে এসব চলছে আর এরই মধ্যে পাখিরা মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে মঞ্চে। তারাও নাচের ভঙ্গীতে নিজেদের প্রার্থনা জানালো। রাজা আর মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো করে তাদের ভয় দেখালেন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল যে গাছটাকে কেটে ফেলে তার কাঠ দিয়েই একটি বাড়ি তৈরী হবে। রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীরা কুঠারে শান দিতে লাগলেন, গদার মতো শূন্যে ঘোরালেন তাদের, তারপর কাঁধের ওপরে বসিয়ে নাচলেন।

হঠাৎ পাখিদের শব্দ থেমে গেল। দেখা গেল গাছটার জায়গায় এক বৃদ্ধ দু'হাত জোড় করে বলছেন, 'আমাকে মেরোনা তোমরা, কেটে ফেলোনা আমাকে।' কয়েকটি ভীত পাখি তাঁর কাছে নেমে এল। তিনি বার বার তাদের কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু পাখিগুলিকে কারা যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কুঠারের শব্দ……। গাছটা একসময় পড়ে গেল মাটিতে।

এখানেই প্রথম দৃশ্য শেষ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্যঃ গাছের বদলে একটা কাঠের বাড়ি। পাখিদের মধ্যে কেউ কেউ এখন শিশু ; বাকিরা পাখিই রয়ে গেছে। সবাই খেলছে আর দৌড়চ্ছে মঞ্চের উপরে। গান

গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে বাড়ির চারটে দরজা দিয়ে ওরা আসছে আর চুকছে।

খুব তাড়াতাড়িই আগের বারের মতো একটা বড়ো শব্দ শোনা গেল। বাড়িটা কেঁপে উঠলো আর রাজা তার মন্ত্রীদের নিয়ে প্রবেশ করলেন। রাজার পোষাক এখন মধ্যযুগীয়। মন্ত্রীরাও একটু আলাদা—তাঁদের একজন তত্ত্বাবধায়ক, একজন কারিগর, একজন বিচারক আর একজন সৈনিক। শিশু আর পাখির দল খেলায় মত্ত।

রাজা পাখিগুলিকে দেখেই একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। প্রথমে শিশুদের আলাদা করে দেবার চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু ওরা তাঁর কথায় কানই দিল না। সৈনিক ভয় দেখালেন ওদের, তত্ত্বাবধায়ক অনুরোধ জানালেন, কারিগর লাগলেন তক্তা দিয়ে দরজা বন্ধ করার কাজে। আর বিচারক একটা বড় পাল্লায় একটি শিশু আর একটি পাখিকে তুলে দিলেন।

কারিগর দরোজা আটকাতে পারলেন না। রাজারও মাথায় এলোনা কিছুই। পাখি আর ছেলেমেয়েদের কেউই ধরে রাখতে পারলো না। কারিগর বল্লেনঃ আমাদের কাঠ লাগবে না, আর তাছাড়া বাড়িটাও বেশ পুরোনো। টেনে নামিয়ে দিই ওটাকে তার জায়গায় এবং একটা নতুন লম্বা বাড়ি তৈরী হোক্ যেখানে পাখিরাও আসবে না ছেলেরাও খেলতে পারবে না।

কোদাল আর শাবল জোগাড় করে সবাই আবার নাচ সুরু করে দিল। ঠিক তখুনি একজন বয়স্ক মহিলা কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছেলেমেয়েরা আর পাখিগুলি জড়াজড়ি করে তাঁর কোল ঘেঁসে দাঁড়ালো। (লোরে এই ভূমিকাটি করবে)। তিনি বল্লেন—এই বাড়িটাই তাঁর চাই, কেননা শিশুরা এখানে বাস করে আর পাখিরাও এখানেই থাকে। কেউ তাঁর কথা শুনলো না। সবাইকে টেনে বের করে দিল ওরা। বাড়িটি ভেঙে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এসে পড়তে লাগলো মহিলাটির সারা গায়ে।

তৃতীয় দৃশ্যে পর্দা উঠলে আমরা একটা বড়ো বাড়ি দেখতে পাবো। পাখিদের বসবার কোনো কার্ণিশ নেই কোথাও। শিশু আর পাখিদের তখন আর দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঠক্ ঠক্ করে একটা একঘেয়ে আওয়াজ ক্রমাগতই উঠে আসছে।

অল্প পরেই রাজা, তাঁর মন্ত্রী আর দু'একজন বড় ছেলে আর মেয়ে এসে ঢুকবে। ওরা একদিন শিশু ছিল। মন্ত্রীদের একজন জিনিসপত্র বিক্রী করেন, আরেকজন হোটেলের মালিক, তৃতীয়জন উকীল আর চতুর্থ সরকারী কর্মচারী।

সবাই বেশ ফুর্তিতে আছে। সবাই নাচছে। ওদের নাচ খুব স্বয়ংক্রিয় আর যান্ত্রিক। বড় বড় ছেলেমেয়েরা এখন খেলাই ভুলে গেছে।

একটু পরে এরোপ্লেন ঘুরে ঘুরে ওঠার মতো আওয়াজ শোনা গেল। ধীরে ধীরে শব্দটা আরো বড় হয়ে উঠছে। সবাই ভীত। বাড়িটা কাঁপছে। ওরা সেটিকে স্থির করবার চেষ্টা করলো।

এরোপ্লেনের মুখোশ পরে পাখিরা এসে ঢুকলো। আকাশে নানা কসরৎ দেখাতে লাগলো তারা। চারদিকে দারুণ ভয় আস্তে-আস্তে গোটা বাড়িটাই ভেঙে পড়লো।

প্রথম দৃশ্যের বুড়ো লোকটি আর দ্বিতীয় দৃশ্যের বয়স্কা মহিলা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর পাখিদের নিয়ে বাড়িটার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। তাদের কারো কারো হাতে গাছের ডাল, অন্যদের হাতে কাঠের তৈরী অদ্ভুত বাজনা। ওরা আগের মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে আর খেলতে লাগলো তারা।

আস্তে আস্তে ভাঙা বাড়িটা মিলিয়ে গেল চোখের

সামনে থেকে। তার বদলে দেখা গেল অসংখ্য বাড়ি আর গাছ। পর্দা নেমে এল।

আমি নাটকটার নাম রেখেছি 'সুরের গাছ'।

আঠাশ

আপ্পার বক্তৃতা দেওয়া শেষ হয়েছে। বক্তৃতার আগে ইমোতো সেগুলির জাপানী অনুবাদ করে শ্রোতাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আপ্পা অবশ্য ইংরেজীতেই বক্তৃতা দিয়েছেন। নভেম্বরে এগুলি একটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবে।

বক্তৃতাগুলির একটা ফল হয়েছে এই যে এখানে আমাদের আরো কিছুদিন থাকতে হবে। আপ্পা কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর ধরে তুলনামূলক দর্শন বিষয়ে কিছু বলবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। আপ্পা থাকতেও রাজি। আমরা এখান থেকে কিয়োটো চলে যেতে পারি অথবা এখানে আরেকটা বাসা পাওয়া গেলে দু'জায়গাতেই পালা করে থাকবো।

এল্‌ওয়ার্থ আমাকে একটি চিঠি লিখেছেন। এবারের চিঠিটা গত চিঠিটার তুলনায় একেবারে উল্টো ধরণের। যুদ্ধ অথবা বর্তমান অবস্থার কোনো কথাই তাতে নেই। আমি চিঠিটা থেকে একটি অংশ তোমার জন্যে তুলে দিচ্ছি :

'অসুবিধে এই যে আমাদের মন যথেষ্ট তাড়াতাড়ি কাজ করতে শেখে নি। প্রতিটি অবস্থাকেই অপূর্ব মনে করবার শিক্ষা তার নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দুঃখ বোধ হয় এই। আমাদের আশা আছে যে একটা তাৎক্ষণিকতার চেতনা তৈরী করে এই ব্যাপারটাকে অতিক্রম করা যাবে। আমার অনুভূতি বলে যে আমাদের মনের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগগুলিকে লুপ্ত করে দিতে পারলেই এটা সম্ভব অভ্যাসের। এই বিভাগ সময়, স্থান, সমষ্টি ও ব্যক্তিগত বৈষম্য—আমরা যাদের মূল্যবোধ বলি।'

এ বিষয়ে আমি আর কি মন্তব্য করবো? আমি কেবল জানি নিজেকে ভুলে যাওয়া—যার মধ্যে হয় তো এর সমস্তটাই রয়েছে। নিজেকে ভুলে যেতে পারলে সময় এবং স্থানের কোনো বন্ধনই আর থাকে না। প্রাচীন কালে একেই 'সমর্পণ' বলা হোত। এল্‌ওয়ার্থ একই কথা একটু অন্য ভাষায় বলেছেন। আসলে কখন আমরা ভুল করি? আমাদের ভুল হয় যখন কেবল কতগুলি ধারণা নিয়েই পড়ে থাকি। এল্‌ওয়ার্থ কথিত তাৎক্ষণিকতার আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে পুরোপুরি নেই;—যে আকাঙ্খা একদিন রাধাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, যে আকাঙ্খা ঋগ্বেদের উর্বশীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। ফলত ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়; আর অতীতের সজাগ দৃষ্টিকেও কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।

লোরেকে চিনতে পারার জন্য তোমায় অভিনন্দন জানানো উচিত। ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তোমার থিসিস্ পড়বার পর থেকে ওকে তোমার চিঠির প্রতিটি লাইন পড়ে ব্যাখ্যা করে শোনাতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই আবার কপিরাইটের প্রশ্ন তুলবে না?

অধ্যাপক যোশী সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। ওর স্ত্রী পুনার একজন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়। তিনি অধ্যাপক যোশীরই ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু যোশী বলেন যে ওদের মধ্যে প্রেম বা সে ধরণের কিছু এর আগে কখনোই ছিল না। এর থেকে খুব নিরাপদেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ওঁদের জীবন সুখেরই হবে। ফটোতে ভদ্রমহিলাকে বেশ চটপটে আর সাংসারিক মনে হচ্ছে।

তোমার চিঠি পেয়ে অধ্যাপক গুরুপদস্বামীর খবরের জন্য আমি আরো চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

আগামী সপ্তাহে আমি লোরের কাছে থাকবো; ওরা সবাই এখানে আরো কিছুদিন বেশী থেকে যাচ্ছে। হয় তো এখান থেকেই সোজা সুইডেনে চলে যাবে।

এই মুহূর্তে আমার নিজের আর কোনো খবর নেই। 'সুরের গাছ' (নামটা ঠিক হচ্ছে না) অনেকেরই ভালো লেগেছে। নাটকটি বেশ ভালো হয়েছিল। কেউ কেউ ওর মধ্যে একটি অন্য অর্থ দেখতে পেয়েছেন। আমি নিজে কিন্তু একটি সহজ গল্প বলতেই চেয়েছিলাম। অন্য কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না।

ঊনত্রিশ

তুমি জানতে চেয়েছো এটা কি করে সম্ভব হোল যে পৃথিবীতে আমি কেবল 'ভালো' মানুষদেরই দেখা পেয়েছি। 'খারাপ' মানুষদের সামনে আমাকে কখনো দাঁড়াতে হয়েছিল কিনা এই তোমার প্রশ্ন। বস্তুত তোমার প্রশ্নটা শুনেই আমি এ বিষয়ে প্রথম সচেতন হলাম। আমি ভেবেছিলাম সবাই আমার নিজেরি মতো। (আমরা তো নিজেদের 'ভালো' বলেই মনে করি।) মনে হয় আমি যে পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছিলাম, যেই মানুষদের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁরা সবাই আমার মতোই ছিলেন। ঈর্ষাতুর, ঝগড়াটে লোকেদের সঙ্গে কখনো মিশিনি। তাছাড়া বাড়িতে কোনো ভাই বোন ছিল না। আমি একা একা অনেক আদর পেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিলাম। চার পাশের সবাই আমাকে স্নেহ করতেন, আর আমি তা নিতাম। সমস্ত কিছুই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাহলেও আমার বিশ্বাস এ সবের জন্যে আমি একটুও বদলাই নি—আমি যা আমি তাই আছি। আমরা সাধারণত সুখ বলতে যা বুঝি তা পেলে মানুষ সবসময়ে সুখী হয় না। (তুমি হয় তো বলবে: এতে আর নতুন কি আছে? সন্ন্যাসীরাও তো এই এক কথাই বলে আসছেন এতদিন ধরে)। যন্ত্রণার অন্য পারে যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দের পরেও আরো তীব্র আনন্দ আছে। এই আনন্দে সুখ আর বেদনা এক সঙ্গে মিলে যায়। কুন্তী কৃষ্ণকে বলেছিলেন: দুঃখ সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুক। কেন না দুঃখের মুহূর্তেই কৃষ্ণের কথা মনে পড়বে। কিন্তু আমার ধারণা এটা সত্যি নয়। এমন কি তীব্রতম আনন্দের মুহূর্তেও কৃষ্ণকে খুব সহজ আর গভীর ভাবে মনে করতে হবে। দুঃখের মুহূর্তে সবাই তাঁকে মনে করতে পারে। আমি যে সব সময়ে ভালো সঙ্গী পাই তার জন্য দায়ী কিছুটা আমার সৌভাগ্য আর কিছুটা আমার মন। আমি কোনো কিছুই সরিয়ে রাখি না। আর শেষ পর্যন্ত যা নিই তা আমার নিজের করে তুলি। ভালো বা মন্দ আসলে আমরা নিজেই।

ছেলেবেলায় একদিন আমি ভীষণ অবাধ্য হয়েছিলাম। ঠিক কি ঘটেছিল এখন তা আর মনে নেই। এমন কি আপ্পাও, এমনি যাঁর মেজাজ খুব ঠাণ্ডা—সেদিন খুব রেগে উঠেছিলেন আমার উপর। রাজাম্মা, ভেঙ্কাপ্পা সবাই খুব ভয় পেয়েছিলেন। হঠাৎ মনে হল এসমস্তই হচ্ছে আমার নিজের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি শান্ত হয়ে গেলাম:—আপ্পা আমাকে মারবেন এই ভয়ে নয়। আমাকে মারলে আমি আরো জ্বলে উঠতাম। সেদিনের পর আমি আর কখনো রাগিনি, অবাধ্য হইনি এ থেকে তুমি হয়তো কিছু বুঝতে পারবে।

এ কথা ঠিক যে কখনো কোনো শয়তান, প্রতারক বা পুরোপুরি খারাপ লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি তোমারি মতো খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি কখন সেরকম একটি লোকের দেখা পাবো। কিন্তু দেখা না হলেও কি আমার জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে? আসলে তো আমাদের প্রত্যেকটা চেষ্টারই উদ্দেশ্য পৃথিবীটাকে ভালো মানুষদের বাসস্থান করে তোলা। শুভচেতনাতেই কি আমরা বিশ্বাসী নই? এ যেন ঠিক কোনো খলচরিত্র নেই বলে একটা উপন্যাস বা নাটককে বাজে বলে দেয়ার মতো। পৃথিবীর সমস্ত সংঘাত কেবলমাত্র ভালো আর খারাপের দ্বন্দ্ব থেকেই যদি উঠে আসে তাহলে তো মাঝে মাঝে ইতিহাসের

নামগুলি বদলে দিলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। উপন্যাস আর নাটক লেখার কাজ তাহলে আর একটুও কঠিন থাকবে না। কয়েকগুলি কালো আর শাদা পুতুল নাচবে শুধু; আসলে যে সমস্ত ভিলেনের কথা তোমার মনে রয়েছে কোনো লেখকের উচিত একবার তাদের পুরোপুরি বাদ দিয়ে একটা নাটক বা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন: আমার নাটকটার রাজা কি খারাপ লোক?

উত্তর: আমার তো মনে হয় পাখিরা নিজেরাও একটু খারাপ। তাদেরো রাজার প্রয়োজনের কথা ভাবা উচিত ছিল। কি ক্ষতি হোত যদি তারা রাজার সঙ্গে একটা চুক্তি করে নিতো যে কেবল একটি বিশেষ সময়ে গান গাইবে; শিকারের অসুবিধে করবে না? ওরাও কি প্রত্যেক দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই আরো খারাপ ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি? শেষ পর্যন্ত কারা কাদের ধ্বংস করলো? 'রাজা খুব শিক্ষা পেলো,' একথা বল্লেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

নাটকটা লিখে আমি নিজেও একটু 'দুষ্টু' হয়ে গেছি।

আগামী মাসে লোরে আর ওর বাবা এখান থেকে সুইডেনের জাহাজে চড়ে আমেরিকা চলে যাবে। এখানকার অধিকাংশ ইউরোপীয়ানরাই ওই জাহাজে আমেরিকা চলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ভাবি যাবো; যদি সম্ভব হয় ইংলণ্ডে তোমার সঙ্গে দেখা কোরবো। কিন্তু এত গোলমালের মধ্যে তা কি করে সম্ভব হবে? আল্পা বলবেন: স্বেচ্ছায় যুদ্ধের এলাকার মধ্যে যেও না। কিন্তু আগামীকাল যদি এখানেই যুদ্ধ বেধে যায়? থাক্, আগে থেকেই কিছু ভাববো না। এবারকার মতো লোরেই আমার দূত হবে। সুযোগ পেলে ও তোমার সঙ্গে অক্সফোর্ডে দেখা করবে।

তিরিশ

লোরে গতকাল চলে গেলো। আমারও আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কিয়োটোতে বাস করার ইচ্ছে ছেড়ে দিতে হোলো। নামুরা কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি প্রায় সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলেছিলেন; কিছুদিন ধরে ওঁকে সব সময়েই খুব দুঃখী দেখায়। ওঁকে দেখলে মনে হয় কিছু একটা যেন গোলমাল হয়ে গেছে কোথাও আর তা দিন দিন আরো বেড়েই যাবে।

মনে হচ্ছে আমার তিন চারটি চিঠি তুমি পাওনি। কেননা তোমার চিঠিতে তাদের কোনো কথাই নেই। কিছুদিন ধরে তোমার চিঠিও অনেকদিন পর পর আসছে। পুরো পৃথিবীটাই যখন আমাদের কাছে একটা বিরাট অভিযোগ নিয়ে আসে তখন আর কাকে কি বলবো? তাহলেও নিজেদের সুবিধের জন্য এবার থেকে আমরা চিঠিতে এক, দুই, তিন……নম্বর দিয়ে দেবো, আমি এই চিঠিতে এক লিখে দিয়েছি। এরপর থেকে সংখ্যা অনুযায়ী পর পর তোমাকে চিঠি লিখবো। তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে কোনো চিঠি হারিয়ে গেছে কি না। তুমিও নম্বর দিয়ে চিঠি লিখতে পারো,

তুমি সুস্থ আছো জানলে ভালো লাগে। অক্সফোর্ড ছেড়ে দিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ নেয়া কিন্তু আরো বিপদের। ভালো খাবার পাওয়াই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তুমি যা চেয়েছিলে তা হোল না ভেবে দুঃখ লাগে। সেই সঙ্গে তোমার এরকম লাগছে না জেনে অবাক লাগছে আর প্রশংসা করছি তোমার।

তাড়াতাড়ি চিঠি লিখো তুমি।

একত্রিশ

লোরে চলে যাবার পর একমাস কেটে গেল। ও যতদিন ছিল ততদিন দারুণ বন্ধুত্ব জমেছিল আমাদের। আমি ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি ওর সঙ্গে থেকেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলার মানে বুঝতে পেরেছিলাম।

ছোটবেলায় কখনো কখনো আমার ভীষণ অন্য কারো মতো হয়ে যেতে ইচ্ছে করতো। তখন হঠাৎ আমার মনে হতোঃ আসলে অন্য কেউ যে 'আরেকজন', আমরা নিজেরাই নই এটাই বা আমরা কি করে জানি? তারপর থেকে এই খেলাটা আমার ভীষণ ভালো লাগতো। আমি নিজেই নানারকম হয়ে যেতাম। সে সময়ে নিজেকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করেছিলাম আমি। ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতা অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে। শৈশব চলে যাবার দীর্ঘদিন পরে লোরেই আবার তাকে ফিরিয়ে আনলো। সেবার স্কুলের একটা পুরোনো ছবি আমার কাছে ছিল; ছবিটিতে রাধা কৃষ্ণ হয়ে গেছেন আর কৃষ্ণ হয়েছেন রাধা। লোরের ব্যবহারও এমনি সহজ। একথা বলতেই লোরের মনে হোল ছবিটা ওর চাই-ই চাই। এখানে বসে দেশ থেকে ছবি আনা বেশ কঠিন ব্যাপার। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ছবি খুঁজেছি। পরে টোকিওতেও গিয়েছিলাম, —কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। হঠাৎ একদিন আপ্পার লেখা গুছোতে গুছোতে ওঁর একটি লেখার মধ্য থেকেই ছবিটি বেরিয়ে পড়লো। ছবিটা আমি ষ্টুডিও থেকে কেটে রেখে দিয়েছিলাম। মিসেস্ ইমো তা একটি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে ছবিটি লোরেকে দিয়ে দিলেন। শিল্পকর্মের অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করবার সময় তুমি এসব রচনাকে কোন অভীধা দিয়ে থাকো? ধার্মিক, আধ্যাত্মিক বা কামুক এ ধরণের বিশেষণ ব্যবহার কোরো না।

লোরের কথা তোমাকে আরো অনেক শোনাবো, তবে এখন নয়, আরো পরে, অন্য কোনো সময়ে। তোমার চিঠি না পড়েই, বা চিঠি আসবার আগেই ও বলে দিতে পারতো তাতে কি লেখা থাকতে পারে। মাঝে মাঝে আমার চিঠিতে লোরে নিজেও কিছু কিছু যোগ করে দিত। আমার নাটক সম্বন্ধে প্রশ্ন আর উত্তরগুলি ওরই লেখা। এমন আরো কিছু তাহল রয়েছে। একটি শব্দ বা বাক্য বদলে দিয়ে ও কথাটাকে আরো ইঙ্গিতবহ করে তুলতে পারতো। তোমার ইচ্ছে হলে ওর লেখা জায়গাগুলি খুঁজে বের করতে পারো।

একটি নতুন খবরের টুকরো শোনো: আমি 'চৌরপঞ্চাশিকা'র বিষয়ের ওপরে একটি নৃত্যনাট্য লিখছি। জাপানী লোকসাহিত্যে এই একই গল্প একটু অন্যরকমভাবে বলা আছে। সেজন্যই আমি এই কাহিনীটি বাছলাম। চৌরপঞ্চাশিকা'য় এক বন্দী রাজকন্যার প্রতি তার দুঃসাহসিক ভালোবাসার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হোল। মৃত্যুর আগে সে তার ভালোবাসার তীব্র মুহূর্তগুলি বর্ণনা করতে লাগলো, নতুন করে সেই সময়েই যেন বেঁচে উঠলো সে, আর এই ভাবেই রাজার ক্ষমা পেয়ে গেল। সংক্ষেপে গল্পটা এই। মনে হয় জীবনের তীব্র শক্তিই যেন ওকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল। গল্পটাকে আমি একটু অন্য ভাবে বলবো। বন্দী নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে, আর ওর প্রেমিকা পেছনে আসতে আসতে প্রত্যেককে একটি করে প্রশ্ন করছে। কেউ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। রাজা এগিয়ে এলেন তাঁর মেয়ের খোঁজে। রাজকন্যা এমন কি রাজাকেও একটি প্রশ্ন করে বসলো। রাজা তার কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। এখন কেবল একটি মাত্র জবাব;—ফাঁসিকাষ্ঠে উঠবার আগেই প্রেমিকাকে মুক্তি দিতে হবে। রাজা সেই আদেশ দিলেন, রাজদূতেরা খুব দ্রুত এগিয়ে গেল,—ততক্ষণে তার ফাঁসী হয়ে গেছে।

বত্রিশ

কিছুদিন থেকেই আপ্পার শরীর ভালো যাচ্ছে না। রোজ সন্ধ্যায় ওঁর জ্বর ওঠে। ডাক্তারের অষুধে কিছুই হচ্ছে না। মনে হয় গত দু'বছরের পরিশ্রম এবার শোধ নিচ্ছে ওঁর উপরে। নামুরাকে আরো বেশী দুঃখী দেখাচ্ছে। বাবার

চিন্তা যেন ওঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব, এখন আর ভারতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। দেশ থেকে কোনো চিঠিও আসেনি। যোশী লিখেছেন আট মাস আগে; বাড়ির খবর১ পাচ্ছি না। জানি না আমার চিঠিগুলি ওরা পেয়েছে কিনা।

আমি তোমার কিছুদিন আগে লেখা চার আর পাঁচ নম্বর চিঠি দুটো পাইনি।

সান ফ্রান্সিসকো থেকে লোরের চিঠি এক্ষুণি এল। ওরা হয় তো কয়েকদিন আমেরিকায় থাকবে। চিঠিতে সবকিছুই লেখা আছে: নৌকোতে হৈচৈ, ভয়াবহ আবহাওয়া, ছোটদের দুষ্টুমি। ওরা একবার একটা ডুবোজাহাজও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু লোরের হাতের লেখা সব সময় বোঝা যায় না আর ওর লেখার ভঙ্গীও একটু জটিল।

ভারতে আসার কোনো কথাই লোরে লেখে নি। ও তোমার কথা জানতে চেয়েছে।

আমার ব্যালেটা এখনো পর্যন্ত একটা ধারণা হয়েই রয়েছে। এ বিষয়ে লোরের মন্তব্য পড়ে আমার উৎসাহ যেন আরো ঠাণ্ডা হয়ে এল। ওর মতে গল্পটির ভিত্তি বড় বেশী বুদ্ধিনির্ভর। আসলে প্রশ্ন আর উত্তর দিয়ে কখনো কিছুই ঠিক করা যায় না। মূল কবিতাটিতে একটি মুহূর্তের কথাই বলা হয়েছে। লোরে আমাকে এর বদলে নার্সিসাস আর প্রতিধ্বনির গল্পের কথা ভাবতে লিখেছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনিল রায়ের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০

(তৃতীয় সংস্করণ)

"... নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী : ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

: উপন্যাস

কণ্ঠভরা বিষ

উত্তরখণ্ড

মিহির মুখোপাধ্যায়

পনেরো

—আমরা চারজন হাতিয়ার নিয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, যেন চারখানা শালকাঠের খুঁটি, চোখের পাতা ছাড়া আর কিছুই নড়ছে না, দম ফেলার শব্দ ও শোনা যাচ্ছে না, আমার ডানপাশে নজর বেগ, বাঁ-পাশে সলামত খাঁ, তারপর জগন্নাথ সিঙ্, একটু তফাতে আবার চারজন পাশাপাশি, তাঁবুর দুই তরফ কানাতের মাঝখানে, মনে করুন, দুই কি আড়াই হাত ফাঁক, সেই ফাঁকের মধ্যে এক এক পাশে পঞ্চাশ জন করে আমরা বাছাবাছা একশোজন লুকিয়ে রয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের হাতে দুটো করে হাতিয়ার, কারো হাতে দু'খানি তরোয়াল, কারো হাতে ছোরা আর তরোয়াল, আমার বাঁ হাতে ছোট বল্লম, ডান হাতে তরোয়াল, কারো সঙ্গেই ঢাল নেই, ওই টুকু জায়গার মধ্যে চওড়া ভারী ঢাল নিয়ে নড়াচড়ার অসুবিধে, কারো হাতে বন্দুক নেই, তীর ধনুক নেই, ওসব ব্যবহারের কোন সুবিধে নেই, তাঁবুর ভেতর দিকে কানাতের কাপড় আমাদের দুপাশে এমনভাবে ফাঁক করা রয়েছে যাতে আমরা এক সঙ্গে দুজন করে বেরিয়ে আসতে পারি, তাঁবুর ভেতর যারা থাকবে, তারা কিন্তু সেই ফাঁক দেখতে পাবে না, পাঁচ হাত অন্তর রেশমী পর্দায় সেই সামান্য ফাঁক ঢাকা রয়েছে, মস্ত তাঁবুর ভেতরটা খুব জমকালো করে সাজানো, দামী দামী গালিচা, রেশমী পর্দা; তাঁবুর দরজায় দেওয়ানজী রাজা জানকীরাম আর সর্দার মুস্তাফা খাঁন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের পাশে দু'জন মাত্র সেপাই, আর কেউ নেই, তাঁবুর ভেতরে দরজা থেকে অনেকটা দূরে জমকালো সাজানো মসনদে খোদ নবাব বাহাদুর বসে আছেন—

গল্প বলছিল মামুদ জাফর। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মশাইর বৈঠকখানা ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। আরো অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। রামেশ্বর মুখুজ্জে, শিবদাস, ভারতচন্দ্র, জগমোহন দত্ত, যদু বিশ্বাস, হরিমোহন, দরজার পাশে ফটিকচাঁদ, বৃন্দাবন চাপরাশী, সাধুচরণ। চৌধুরী মশাইর পেছনে দাঁড়িয়ে সেই লোহারাম বাগদীর ছেলে কেবলরাম মস্ত তালপাতার পাখা নেড়ে নেড়ে হাওয়া দিচ্ছিল। এছাড়া আরো দু'চারজন আমলা-কর্মচারী, আত্মীয়-বান্ধব মামুদ জাফরের মুখে গল্প শুনতে এসেছে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। মানকরার ময়দানের বিবরণ বলছিল মামুদ জাফর। যোদ্ধা হলেও মার্জিত চেহারার এই মানুষটি বেশ গুছিয়ে গল্প বলতে পারে।

মামুদ জাফরের বাড়ি হুগলীতে; সেখানেই তার বুড়ো বাবা-মা, বাচ্চা-বিবি আর অনেকগুলি ভাইবোন। বাবা আর ভাইদের সঙ্গে হুগলীর ফৌজদারের বাহিনীতে কাজ করত মামুদ জাফর। যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সাহসী, আর তেমনি সুঠাম শরীর। তার এক ভাই আর ভাতিজা ফরাসী ছুটির সেপাইদের দলে কাজ করে। সেই সুবাদেই এখানে তার আসা-যাওয়া। দেওয়ানজীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। বল্লম ছোঁড়া আর তরোয়ালবাজিতে খুব নাম-ডাক মামুদ জাফরের। সেই নামডাক শুনে আলীবর্দী খাঁন তাঁকে তলব দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। বাছাই করা যে একশোজন

সেপাইকে বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হয়েছিল বর্গী সর্দারদের খুন করার জন্য তাদের মধ্যে মামুদ জাফরও জায়গা পেয়েছিল।

দরবার গৃহের মত জমকালো ভাবে সাজানো বিশাল তাঁবুর একপ্রান্তে বেদীর উপর মসনদে বসেছিলেন নবাব সুজাউল মুল্ক হেসামউদ্দৌলা আলীবর্দী খাঁন বাহাদুর। মসনদের দু'পাশে পাঁচজন করে দশজন দেহরক্ষী পাথরের পুতুলের মত স্থির। এই দশজন সশস্ত্র যোদ্ধা ছাড়া তাবুর ভেতরে আশেপাশে আর কোন যোদ্ধা কারো নজরে পড়বে না। নবাববাহাদুরের প্রশান্ত মুখে উদ্বেগ উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই।

প্রায় দু'শো হাত দূরে তাবুর অপর প্রান্তে প্রবেশ পথের দু'পাশে রেশমী ঝালর দেওয়া মখমলের পর্দা। ঢাল-বল্লমধারী দুজন সশস্ত্র প্রহরী দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরে একপাশে সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন রাজা জানকীরাম আরেক পাশে সর্দার মুস্তফা খাঁন। খাঁন সাহেবের কটিদেশে অবশ্য অর্ধচন্দ্রাকৃতি একখানি দামস্কাসের তরোয়াল। তাদের পাশেই দুটো ডালা হাতে দু'জন খিদমদগার। সেই ডালার মধ্যে গোলাপফুলের ছোট ছোট তোড়া। এ ছাড়া আরো সাত আটজন নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য কাছাকাছি তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করছে। তারা কেউ হুকোবরদার, কেউ ঝাড়ুদার, কেউ পালকি বেয়ারা।

ভাস্কর পণ্ডিত এলেন জমকালো এক হাতির পিঠে চড়ে। অন্যান্য একুশজন সর্দার ঘোড়ার সওয়ার। আরো পঁচিশজন সাধারণ শ্রেণীর কর্মচারী। তাদের কেউ পেশকার, কেউ খাস-মুনসী, কেউ ওয়াকিনবীশ। রঘুজী গায়কোয়াড় আসেন নি। শরীর খারাপের অজুহাতে পলাশী প্রান্তরে নিজের তাঁবুতে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

হাতির পিঠ থেকে হাসি হাসি মুখে নামলেন ভাস্কররাম। এগিয়ে এসে আদাব-তসলিম জানালেন সর্দার মুস্তাফা খাঁন। মাথা নিচু করে নমস্কার দিলেন রাজা জানকীরাম। গোলাপ-জল আর আতর ছিটিয়ে দিল খিদমদগারেরা। সর্দার মুস্তাফা খান একটি সুদৃশ্য গোলাপের তোড়া দিলেন ভাস্কররামের হাতে। রাজা জানকীরাম দিলেন আলীভাইকে। তারপর প্রত্যেক সর্দারের হাতে এক একটি করে ফুলের তোড়া ধরিয়ে দিতে লাগলেন। চারপাশে ছোট বড় আরো অনেক তাঁবু।

ভাস্কর পণ্ডিত হয়তো ভেবেছিলেন, তাদের বিশ্রামের জন্যই এই সব তাঁবু তৈরী হয়েছে।

কিন্তু তারা জানতেন না, সেইসব তাঁবুর ভেতরে, ছাউনির আড়ালে অন্ততঃ তিন হাজার কৌশলী যোদ্ধা ঘাতকের হিংস্রতা নিয়ে নিপুণ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আদেশের অপেক্ষায় স্থির হয়ে আছে।

দরবার কক্ষের মত সাজানো বিশাল তাঁবুর মধ্যে হাসি হাসি মুখে প্রবেশ করলেন ভাস্কররাম।

তাঁর ডান পাশে আলিভাই করাওওল, বাঁ পাশে গোবিন্দরাও শেলুকর।

তাদের পেছনে দাজীবা ভোঁসলে, শাহ আহমদ খাঁ, তারপর পাশাপাশি বাপুজী কদম, ব্যঙ্কটরাও, সঠবাজী যাদব, তারপর যশোবন্তরাও গুজর, বাবুজী মহাডীক, নারায়ণ ভোঁসলে।

একে একে সার বেঁধে ভেতরে ঢুকছেন সবাই। পায়ের নিচে মহার্ঘ গালিচা। দু'পাশে রঙীন রেশমী পর্দা। আতর আর গোলাপজলের গন্ধে ভরপুর। নবাব শিবিরের আড়ম্বর-আয়োজন দেখে মুগ্ধ বিস্মিত বর্গী নায়করা হাসি হাসি মুখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন, তারিফ করছিলেন। দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সব শেষে প্রবেশ করলেন নীলকণ্ঠরাও মোহিতে, শ্রীপতরাও মেহেকর। তাদের পেছনে পেশকার, খাস-মুনসী, ওয়াকিনবীশের দলে প্রায় পঁচিশজন। রাজা জানকীরাম আর সর্দার মুস্তাফা খাঁন কিন্তু প্রধান সর্দারদের

সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখিয়ে ভেতরে ঢুকলেন না। অথচ সেটাই শিষ্টাচারসম্মত প্রথা। প্রত্যেক সর্দারের হাতে ফুলের তোড়া, ধরিয়ে দেবার অছিলায় দু'জনেই প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ মারাঠা কর্মচারীটি তাঁবুর ভেতর ঢুকে যেতেই সর্দার মুস্তাফা খাঁন হাত তুলে কি একটা ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাত আটজন নিরীহ চেহারার খিদমদগার তৎপর হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে দরজার মুখে দুই প্রস্থ পর্দা ফেলে মোটা দড়ি দিয়ে খুঁটীর সঙ্গে এমনভাবে বাঁধল যেন সহজে কেউ আর বেরিয়ে আসতে না পারে। তরোয়াল দিয়ে পর্দা কেটে হয়তো বেরিয়ে আসা যায়; কিন্তু বাইরের প্রহরী দু'জন উদ্যত বল্লম হাতে প্রস্তুত হয়ে রইল।

তেমনভাবে কেউ বেরোবার চেষ্টা করলে সোজাসুজি গেঁথে ফেলবে।

মুস্তাফা খান একটু দূরে দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে চাপলেন আর মোটাসোটা রাজা জানকীরাম হাঁসফাস করে তাড়াতাড়ি পাল্‌কিতে উঠলেন।

ওদিকে ভাস্কররাম তখন শিবিরের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেছেন। তার ডানপাশে আপিভাই, বাঁ-পাশে গোবিন্দরাও। নবাবের মসনদ মাত্র তিরিশ পয়ত্রিশ হাত দূরে।

আলীবর্দী খান উঠে দাঁড়িয়েছেন, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। মারাঠা নায়কদের পশ্চাতে প্রবেশ পথের পর্দা বন্ধ হয়ে [illegible] সেই বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধের কণ্ঠে যেন সিংহের গর্জন [illegible] মারো, এই জঘন্য কাফিরদের—

[illegible]ঙ্গে সঙ্গেই মসনদের পাশে দাঁড়ানো দেহরক্ষী [illegible]াঁপিয়ে পড়ল।

[illegible]ক, পর্দার আড়াল থেকে একশত সশস্ত্র [illegible]জির মত হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এল। [illegible]—আমরা দুপাশ দিয়ে দুই দলে [illegible] ওদের ডানপাশে, বেরিয়ে এসে [illegible] ডান পাঁজরে বাঁ-হাতের বল্লম ঢুকিয়ে দিলুম, লোকটা কেমন বেওকুফের মত আমার দিকে তাকাল, কি যে হয়ে যাচ্ছে কিছুই যেন বুঝতে পারেনি, কোমরে হাত দিয়ে বোধহয় ওর হাতিয়ার খুঁজল, তারপর ঘুরে মাটিতে পড়ে যাবার আগেই আমি ডানহাতের তরোয়ালের এক কোপে ওর গর্দানা দু'ফাঁক করে দিলুম, ওর চোখ দুটো তখনো খোলা ছিল, মুখটা আস্তে আস্তে হা হয়ে গেল—

শ্রোতারা নির্বাক, নিস্পন্দ। শুধু ভারতচন্দ্রের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—ইস্, কি সাংঘাতিক—

আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে পাশে ভারতের মুখের দিকে তাকাল মামুদ জাফর, সামান্য হেসে বললো—আপনার আফশোষ হচ্ছে পণ্ডিতজী, কিন্তু ভুলে যাবেন না ওরা আমাদের দুশমন, বছরের পর বছর আমাদের মুল্লুক লুঠ করেছে, খুন-খারাপি করেছে, জেনানাদের বেইজ্জত করেছে, তার বদলা নেবনা, কি যে বলেন, আর এই জন্যইতো নবাব বাহাদুরের নিমক খাই আমরা, সব সেপাইরা—

—এতো ঠিক কথা, খুব খাঁটি কথা বললেন ইন্দ্রনারায়ণ—এই বর্গী বদমাশরা রাঢ় অঞ্চলের মত সোনার দেশকে শ্মশান করে দিয়েছে, নবাববাহাদুর এদের এতগুলি সর্দারকে একসঙ্গে খুন করিয়ে সুবে বাংলা মুলুকের মস্ত উপকার করেছেন, এই বয়সেও তাঁর সাহস ও বুদ্ধির কথা ভাবলে অবাক হতে হয়, কি বলেন মুখুজ্জেমশাই—

—নিশ্চয়ই, একশোবার, হাজারবার সেলাম নবাববাহাদুরকে—সায় দিলেন রামেশ্বর মুখুজ্জে—আরে আমাদের ভারতভায়া হ'ল কোমল-প্রাণ কবি-মানুষ, ওর হয়তো খুন-খারাপির কথা শুনতে খারাপ লাগছে—কি, রায়-মশাই, তাই নাকি—ঠোঁটের ফাঁকে গড়গড়ার নলটি ধরে সামান্য হাসলেন ইন্দ্রনারায়ণ—আপনার যদি খারাপ লাগে কিংবা ভয় পেয়ে থাকেন, তবে এই ঘটনার বিবরণ আপনার না শোনাই ভাল—

—না ভয় আমি পাইনি, খুনজখম আমি অনেক দেখেছি—জবাব দিল ভারতচন্দ্র—তবে কৌশলে এতগুলি নামজাদা সেনাপতিকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করে এনে এমন পাইকারী হত্যাকাণ্ড বাঙলাদেশে আর কখনো হয়নি—

—কখনো হয়নি বলে যে, কোনদিন হবে না, হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই—রায়েশ্বর বললেন—নবাব বাহাদুর নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, আর কৌশলে হত্যার কথা যদি বলো, সেতো মহাভারতের আমল থেকে হয়ে আসছে, কীচকবধের কথাটা ভেবে ভাখো না, আপনি কি বলেন দেওয়ানজী—

—যথার্থ বলেছেন, রাজনীতিতে অত বাছবিচার করলে চলে না—জবাব দিলেন ইন্দ্রনারায়ণ—সপ্ত মহারথী মিলে অন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুকে মেরেছিলেন, মারি অরি পারি যে কৌশলে—

—সেতো ঠিকই—বললো ভারতচন্দ্র—কিন্তু আমার মতে হত্যাকাণ্ড সব সময়ই খারাপ, তা' রাজনীতির জন্যই হোক কিংবা ধর্মের নামেই হোক, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন আত্মরক্ষার জন্য, মহিলাদের মর্য্যাদা রক্ষার প্রশ্নে অথবা শিশু-বৃদ্ধ-দুর্বলের প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে হত্যাকাণ্ড অনুমোদন করা যেতে পারে, যেমন কীচকবধ, কিন্তু অভিমন্যুকে যে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল, একথা মহাভারতে বারবার বলা হয়েছে—

—কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ধর্মযুদ্ধ আর কোনটা অধর্মযুদ্ধ, এই জটিল তর্কের বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে পরে আলোচনা করতে রাজি আছি, কিন্তু এখন নয়—মৃদু হাসিমুখে বললেন ইন্দ্রনারায়ণ—আর আমরা তো কাউকে হত্যা করতে যাচ্ছি না, আমরা শুধু একটা ঘটনার বিবরণ শুনছি, আর আমার মনে হয়, সুবে বাঙলা মুলুকের মঙ্গলের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারীর মান-সম্ভ্রম, ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য নবাববাহাদুর যা করেছেন, কিংবা বলবো, করতে বাধ্য হয়েছেন, তা'ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না, কৌশলে এতগুলি সর্দারকে খুন করাতে না পারলে, বর্গী বদমাশদের এত সহজে তাড়ানো যেত না—

তারপর মামুদ জাফরকে লক্ষ্য করে বললেন দেওয়ানজী—তুমি যা দেখেছ, যা করেছ সব খুলে বলবে জাফর সাহেব, একটি কথাও বাদ দিতে পারবে না, ওরে ফটিক, ছিলিম পালটে দে', জাফর সাহেবকে পান দে'—

শ্রোতাদের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মুখের কাছে মুঠো তুলে সামান্য কেশে আবার শুরু করল মামুদ জাফর—হ্যাঁ যা বলছিলুম, আমি যাকে পয়লা চোটে মেরেছিলুম, সেই লোকটির নাম পরে জানতে পেরেছিলুম, ওর নাম ছিল বাবুজী মহাড়ীক, একজন নামকরা সর্দার, ওর পাঁজরের ফাঁকে বল্লমের ফলাটা আটকে গিয়েছিল, এক হাতে টেনে বার করতে পারলুম না, দেরী করার উপায় নেই, বুকে এক লাথি মেরে বল্লমটা ছাড়িয়ে আনলুম, সে সময় নজর পড়ল ওর বুকে একছড়া মুক্তোর মালা, নবাববাহাদুরের ঢালাও হুকুম ছিল, বর্গীদের কাছ থেকে যা পাবে লুটে নেবে, কাঁচা খুনের রঙ মাখা শাদা মুক্তোগুলি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, আমি টপ করে তুলে তরোয়ারের খাপের মধ্যে নিয়ে নিলুম, হঠাৎ জগন্নাথ সিঙের চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি আমাদের জগু পালোয়ান পর্দার দড়িতে পা জড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেছে, ওর কপাল কেটে খুন ঝরছে, এক বর্গী বদমাশ তরোয়াল তুলেছে [illegible] ঘা দেবার জন্য, আমি এই দুশমনের মহড়া [illegible] জায়গা পাঁয়তারার সুবিধে নেই, তরোয়াল [illegible] নেই, আমি কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখছিলুম [illegible] লড়াক, কিন্তু জগুভাই ততক্ষণে সামলে [illegible] মেরেছে, আমিও পেটের মধ্যে তরো[illegible] লোকটা মাটিতে পড়ে গেল, ওদিকে [illegible] সব ক'টা বদমাশই মাটি নিয়েছে, চা[illegible] গালিচায় চাপ চাপ রক্ত, কেউ[illegible]

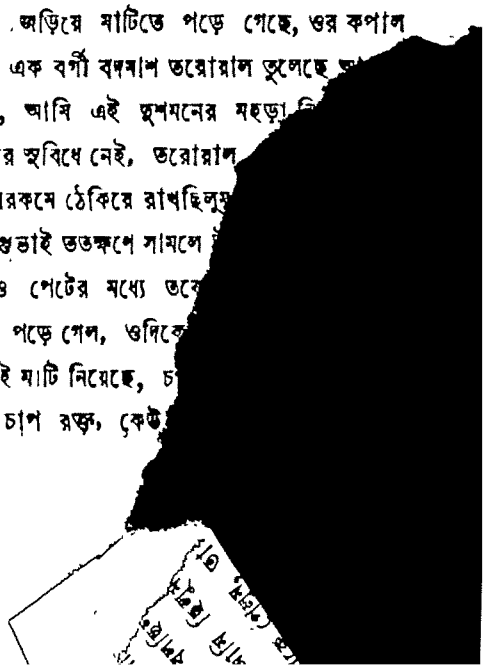

কেউ তখনো চেঁচিয়ে গালাগালি দিচ্ছিল, ওদের ভাষা বুঝতে পারিনি, সমস্ত কাজ হাসিল করতে বোধহয় আট ঘড়ির বেশি সময় লাগেনি, জগুভাই খুব জখম হয়েছিল, দু'তিন জায়গায় চোট লেগেছিল, কোনরকমে আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমি মসনদের দিকে তাকালুম, কিন্তু নবাব বাহাদুরকে সেখানে দেখতে পেলুম না—নবাববাহাদুর সেখানে ছিলেন না। হত্যার হুকুম দিয়েই তিনি আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে পাশের একটা ছোট তাঁবুতে গিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে শুধু পাঁচজন সশস্ত্র দেহরক্ষী ছিল। আক্রমণের আরম্ভেই নবাবের হুকুম শোনামাত্র আলীভাই করাওওল তবোয়াল খুলে মসনদের দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করেছিলেন—বেইমান, বেইমান—বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

কিন্তু মাত্র তিরিশ হাত দূরের মসনদের কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক আলিনবী খাঁ বল্লম ছুঁড়ে মুহূর্তের মধ্যে আলীভাইকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল।

ভাস্করপণ্ডিত কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। প্রবীণ নায়ক গোবিন্দরাও শেলুকর তরোয়াল খুলে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তাঁদের ঠিক পেছনেই যারা ছিলেন, সেই দাজীবা ভোঁসলে, শাহ আহমদ খাঁ, বাপুজী কদম তরোয়াল তুলে ভাস্কর পণ্ডিতকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যশোবন্ত রাও গুজর—আমি জানতুম, আমি আগেই জানতুম, আমি, আমি—

শত কণ্ঠের কোলাহল আর অস্ত্র ঝন্‌ঝনার মধ্যে তাঁর বিপন্ন আর্তনাদ চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সঙ্গের সামান্য অস্ত্র নিয়েও মারাঠা নায়কেরা মরীয়া হয়ে পাগলের মত কিছুক্ষণ লড়েছিলেন। কিন্তু ওই কিছুক্ষণমাত্রই লড়াই চলেছিল। সাতচল্লিশজন মারাঠিকে ঘিরে ধরেছিল একশো দশজন নবাবী সেপাই। সংখ্যায় দ্বিগুণেরও বেশী সম্পূর্ণ প্রস্তুত শত্রুর বিরুদ্ধে আর কতক্ষণই বা লড়াই করা যায়। তা'ছাড়া নিম্নশ্রেণীর মারাঠা কর্মচারীদের অনেকের সঙ্গেই কোন অস্ত্র ছিল না।

ভাস্করপণ্ডিত নিজেও নিরস্ত্র ছিলেন। তথাপি মারাঠা নায়করা অস্ত্র ত্যাগের কথা ভাবেন নি। হয়তো দ্রুত আকস্মিক আক্রমণের মুখে তেমন কিছু ভাবারও অবসর পাননি।

আর আত্মসমর্পণ করলেও আত্মরক্ষা হ'ত কিনা সন্দেহ। কারণ নবাববাহাদুরের নিপুণ সেপাইরা নির্মমভাবে হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত ছিল।

সব শেষ হবার পরেও কিন্তু আলীবর্দী খাঁন নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। পাশের সেই ছোট তাঁবুতে বসে বার বার হুকুম দিচ্ছিলেন—সব কটা বদমাশকে খুন করো, একটাও যেন পালাতে না পারে, ভাস্কর পণ্ডিতের মাথা কাটো, ভাস্করের মাথা এনে আমাকে দেখাও—

এই হুকুমও অক্ষরে অক্ষরে তামিল হ'ল। আলিনকী খাঁ একখানা রূপোর রেকাবীতে করে ভাস্কর পণ্ডিতের মাথা এনে নবাববাহাদুরের সামনে ধরল। বল্লমবিদ্ধ আহত আলীভাই করাওওল তখনো মসনদের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সলাবত খাঁ এককোপে তার মাথা কেটে নবাবের সামনে নিয়ে গেল।

অত্যাচারী বর্গী সর্দারদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।

মামুদ জাফর বললো—আমাদের তরফে সাতজন জখম হয়েছে, দু'জন শহীদ হয়েছে, নবাববাহাদুর বহোত খুশ হয়ে আমাদের মাথাপিছু শওরূপেয়া বখশিশের হুকুম দিলেন—

বর্গী নায়কও সাধারণ কর্মচারীদের সাতচল্লিশটি মৃতদেহ নিজের চোখে দেখে, সেপাইদের বখশিশ দেবার হুকুম জারী করে আলীবর্দীখান হাতীর পিঠে চাপলেন। তারপর বর্গীবাহিনীর শিবির আক্রমণের আদেশ দিলেন। বাহাত্তর

বছরের বৃদ্ধ নবাবের সাহস, ক্ষিপ্রতা, ধৈর্য ও রণকৌশল অনুগামী যোদ্ধাদের দ্বিগুণ উৎসাহিত করল।

ওদিকে রঘুজী গায়কোয়াড় নিজের তাঁবুতে অপেক্ষা করছিলেন। নবাব শিবিরে গোলমালের খবর পাওয়ামাত্রই তিনি আপন বাহিনী নিয়ে পালালেন। এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে দেখলেন না।

পলাশী ও কাটোয়া শিবিরের ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্রের ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে প্রায় দশ হাজার সৈন্যসহ একরকম নিরাপদেই নিজের দেশের পথ ধরলেন।

নবাববাহাদুর গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়া পর্যন্ত তাড়া করে গেলেন বটে, কিন্তু কোথাও বর্গীবাহিনীর চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। বাংলা-উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট বর্গীদলের যেসব ঘাঁটি ছিল, নায়কদের নিহত হবার সংবাদ শুনে সেসব ঘাটি ছেড়ে সাত-আট দিনের মধ্যেই সমস্ত বর্গীরা নাগপুরের পথে পালিয়ে গেল।

নবাব আলীবর্দী খাঁন দশ লক্ষ টাকা বিজয়ী বাহিনীর মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

তারপর দিল্লীর বাদশাহর কাছে তাঁর সেনানায়কদের মনসব ও খেতাব বাড়িয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে খবর পাঠালেন নবাববাহাদুর।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৭·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী

জাপানের দিনগুলি

বারীন বর্দ্ধন

যাক যা বলছিলাম। তেনপুরার স্বাদের তুলনায় ওচা উৎসবের ওচা কিন্তু খেতে গিয়ে প্রথমটায় মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। ছেলে বয়সের চিরতা খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় সবুজ রং-এর দুধ চিনি ছাড়া গরম জল। এই গরম জল খেতে গিয়েই জাপানীদের সৌন্দর্য্যবোধ সব এক সঙ্গে কোন বাধা না মেনে বাইরে প্রকাশ পায়। চায়ের পেয়ালা-গুলোতে হাতল নেই। দামের দিক থেকে নাকি এক একটা চৌদ্দ পনর টাকা।

চায়ের বাটি হাতে তুলেই যে ঢক্ ঢক্ করে চা খাওয়া সুরু করতে হবে এমন সৌন্দর্য্যবিনাশী ছন্দছাড়া কাজ কেউই করতে পারে না। বিশেষ করে রং বেরং এর ফুল-আঁকা কিমোনো পরা জাপানীরা তো নয়ই। কাজেই দর্শকদের চেয়েও উন্মুখ হয়ে কীর্ত্তিকলাপ দেখছিলাম আমরা কয়েকজন। মেয়েটি ধীরে ধীরে দু হাতের মধ্যে তুলে নিল ওচার বাটি এবং তাই দেখে বাকী সবাই ওই একই কায়দায় তুলে ধরল নিজেদের বাটিগুলো। এবার হাতের মধ্যেই আস্তে আস্তে চায়ের বাটি ঘুরিয়ে নিল সবাই কয়েকবার এবং পরক্ষণেই অতি প্রিয় সবুজ চায়ের রস খুঁজে পেল তার চির আকাঙ্খিত ঠোঁটের ছোঁয়া। নির্বিঘ্নে সবাই পান করে নিল এক এক বাটি ওচা।

ইতিহাসের ধারা চলে এই ভাবে। যার পিছনে রয়েছে যুক্তিতর্কের অবকাশ, যার উৎস হচ্ছে ধর্মীয় শাসন তাকেই পোয়াতে হয় সারাজীবন বাদপ্রতিবাদের ঝড়। আভিজাত্যের দিক থেকে, কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই ওচা উৎসবের। কিন্তু বহু বছর ধরেই চলে আসছে এই অলিখিত অকথিত উৎসবের ধারা। পরিচয় বহন করছে জাপানীদের অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য পিপাসার। চা খাওয়া একটা অতি সাধারণ নগণ্য দৈনন্দিন ব্যাপার আমাদের জীবনে। তার মধ্যেও আবার ওচা। ভুলে যাওয়ার মতই অনাস্থীর সে। কিন্তু সেই ওচাকেই এরা তৈরী করেছে নূতন সাজে। দিয়েছে তাকে জীবনে পরম আকাঙ্খিত স্থান। উৎসবে যেমন আনন্দটা চলে আগে পিছে। উৎসবের মুহূর্ত্তেই মাত্র তাতে পড়ে ছেদ। তেমনি ওচা নো ইউর আগে পিছে চলেছে পুরোনো দিনের রীতিনীতি। শুধু নতজানু হয়ে চা খাওয়াতে নেই তার পূর্ণ মাহাত্ম্য। সে আছে জড়িয়ে জাপানী জীবনের প্রতিটি অঙ্গে। তাই তার স্থান কুলবধুর মতই একান্তে। তাই সে ঘরোয়া।

জাপানের ষ্টেজে প্রথম জাপানী নাটক। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সব এসেছে ভারত, বর্মা, ফিলিপাইন আর ভিয়েৎনাম থেকে। হয়ত সুরুতেই এর শেষ। কাজেই এ কাহিনীর যবনিকা টানতে গিয়ে নাটকের শেষটাও প্রয়োজনীয় তার পরিপূর্ণ রূপায়নে। 'ওচা নো ইউ'র পরের দৃশ্যটা ছিল জাপানের মাটিতে বিদেশী ছাত্রদের দুরারোগ্য নির্জনতা। দৃশ্যটা ছিল হাস্যরসাত্মক। এবং আমাকে করতে হয়েছিল

সেয়ানা ছেলের অভিনয়। হাসি ঠাট্টা আর হাত-তালির মধ্যে শেষ হল সে দৃশ্য। সাফল্যের পর্ব, ক্যামেরার ক্লিক্, এবং টেলিভিশন্ ক্যামেরার একটানা ঝি মি—সব মিলে আমাদের করে দিয়েছিল পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ।

কিন্তু তাতেও অভিনয়ের শেষ হল না। কথা ছিল প্রতিদেশের ছেলেরা নিজ নিজ দেশের কোরাস গান গেয়ে দর্শকদের শোনাবে এবং সে জলসার সুরুতে এ অধমকেই বাজাতে হবে দেশীয় সুরের মূর্ছনায় বাঁশী।

বাঁশের বাঁশী সর্বদাই একটা আমার সঙ্গে থাকত। কোথাও গেলে বাঁশী একটা সঙ্গে যাবেই। তাই বিশ কিলোগ্রাম উড়োজাহাজী মালের মধ্যেও জায়গা পেয়েছিল চার আনা দামের খাস্ ত্রিপুরার জঙ্গল থেকে কাটা বাঁশের বাঁশী। চার আনা তার অর্থকরী দাম হলেও প্রয়োজনের দিক থেকে তার মূল্য ছিল অনেক বেশী। বিদেশের মাটিতে ঐ বস্তুটি একেবারেই দুর্লভ। এ যাত্রা ঐ চার আনার বাঁশীই রক্ষা করেছিল আমার নাম আর ভারতের প্রতি জাপানের অতি ক্ষুদ্র একটা অনুরোধ। তাড়াতাড়িতে কোন কিছু না ভেবে বাজিয়ে শোনালাম একটি চিরপরিচিত ভাটিয়ালী সুর।

এবারেও উঠল হাততালির ঝড়। কিন্তু আরও বাকী আছে। গাইতে হবে কোরাস গান। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। জাপানীরা তা ভাল করেই জানে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষায় কোরাস গানের জন্ম হয় তো শুধু বোম্বের ষ্টুডিয়োতে। সবাই মিলে তা গাওয়া চলে। কিন্তু বিদেশের দরবারে ঐ গান পরিবেশন করতে বাধল! জিজ্ঞাসা করলাম হোষ্টেলের বন্ধুদের। তাদেরও ওই একই অভিমত। গান না পাওয়া যায় —গাইবেন না। তা বলে সিনেমার হিন্দীগান!

ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম রেকর্ডের খোঁজে। আছে বহু ধরণের রেকর্ড। গান, যন্ত্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও রেকর্ড রয়েছে কয়েকখানা। শেষটায় অনেক খুঁজে একটা রেকর্ড বার করা হল। গানটা স্বদেশীভাবাত্মক হিন্দী। গায়িকা বাঙ্গালী।

নাটকের শেষে সবাই এক মুখ রং নিয়ে বাইরে এসেছি। হঠাৎ কুবোতা সেনসেই নিয়ে এলেন অচেনা এক ভদ্রলোককে। পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—ইনি একজন গাইগোর অধ্যাপক।

বিনীত কণ্ঠে অধ্যাপকমশাই জিজ্ঞাসা করলেন ভারতের সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক আর হাতে তুলে নিলেন ঐ চার আনা দামের বাঁশীটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন আর বলছেন —এই সাধারণ বাঁশে কি করে ঐ সুর বের হয়?

পরক্ষণেই পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে এবং কাগজের মোড়ক থেকে বার করলেন আরও বড় অপরূপ এক বাঁশের বাঁশী। ক্ল্যারিওনেটের মত আলাদা করা চলে। বাঁশীর দু'টো অংশ জুড়তে গিয়ে অধ্যাপকমশাই বললেন—কিছু মনে করবেন না। আপনাদের বাঁশী শুনলাম। এবার আপনাকে জাপানী বাঁশী একটু শোনাতে চাই।

প্রথম দৃষ্টিতে অধ্যাপকমশাইর কাণ্ডকারখানা অদ্ভুত মনে হলেও তার মধ্যে ছিল আবেগ মেশান স্বতঃস্ফূর্ততা। দেশকে বিদেশের সামনে তুলে ধরতে এরা কেউই কোন সঙ্কোচ বোধ করে না। যতটা সম্ভব সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে। খুঁটিয়ে দেখায় নিজের দেশকে। ভারতকে এরা জানে কলাকেন্দ্রের আকর বলে। ভারতের আর্ট, সংস্কৃতি—সবই ভারতের নিজস্ব। আর শুধু তাই নয়। আড়াইশ বছর বিলেতী রাজত্বের পরও ভারতে ভারতীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি শিল্পকলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। বনিয়াদি গঠনের দৃঢ় ভিত্তি শিথিল হয়নি ইংরেজী শাসনে। এই অপরিবর্তনীয় জীবন-দর্শন ছিল জাপানীদের কাছে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আজ সে দেশেরই একজনকে জাপানী সঙ্গীতের ধারা বোঝাতে

গিয়ে অতিরিক্তমাত্রায় উৎসাহী হয়ে পড়লেন অধ্যাপক মশাই।

অধ্যাপকমশাই বাজিয়ে যাচ্ছেন বাঁশী আর কুবোতা সেনসেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন জাপানী মার্গসঙ্গীতের উৎস এবং প্রবাহ।—এক মুখ রং নিয়ে তাই শুনছি। সুর বাজছে খাদে। হঠাৎ চড়ে গেল তারার পর্দায়। আর সেই থেকে ধীরে ধীরে প্রতিটি স্বর বেয়ে উঠতে লাগল। এই আরোহণ-অবরোহণের মাধ্যমে সুর তার পথ খুঁজতে লাগল পরিণতির। মুগ্ধ হয়ে শুনছেন কুবোতা সেনসেই আর ততোধিক তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছেন অধ্যাপকমশাই। সুরের গতি ধীর এবং প্রতি পদে তার স্থায়িত্বও ছিল বেশ কয়েক সেকেণ্ড।

একটু ধাক্কা দিতেই কুবোতা সেনসেইর মোহ ভাঙল।

জিজ্ঞাসা করলাম—সেনসেই, এবার সুরটা বুঝিয়ে দিন?

কুবোতা সেনসেই জাপানী সঙ্গীতবিশারদ নন। তাই বলে পিছপা হলেন না। অধ্যাপকমশাই আগেই কি যেন বলে রেখেছিলেন। সেই কথার ভিত্তিতে বললেন—এ সুরটা হল আনন্দের সুর। প্রখর রোদে সাগরের জল চিক্ চিক্ করে উঠে। উপরে নীল আকাশ। ধীরে বইছে কবোষ্ণ হাওয়া। আর সেই পরিবেশে আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছে উপকূলের পক্ষিসমাজ। দলে দলে তারা বেরিয়ে পড়েছে। ঘুরে ঘুরে উড়ছে আকাশের গায়। আর গান গাইছে আপন মনে। সেই সুরকে রূপ দিচ্ছেন অধ্যাপকমশাই বাঁশীতে।

বাজনা চলেছে। কুবোতা সেনসেই আবার তন্ময় হয়ে পড়লেন সুরের মূর্ছনায়। আর আমি তখন ব্যস্ত ভারতীয় সঙ্গীতের ধারার সঙ্গে এর মিল খুঁজতে। জাপানের সংস্কৃতি চীনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মাঝামাঝিতে এল ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের ঢেউ। শুধু তাই নয়। নিয়ে এল সঙ্গে করে খ্রীস্টপূর্ব ভারতীয় ভাবধারার খানিকটা। ভারতের মার্গসঙ্গীতের জন্মও তো সেই কালে। তাই ভাবছিলাম কোথাও এতটুকু ভারতীয় রেশ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সুরের তুলনামূলক প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে প্রথমেই জেনেছিলাম যে সাদা কথায় তফাৎটা হল হার্মোনী এবং মেলোডির। অর্থাৎ নানা রকম যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে সুর পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে। কিন্তু বিভিন্ন যন্ত্রে বা কণ্ঠে জন্ম নিয়েও এরা পৃথিবীর আলোতে এসে লড়াই করেনা নিজেদের মধ্যে। সবাই মিলে তৈরী করে সঙ্গীতের রাজত্ব যেখানে ঠিক সেই মুহূর্তেই শ্রোতার দল পৌঁছেছে তাদের সঙ্গীতমুখর মনটি নিয়ে।

প্রাচ্যের ধারা একটু ভিন্ন। একটি কি দু'টি যন্ত্র থেকে বেরোবে সুরের ধারা। প্রতিপদে শ্রুতি এবং মূর্ছনার মাধ্যমে সে রূপ দিবে সঙ্গীতজ্ঞের অন্তরের আবেগ। প্রয়োজনমত সঙ্গীতজ্ঞ সুরের চেহারায় আনবেন বৈচিত্র্য যে বৈচিত্র্য সুরুতে উপলব্ধি করেছেন একমাত্র সঙ্গীতজ্ঞ নিজে। একই সুর নানা ভঙ্গীতে জানিয়ে দেবে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি। প্রথমটায় তৈরী হবে পরিবেশ শ্রোতাদের মনকে সঙ্গীতমুখর করবার জন্য। এবার সুর তার সমস্ত রূপ নিয়ে উঠে আসবে প্রতি ঝঙ্কারে এবং টেনে নিয়ে চলবে শ্রোতাকে চরম পরিণতির দিকে। ভারতীয় সঙ্গীতের এ মাধুর্য্য ভারতেরই অন্তর্নিহিত। তার কি কোন ধরা ছোঁয়া নেই প্রাচীন জাপানী মার্গসঙ্গীতে?

বাঁশীর আওয়াজে তাই ভাবছিলাম বহুক্ষণ ধরে।

আছে কিছু মেলোডি আর কিছু হার্মোনি। প্রথমটা সুপ্রাচীন। অন্তর তার প্রাচ্যের ঐতিহ্যেই নিহিত। দ্বিতীয়টা আধুনিক। আর পাঁচটা সাগরপারের জিনিষের মত এরাও কায়েমীসত্তা লাভ করেছে জাপানের মাটিতে। তাই দেখেছিলাম কোতো আর বিওয়ার সঙ্গে জাপানীরা চর্চা করছে ব্যাঞ্জো, পিয়ানো, বেহালা আর চেলো। অধ্যাপক-মশাই প্রায় মিনিট পনের বাজিয়ে শোনালেন জাপানের মার্গসঙ্গীত। উৎস সম্বন্ধে আগেই বলেছি। ব্যঞ্জনায় ছিল হার্মোনি আর মেলোডির সমন্বয়। তাই শুনতে শুনতে চলে

আসার কথা মনে রইলনা। প্রকৃতির একই রূপের বিভিন্ন প্রকাশ। বাহার সুরের উচ্ছ্বাসবাহুল্য ছিলনা অধ্যাপকমশাইর পাখীর সুরে। কিন্তু তিনি যা শুনিয়েছিলেন তা ছিল প্রকৃতির-ই স্বতঃস্ফূর্ত একটা মুহূর্ত। সঙ্গীতজ্ঞ উপলক্ষ মাত্র। কোনদূরে পক্ষিকূল কুজনরত। টোকিওর চাঞ্চল্যে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি পৌঁছে দিলেন আপন সত্তার আপনিমুখর রূপটি।

সঙ্গীতের উৎস কোথায় জানিনা। কোন দেশে এই নিয়ে চর্চা হয়েছে কিনা তাও জানা নেই। বিশেষ করে ভারতের প্রতিটি রাগিনীর অধ্যাত্ম রূপ থাকার দরুণ উৎস সন্ধান করাও বস্তুতন্ত্রের দিক থেকে সম্ভব নয়। ভৈরবী সুরে যদি প্রভাতের মূর্চ্ছনা মনে না ফোটে, যদি আমেজ না লাগে প্রভাতী হাওয়ার তবে সে জন নিতান্তই কৃপার পাত্র। মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে এ জাতীয় কৃপার পাত্র আমাদের দেশে অনেকেই। কিন্তু সুরের সৃষ্টি বা উৎস খুঁজতে গিয়ে মনোজাগতিক আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে যদি তার প্রাচীন পরিবেশের কথাও জানা যায়, তবে তার প্রভাব বস্তুতন্ত্রের আমলে বড় কম হবে না। জাপানের মার্গসঙ্গীত শোনা এই প্রথম এবং এই শেষ। কিন্তু তাই বলে বৈরাগ্য এল না বাঁশী শুনতে শুনতে। কুবোতা সেনসেইর ইতিহাসই এ যাত্রা আবিষ্ট করে রাখল বাজনার শেষ অবধি। প্রথমটা কাহিনীকে বাহন করে মন চলে গেল সেই নিভৃত সমুদ্রোপকূলে এবং পরক্ষণেই খুঁজে পেল সুরের মাধুর্য্য আর আনন্দ।

অধ্যাপকমশাইর বাজনা থামল। জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন লাগল?

বললাম—জাপানের গানবাজনার সঙ্গে কোনই পরিচয় ছিল না এর আগে। তবু আজ আপনার বাজনা শুনে এটুকু আন্দাজ করতে পারি যে জাপানের মার্গ সঙ্গীতের রূপটি প্রাচ্যেরই নিজস্ব। প্রকাশে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন।

বলেই মনে হল হয় ত আমার ভাটিয়ালি সুরটি অধ্যাপকমশাই মনে ধরে রাখবেন মার্গ সঙ্গীতেরই নিদর্শন হিসাবে।

তাই আবার বললাম—আমার যে বাজনা শুনলেন তা ভারতের লোকসঙ্গীতেরই একটি। ভারতের মার্গসঙ্গীত কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। কাল তারই একটা নমুনা আপনাকে শুনিয়ে যাব।

মনে হল এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আট কোটি লোকের বাসভূমি জাপানে যদি ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার অবকাশ হয় তবে উৎসাহী অধ্যাপকমশাইর মত আমিও কেন সে সুযোগ গ্রহণ করব না। বিকেলেই ছুটলাম ভারতীয় দূতাবাসে এবং রেকর্ডের বাক্স খুঁজে খুঁজে বার করলাম বাঁশীর একটি রেকর্ড।

পরদিন ভোরে ক্লাশে ঢুকে প্রথমেই কুবোতা সেনসেইকে বললাম—আজ একবার বংশীবাদক মাষ্টারমশাইকে ডাকুন তো। ভারতের সেরা বাঁশী আজ শুনিয়ে যাব।

কুবোতা সেনসেই চলে গেলেন অধ্যাপকমশাইর খোঁজে আর আমি ছুটে গেলাম আফিসে টেপ্‌রেকর্ডিং যন্ত্রটির জন্য। যদি শোনাতে হয় তবে একদিন কেন। প্রতিদিন যাতে শুনতে পায় এদেশের লোকেরা তারই ব্যবস্থা করে যাব।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেপ্‌রেকর্ডিং হয়ে গেল। অধ্যাপকমশাই-কুবোতা সেনসেইর ঘাড়ে ঝুঁকে পড়ে শুনতে লাগলেন ঐ দুপুরে বেহাগ রাগিনীর সুর। বেহাগের সময়কাল ভরদুপুর নয় তা জানি। কিন্তু প্রভাব তার একটুও ক্ষুণ্ণ হল না দ্বিপ্রহরের রুদ্ররোষে।

বাজনা শেষ হতেই অধ্যাপকমশাইকে বললাম—ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের একটা সুর আপনার জন্য রেকর্ড করে গেলাম। কিন্তু জাপানের সঙ্গীতেরও যে একটা নিদর্শন নেওয়া দরকার।

এবার অধ্যাপকমশাই বাজিয়ে শোনালেন ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের একটা জাপানী গান। জাপানের মাটিতে

এ গান জানে না এমন ছেলেমেয়ে কেউ নেই। গানের শেষ পদটিই খালি মনে আছে—'মিনুনা দেতে কোই কোই কোই'—তোরা সব বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়। তবে সুরটা মনে আছে এখনও। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই সুর বাজবে সারা গানে। সাধারণ বাংলা গানের মত।

দেশে ফিরে বহুদিন বাদে একদিন বাঁশীতে বাজাচ্ছিলাম সেই সুরটি। সে সময় থাকতাম এক সঙ্গীত-সমালোচক বন্ধুর সাথে। বন্ধুটি আগে ছিলেন কলিকাতারই বিশিষ্ট ইংরেজী কাগজের সাব্ এডিটার এবং কাজের ফাঁকে লিখতেন গানের সমালোচনা।

যাক্, একদিন বাঁশীতে সেই মিনুনা দেতে কোই কোই কোই সুরটি বাজাবার চেষ্টা করছি। বারান্দায় বসে বন্ধুটি কি পড়ছিলেন। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ধরণের ভূপালী পর্দায় কি গান বাজাচ্ছেন?

বন্ধুকে বললাম সুরের ইতিহাস আর বাজিয়ে শোনালাম পুরো গানটি। —ভূপালী রাগে জাপানী সুর।

(ক্রমশঃ)

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। যাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

30 লক্ষ মহিলা ভুল করতে পারেন না

গত চার বছরে 30 লক্ষের চেয়েও বেশী স্ত্রীলোক ঝুপ্ নিয়েছেন। তাঁরা জানেন যে ঝুপ্ :

ফলপ্রদ—জন্ম নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে একটি।

সরল—কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারবাবু ঝুপ্ লাগিয়ে দিতে পারেন।

পরিবর্তনসাধ্য—আপনারই যখনই আর একটি সন্তানের প্রয়োজন হবে, আপনি সহজেই এটিকে বের করে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

সুবিধাজনক—ঝুপ্ নেওয়ার পরে সেটি যদি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তবে অন্য কোনও উপায় আপনাকে খুঁজতে হবে না। দাম্পত্য সুখের ক্ষেত্রে ঝুপ্ বাধা সৃষ্টি করে না।

ক্ষতিকারক নয়—ঝুপ্ নিলে কোনও রোগ হয় না। যদি কোনও উপসর্গ দেখা দেয়, সে সবের সহজেই চিকিৎসা হতে পারে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ডাক্তারেরা যত ধিরেছেন যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের জন্যে ঝুপ্ একান্ত উপযুক্ত। ঝুপ্ যাঁদের সহ্য হয় না, তাঁরা সময়ের ব্যবধানে সন্তান জন্ম ও সন্তান সংখ্যা সীমিত করবার জন্যে অন্যান্য উপায়ের আশ্রয় নিতে পারেন। বাড়ীর সবচেয়ে কাছের পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ করুন। পরিবার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তীয় নির্দেশ ও যাবতীয় সেবা-সহযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

গুজবে কাণ দেবেন না

আপনার ডাক্তারবাবুর কথা বিশ্বাস করুন

পূর্ব প্রকাশিতের পর

জাতীয়তার রূপায়ন

দীপঙ্কর

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপরোক্ত অভিমত দেখা গেল। তাঁহারা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ কোন রাজ্য সম্বন্ধে নহে। উহা তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্মজীবনী পাঠ করিলে এ-কথা সম্যক উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলাদেশ সম্বন্ধেও তাঁহার নিজস্ব কোন প্রকার উচ্চাশা ছিল না। অবশ্য বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, বাঙালীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার গর্ব এবং উচ্চাশা ছিল বলিয়াই তিনি বাঙালীর সমালোচনা করিয়াছেন। দেশ এবং জাতি ন্যায়, নীতি এবং সৎপথে পরিচালিত হইয়া যাহাতে মান-মর্যাদাসহ সগর্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে এই জন্যই তাঁহার সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'তক্তপোষে বসিয়া মলিন তাস সজোরে ভাঁজা আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা বিশেষ দিক।' আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বলিয়াছেন, "দুঃখের বিষয় বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন প্রকার। এখানে যুবকেরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে কার্যে অগ্রসর হয়। প্রাথমিক যে কোন বিপত্তিতে তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের জীবন-পথ কণ্টকাস্তীর্ণ করিয়া রাখে ইহাই যেন তাহাদের ইচ্ছা। পক্ষান্তরে ইংরাজ যুবক বাধা বিপত্তিতে আরও দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া উঠিবে। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ইহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বাঙালীরা নিরানন্দ জাতি, জীবনকে উপভোগ করিতে জানে না। তাহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন ও আধা ঘুমন্ত জীবন যাপন করিতে ভালবাসে। সাধারণ বাঙালীকে দেখিলে টেনিসনের 'Lotus Eaters', 'কমল বিলাসী' কবিতার কথা মনে পড়ে।"

বাঙালী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউক এবং ব্যবসাক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের সম্মানিত আসন লাভ করুক ইহাই ছিল আচার্য রায়ের উপদেশ, আশা এবং অনুরোধ। কিন্তু ব্যবসায়ী-ই হউক, কি রাজনীতিবিদ-ই হউক বা শিক্ষকই হউক মানুষকে প্রথম মানুষ-ই হইতে হইবে। উহা যেন বৃহৎ অট্টালিকার বুনিয়াদ। বুনিয়াদ শক্ত হইলে গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈয়ারী করিতে অসুবিধা হয় না। প্রয়োজন,—দৃঢ় সঙ্কল্প আর মনোবল। নিজেকে দুর্বল ভাবিলে স্বাভাবিকই মানুষের ক্রিয়াকর্মে দুর্বলতার ছাপ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। নিজেকে যদি শক্তিশালী ভাবা যায়, তেজস্বী ও বীর্যবান ভাবা যায় তবে তাহার কার্যের মধ্যেও অসীম শক্তি-সাহসের লক্ষণ দেখা যায়।

মোটকথা তখনকার ভারতীয় পরিবেশকে একটা ঐক্যবদ্ধ, সংহতিপূর্ণ ভারত বলা চলে না। কিন্তু মানুষে মানুষে চিরদিনই একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আছে তাহা না হইলে একজন ভারতীয়, অদেখা, অপরিচিত একজন বিদেশী মানুষকে ভালোবাসিতে পারে না। সুতরাং একই দেশের এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের জন-জীবনের মিল খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব নহে। এই মিল বা মিলনের সূত্র অলিখিত অক্ষরে অন্তরে অন্তরে লিখিত। উহার সূত্র ধরিয়া একজন,

এক পথের পথিক হইবার যে আয়োজন তাহাই ছিল তখনকার দিনের প্রধান কাজ। উহা স্বদেশী সংগঠন। একদিনেই উহা সংগঠিত হইবার কথা নহে। অথবা কাহার-ও কোন একটা বক্তৃতা শুনিয়া বা একবার একপলকে কিছু লিখিত উপদেশ পড়িয়া দেশের সব মানুষ আত্মসমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের করণীয় সম্বন্ধে উপযুক্তভাবে সচকিত হইয়া উঠিবে ইহা দুরাশা। কিন্তু দুরাশা বলিয়া কেহ কোন কালে তাহার আশাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে নাই। নতুন তুর্কীর মহান স্রষ্টা কামালআতাতুর্ক পাশা শৈশবে পিতাকে হারাইয়া সুলতানের অধীনে সামান্য সৈনিকের জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মন এক মহান যোদ্ধার আশা-আকাঙ্খায় পরিপূর্ণ ছিল। সুলতানের অত্যাচার অবিচার এবং কুসংস্কারের স্তূপীকৃত পাহাড় তুরস্কের জনজীবনকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া, মেঘ-নির্মুক্ত নির্মল স্বচ্ছ নভের মত, তুরস্কের বাহ্যিক আর আন্তরিক আবহাওয়াকে সুস্থ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশাই ছিল প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞাই আশা। তাঁহার আশা সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত তাই জগতের বুকে মহান কামাল পাশার মহত্তর তুরস্ক আজ বিদ্যমান।

সুতরাং আশাকে সম্মুখে রাখিতেই হইবে। বৃহত্তর আশাকে সম্মুখে রাখিয়া একে একে সেই আশার পতাকাতলে সম্মিলিত হওয়াই ছিল লক্ষ্য। এখানে মহামতী গোখেলের কথাটী মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন, "What Bengal thinks to-day India will think to-morrow." গোখেলের এমন কথা বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। ডিরোজিও ও তৎকালীন শিক্ষায় দেশের আবহাওয়া ছিল সমৃদ্ধ। ঐ শিক্ষার আলোকে যাহারা জীবনকে আলোকিত করিয়া দেশের বুকে নিজেদের নাম অক্ষয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তখন ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের যুগ। রাজা রামমোহন রায় তখন বিলাত যাত্রা করেন। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের ভার তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করিয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। ভগবৎ ভক্তির দিকে যাহাদের মন-প্রাণ উৎসর্গীকৃত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই দলভুক্ত। অপর দল ভগবৎ ভক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপিত না করিয়া যুক্তিবাদের দিকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যেমন সতীদাহ প্রথা তাহাদের মতে সামাজিক কু-প্রথা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইহার পরে ব্রাহ্মসমাজের বুকে আবারও ভাঙ্গনের আঘাত আসে। তখন হয় তিনটী দল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে দলের পুরোধা ছিলেন সেই দলের নাম 'নববিধান'। এই নববিধান কি এবং কেন তাহা বুঝাইবার জন্য নববিধানের ব্যাখ্যাতা ছিলেন রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এমন কি পরবর্তীকালে বিশ্বজয়ী বীর স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই বিস্তৃত আলোচনা করিবার কারণ এই যে, ধর্ম ও ধর্ম্মীয় পথ নিয়া মতান্তর যাহাই হউক না কেন, সকলের মন সর্বদাই কম্পাসের উত্তরমুখী কাঁটার মত একমুখী হইয়া একই চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল। তাহাদের চিন্তা ছিল, দেশব্যাপী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের নামে শোষণ ও অত্যাচার সম্বন্ধে। এই অত্যাচার দূরীভূত করিবার জন্যই দেশের জননায়কদের এখন ধ্যান এবং প্রচেষ্টা। তাহারা মনে করিতেন, মানুষের উপর মানুষের বিচার, ব্যবহারের ধারা নীতির পথে পরিচালিত না হইয়া নীতিবিগর্হিত পথে

চলিতে থাকিলে সর্বশক্তি দিয়া উহার বিরোধিতা করা মানুষেরই কর্তব্য। এই নীতি পালনে যেমন সামাজিক কর্তব্য রহিয়াছে তেমন ধর্মের দিক হইতেও তাহার অধিকার রহিয়াছে। এ কাজে বাঙালীই প্রথম অগ্রণী হইয়াছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয় নাই, শুধু বিদেশীদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া উহার বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ শুধুমাত্র অঙ্কুরিত হইতেছিল। জনগণের মানস-ভূমি তখন অকর্ষিত। সব কথা সম্যক উপলব্ধি করিবার মত মানসিক গঠন এবং শিক্ষা তাহাদের ছিল না। কর্তব্যের আহ্বানে তাহারা ছুটিয়া চলে, তাহাদের বাচনিক কে যেন কথা বলায়। তাহা না হইলে সেই সময়ে ইংলণ্ডের বুকে দাঁড়াইয়া একজন বাঙালীর মুখে এমন তেজ-বীর্যের কথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত প্রকাশ পায় কি করিয়া? ১৮৭০ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ভারত শাসন সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যে সব বক্তৃতা করেন তাহা স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "I hope and trust that merciful God has called you to govern that nation, will give you wisdom and strength and piety enough to rule our race properly; if not, India will not long be in your hands. You will be forced to leave India to herself, and we shall do our business in the best way we can. It is your duty so long as you hold India in your hands to act as trustees, rendering a due account to God for the way in which you treat the people in that country. Let injustice, oppression, tyranny and cruelty cease, let us not find haughty Anglo-Indians in India treating the people of the country as if they were nothing more than cattle.

[বাংলার জাগরণ : কাজী আবদুল ওদুদ পৃঃ ৯৬-৯৭]

তখনকার পরিবেশেও কেশবচন্দ্র এমন উক্তি করিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বক্তৃতার মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি ইংরাজ সরকার বা রাজপুরুষদের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তাহাও কিছুটা অন্য সূত্রে জানা যাইতে পারে। সুদূর পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ফা-হিয়েনের ভারত বিবরণ হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ধন রত্নের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে সুদূর দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। রত্নরাজি আহরণের প্রলোভনে তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণের নৃশংস সংবাদ ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মনীষী রমেশ দত্ত মহাশয়ের উক্তিটিও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে যে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিল সেই ভারতই আজ সর্বাপেক্ষা দরিদ্র"।

[স্বরাজের পথে : অধ্যাপক অনিলবরণ রায়, পৃঃ ১৯]

সুতরাং সাধারণ শাসন ও অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় মনীষীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজ রাজত্বের সময় তাহাদের রাজত্ব সম্বন্ধে একজন ইংরাজ অধ্যাপক এবং রাজনীতিবিদ যে মন্তব্য করিয়াছেন এস্থলে তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধ্যাপক মিলি বলিয়াছেন, "If at any time the Indian people became practically of one mind not to help our administration we shall have to quit that country at once.

[বাংলার জাগরণ : কাজী আবদুল ওদুদ পৃঃ ১৭৭]

অধ্যাপক মিলি শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে লইয়া শিক্ষাবিস্তারকেই তাঁহার জীবনের মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের পবিত্র কর্মে নিযুক্ত থাকিলেও মানুষের ধর্ম তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন

বলিয়াই প্রজাপুঞ্জের উপর তাহাদের অত্যাচারের কাহিনী তাহার মনকে পীড়া দান করিয়া ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। উপরোক্ত কথাগুলি তাহারই নিদর্শন। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য, নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যায় যে তিনি রাজনীতিবিদ, তিনিও রূঢ় হইলেও সত্য বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইনি মাইকেল ডেভিড্। মিঃ ডেভিড্ বলিয়াছেন, "Loyalty can only be felt and expressed when it is honestly earned by the ruling power."

[বাংলার জাগরণ : কাজী আবদুল ওদুদ পৃঃ ১৭৭]

পুরাণ প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আসা যাউক। ১৮৭০ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজ প্রভুদের মানবতার দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য হইলেও পরোক্ষে ভারতবাসীদেরও অনেক কিছু উপলব্ধি করিবার ছিল। কিন্তু প্রশ্ন, উহা করিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা এখনও ভারতবাসীর ছিল কি-না। অবশ্য ইহা একদিক হইতে বিচার করিলে অবান্তর। কারণ স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধ কখনও চাপিয়া রাখা যায় না, যেমন ধর্মরাজ্যের মহাপুরুষগণ দেশকাল পাত্রের বিবেচনার অপেক্ষায় না থাকিয়া যে-বাণী বিতরণের জন্য তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া থাকেন উহা প্রচার করিয়া যান। ভগবান বুদ্ধদেব যে-সময় আমাদের এই ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই সময় দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগ বলিদানে যে পুণ্য নাই এবং ধর্মোপার্জন হয় না তাহা বিশ্বাস করিবার মত উপযুক্ত সময় ছিল না। তথাপি ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার বাণী প্রচারে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "হিংসায় কভু কি হয় ধর্মোপার্জন"? দেখা যায়, কেশবচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন।

Black Acts এর সময় বাঙালী সন্তান ইংরাজ রাজপুরুষদের বিকৃত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সিপাহী বিদ্রোহের তেজস্বিতার সংবাদ, কেশবচন্দ্রের ঐ বক্তৃতা এবং নীল বিদ্রোহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হইলেও,—যদিও পূর্ব কল্পিত নহে তথাপি ইহার মধ্যে একই যোগসূত্রের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ একটা কর্মোদ্যমের ইঙ্গিত অনুমান করা যাইতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের সময়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও একটা বিদ্রোহ পরবর্তীকালের অন্য বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ, দেখা যায়, সিপাহী বিদ্রোহ তখনকার বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহের অনলে ঝাপাইয়া পড়িতে অনুপ্রাণিত করে নাই কিন্তু নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে তাহারা নীরবে সহ্য করে নাই। বস্তুত পক্ষে এই অনভিপ্রেত, অন্যায় অত্যাচার বাংলার সমাজ-জীবনে একটা মঙ্গলজনক ফল আনয়ন করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় "নীলদর্পণ" নাটকে সাহেবদের অত্যাচারের নির্মম কাহিনী নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং ঐ অত্যাচারে অত্যাচারিত, ঔদ্ধত্যে উৎপীড়িত আমাদের চাষীভাই এবং তোরাপের ভয়শূন্য সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ চিত্র ও নীলদর্পণে দর্পণের মতই স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরাজীতে উহা অনুদিত করিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও তাহার নামের উল্লেখ ছিল না। পাদ্রী লঙ সাহেব ইংরাজী অনুদিত ঐ নীলদর্পণ পুস্তকখানি প্রকাশিত করেন। নীলকর সাহেবগণও নীরব না থাকিয়া আদালতে নালিশ জানাইলে লঙ সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় লঙ সাহেবের দেয় জরিমানার টাকা নিজেই জমা দেন। এখানে টাকা-ই প্রধান বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হইল, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশের সহস্র, সহস্র মানুষের জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ।

ওদিকে জনগণকে স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবোধের

ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে আর একটি মিলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার নাম 'হিন্দুমেলা'। মানুষের আত্মসম্মান জ্ঞান, মনুষ্যত্ববোধ এবং জাতির নব জাগরণ অর্থাৎ জাতির জীবন হইতে জড়তাকে দূরীভূত করিয়া নূতন চেতনায় সচেতন করাই ছিল উহার প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্যোক্তগণ কাপড় তৈয়ারী করিতে গিয়া গামছা তৈয়ারী করিয়া আনন্দে উহাই মাথায় করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং দেশলাই তৈয়ারী করিতে গিয়াও তাহারা যে সুষ্ঠুভাবে উহা তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা নহে কিন্তু তাঁহাদের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে-বিষয়ে তাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ঠাকুরবাড়ীর এই হিন্দুমেলা চলে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ভাবনাধারা তখন হইতেই ধারাবাহিক রূপে চলিতে থাকে। নবাব আবদুল লতিফ সাহেব বলিয়াছেন, "When I began my public life, the Mahommadan Community did not evince any cordial desire to seek intercourse with the Europeans or with the Hindoo fellow countrymen and it was with much difficulty that I succeeded in bringing about a favourable change in their feeling.

[বাংলার জাগরণ : কাজী আবদুল ওদুদ পৃঃ ১২৫]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরের' সিঞ্চনে জাতীয়তাবোধের অঙ্কুরিত বীজটি দিনে দিনে শশীকলার মত বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু বৃক্ষ শুধু জল সিঞ্চনেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, বৃক্ষের পুষ্টিসাধনে উন্মুক্ত আলো বাতাসেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। সে-আলোবাতাস ছিল ভারতীয় পবিত্রভূমির ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া। ভারতের বনে বনে কত যোগী, পর্বতের গুহায় গুহায় গুহাহিত কত ঋষি আজও পরম প্রাপ্তির আকাঙ্খায় আকাঙ্খিত একমুখী মন নিয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। দেবদেবীর যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেহ কেহ মহাযোগী, মহাসাধক হইয়াছেন। অনেক বিশ্বাসীর দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, জাতির মঙ্গল-অমঙ্গল এমন কি জগতের পরিবর্তন সাধন পর্যন্ত সেই সব পুণ্যবান যোগীদের ইচ্ছাধীন। তাঁহাদের একটি অঙ্গুলি হেলনে, যাহা আমাদের কাছে একান্ত অসম্ভব, তাহা মুহূর্তে সম্ভবে পরিণত হইয়া থাকে। থিওসফির ব্যাখ্যাতারূপে এ-স্থলে দুই একজনের নাম এবং তাহাদের অভিমত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এলেন ম্যাডাম ব্লাভাট্‌সকি আর কর্ণেল ওলক্ট্-এর বক্তব্য হইল : হিমালয়ের অগম্য প্রদেশে মহাযোগীরা আছেন, সেখান থেকে তাঁরা যোগবলে অথবা আত্মিক বলে জগতের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন আর মানুষের নতুন নতুন উন্নতি সম্ভবপর করছেন।

[বাংলার জাগরণ : কাজী আবুদল ওদুদ, পৃঃ ১৩৩]

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

—শিবনাথ শাস্ত্রী। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ২১১ বিধান সরণি। কলিকাতা-৬। মূল্য পঁচাত্তর পয়সা।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত শিবনাথ শাস্ত্রীর এই জীবনালেখ্য তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় ১৩২৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ধারাবাহিক জীবনচরিত নয়, শিবনাথের জীবনের আদর্শ ও মহৎ বিশেষত্বগুলির একটি আলোচনা। শিবনাথের সামাজিক ব্যক্তিত্বের অন্তঃশায়ী যে ব্যক্তিবিবেক, তারই উদ্ঘাটন। চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন—কোন্ অগ্নিতে জীবন প্রদীপ্ত হইলে তাহার এমন উজ্জ্বল আলো, এমন প্রতাপ, এমন প্রভাব হয়? সে কী শক্তি ছিল শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে, যাহাতে তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়া আসিতাম, যাহার বলে কত জীবন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ের মহৎ আকাঙ্ক্ষারাশি মথিত জলধির ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, অনুতাপের ক্রন্দনে মানুষ আকুল ও উচ্ছ্বসিত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়াছে?' শিবনাথের জীবনের সেই নেপথ্য উপকরণগুলি এই আলোচনায় দৃষ্টিগোচর করে তোলা হয়েছে।

এই আলোচনা অবশ্যই যথেষ্ট বিস্তারিত নয়, জীবনের পৌর্বাপর্য-সমন্বিত তথ্যসমূহ এখানে সঙ্কলিত হয়নি। কিন্তু শিবনাথের জীবনের নির্যাসটি যাতে যথাযথভাবেই উপস্থাপিত হয়, সেদিকে আলোচয়িতার লক্ষ্য সবসময়েই নিবিষ্ট থেকেছে। 'এমন পূর্ণাঙ্গ মানুষ অল্পই দেখিয়াছি'—তিনি লিখেছেন। এই পূর্ণাঙ্গতার সাধনায় যেমন উপার্জিত ঐশ্বর্যের সমাকলন আছে বর্জনের, আত্মবিসর্জনেরও ঐশ্বর্য। সতীশচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন—'আত্মবলিদান, আত্মোৎসর্গ, আত্মবিলোপ, শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনের সকল শক্তির উৎস। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁহার স্থান যে অতি গৌরবময়, সমাজসংস্কার কার্যে তিনি যে একজন অগ্রণী, দেশের মধ্যে তিনি যে একজন বাগ্মী ও জ্ঞাননায়ক, সমসাময়িক যুবকগণের মনুষ্যোচিত জীবনগঠনে তিনি যে একজন প্রধান সহায়, তাঁহার এ সকল গৌরব তাঁহার এই আত্মত্যাগের গৌরবের তুলনায় কিছুই নহে।' অন্যত্র তিনি উজ্জ্বল করে তুলেছেন শিবনাথের স্থিরলক্ষ্য আপাগোড়া-অবিমিশ্র প্রকৃতি লক্ষণ: 'অনেকে সাধারণ কথাবার্তার জন্য একরূপ কণ্ঠস্বর, ও উপাসনা উপদেশের জন্য আর একরূপ কণ্ঠস্বর অভ্যাস করিয়া থাকেন; শাস্ত্রীমহাশয় তাহা কখনও করেন নাই।' তাঁর ভিতরবাহিরের এই অনাহত সহজাত ঐক্যের বিবরণটি এই আলোচনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শিবনাথের নিজের লিপিবদ্ধ করে রাখা জীবনোপকরণগুলির পাশে এই রকম একটি অন্তরুদ্ভাসী মশালের যে অনিবার্য প্রয়োজন ছিল, এই আলোচনা পড়ার পরে স্বতঃই তা মনে হয়। ১৩২৬ সালের প্রকাশিত পত্রিকার পৃষ্ঠান্তরাল থেকে উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে এটিকে উপস্থাপিত করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশন-সংস্থা আগ্রহী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, সন্দেহ নেই। পরিশিষ্ট হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুহ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল গুপ্তের প্রাসঙ্গিক রচনা সংযোজিত হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

JAYASREE, Phone 46-4116, FALGUN 1376, MARCH 1970 Reg. No. C.4224

2 1APR 1970

ফুলের মত স্নিগ্ধ কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য

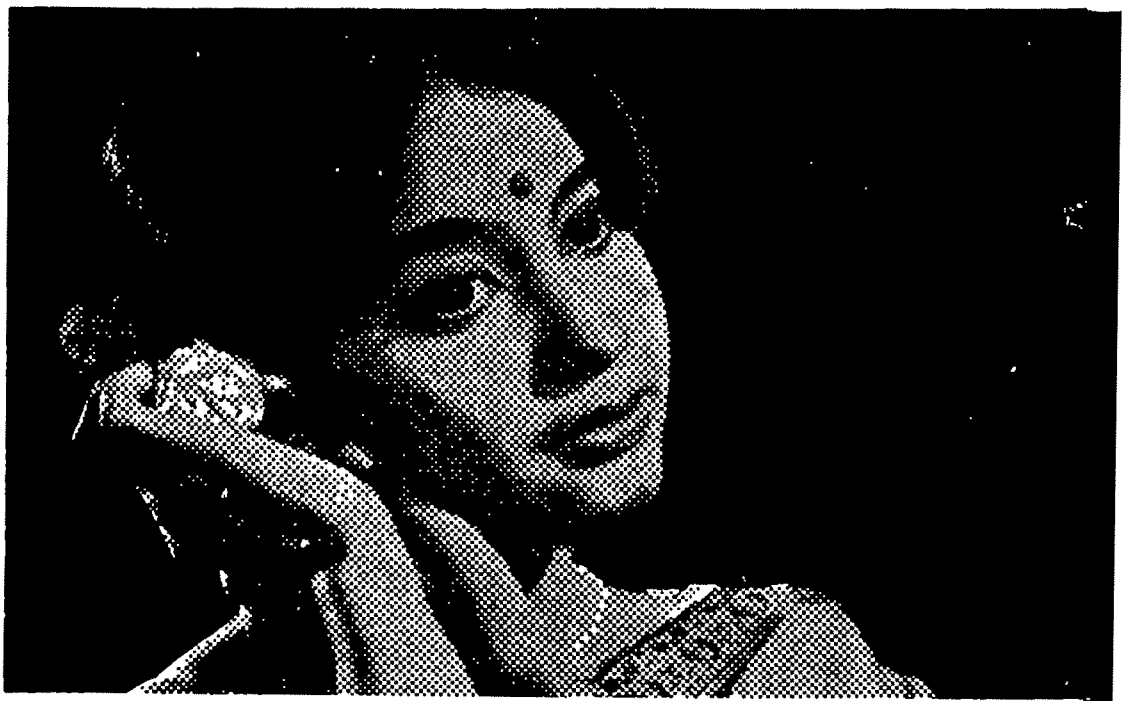

দিনের পর দিন
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
মেখেই হয়েছে

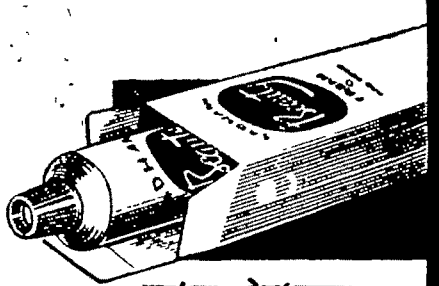

'সাধনা বিউটি ক্রীম' একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়
কলিকাতা-৩

Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. 1·00. with Postage Rs. 1·70
HEAD OFFICE : JAYASREE, 251A/32, Netaji Subhas Ch. Bose Road Calcutta-47

১৩৭৬
চৈত্র

জয়শ্রী

সম্পাদিকা :
লীলা রায়

সূচীপত্র

চৈত্র—১৩৭৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুভাষবাণী		৭৭১
সম্পাদকীয়		৭৭২
বিস্ফোরণ : (প্রবন্ধ)	কালীচরণ ঘোষ	৭৭৯
বন্দ আমার জননী আমার (স্মৃতিচারণ)	জাতক	৭৯২
সাবিত্রী (ধারাবাহিক উপন্যাস) অনুবাদ : পিনাকীপ্রসাদ ধর	পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে	৭৯৯
নিগ্রহ ও দণ্ডবিধানের ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)	কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	৮০৩
সাথী (গল্প)	নমিতা রায় চৌধুরী	৮০৮
পাঞ্চচিত্তি বা ইরাবতীর তীরে (ইতিহাস-বিবরণী)	বিভা সরকার	৮১৩
জাতীয়তার রূপায়ণ (প্রবন্ধ)	দীপঙ্কর	৮১৯
বর্ষসূচী		৮২৩

সম্পাদনা : সুনীল দাস

সহযোগী সম্পাদক

নিজে পড়ুন অন্যকে পড়ান

দর্পণ

(ইংল্যাণ্ড)

দুই বাঙলার বাঙালীদের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত ব্রিটেনের প্রথম বাংলা পত্রিকা। দুই বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহৃদয় যোগাযোগের প্রথম সেতু।

বার্ষিক চাঁদা : সডাক ৫·০০

গ্রাহক ও অন্যান্য বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন—

বাসবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

১, ঢাকুরিয়া স্টেশান লেন

কলিকাতা-৩১

নেতাজী প্রসঙ্গে ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গ্রন্থ

Netaji through German Lens

—a new discovery.

Nanda Mookerjee

8 00

What Netaji stands for

Anil Roy

0·50

Revolution what it is

Subhas Chandra Bose

0·25

বিপ্লব কি ? সুভাষচন্দ্র বসু 0·20

নেতাজীর বাণী : সংকলন 0 20

মাতৃমন্ত্র : দেশাত্মবোধক গানের সংকলন

কালীচরণ ঘোষ ১·৫০

Roll of Honour — a dictionary of Martyrs ! Kalicharan Ghosh

30·00

Jayasree Prakashan

20A Prince Golam Md. Road, Cal-26.

Distributor :

Jatiya Sahitya Prakashan

18A, Tamer Lane, Cal-9.

যে ক'টি সন্তান স্বচ্ছন্দে লালন পালন করতে পারবেন, ততটি সন্তানই হওয়া উচিত

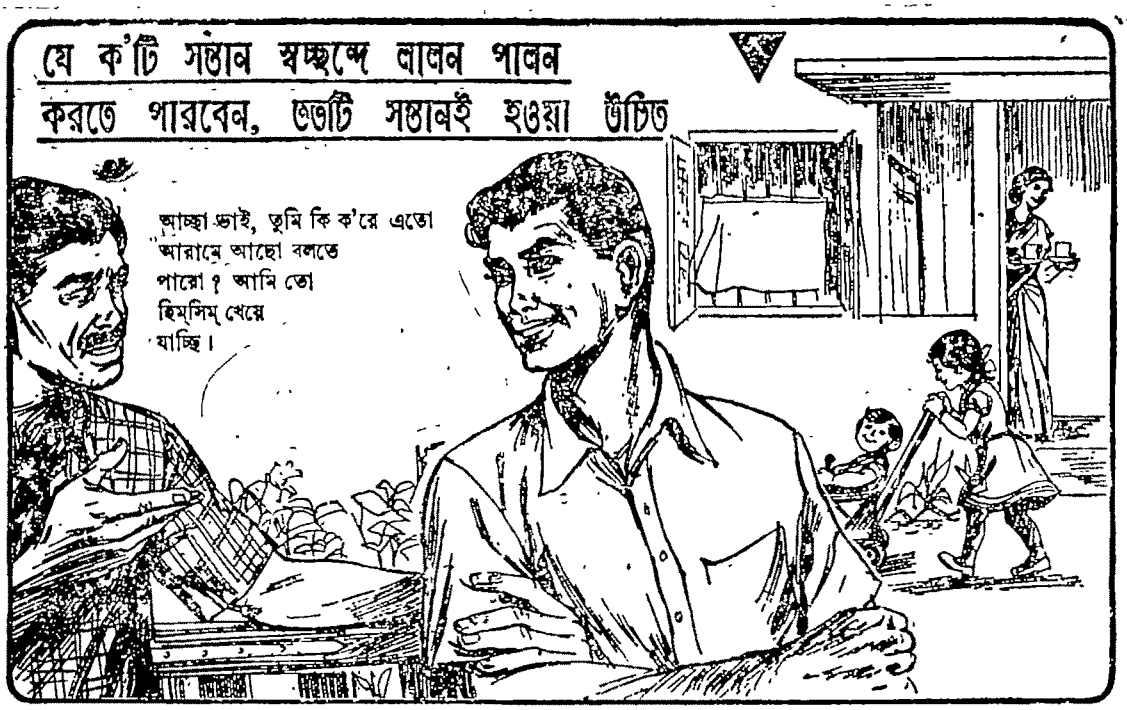

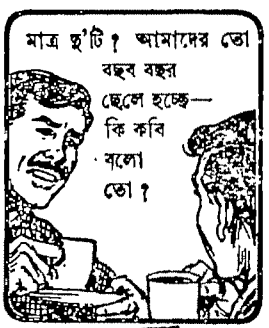

জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনার হাতেই রয়েছে।

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্য

উন্নত ধরণের রাবারের তৈরী জন্মনিরোধক

15 পয়সার 3টি

সরকারী সহায্যে হ্রাস মূল্যে

এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

মুদীর দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ ব্যবসায়ী, পানের দোকান—সবাইকার কাছ থেকে কিনতে পাওয়া যায়।

সুভাষচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

পবিত্রকুমার ঘোষ

মতামত

সুভাষচন্দ্র প্রথম খণ্ড পড়ে ভাল লাগলো। অন্যান্য জীবনী থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার পরিচয় দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন লেখক। এই পরিকল্পনা যথার্থ বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্র কবি, দার্শনিক বা ধর্মগুরু নন। তিনি দেশনেতা। তাই দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর নেতৃত্বের বনিয়াদ গড়েছে। সুতরাং তাঁকে জানতে হলে দেশ ও কালকেও জানা চাই। কবি এবং দার্শনিককে তাঁদের জীবনের মধ্যেই জানা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিস্তৃত জীবনীই তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারে।

এই প্রথম খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ জীবনীর যে আভাস পাওয়া গেল তা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। দেশ ও কালের প্রভাব কিভাবে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে লেখক তা সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে "শিবচেতনার জাগরণ" অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনারীতি বিষয় বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছাপা বাধাই সুরুচিসম্মত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'জাতীয় গ্রন্থাগার'

1970 সালই সেই পরম লগ্ন··· চরম মুহূর্ত্ত···· অবশ্য আপনি যদি ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের জমা কারী হয়ে থাকেন।·····4½% কর-মুক্ত সুদ চাইলেই পাবেন····· আপনাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। আপনার জমা টাকার (100টাকার গুণিতকে) একটি অংশ আলাদা (ব্লক্) করে 3 বছরের জন্যে রাখুন। এই আটকে—রাখা 100টাকা 3 বছরে 114টাকা হয়। আর যদি 2 বছরের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে 4½% সুদ পাবেন। আলাদা রাখা প্রতি 100টাকা 109টাকা হবে।

আর যদি একক, যৌথ বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এ্যাকাউন্টে বছর তামাম সর্বনিম্ন 100টাকা রাখা যায়, (100টাকার কম হলে কিন্তু চলবে না) তাহলে 4% হারে কর-মুক্ত সুদ পাবেন। এখন বলুন, শুভদিন কি ঘনিয়ে আসে নি?

জীবনের পরমলগ্ন

আজকাল সঞ্চয়ে বেশী লাভ

যে কোনও ডাকঘরে বা জাতীয় সঞ্চয় সংগঠকের কাছে বিশদ বিবরণী পাওয়া যাবে

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

dayp 70/30

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়শ্রী

৩৪ বর্ষ ০ দ্বাদশ সংখ্যা ০ চৈত্র ১৩৭৬

সুভাষ-বাণী

"...বিপ্লব সফল করে তুলতে হলে তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত যে উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এবং তৃতীয়ত বিপ্লবের পিছনে জনগণের সমর্থন থাকা আবশ্যক। বিপ্লব সফলরূপে আরম্ভ করতে হলে অন্তত নেতৃবৃন্দের মনে তাদের আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। আর বিপ্লবের সফল পরিণতির জন্য নেতাদের মনে বিপ্লবের পদ্ধতি সম্পর্কেও একটা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং জনগণের সমর্থন তাদের পাওয়া চাই-ই। যদি আদর্শ স্পষ্ট থাকে কিন্তু অবলম্বিত পদ্ধতি ভুল হয়, অথবা যদি পদ্ধতি ঠিক হয় কিন্তু আদর্শ অস্পষ্ট থাকে অথবা সুস্পষ্ট আদর্শ এবং উপযুক্ত পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও বিপ্লব যদি জনগণের সমর্থন লাভে সমর্থ না হয়, তবে এই তিনক্ষেত্রেই বিপ্লবের ব্যর্থতা অনিবার্য। সাফল্যের জন্য এই তিনটি জিনিষই অপরিহার্য।

[বিপ্লব কি? শীর্ষক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত]

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের হাসপাতালের সংজ্ঞাহীন দিনগুলি সাতাশ মাসের সীমানায় পৌঁছে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য কোনো পরিবর্তন নেই, মাঝে মাঝে হঠাৎ অবস্থার সাময়িক অবনতি হওয়া ছাড়া। সে-সময় মুখের ওপর শারীরিক গ্লানির ছাপ সুতীব্রভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু অন্য সময় মুখাবয়বে শারীরিক গ্লানির কোনো রেখাপাতই থাকে না। বরং মাঝে মাঝে মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্য সকলকে বিস্মিত করে দেয়। গত ১লা বৈশাখ সকালবেলা তাঁর উজ্জ্বল, শুভ্রমুখ দেখে মনেই হয় নি সাতাশ মাসের সংজ্ঞাহীন রোগী, যেন তিনি স্বচ্ছন্দ নিদ্রামগ্ন।

পি, জি, হাসপাতালে চিকিৎসার এবং সেবা-যত্নের আন্তরিকার কোনো ত্রুটি নেই। তবুও দেশের বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করানো যায় কি না সে চেষ্টা চলছে।

বিধাতার কাছে আমরা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা জানাচ্ছি।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৭০

পরিচালকমণ্ডলী

জয়শ্রী

অরাজকতার পূর্বাভাস

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগের অব্যবহিত পরেই পশ্চিম বাংলার জনজীবনে সন্ত্রাসের বিভীষিকা কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছিলো। দলীয় পতাকা ও ধ্বনিসহ, বল্লম, শড়কি, টাঙ্গি, বন্দুক, বোমা ইত্যাদি মারণাস্ত্রগুলি কয়েক দিনের জন্য গহ্বরে অপসারিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে নির্বিঘ্ন বোধ করছিল, শিক্ষায়তনগুলিতেও তাণ্ডবের রেশ অবসিত হয়েছিল। কিন্তু সে-মাত্র কয়েকদিনের জন্য। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে আবার অরাজকতার তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতির শাসনের গোড়া থেকেই রাজ্যপালের ভূমিকা বহুলাংশে এই অবস্থার জন্য দায়ী। রাজ্যপাল তার কর্মভার শুরু করেন যুক্তফ্রন্টের পুনরুজ্জীবনে প্রতিশ্রুত হয়ে এবং যুক্তফ্রন্টের পরিণামের জন্য যারা সর্বতোমুখী না হলেও নিঃসংশয়রূপে প্রধানত দায়ী, তাদের স্তুতিগান করে। তার অল্পকালের মধ্যেই এদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে কালক্ষেপণ করে সরকারী নীতি নির্ণয়ে এবং তৎপর প্রশাসনিক প্রয়োগ বিলম্বিত করেছেন। অতঃপর মুখ্যসচিবের নিয়োগে অবাঞ্ছনীয় বিতর্কের অবতারণা করে রাজ্যপালের পদমর্যাদা লঘু করেছেন এবং প্রশাসনে শৈথিল্য ও নিষ্ক্রিয়তা সঞ্চারণে সহায়ক হয়ে দায়িত্ব নেবার প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই প্রশাসনকে উদ্দেশ্যহীন, দৃঢ়তাহীন, দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছেন। এ কথা ঠিক যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে চৌদ্দদলের সঞ্জীবনে অদম্য উৎসাহের প্রতিক্রিয়াও প্রশাসনকে সংশয়াবিষ্ট করে তুলে থাকবে। তাদের মনের কোণে পুরাণো মনিবদের প্রশাসনে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা, পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতে যদি কিছুমাত্র স্থান পায়, সেক্ষত্রে তাদের পক্ষে গত তের মাসের অভিজ্ঞতার পর দোদুল্যমান হওয়া স্বাভাবিক এবং দৃঢ়হস্তে প্রশাসনের প্রয়োগে তারা অসমর্থ হবেন। রাজ্যপালের বাকসর্বস্ব ভূমিকা, কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে চৌদ্দ পার্টির যুক্তফ্রন্টের পুনরাগমনের প্রচার, ধ্বংসাত্মক ও অরাজকতাকামী শক্তি-গুলিকে উৎসাহ দিয়ে গোপন গহ্বর থেকে তাদের দিবালোকে প্রত্যাবর্তনে দুঃসাহসী করে তুলেছে এবং তার ফল যা হবার তাই হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের আমলে এই শক্তিগুলি কিভাবে দানা বাঁধবার অবাধ সুযোগ পেয়েছিলো, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর বোমা, বোমার মাল-মশলা, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানা পুলিসী তৎপরতার আবিষ্কারের মধ্যে। যুক্তফ্রন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই আবিষ্কারের জন্য কৃতিত্বের ক্ষীণ দাবী করে বলেছেন যে তার আমলেই 'বম্ব স্কোয়াড' গঠিত হয়েছিল। তা গঠিত হয়ে থাকলেও সেটা ছিল একান্ত লোক-দেখানো, অন্যথায় সে-আমলেই বোমা-বন্দুক পুলিসের হাতে ধরা পড়তো। বোমার কারবারীরা যাতে ধরা না পড়ে, পুলিসী নিষ্ক্রিয়তার তা ছাড়া অন্য কি উদ্দেশ্য ছিল?

রাজ্যপালের আমলে তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। যারা বিগত সরকারের আমলে পুলিসকে নিষ্ক্রিয় রেখে দলীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে একদলীয় শাসন পত্তনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তারাই পুলিসী অত্যাচারের আর্তনাদ তুলে প্রশাসনকে অচল করবার কৌশল নিয়েছেন। পুলিশের দিক থেকে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, পুলিশের রাশ অবশ্যই টানতে হবে। কিন্তু যেখানে পুলিশের ওপর আক্রমণ নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দক্ষ, কর্তব্যরত, সৎ পুলিশ অফিসারেরা আক্রমণের সুনিশ্চিত লক্ষ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে নিচ্ছে—যেমন সম্প্রতি কাশীপুর থানার অফিসারদের ভাগ্যে ঘটেছে, ইতিপূর্বেও যা ঘটেছে—সেখানে আত্মরক্ষার অধিকারের প্রয়োগ তাদের অবশ্যই করতে হবে। জনসাধারণকে পেছন থেকে পুলিশকে আক্রমণে প্ররোচিত করে, শেষে অত্যাচারিতের ভূমিকায় পুলিশের বিরুদ্ধে সরব অভিযোগ তুলে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করবার কৌশলের ফাঁদে এই সরকারও পা দিয়েছেন। কঠোর হস্তে অরাজকতা দমন করবার উদ্যোগ না নিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিপদ যে কত গভীরে তার পরিচয়ও দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করছে। শিক্ষায়তনের উপর আক্রমণ, গান্ধীজীর সঙ্গে জড়িত সব কিছুর উপর আক্রমণ, পরিবহনের উপর তড়িৎ আক্রমণ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। এর মধ্যে গান্ধীজীর ছবি, পুস্তক ও তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ সব চাইতে মারাত্মক। আসলে এই আক্রমণ ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবার প্রথম পদক্ষেপ। এই অশুভ প্রচেষ্টার সফলতা ভারতীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিকে আক্রমণের প্রবণতা যোগাবে। গান্ধীজীর রাজনীতির সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু মানুষের মত পার্থক্য রয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষ গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু গান্ধীজী যে জীবনাদর্শ রেখে গেছেন, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ভারতীয় ঐতিহ্যে যে সংযোজন রেখে গেছে, যে সংযোজন বিশ্ব-ঐতিহ্যে স্থানলাভ করেছে, তার প্রতি আঘাত সমস্ত মানবতাবাদের উপর আঘাত। এই আঘাতকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। কারণ ঐতিহ্যগত পরাজয় জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূলকে ধ্বসিয়ে দিয়ে বৈদেশিক আধিপত্যের পথ তৈরী করবে।

গান্ধীজীর স্মৃতির উপর আক্রমণ অলক্ষ্যে সেই বৃহত্তর আক্রমণের সূচীমুখ রচনা করছে। সমাজে যারা দুর্বল, অত্যাচারিত, শোষিত তাদের দ্রুত মানবিক এবং আর্থিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে ভারতবর্ষের আর্থিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন সাধনে অগ্রণী হতে হবে। অপর দিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নির্বিঘ্ন করতে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গে আজ সেই পরীক্ষাই চলছে। সীমান্তে চীন-পাকিস্তান, দেশের অভ্যন্তরে চীন-মার্কিণ-রুশ শিবিরের অনুচরেরা আর আর্থিক বৈষম্যের চাপে সমাজে শোষিতদের দুর্গতি। এই পরিস্থিতিতে জাতীয়তার নিরিখে সমাজ-পরিবর্তনের শক্তিগুলির সংহতি সাধন এবং কলুষমুক্ত জাতীয়তার আদর্শে প্রতিশ্রুত সৎ, দক্ষ ও দৃঢ় প্রশাসন—পশ্চিম বাংলার অরাজকতার পূর্বাভাসের মধ্যে পথ দেখাবে।

নেতাজী-রহস্য তদন্ত

অবশেষে ভারত সরকার আর একটি তদন্ত কমিশন বসিয়ে নেতাজীর দ্বিতীয়বার অন্তর্ধানের উপর আলোকসম্পাতে সম্মত হয়েছেন। প্রথমে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের চেষ্টায় ১৯৫৪ সালে শাহ নওয়াজ কমিশন বসিয়ে নেহেরু সরকার এই সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু শাহ নওয়াজ কমিশনের সিদ্ধান্ত দেশবাসী আদৌ মেনে নিতে পারে নি এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্তকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে মনে করেছে। এমন কি এই কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার বেশ কয়েক বছর পরও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো সুনিশ্চিত তথ্য নাই, এই অভিমত প্রকাশ করলেও আর একটি তদন্ত কমিশন বসাতে সম্মত হন নি। এবারকার লোকসভার- সদস্য শ্রীসমর গুহের ঐকান্তিক চেষ্টায় আর একটি তদন্তে বর্তমান সরকার সম্মত হয়েছেন। এই বিলম্বিত সম্মতি কি সত্যই নেতাজী-রহস্য উদ্ঘাটনে আন্তরিকতার স্বাক্ষর বহন করছে না কালের অতিক্রমণে দলিল, সাক্ষ্য ইত্যাদির অভাব এই তদন্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে, এই ভরসায়ই কি বর্তমান সরকার পঁচিশ বছর পর আর একটি তদন্তে সম্মত হয়েছেন?

পুনরায় উদ্বাস্তুর স্রোত

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুনরায় দলে দলে উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বাংলায় আসছে। এই নূতন স্রোত সুরু হয়েছে যশোহর-খুলনা জেলা দিয়ে এবং শোনা যায় পূর্ববাংলার অবশিষ্ট হিন্দুরা এবার সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসবে। এবারকার উদ্বাস্তু আগমনের কারণ নির্ণয়ে জানা গেলো গ্রামের সংখ্যালঘুরা আর এক দফা অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে ঘর-বাড়ী-জমি-জমা ছেড়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে এ-পারে চলে আসছেন। দেশত্যাগের আশু কারণরূপে মেয়েদের উপর অত্যাচার, ডাকাতি, ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি আগত উদ্বাস্তুদের মুখে শোনা গেছে। কিন্তু ১৯৬৪র চূড়ান্ত অত্যাচারের পর আবার এই নূতন স্রোত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, বিশেষভাবে এই কয় বছরে পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন এক তীব্রসচেতনতা সাংগঠনিক রূপ নিয়েছে,—যে সাংগঠনিক প্রকৃতি মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলায় প্রবলভাবে সঞ্চারিত করেছে। বর্তমান উদ্বাস্তু স্রোত সেই অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব, সংগঠন ও মানসিকতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অভিযান কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হলেও পূর্ববাংলার এই সর্বশেষ সংখ্যালঘু বিতাড়ন পাকিস্তানে আগামী ৫ই অক্টোবর বয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হবে, তারই সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক যে রয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পাকিস্তানের নূতন সংবিধানের কাঠামোতে সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ববাংলার প্রতিনিধিদের

সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা, মুজিবর রহমান এবং তার দল আওয়ামী লীগের অ-সাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতির প্রাধান্যদানের সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রাধান্য ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের উন্নতি বিধানের সহায়কও হবে। এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীলরা, পুঁজিপতিরা, সামরিকতন্ত্রীরা, অন্ধ সাম্প্রদায়িকরা এবং কট্টর চীনপন্থীরা ক্রমে ক্রমে একত্রিত হবে। তারই প্রথম পদক্ষেপ সংখ্যালঘু বিতাড়ন। কারণ, এরা মুজিবর রহমান এবং তার রাজনীতির সমর্থক। মুজিবরের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করতে পূর্ববাংলা থেকে সংখ্যালঘু উৎসাদন প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি প্রাথমিক কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করে থাকেন তবে অবাক হবার কিছু নেই।

সামরিক সন্ত্রাস

সম্প্রতি ভারত সরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিবরণী লোকসভায় উপস্থাপিত করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের ধারণা ভারতবর্ষের বর্তমান সামরিক প্রস্তুতির মুখে চীন ও পাকিস্তানের যৌথ আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সক্ষমতার দাবী রাখে। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী ৮,২৮,০০০ হাজারে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ৪৫ স্কোয়াড্রন বিমানবাহিনী সজ্জিত করা হয়েছে, সাবমেরিনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে, বিমানবাহী জাহাজ রয়েছে, এই দেশে পৃথিবীর যে কোনো দেশের ট্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনীয় ট্যাঙ্ক তৈরী হচ্ছে এবং সমরাস্ত্র উৎপাদনে ক্ষিপ্রগতিতে ভারতবর্ষ অগ্রসর হচ্ছে। অতি আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত সামরিকবাহিনীর সংখ্যার চাইতে ভারত সরকার তাদের প্রয়োগিক তৎপরতার উপর নজর দিচ্ছেন।

প্রতিরক্ষার এই সন্তোষজনক ব্যবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সমরসজ্জা এবং চীনের সমরায়োজন এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী শক্তিগুলিকে প্ররোচনা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে। চীন তিব্বতে প্রায় ১,৩০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রেখেছে, মনখুম থেকে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের কুঞ্জেরাব পর্যন্ত চীনা শ্রমিকদের সাহায্যে শড়ক নির্মাণ করেছে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে চীনা সেনানীরা গেরিলাযুদ্ধের শিবির পরিচালনা করছে। পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে এমনি একটি শিবিরে মিজোদের শিক্ষা চলছে, পশ্চিম বাংলার চীনপন্থীদের ও এই শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা রয়েছে।

এছাড়া আমেরিকা, সোভিয়েত, ফ্রান্স এবং চীন সকলেই পাকিস্তানী সমরসজ্জার আয়োজনে শক্তি সঞ্চার করেছে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার সূত্রে পাকিস্তান ১৫০ থেকে ১৭০ কোটি ডলারের সমরাস্ত্র পেয়েছে সে-সময় পাকিস্তানের সমরাস্ত্রের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগই আমেরিকা যোগান দিয়েছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে আমেরিকার অস্ত্রযোগানের নীতি নূতন রূপ নিলে দেখা গেলো, আমেরিকার মারণাস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ রইলো এবং তৃতীয় কোনো দেশের সাহায্যে ভাটোর সমরাস্ত্র পাকিস্তানে বিক্রি করা চলবে না। এর আশু ফল হল ১৯৬৫-র যুদ্ধে বিধ্বস্ত পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক এবং বিমান মার্কিনী সাহায্যে মেরামত হয়ে গেলো এবং এই নীতি ভারতের কোনো সাহায্যেই এলো না, কারণ যুদ্ধে ঘায়েল মার্কিনী ট্যাঙ্ক ভারতের হাতে ছিলো না, বিমানও প্রায় ছিল না বল্লেই চলে। তুর্কীর মারফৎ ২০০ মার্কিনী ট্যাঙ্ক পাকিস্তানের হাতে পৌঁছাবার উদ্যোগ হয়েছে। ভারতীয় প্রতিবাদে আপাতত তাকে রোখা গেলেও—এই ট্যাঙ্ক বহর পাকিস্তানের হাতে পৌঁছাবেই।

চীনও দরাজ হাতে পাকিস্তানকে সাহায্য করছে। প্রচুর চীনা অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানের হাতে পৌঁচেছে; দুইটি পদাতিক

ডিভিশন তৈরী করবার সমস্ত উপকরণ চীন পাকিস্তানকে দিয়েছে, ৩৫০ টি ট্যাঙ্ক, ১২০টি মিগ বিমান, দুই স্কোয়াড্রন বম্বার, গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য বড় বড় সরঞ্জাম, সাঁজোয়া গাড়ী, যন্ত্রপাতি, এবং সামরিক সজ্জা ক্রয়ের জন্য নগদ টাকা চীন পাকিস্তানকে দিয়েছে। পাকিস্তানের এক্তিয়ারে সাবমেরিনও পৌঁচেছে।

তাসখন্দ চুক্তি সত্ত্বেও সোভিয়েটের সামরিক সাহায্য পাকিস্তানে অবাধে পৌঁচেছে। গতবছরের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫০টি Tu-54 এবং Tu-55 সোভিয়েট ট্যাঙ্ক, বহু ১৩৩ মি-মি কামান, রাডার যন্ত্র, গোলাগুলি এবং নানা সামরিক উপকরণ সোভিয়েত পাকিস্তানকে পৌঁছে দিয়েছে।

সোভিয়েত রুশ ও মার্কিন রাষ্ট্রের কাছে ভারতীয় প্রতিবাদ বার বার অগ্রাহ্য হয়েছে এবং ভারতবর্ষই পাকিস্তানের বিঘোষিত একমাত্র শত্রু হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানকে অবাধ সমরাস্ত্র সরবরাহ করে এই দুই রাষ্ট্র ভারতীয় উপমহাদেশে সামরিক ভারসাম্য সুপরিকল্পিতভাবে বিধ্বস্ত করে ভারতবর্ষকে বিপন্ন করে তুলেছে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে তার বিষময় পরিণতিরূপে পাকিস্তানের সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে।

এপোলো ১৩র সঙ্কট

শেষ মুহূর্তে একজন মহাকাশচারীকে পরিবর্তন করে গত ১১ই এপ্রিল তৃতীয়বার চন্দ্রাভিযানের উদ্দেশ্যে এপোলো মহাকাশযানের আর একটি যাত্রা শুরু হয়। এই তৃতীয় অভিযানে চন্দ্রকক্ষের উপান্তে পৌঁছে এপোলো ১৩ মহাকাশযানটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং অকস্মাৎ সঞ্চিত অক্সিজেন ও বিদ্যুৎশক্তি দ্রুত হ্রাস পেয়ে মহাকাশচারীদের চাঁদে অবতরণ দূরে থাকুক পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে গুরুতর সংশয় সৃষ্টি করে। মহাকাশযানের তিনটি অংশের সার্ভিস মডিউলটি কোনো অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘ হওয়ার ফলে এই বিপর্যয় ঘটে। ফলে কম্যাণ্ড মডিউল বা মূল মহাকাশ যানটিও বিদ্যুৎ এবং অক্সিজেনের অভাবে প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট বিদ্যুৎ, অক্সিজেন, ও জল সংরক্ষণ করে কম্যাণ্ড মডিউলটিকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য সক্ষম ও সক্রিয় রাখবার উদ্দেশ্যে এই মূলযানটিকে একেবারে শুদ্ধ করে অধিনায়ক লোভেল তার দুই সঙ্গী নিয়ে চাঁদের ভেলা বা লুনার মডিউলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ক্ষুদ্রযানটির রকেটের সাহায্যে চাঁদের অপর পিঠ পরিক্রমা করে পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরে অবতরণের জন্য কঠিন মানসিক ও কারিক সংগ্রাম শুরু করে। ১৪ই এপ্রিল এই দুর্ঘটনার প্রারম্ভ থেকে ১৮ই এপ্রিলের ভোররাত্রি পর্য্যন্ত এই অভিযাত্রীরা মহাকাশের নিঃসঙ্গতায় মৃত্যুর সঙ্গে নিঃশব্দ সংগ্রামে যে স্থৈর্য, ধৈর্য, সাহস ও যান্ত্রিক কুশলতার সঙ্গে কম্যাণ্ড মডিউলটিকে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং এই প্রত্যাবর্তনে হাউসটন মহাকাশ কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা ও কয়েক সহস্র কর্মী যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, ও আত্মনিবেদনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন তা একদিকে যেমন বিজ্ঞানের বিস্ময়, আর একদিকে তেমনি মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কর্তব্যনিষ্ঠার ও দুর্লভ শক্তির স্বাক্ষর বহন করে এনেছে। আমরা এই তিন মহাকাশচারীকে এবং হাউসটনের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই। সমগ্র বিশ্ব এদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে উদ্বেল হয়ে উঠে বিশ্বমানবের একাত্মতা সপ্রমাণ করেছে। এই দুর্ঘটনার কারণ নির্ণিত না হওয়া পর্যন্ত এপোলো অভিযান মুলতুবী থাকবে এটাই সকল দেশের সকল স্তরের মানুষ একান্তভাবে আশা করবে।

কেরলে মার্ক্সবাদীদের পরাজয়

মার্ক্সবাদীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা নাম্বুদ্রিপাদের কেরলে, তাদের লাঞ্ছনা কেবলই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই লাঞ্ছনা জুটছে আর কারো হাতে নয়, তাদের বাঞ্ছিত গণদেবতাদের হাতে। প্রায় আড়াই বছর শাসনের পর মার্ক্সবাদীদের ধারণা

হয়েছিলো কেরল তাদের অসপত্ন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে এবং এই দুর্ভেদ্য দুর্গে যেই মাথা ঠুকুক না কেন গণদেবতার আসনে তারা অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে থাকবেন। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল কোণ ঠাসা হয়ে মাদুরিপাদের পদ-ত্যাগের অল্পকালপরেই। অচ্যুত যেমন সরকার ভূমি সংস্কার আইনের ক্ষিপ্র প্রয়োগে মার্ক্সবাদীদের কৃষক-ক্ষেপানো নীতি ব্যর্থ করে দিলেন এবং মার্ক্সবাদীদের দুষ্কৃতি যে পরিমাণ অন্তঃসলিলা গণবিক্ষোভের সূচীমুখ তৈরী করে রেখেছিল, সেই পরিমাণে প্রকাশ্যে জনসাধারণ তাদের বিরোধিতায় নেমে এলো। কোট্টারাকনারায় ও নীলাম্বুরের নির্বাচনে তারই পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথমটিতে অচ্যুত যেমন ৪৪,৪৭২ ভোট পেয়ে মার্ক্সবাদী সমর্থিত শঙ্করনারায়ণ নায়ারের ১৮,৪০৯ ভোটকে অনেক পেছনে ফেলে এলেন এবং নীলাম্বুরে শাসক কংগ্রেসের গঙ্গাধরণের কাছে (৩০,৮০২) তাদের প্রার্থী আবু বকর (২৫,২২৮) বিপুল ভোটে পরাজিত হোলো। কেরলের এই পরীক্ষার পরও পশ্চিম বাংলায় মার্ক্সবাদীদের নিয়ে আবার চৌদ্দ দলের ফ্রন্ট গড়বার কথা উঠছে। এটা কিসের ইশারা। দেশের বাইরের ইঙ্গিত না সকল মার্ক্সবাদীদের সংহতিবিধানের প্রয়াস। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের পথে যে-ই পা বাড়ান না কেন, তাদের পরিণতির সম্ভাবনা তারা যেন ভুলে না যান।

লেনিন শতবার্ষিকী

ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর আবেদন বিশ্ব-মানুষের দুয়ারে রাজনৈতিক সাম্য-স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে জনমানসে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তারই পরিণতিতে বিশ্বমানবের বন্ধনমুক্তির জোয়ার অর্থনৈতিক অসাম্যের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হয়ে আর একটি মহৎ বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করেছিলো। সে-বিপ্লব হবে শিল্পপ্রধান দেশে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ সচেতনায় অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার অর্জনে নানা সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। এই বিধান দিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে বিপ্লবের তাত্ত্বিক কার্ল-মার্কস। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হোলো। পরাক্রান্ত জারের অনগ্রসর রুশ দেশে অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিপ্লবের আর এক পুরোহিতের আবির্ভাব হোলো। ১৯১৭ সালে সমাজবাদী সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা কার্লমার্কসের তত্ত্বশিষ্য আর এক নেতা সাম্যের প্রতিশ্রুতি সহ সার্থক বিপ্লব পরিচালনার গৌরব নিয়ে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেই দুর্লভ নেতৃত্বের অধিকারী লেনিনের শতবার্ষিকীপূর্তি গত ২২শে এপ্রিল বহুদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিপ্লবের স্থপতি লেনিনের মানবিক মূল্যবোধগুলি তার অবর্তমানে যান্ত্রিক মূল্যবোধে পর্যবসিত হয়ে সোভিয়েত রুশের নাগরিক জীবনে একনায়কতন্ত্রের সন্ত্রাসের মুখে তার সেরা সহকর্মীদের সঙ্গে হাজার হাজার নিষ্ঠাবান বিপ্লবী ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসকারা কার্লাইলের সেই অমোঘ বাণীর 'বিপ্লব তার সন্ততিদের, গ্রাস করে' ('Revolution devours its own children') যাথার্থতা সপ্রমাণ করেছে। ষ্টালিন সেই ঘাতকের ভূমিক গ্রহণ করেছিলেন হয়তো বা এই কারণেই লেনিন তাঁর শেষ রাজনৈতিক দলিলে ষ্টালিনের নির্মমতা লক্ষ্য করে তাকে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অপসারণের জন্য বলে গিয়েছিলেন।

বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রুশে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি মানুষের বিলুপ্তির যে রক্তাক্ত অধ্যায়গুলি রচিত হয়েছে আজও সোভিয়েত রুশে সেই রক্তস্নাত অধ্যায়ের উত্তরণ সম্ভব হয় নাই তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি-সাহিত্যিকদের উপর রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নে, স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন মতের, মনের

মুক্তির লাঞ্ছিত অবদমনে ও সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির একাধিপত্য বিস্তারের সামরিক উদ্যোগে। এই দুই দিকেই সোভিয়েত রুশ প্রতিহত হয়েছে, রুদ্ধকণ্ঠ রুশ কবি-সাহিত্যিকদের আর্তনাদ বাইরের পৃথিবীতে যেমন এসে পৌঁচেছে তেমনি যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, ইতালী চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট দলের এবং চীনের সোভিয়েত শক্তির একাধিপত্যের বিরোধিতায়। কিন্তু রুশ বিপ্লবের নানা স্খলন, বিভ্রান্তি এবং স্বৈরাচারী পরিণতি সত্ত্বেও মানুষের রাজনৈতিক সাম্য-স্বাধীনতার বাণী যেমন ইতিহাসে পথনির্দেশ করে গেছে, তেমনি আর্থিক সমতার প্রতিশ্রুতি রুশ বিপ্লব বহন করে এনেছিলো, যে বিপ্লবের শীর্ষদেশে লেনিনের স্থান চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে।

রুশ বিপ্লব মানুষের জীবনে যে অপূর্ণতা রেখে গেছে, সাম্য ও স্বাধীনতার সমন্বয়ের অপূর্ণতা, মানুষের জীবনে একদেশদর্শিতার অপূর্ণতা, বস্তু ও চেতনের সমন্বয়ে অপূর্ণতা, ভারতবর্ষের আগামী বিপ্লব সেই পূর্ণতা সাধন করবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই বিপ্লবেরই পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। লেনিনের শতবার্ষিকীতে ভারতবাসীকে তা স্মরণ রাখতে হবে।

২৮. ৪. ৭০

গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ

সম্প্রতি আমরা নানা জনের নিকট শুনতে পাচ্ছি তাঁরা নিয়মিত পত্রিকা পাচ্ছেন না। অভিযোগটি মৌখিক বা লোক মারফৎ পেশ না করে জয়শ্রী দপ্তরে লিখিতভাবে জানালে দপ্তরের কাজের সুবিধা হয়। আশাকরি ভবিষ্যতে আমাদের কাজের সুবিধার্থে সকলে এ বিষয়ে জয়শ্রী দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়ে সহযোগিতা করবেন।

কার্যাধ্যক্ষ
জয়শ্রী

চাঁদা শেষের বিজ্ঞপ্তি

চৈত্র, ১৩৭৬, যাঁদের চাঁদার মেয়াদ শেষ হয়েছে বৈশাখ ১৩৭৭র জয়শ্রী প্রাপ্তির পূর্বে তাঁদের দেয় চাঁদা প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব। নচেৎ বৈশাখ সংখ্যা ভি, পি, করে পাঠানো হবে না।

কার্যাধ্যক্ষ
জয়শ্রী

বার্ষিক চাঁদা ১০·০০ ষাণ্মাসিক ৫·০০
জয়শ্রী : ২৫১ এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৪৭

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লব ইতিহাস
ধারাবাহিক রচনা

বিস্ফোরণ

কালীচরণ ঘোষ

United Friends Club

"স্বদেশী যুগে" অনেক আখড়া স্থাপিত হয়েছিল, এবং মুখ্যতঃ স্বাস্থ্যচর্চ্চাই লক্ষ্য। সবই যুবকের সঙ্ঘ সুতরাং তাদের অনেকেই ক্রমে জাতীয়তার মন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। জোড়াসাঁকোর এই শ্রেণীর যে সমিতি গড়ে ওঠে তার নাম ছিল ইউনাইটেড্ ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্র নাথের কারাদণ্ড হলে (২৪. ৭. ১৯০৭) নানাস্থানে সভা সমিতি করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছিল। বিডন স্কোয়ারে আহূত এক সভায় পুলিশ থেকে এক বক্তাকে বক্তৃতাদানে বাধা দেয়। প্রথম বচসা, পরে দাঙ্গা। ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস ক্লাবের ছেলেরা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। সঙ্গে দর্জিপাড়া অনুশীলন সমিতি যোগ দেয়। পুলিশের সঙ্গে মারামারিতে উভয় দলের যশঃ ক্ষুণ্ণ হয়নি। পুলিশ বুঝেছিল যে ছেলেরা ক্ষেপেছে; আর যখন তখন এলোপাথাড়ি মার দেওয়া চলবে না।

এই শ্রাদ্ধ গড়ায় অনেক দূর। ক্লাবের সভ্যরা এক ফিরিঙ্গি সার্জ্জেণ্টকে পাকড়াও করে এবং তার আচরণের শাস্তিস্বরূপ তার একখানা হাত কেটে ফেলে। ফলে ৫ নং দীন রক্ষিত লেনের সত্যচরণ দাঁর নামে মামলা ওঠে এবং হাইকোর্টে ১৯০৭ ডিসেম্বর ১১ই তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

'মুরারি পুকুর বাগান'

বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের প্রথম পর্য্যায় কাটবার পর ক্ষেত্র বাড়িয়ে বিপ্লবীদল হাত পাকাবার জন্য নানা পরীক্ষা যে চালিয়ে যাচ্ছিল তার প্রমাণও কোনো কোনো ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। সে সকলের কথা বিবৃত করবার আগে আলিপুর ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। মাণিকতলা বা মুরারি পুকুর বাগান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বাঙ্গলার বিপ্লব কোন্ পথ নিচ্ছে, কারা এর মূলে আছে, উদ্দেশ্য তাদের কি, বিপদের গুরুত্ব কতখানি, উদ্যোক্তাদের মানসিক অবস্থা, কতদূর বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তারা নেমেছে, ইত্যাদি তত্ত্বগুলি এই ব্যাপারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রকৃত পক্ষে এটি বাঙ্গলার সশস্ত্র বিপ্লবের মূলকেন্দ্র এবং সেখান থেকে বে-পরোয়া বিপ্লবী মনোভাব চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। গভর্ণমেণ্ট ও বুঝতে পারে, এ নিতান্ত ছেলে খেলা নয়। নিরীহ 'গো-বেচারা' অগ্নিগর্ভ বাঙ্গালী মন উত্যক্ত হলে, আত্মসম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর এবং দেশপ্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে পারে।

বিরাট ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে উপেক্ষণীয় অভিযান। তবুও সামান্য কয়টি "বোমার আসামী" পরবর্ত্তী কালে বিপ্লবী যুবকদের মনে সাহস যুগিয়েছে, মনোবল ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির

পরিচয় দিতে শিক্ষা দিয়েছে ; অসাধ্য সাধনে কৃতসম্পন্ন করে ছেড়েছে। তারা পথ দেখিয়ে গেছে আর সেই রক্ত রাঙ্গা রেখা ধরে বছরের পর বছর বাঙ্গলা মায়ের বীর যোদ্ধাদল অকুতোভয়ে জেল, কালাপানি আর ফাঁসীকে আলিঙ্গন জানিয়েছে।

দেওঘর : প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

মানিকতলা বাগানে কেন্দ্র খোলবার আগে থেকেই তোড়জোড় চলছিল নানা রকম, তার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন বোমা প্রস্তুত ছিল অন্যতম লক্ষ্য। এর জন্য দেওঘরের কাছেই জঙ্গ একটা ঘাঁটি খোলা হয়েছিল। সেখানে বোমা তৈরী করতে লেগে গেলেন উল্লাসকর দত্ত। তার শক্তি সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোনো ধারণা করার মত অবস্থায় এসে পৌঁছাননি অনেক দিন। অবশেষে বোমা নির্মাতা বল্লেন যে তাঁর গবেষণা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার পরীক্ষা প্রয়োজন।

প্রয়োগ করার যায়গা স্থির হ'ল দেওঘরেরই কাছে লতা গুল্ম ঢাকা অনুচ্চ দিঘিরিয়া পাহাড়। সেখানে গেলেন স্বয়ং উল্লাসকর আর সঙ্গী চারজন হলেন রঙ্গপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, বারীন্দ্র, নলিনীকান্ত গুপ্ত আর বিভূতি সরকার। পাহাড়ের মাথায় "একটা প্রকাণ্ড পাথর দেখা গেল—একদিক খাড়া উঁচু, বুক প্রমাণ হবে, আর একটা দিক ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে চলে গেছে বিশ পঁচিশ হাত। প্ল্যান হল; প্রফুল্ল ছুঁড়বে খাড়া দিকটার আবডালে পিছনে দাঁড়িয়ে ঢালুটার ওপর তাক করেই, ছুঁড়ে বসে পড়বে যাতে ফাটার পরে কোনো টুকরো গায়ে না লাগে।" (নলিনী কান্ত গুপ্ত : স্মৃতির পাতা, ১৩৭০, পৃঃ ৪৩)। ঘটনা ঠিক এ রাস্তা নিল না। প্রফুল্ল বোমা ছুঁড়েছিল, মনে করেছিল বোমা ভূমিতে পড়ে ফাটবে। কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং বোমার টুকরো এসে প্রফুল্লর মাথায় ডান দিকটায় দারুণ আঘাত করে আর মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। অশুভ সেদিনটা ছিল ১৯০৮ জানুয়ারী ২৯-এ।

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর অপঘাত মৃত্যু দিয়ে যাত্রা শুরু। বোমার বিস্ফোরণ এই প্রথম এবং তাই দিয়ে হ'ল বিপ্লবীর জীবনান্ত। অমূল্য তার দান। এ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখেছেন : 'আমাদের একটি ছেলে বোমা ফাটিয়া মারা পড়ে। আমাদের যতগুলি ছেলে ছিল, তার মধ্যে সেইটিই বোধ হয় সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে, যে তাহাকে দেখিয়াছে, সেই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই।' রঙ্গপুরের জজকোর্টের পেস্কার ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র। স্থানীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় প্রফুল্লর একটা অংশ ছিল, এবং মানিকতলা ষড়যন্ত্রে তার নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে যায়। তার খোঁজে পুলিশ বাঙ্গলার বহু জেলা তোলপাড় করেছে; তাকে ধরবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে কিন্তু প্রফুল্ল তখন সকল ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। পুলিশ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ঐ সাংঘাতিক লোকটি বাইরে থাকলে কিছু অঘটন ঘটাতে পারে। খোঁজাখুঁজি সমানে চলেছে ও অন্যদিকে বোমার মামলার আয়োজনও হচ্ছে। পুলিশের গোপন অনুসন্ধানের ফল অতি উচ্চ দপ্তরে জ্ঞাত করা হয়। তার পূর্ব পর্য্যন্ত সকলেই মনে করতো—গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত, প্রফুল্ল সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে গেছে। এটি মানিকতলা ষড়যন্ত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লর মৃত্যু বিপ্লবীদের নিরুৎসাহ করতে পারেনি। মানিকতলা কেন্দ্র গড়ে ওঠার সামান্য আগে ও পরেই চন্দননগরের মেয়রের ঘরে বোমা ফেলা, সেখানে রেললাইন ধ্বংস করার চেষ্টা, নারায়ণগড়ে ছোটলাট হত্যার পরিকল্পনা ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা, সবই এই দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কটি জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

ক্ষুদিরাম—প্রফুল্ল

কাজি কিংসফোর্ডের নাম গ্রহণ না করে বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাস লেখা যায় না; যেমন যায় না লাট কার্জনকে বাদ দিয়ে। কলকাতায় কাজিকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। মোটা বই এর পাতার মাঝখান কেটে গর্ত করে (book bomb) তার মধ্যে বিস্ফোরক ভর্ত্তি করবার পর তাঁর বাসভবনে পাঠানো হয়েছিল। বইখানার দড়ির বাঁধন খুললেই স্প্রীং ঠিকরে উঠলে বোমা ফাটবে এবং তাতেই কাজির জীবনান্ত ঘটবে। কপালে তার মরণ নেই তাই সে বই আর খোলা হয়নি। সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে কাজি মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান। রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তিতে খবর পেয়ে পরে পুলিশ সেখানে বইখানি খুঁজে পেয়ে তার মধ্যে বোমা আবিষ্কার করে।

বাঙলার বিপ্লবী সংস্থা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সুতরাং সেই নির্দেশ অনুযায়ী তার পিছনে ছুটে চলেছে যমের দূত। ১৯০৮ মার্চ্চ ২৮-এ কিংসফোর্ড কলকাতা হতে বদলি হয়ে যান।

কলকাতা থেকে পাঠানো হ'ল নেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু আর রঙ্গপুরের দীনেশচন্দ্র রায়কে (ওরফে প্রফুল্ল চাকী) তাঁরা ১৯০৮ এপ্রিলের ১৭।১৮ তারিখ নাগাদ মজঃফরপুর পৌঁছান এবং এক ধরমশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ কাজে প্রধান সহায় হয়েছিলেন কিশোরীমোহন বন্দোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে এপ্রিল ২০-শে কুড়িটাকার যে মণি অর্ডার গিয়েছিল ধরমশালার ঠিকানায়, সে টাকা তাঁর হাতে পড়ে (পোষ্ট অফিস মারফত) এবং তিনি সে টাকা প্রফুল্লকে দেন। এর জন্য পরে কিশোরীর নামে দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল (মে ৩০এ)। কিন্তু ১৯০৮ জুন ১৩-ই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

দিন যায়; কিংসফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করতে সপ্তাহ গড়িয়ে এল, ঠিক সুযোগ হচ্ছে না। অথচ কার্য্যোদ্ধার না করে তারা ফিরেও যেতে পারে না; "মন্ত্রের সাধন" হ'ল প্রতিজ্ঞা। অচেনা জায়গায় সব খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করা সহজ নয়। এটা বোঝা গেল, কাছারি যাওয়া আসা ছাড়া কাজি তার বাসা থেকে প্রায়ই বার হননা। কাছারিতে (এজলাসে) হত্যা করা যেত, কিন্তু অনেক নিরীহ প্রাণী হতাহত হবে বলে কিছু করা হয়নি।

শিকারের খোঁজে দুই বন্ধু সতর্ক হয়ে রয়েছে। কিংসফোর্ডের গমনাগমন লক্ষ্য করা একটা বড় কাজ। কোয়ার্টারের কাছেই ইয়োরোপীয় ক্লাবে কিংসফোর্ড তাস খেলতে যান। ১৯০৮ এপ্রিল ৩০-এ তাঁর খেলার সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় বড় উকিল কেনেডির পত্নী ও কন্যা। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় খেলা শেষ হলে এঁরা কিংসফোর্ডের ঘোড়া-টানা গাড়ীর মত অবিকল দেখতে একটা 'ভিক্টোরিয়া' চড়ে তাঁদের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। অল্প দূরত্বের ব্যবধানে কিংসফোর্ডের গাড়ী পিছনে আসছিল। কেনেডির গাড়ী কিংসফোর্ডের ফটকের সামনে আসতেই ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত শহর কাঁপিয়ে বোমা ফাটে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা চুরমার হয়ে যায়। শ্রীমতী ও কুমারী কেনেডি মারা যান অল্প সময়ের মধ্যে।

আততায়ীরা জুতা ফেলে খালি পায়ে ছুটতে আরম্ভ করে। তারা কিছু পথ একসঙ্গে চলার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়; দীনেশ সমস্তিপুর ও ক্ষুদিরাম ওয়াইনীর দিকে। পুলিশের লোক ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। এক দল রেল লাইন ধরে পিছু ধাওয়া করতে লেগে গেল। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পুলিশ মোতায়েন করা হলো। থানায় থানায় খবর গেল সন্দেহোদ্দীপক কোনো যুবককে খালি পায়ে দেখলেই যেন ধরে রাখা হয়।

দীনেশ রায়

ঘটনাস্থল থেকে (১৯০৮) যে ১-লা দীনেশ বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল (বর্ত্তমানে মোকামা-বারৌণী লাইন) এর সমস্তিপুর পৌঁছে মোকামা ঘাট যাবার টিকিট কেনে। ইতিমধ্যে সে নতুন পোষাক ও জুতো কিনে পরেছে। ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে তাকে দেখে সাব-ইনস্‌পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জির সন্দেহ হয়। সে ছুটী শেষে কাজে যোগ দেবার জন্য মজঃফরপুর থেকে সিংভূম যাচ্ছিল। নন্দ দীনেশের সঙ্গে একই কামরায় ওঠে ও আলাপ জমাতে চেষ্টা করে। দীনেশের সেটা মোটেই ভাল লাগে না। সেমুরিয়া ঘাটে নেমে গঙ্গায় জল খেয়ে সে ভিন্ন কামরায় ওঠে এবং মোকামা জংশনে নামে। শিকার ফস্কে যায় মনে করে নন্দ ঘুরে ফিরে মোকামা-ঘাটে দীনেশকে খুঁজে বার করে এবং তার বিরক্তি উৎপাদন করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সয়তানীর সীমা নেই। ইতিমধ্যে সে মজঃফরপুরে এক টেলিগ্রামে অবস্থার বিবরণ দিয়ে দীনেশকে গ্রেপ্তার করবার অনুমতি চায়। দীনেশ মোকামা ষ্টেশনে নেমে হাওড়া যাবার টিকিট কেনে। এখানে নন্দর ইচ্ছা পূরণ করে টেলিগ্রাম আসে। সানন্দ-চিত্তে সে দীনেশকে গ্রেপ্তার করছে এই কথা বলে। "বাঙ্গালী হয়ে এই কাজটা করলেন ?" বলেই দীনেশ সরে পড়তে চেষ্টা করে। নন্দর আর্দ্দালি পশ্চাদ্ধাবন করে। দীনেশ ফিরে গুলি চালায় কিন্তু কনষ্টেবলের লাগে না। প্ল্যাটফরমের প্রায় শেষে উল্টো দিক থেকে আর এক পাহারাওয়ালা এসে পলায়মান দীনেশের পথ রোধ করে। এখন সামনে ও পিছন থেকে দুজনে তাকে জাপ্টে ধরে ফেলে। অসীম শক্তিবলে দীনেশ হাত দুটো মুক্ত করে নেয় এবং দুবার তার ব্রাউনিং পিস্তল হতে নিজ দেহে গুলি ছোঁড়ে। একটি তার চিবুক ও দ্বিতীয়টি তার কণ্ঠার হাড় ভেদ করে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে (মে ১-লা)। দীনেশের মৃত দেহ কলকাতায় আনা হয় এবং স্বল্পকালের মধ্যে তাঁকে রঙ্গপুরের প্রফুল্ল চাকী বলে সনাক্ত হলে পুলিশ স্বস্তি লাভ করে।

রংপুরে রাস্তায় "বন্দে মাতরম" গান করায় দীনেশ সরকারী স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। সেখানকার "প্রবেশিকা" পাশ করে কলকেতায় এসে ন্যাশনাল কলেজে ভর্ত্তি হয় এবং মাণিকতলা বাগানের সঙ্গে জড়িত হয়। প্রফুল্লকে উদ্দেশ করে রচিত সে-কালের এক গানে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হ'লো :

আজিও তোমারে ভুলিতে পারিনি
বীর প্রফুল্ল চাকী ;

* * * *

তব পবিত্র সুকঠোর দেহ
স্পর্শিতে কভু পারে নাই কেহ
নিজ হাতে দিলে পরাণ আহুতি
বন্ধন-লাজ ঢাকি ।

* * * *

ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে রেল লাইন ধরে চলতে থাকে এবং চব্বিশ মাইল অতিক্রম করে বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের ওয়াইনী (বর্ত্তমানে ওয়েন) ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছায় পরদিন সকাল আটটায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রমে কাতর হয়ে সে নিকটস্থ এক দোকানে গিয়ে মুড়ি কিনে খাচ্ছিল ; সন্দেহ ক্রমে পুলিশ তাকে সেখানে গ্রেপ্তার করে।

খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় খবর এলে বিহার পুলিশকে নির্দ্দেশ যায় যাতে যে কোনও উপায়ে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় এবং তার ভিতর যেন কলকাতার নেতাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের

মত ইঙ্গিত সংযুক্ত থাকে। তা ছাড়া বিস্ফোরক প্রাপ্তির স্থানের সংবাদ যেন আদায় করা হয়। কোনো ত্রুটী যে হয়নি সে কথা বলা বাহুল্য। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে পকেট থেকে রিভলবার বার করবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পুলিসের লোক হাত চেপে ধরায় সক্ষম হয়নি। তার নিকট দুটো রিভলবার, খুচরো সব মিলিয়ে নগদ প্রায় ত্রিশ টাকা এবং সাঁইত্রিশটি টোটা ছিল। আর ছিল ভারতীয় রেলপথের একখানা মানচিত্র এবং টাইম টেবলের একটা বিচ্ছিন্ন পাতা।

বিকালের ট্রেণে তাকে মজঃফরপুর নিয়ে যাওয়া হয়। তার মুখে চিন্তার কোনো রেখা ছিল না, যেন কিছুই ঘটেনি। ট্রেণ থেকে থানায় নিয়ে যাবার জন্ত পুলিশের গাড়ীতে তোলবার সময় সে উচ্চৈঃস্বরে "বন্দেমাতারম" ধ্বনি দিয়েছিল মাত্র।

মামলা দায়রা সোপর্দ্দ হয় মে ২৫-এ আর বিচার আরম্ভ হয় (১৯০৮) জুন ৮-ই। জজের প্রশ্নের উত্তরে সে অপরাধ স্বীকার করে। সে কাঠগড়ায় অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে দেখলে বোঝাই যেত না যে ঐ মামলার সঙ্গে তার কোনো সংশ্রব আছে। অনেক সময় তাকে সুপ্ত অবস্থায় দেখা গেছে। জুন ১৩ ই প্রদত্ত রায়ে তার ফাঁসির হুকুম হয়। তখনও সে নির্ব্বিকার। সে বলেছিল যে গীতা পড়ার ফলে তার মরণের ভয় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে।

হাইকোর্টে আপীলের রায় বেরোয় জুলাই ১৩-ই। গভর্ণমেণ্ট আর দেরী করতে পারেনি। আগষ্ট ১১-ই মজঃফরপুর জেলে ফাঁসিকাঠে বাঙ্গালার বীর বালক জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছে। প্রায় সত্তর বছর পরেও তাঁর কথা লিখিতে গর্ব বোধ করছি।

মনে থাকার আর এক বড় কারণ আছে। দেশের বন্ধন-মুক্তির জন্ত ইংরেজের ফাঁসি কাঠে জীবন উৎসর্গ করা এই প্রথম বলেই হয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে মহারাজা নন্দকুমারের কথা মনে পড়ে। (১৭৭৫ আগষ্ট ৫-ই) দেশের লোক ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে নানা গানের মধ্য দিয়ে; লোকে চারণের মত সে সব গান পথে পথে সভা-সমিতিতে গেয়ে বেড়িয়েছে। কাপড়ের পাড়ে একটি গানের অংশ বুনে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ করেছে। ঐ পাড়ের কাপড়ের চলন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

কাপড়ের পাড়ে ছিল, "বিদায় দে মা ঘুরে আসি।" এইটিই চলেছিল বেশী। কিন্তু এতে ক্ষুদিরামের প্রতি হয় ত কিছু অবিচার হয়ে থাকবে। বীরের তেজ এতে নেই, কাঁদুনি ভাব বেশী। অন্যান্য গানও রচিত হয়েছিল। মনে হয় তার আগে এক জন দেশপ্রেমিকের মরণে এতগুলি গান বহুকাল রচিত হয়নি। একটি ছিল,

"ক্ষুদিরাম তুমি দিয়েছিলে প্রাণ
বাঙলারে ভালবাসি।
হাসিতে হাসিতে মরণ মঞ্চে
গলায় পরিলে ফাঁসি।"

* * *

(মাতৃমন্ত্র, পৃঃ ১২৪)

দ্বিতীয়টি—

"ক্ষুদি তোমার পায়ে নমস্কার।
তোমার কাণ্ড দেখে ভণ্ডরা সব
করছে ভয়ে হাহাকার।

* * *

রাজার জাতি বুটের লাথি
পড়ছে মাথায় দিবারাতি
তুমি ভাঙলে যে ভুল জীবন দিয়ে
দেশের লোকের সবাকার।

* * *

পরেই দেখা যায় :

"ক্ষুদিরাম নূনের ছিটা—
ফেললো সাদা জোঁকের মুখে,
রাঙা মুখ কুঁকড়ে গেল
লাগলো কাঁপন তাদের বুকে।

* * *"

এ সকলকে ছাপিয়ে গেল—

"তোরা প্রাণ খুলে বল 'বন্দে মাতরম'।
তোদের ঘুমের নেশা ভাঙিয়ে দিলে
ক্ষুদিরামের একটি বম্ ॥
তোরা শক্তি মায়ের শক্ত ছেলে
তোদের জোড়া কোথায় মিলে ?
তোরা মা অভয়ার অভয় পেলি
তোরা নয়রে ছোট নয়রে কম।
একবার তোরা ফিরে দাঁড়া,
তুলে নে মার বলির খাঁড়া।
ছুটবে তোদের মনের ধাঁধা,
বুঝবি নিজের পরাক্রম ॥

দীর্ঘ হয়ে যাবার ভয়ে অবশিষ্ট অংশ ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নানা 'যুগে' অত্যাচারীর যে দুর্দশা ঘটেছিল সে সবের উল্লেখ করে কবি কেবল নিজের ব্যাপক দৃষ্টিরই পরিচয় দেন নি, দিয়েছেন ক্ষুদিরামকে তার প্রাপ্য যশঃ। লিখছেন—

"দৈত্যকুলে জন্মাল এক
ক্ষুদির মত পাগলা ছেলে,
বলল কভু কৃষ্ণ নাম
ছাড়বে না, তার জীবন গেলে।
অত্যাচারের পাকে পাকে
কেবল "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ডাকে।
শেষে নরসিংহের নখাঘাতে,
ঘুচলো দৈত্যের মনের ভ্রম ॥
ত্রেতা যুগে রামের সীতা
করলো চুরি রাবণ রাজা
নারীহরণ পাপের ফলে
পেল পাপী উচিৎ সাজা
সোনার লঙ্কা ভস্ম হলো,
শক্তির দম্ভ ঘুচে গেল
বংশ শুদ্ধ সবাই ম'লো
হ'লো না তার একটা কম ॥
দ্বাপরেতে রাজ্যলোভী দুর্য্যোধনের সর্ব্বগ্রাসে
মিথ্যা পাশার নেশায় পড়ে পাণ্ডব গেল বনবাসে,
হরণ করে নারীর বস্ত্র
গড়লো নিজের মারণাস্ত্র,
শেষে ভীমের গদায় পেল সাজা।
হ'লো না তার ব্যতিক্রম।
ভাবলি বুঝি কলিকালে
তোদের কাজের শাস্তি নাই,
সেই সাহসে গায়ের জোরে,
জুলুম করে বেড়াস্ তাই
মিথ্যা মুখোস ফেল না খুলে,
দেখনা জ্ঞানের চক্ষু খুলে।
আজ ফাঁসির মঞ্চে হাসি মুখে
দাঁড়িয়ে আছে তোদের যম ॥

[যদি কেউ সবটা পড়ে থাকেন, তাঁর ধৈর্য্যের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।]

তৃতীয় অঙ্ক—মানিকতলা বাগান

এইবার মানিকতলার বাগানবাসী ও তাঁদের সঙ্গীদের আর এক অঙ্ক আরম্ভ হ'ল। আর তার গর্ভাঙ্ক অতি দুঃসাহস এবং অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দেয়।

মজঃফরপুর ঘটনার পরই পুলিশ একেবারে ভীষণভাবে তৎপর হয়ে পড়ল। তারা বেশ কিছুদিন থেকে "বাগান" চৌকি দিচ্ছিল। তাছাড়া আরও কয়েকটি কেন্দ্রের ওপর কড়া নজর রাখা যে হ'ত সেটা যুগপৎ কয়েক স্থানে খানা-তল্লাসী থেকে বোঝা গেল। (১৯০৮) মে ২-রা (ক) মুরারি পুকুর রোড (বাগান), (খ) ১৩৪ হ্যারিসন রোড, (গ) ২৩, স্কটস লেন, (ঘ) ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট, (ঙ) ৩৮।২ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, (চ) ১৫ গোপী মোহন দত্ত লেন, এক দিনে একই সময়ে খানাতল্লাসী হয় এবং বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বেপরোয়া ধরপাকড় চলতে থাকে। সেই সপ্তাহের মধ্যে আরও বহুস্থান খানাতল্লাসী হয়েছিল তার মধ্যে 'বন্দে মাতারম' অফিস অন্যতম। কলকাতার বাইরে থেকেও আসামী গ্রেপ্তার এবং কলকাতায় বিচারের উদ্দেশ্যে টেনে হাজির করা হয়েছে। সংখ্যায় জন পঞ্চাশেরও বেশী হবে, তার মধ্যে আবার বেছে বেছে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ঠিক করা হয়।

কলকাতা পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জন কয়েক কে মে ৪-ঠা এবং ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি (Leonard Birley) র নিকট মে ৬-ই সমস্ত আসামীকে হাজির করা হয়। মে ১৮ই পর্য্যন্ত সকলকে হাজতবাসের হুকুম দেওয়া হয়। এইদিন মোট ৩১ জনকে হাজির করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে বার্লি দু' শতাধিক সাক্ষী গ্রহণ করে আগষ্ট ১৯-এ উনত্রিশ জনকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একদল (সাত জন) খাড়া করা হলে সেপ্টেম্বর ১৪-ই তাদেরও প্রথম দলের আসামীদের সঙ্গে বিচারের আদেশ হয়।

দায়রা জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ (Charles Porten Beacheroft) অক্টোবর ১৯শে শুনানী আরম্ভ করেন। পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯০৯ এপ্রিল ১৩-ই। মোট আসামী সংখ্যা ছত্রিশ। (১৯০৯) মে ৬-ই দায়রার রায় ঘোষণা করা হয়। তাতে সতেরো জন মুক্তি পান, তন্মধ্যে অরবিন্দ অন্যতম। দু জনের ফাঁসি, দশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিনজনের দশ বছর দ্বীপান্তর (এঁদের সকলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়), তিন জনের সাত বৎসর ও এক জনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

প্রধান আসামীদের কয়েকজন দীপ্ত ভাষায় অকপটে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়ের কথা বলেছিলেন এবং ষড়যন্ত্রের সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলেন। প্রধান আসামী বারীন্দ্র কুমার বিবৃতি দেন মে ৪-ঠা। পরে উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন যে কাজের যিনি ভার নিয়েছিলেন সে সকল কথা প্রকাশ করে বলেন। আজ আমার নিকট এ বিষয়ের ভাল মন্দ বিচারের যৌক্তিকতা নেই। সে যুগে এই তেজোব্যঞ্জক বিবৃতির ফলে বহু সন্দেহবাদী অথচ দেশ-প্রেমে মাতোয়ারা যুবক ঘর ছেড়ে সাহসে ভর করে বেরিয়ে পড়েছিল এবং উত্তরকালে বিপ্লবে বড় অংশ গ্রহণ করেছিল, সে কথা একাধিক লোকের মুখ থেকে শুনেছি।

এইবার হাইকোর্টের পালা। বারীন ও উল্লাসকরের আপীল ১৯০৯ মে ১৩-ই ও অপর সকলের মে ১৭-ই দাখিল করা হয়। আগষ্ট ৯-ই সওয়াল শুরু হয়ে নভেম্বর ২৩এ রায় দেওয়া হয়েছিল। ফাঁসি রদ হয়ে যায়, চারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিন জনের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর, তিন জনের সাত বৎসরের দ্বীপান্তর এবং দুজনের পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। রায় দেন জজ জেঙ্কিন্‌স্‌ (Jenkins) ও কারণডফ্‌ (Carnduff)।

পাঁচ জন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়ায় তৃতীয় জজ (Richard Harrington) এর নিকট পুনর্বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। তিনি ১৯১০ জানুয়ারী ৪-ঠা শুনানী আরম্ভ করেন এবং ফেব্রুয়ারী ১৮-ই রায় দেন। ফলে তিন জন মুক্তি পান এবং দুজনের সাজা বজায় রাখেন।

হুকে সাজালে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়:

[যাঃ দ্বীঃ=যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বঃ দ্বীঃ=বৎসর দ্বীপান্তর
সঃ=সশ্রম কারাদণ্ড।]

	দায়রা জজের রায় (৬.৫.০৯)	হাইকোর্টে রায় (২৩.১১.০৯)	তৃতীয় জজের রায় (১৮.২.১০)
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	ফাঁসি	যাঃ দ্বীঃ	—
উল্লাসকর দত্ত	ফাঁসি	যাঃ দ্বীঃ	—
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	যাঃ দ্বীঃ	যাঃ দ্বীঃ	—
হেমচন্দ্র দাস	যাঃ দ্বীঃ	যাঃ দ্বীঃ	—
বিভূতি ভূষণ সরকার	যাঃ দ্বীঃ	১০ বঃ দ্বীঃ	—
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল	যাঃ দ্বীঃ	১০ বঃ দ্বীঃ	—
ইন্দুভূষণ রায় (৫)	যাঃ দ্বীঃ	১০ বঃ দ্বীঃ	—
বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন	যাঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	৭ বঃ দ্বীঃ
সুধীর চন্দ্র সরকার	যাঃ দ্বীঃ	৭ বঃ দ্বীঃ	—
ইন্দ্র নাথ নন্দী	যাঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	মুক্তি
অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	যাঃ দ্বীঃ	৭ বঃ দ্বীঃ	—
শৈলেন্দ্র নাথ বসু	যাঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	৫ বঃ সঃ
শিশির কুমার ঘোষ	১০ বঃ দ্বীঃ	৫ বঃ সঃ	—
নিরাপদ রায়	১০ বঃ দ্বীঃ	৫ বঃ সঃ	—
পরেশ চন্দ্র মৌলিক	১০ বঃ দ্বীঃ	৭ বঃ দ্বীঃ	—
সুশীল কুমার সেন	৭ বঃ দ্বীঃ	দ্বিমত	মুক্তি
বালকৃষ্ণ হরিকানে	৭ বঃ দ্বীঃ	মুক্তি	—
অশোক নন্দী	৭ বঃ দ্বীঃ	মৃত	—
কৃষ্ণজীবন সান্যাল	১ বঃ সঃ	দ্বিমত	মুক্তি

মামলা আরম্ভ এবং যথারীতি দিনের পর দিন চলবার পর এক সময় শেষও হ'ল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা ঘটল তা সমস্ত বিচারবুদ্ধি এমনকি কল্পনাকেও পরাস্ত করতে সক্ষম।

গর্ভাঙ্ক—নরেন কানাই-সত্যেন

আসামীদের রায়ের মধ্যে তালিকার তিনটি লোকের নাম দেখা যায়না। অথচ তাঁরা খাঁটি দোষী বলে গভর্ণমেণ্টের ধারণা এবং মামলাতেও তাঁদের নাম ছিল। এ তিন জন হচ্ছেন: মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্র নাথ বসু, চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত আর শ্রীরামপুরের নরেন্দ্র নাথ গোস্বামী। কানাই হচ্ছে প্রথম ঝাঁকের আসামী; মে ২-রা তারিখে ১৫, গোপী মোহন দত্ত লেন থেকে ধরা পড়ে। নরেনকে শ্রীরামপুরে মে ৫-ই গ্রেপ্তার করে প্রথম দলের আসামীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সত্যেন প্রথমে মেদিনীপুরে তাঁর ভাইয়ের বন্দুক নিয়ে বে-আইনী ঘোরাফেরা করার অপরাধে জুলাই ৪-ঠা ছ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জুলাই ১৮-ই দায়রা জজ তাঁর আপীল নাকচ করে দেন। কয়েদীর পোষাক পরিহিত সত্যেনকে (১৯০৮) জুলাই ২১-এ আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির করলে তাঁকে দ্বিতীয় ঝাঁকের মধ্যে আসামী করা হয়।

বড় লোকের ছেলে নরেন। ঠিক এতটা হজম করতে হবে, এ কথা ভাবে নি। প্রথমটা বেশ মন-মরা হয়ে পড়ে, অন্যান্য আসামীদের হৈহুল্লোড়ে যোগ দেয় না। পুলিশ কি সন্ধান পেয়েছিল বলা যায় না। কিন্তু একদিন দেখা গেল নরেনকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেল জেল অফিসে, তারপর আরও কয়েকবার। ফলে দাঁড়াল, নরেনের অনুসন্ধিৎসা বাড়ল দলের সভ্যদের বিশেষ বাঙ্গলায় বাইরের সভ্যদের পরিচয় জানতে। সহ-আসামীরা সন্দেহ করতে লাগল, নরেনের মাথায় কোনও কুবুদ্ধি গজিয়ে উঠেছে এবং তারা সম্ভাব্য অসম্ভাব্য নাম তৈরী করে সরবরাহ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নরেন মে ২৯-এ পুলিশের এক কর্ত্তার কাছে গোপনে জবানবন্দী দেয় এবং গভর্ণমেণ্ট জুন ৮ই তাকে রাজসাক্ষী করা স্থির করে। সকলের অজ্ঞাতে সব ঠিক হবার পর সে আরও উৎসাহ ভরে গোপন তথ্য সংগ্রহে উঠে পড়ে লেগে যায়।

জুন ২৩-এ ম্যাজিষ্ট্রেট বালির নিকট হাজির করলে

(সরকারী সাক্ষী নং ৬৮) নরেন্দ্র গোঁসাই-এর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়। তখন প্রাণ খুলে সে বিশেষ করে অরবিন্দকে জড়িয়ে একরার করতে থাকে। পরে (১৯০৮) জুন ২৪-এ, ও জুলাই ৩-রা মোটমাট চারদিন ধরে তার বিবৃতি চলে। বলা বাহুল্য সব বন্দোবস্ত যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন তাকে অন্য সকল আসামী থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে ইউরোপীয় অভিযুক্তদের ওয়ার্ডে রাখা হয়। কাছারীতেও তার সচ্ছন্দ ঘোরাফেরা, পুলিশের সঙ্গে হাসি তামাসা চলতে থাকে। মনে যে তার আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই সে কথা তার হালচাল থেকে বুঝতে কারও বাকী রইল না।

কিন্তু এদিকে বিপদ ঘনিয়ে উঠল। তার জবানবন্দীর ওপর জেরা হয়ে গেলে সেটা আইনসম্মত সাক্ষ্য (evidence) রূপে গৃহীত হবে। বিশেষ করে পুলিশের পরামর্শে অরবিন্দকে সে যেভাবে জড়িয়েছে তাতে তাঁর গুরুতর সাজা হওয়া বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল।

আসামীদের মধ্যে জেলের দেওয়াল টপ্‌কে পালাবার মতলব হচ্ছিল এবং বাইরের লোক, বিশেষতঃ চন্দননগরের কর্মী শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পত্রের আদানপ্রদান চলতে থাকে। কেবল এই কাজে নয়, আসামীদের অসুস্থতার মত হাসপাতালে ভর্ত্তি করা প্রভৃতি ব্যাপারে জেলের "বড়" ডাক্তারবাবু বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করতেন। (বিপ্লবের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত)। কোয়ার্টারে ফিরে যাবার আগে তিনি বাইরে পাঠাবার চিঠি নিয়ে এবং প্রাপ্ত চিঠি পৌঁছে দিয়ে যেতেন। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্য ফাঁক ফাঁক গরাদ দিয়ে (তারের জালহীন) একটা ব্যবধান সৃষ্টি করা ছিল মাত্র। তার মধ্যে দিয়ে মালপত্র পাচার করার কোনো অসুবিধা ছিল না। বারীনের নির্দ্দেশ মত একদিন আগষ্টের একেবারে শেষ দিকে শ্রীবসন্তকুমার আর শ্রীশচন্দ্র আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে গায়ের চাদরের আবরণে, দুটা রিভলবার দিয়ে যান। আরও একটা অস্ত্র সময়ে আসে সেটি ব্যবহার করা হয় নি। শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্তর মাথা রাখবার মাটির "বালিশের" গর্ত্তের মধ্যে রাখা ছিল। হাঙ্গামা বেধে যাবার পর সম্ভবতঃ জেল কর্ত্তৃপক্ষ আরও বে-ইজ্জত হবার ভয়ে সেটা গাপ্‌ করে ফেলে।

সত্যেন এক চিররুগ্ন যুবক। কিন্তু মাথায় ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি আর মনে ছিল অসীম সাহস। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি (১৯০৮) ২৬, ২৭ ও ২৮-এ জুলাই মামলার শুনানীতে কোর্টে হাজির হন নি। মাঝে মাঝে তাঁকে হাসপাতালের শরণ নিতে হচ্ছে। রোগ বৃদ্ধিতে ২৭-এ তিনি হাসপাতালে পুনরায় স্থানান্তরিত হন। আগষ্ট ৩০-এ বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর দুবার সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।

সত্যেন আর কানাইয়ের মধ্যে কিছু গোপন পরামর্শ হয়ে থাকবে। পেটের কলিক্ (শূল বেদনা) বলে কানাই আগষ্ট ৩০-এ হাসপাতালে চলে যায়। জুলাই ২৯-এ সত্যেন নরেন গোস্বামীকে খবর পাঠায় যেন সে একবার হাসপাতালে সত্যেনের সঙ্গে করে। কারণ সে অসুস্থ এবং কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত। সব খবর জানিয়ে দিয়ে সে মন পরিষ্কার করে নিতে চায়। নরেন সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে সব কথা বলে এবং অনুমতি পেয়ে সেই সন্ধ্যাতেই এবং পরের দিনও (৩০-এ) একবার দেখা করে। ৩১-এসকালে আবার দেখা করার ব্যবস্থা ঠিক করে প্রফুল্লমনে ফিরে আসে।

আগষ্ট ৩১-এ সকাল ৭টা নাগাদ সে এক ফিরিঙ্গি ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাসপাতালে গিয়ে দোতালার উঠে আন্দাজ দশ মিনিট বারান্দায় অপেক্ষা করতে থাকে। এমন সময় কানাই এসে গুলি ছোঁড়ে এবং নরেনের হাতে লাগে। সে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে এবং সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে। ইতিমধ্যে সত্যেন এসে পড়ে এবং দেখে

শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায়। পিছনে ছুটেছে দুই যমদূত। ওয়ার্ডার বাধা দিতে গেলে সে ডান হাতের তালুতে একটা গুলি দ্বারা আহত হয়েও নরেনকে রক্ষা করে পিছনে পিছনে ছুটে চলে। কানাই, সত্যেন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু ধাওয়া করে চলেছে। একটা বুলেট নরেনের পাছাতে লাগে এবং নরেনের পলায়নের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়ে পড়ে। যখন হাসপাতাল পার হয়ে অফিসের দিকে চলেছে তখন সত্যেন ও কানাইকে ওয়ার্ডাররা ধরে ফেলে। কোনো রকমে ডান হাতটা ছাড়িয়ে কানাই শেষ বুলেট নরেনের দেহে প্রবিষ্ট করে দেয়। নরেনের আধখানা দেহ নর্দমার মধ্যে আর বাকীটা তার পাড়ে লুটাতে থাকে। কানাই, সত্যেন সফলতার আনন্দে বিভোর; নিরীহ শান্ত লোকের মত ওয়ার্ডারদের হাতে বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাগলা ঘন্টির শব্দে জেলখানার মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। কয়েদীরা সব ঘরে ঘরে বন্ধ হলো। তখন সকাল সওয়া সাত। ক'মিনিটের ব্যাপার, কিন্তু ইতিহাসের কাহিনীর গতিপথ সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইতে আরম্ভ হ'লো।

কতকগুলি পত্রিকা আনন্দ চেপে রাখতে পারেনি। তারা কানাই, সত্যেনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লাস ফেটে পড়ল। মুখে মুখে এক কথা "সাবাস!" তাদের সেপ্টেম্বর ৩-রা দায়রা সোপার্দ করা হ'ল। তারপর বিচারের পালা। মামলা উঠল ৭-ই। কানাই আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো ব্যবস্থাই করেনি। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, বাকীটা নিষ্প্রয়োজন। (১৯০৮) সেপ্টেম্বর ৯-ই মামলার নিষ্পত্তি। জুরীদের (মোট) পাঁচজনই কানাইকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করে এবং তিন জনে সত্যেনকে নিরপরাধ বলে। সঙ্গে সঙ্গে কানাই এর ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। অধিক সংখ্যক জুরির সঙ্গে একমত না হওয়ায় সত্যেনের মামলা হাইকোর্টে পাকা অভিমত সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হয়।

আপীল করায় কানাইয়ের আপত্তি। আপীলে যে কটা দিন নষ্ট হবে ফাঁসিতে মরলে সে কটা দিন আগে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, এই হ'ল তার উক্তি। অক্টোবর ২১-এ হাইকোর্ট দুজনেরই প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে।

কানাই সম্পূর্ণ অবিচলিত। তার যে মৃত্যু আসন্ন সে বিষয় তার মুখে কোনো রেখাপাত করেনি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা'য় লিখেছেন, "শুনিলাম যে, কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া শেষ দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

"যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে! আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে; বাকী কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইয়ের মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই। চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্য মূল্য হইয়া গিয়াছে, সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে।"

ফাঁসি কাঠ ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল নভেম্বর ১০-ই। ধীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অপরের বিনা সাহায্যে কানাই ধাপ কয়টি উঠে পড়ল। হাত বাঁধা, মুখ ঢাকা যথারীতি সব ঠিকই হল। আসামী একবার "বন্দে মাতরম" বলে উঠল; পায়ের তলায় তক্তা সরে গেল। নিমেষের মধ্যে কানাইয়ের নিস্পন্দ দেহ ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখা গেল।

তাকে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে দাহ করবার অনুমতি

দেওয়া হয়। বিপুল শঙ্খধ্বনি আর পর্ব্বতপ্রমাণ ফুলের মধ্যে দিয়ে বিরাট মিছিল চলতে থাকে। জয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আদর্শ নিষ্ঠার প্রতীককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য হাজার হাজার ছাত্র জুটে ছিল, আর তাদের দলপতি হলেন পরবর্তী কালের স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। চন্দন কাঠের চিতার মাঝে কানাইয়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল বটে, কিন্তু কানাই আজও অমর। শ্রদ্ধার সঙ্গে সকল ভারতবাসী (কয়েকটি কুলাঙ্গার পাষণ্ড ছাড়া তাঁর নাম আজও সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করে।

সত্যেনের ফাঁসী হতে একটু বিলম্ব পড়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি যে সত্যেনের গুলিতে নরেনের মৃত্যু হয়েছে। সবদিক বিচার করেই পাঁচ জন জুরীর মধ্যে তিন জন তাঁকে নির্দ্দোষ বলেছিলেন। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করা হয়। সকল স্তর পার হয়ে যাবার পর তাকে (১৯০৮) নভেম্বর ২১-এ ফাঁসি দেওয়া হয়। কানাইয়ের শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রার দৃশ্য গভর্ণমেণ্টকে সন্ত্রস্ত করেছিল। কানাইয়ের শব যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে সত্যেনকে জেলের মধ্যেই দাহ করা হয়।

অশোক নন্দী

মাণিকতলা বাগানের অধিষ্ঠাত্রী অদৃশ্য বুভুক্ষু দেবীর ক্ষুধা এখনও চরিতার্থ হয়নি। এই মামলার মধ্যেই এক আসামী অশোক নন্দীর জীবনাবসান ঘটে। মনে রাখা ভাল অশোককে একবার উল্লাসকরের সঙ্গে অস্ত্র আইনে জড়ানো হয়েছিল। লম্বা মামলার পরে সেখানে মুক্তি পায়। বালি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে বীচক্রফট্ জজের পাল্লায় পড়েছে কিশোর অশোক নন্দী। মামলা যখন চলেছে তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। উরু-সন্ধিতে যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগের আবির্ভাব। রোগ সংক্রমনের ভয়ে তার ভাগ্যে জেলখানার অস্বাস্থ্যকর স্থানে স্বতন্ত্র বাস ঘটে।

দায়রায় তার সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আপীলের শুনানীর সময় তাকে জামীনে মুক্তি দেবার জন্য বার বার আবেদন করা হয়। জজ সাহেবের মন তাতে ভিজল না। তখন কৌঁসুলী চিত্তরঞ্জন দাশের পরামর্শ মত ছোটলাট বাহাদুরকে আবেদন করার ফলে (১৯০৯) জুলাই ২রা অশোককে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়। এ সীমিত স্বাধীনতা থেকে শ্রীভগবান তাঁকে সকল বিপদ, সকল দণ্ড, মানুষের সকল জিঘাংসার বাইরে পাঠিয়ে দেন (১৯০৯) আগষ্ট ৬-ই। তাঁর সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটে। হাইকোর্টের রায়ে অশোক মুক্তি লাভ করে। তার পূর্ব্বে তার চিরমুক্তি হয়ে গেছে।

ইন্দুভূষণ রায়

দ্বীপান্তরের আসামীদের আন্দামানে নিগ্রহের কাহিনী চলার আগে এঁদের প্রথম দলের বাঙ্গলা ত্যাগের কথা বলা দরকার। পণ্ডিচেরী, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের স্থায়ী অধিবাসী এবং আলিপুর মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন জানিয়েছেন প্রথম দলে ছিলেন বারীন, উল্লাসকর, হৃষীকেশ, অবিনাশ, হেমচন্দ্র, ইন্দুভূষণ ও বিভূতি আর তাঁরা রওনা হলেন ১৯০৯ ডিসেম্বর ১১-ই। দ্বিতীয় দল যান ১৯১০ জানুয়ারী ২২-এ উপেন ও সুধীর। আগষ্ট ১৬-ই যান বীরেন। সবাই "মহারাজা" নামের জাহাজের যাত্রী।

আলিপুর বোমার মামলার কাহিনী শেষ হবার নয়। মামলা ত শেষ হয়েছে কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণার অধিক নিগ্রহ সহ্য করতে হচ্ছে কয়েদীদের। যখন নিপীড়ন সহ্যাতীত হয় তখন আত্মহত্যাই নিষ্কৃতির একমাত্র পথ।

হাইকোর্টের আপীলে যুবক ইন্দুভূষণ রায়ের দশ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। আন্দামানের জেলে অপরিসীম

শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। তার মাঝে পড়ে ইন্দুভূষণ একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কঠোর অমানুষিক পরিশ্রম, সর্ব্বক্ষণ গালিগালাজ সহ্য করা তার শক্তির বাইরে হ'য়ে পড়েছিল। সঙ্গীদের সে নিজ দুরবস্থার কথা বলে, আর ভাবে দশ বৎসর ধরে এ নরক-যন্ত্রণা সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব।

অতি সাহসী ইন্দু, যে এক সময় চন্দননগরের মেয়রের ঘরে বোমা ফেলেছিল, আজ তার অতি করুণ অবস্থা। যন্ত্রণায় এবং শরীরের দুরবস্থায় আজ সে ভেঙে পড়েছে। জেলে তার কাজ ছিল 'রম্বাস' নামে গুল্ম থেকে সাদা শণ উদ্ধার। 'রম্বাস'-এর রস দেহে লাগলে ফোস্কা হয়। ইন্দুর হাতে ফোস্কা হয়ে গলে গিয়ে দগদগে ঘা হয়েছে, সাদা, জল লাগলেও অসহ্য জ্বালা করে। ১৯১২ এপ্রিল ২৮ এ মে জেল সুপারের কাছে যায়। কর্তা অকথ্য গালিগালাজ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। বেরিয়ে যাবার আগে সে কাতর ভাবে বলে যেন কয়েকদিনের জন্য তার বদলি কাজ দেওয়া হয়। ফলে দাঁড়ালো ঘানি ঘোরানো। ইংরাজীতে যাকে বলে "from the frying pan into the fire"। এর সঙ্গে কুকথা, অশ্রাব্য তিরস্কার হ'ল উপরন্তু লাভ।

অসহ্য, ঐ হাতে ঘানি টানা রক্ত মাংসের দেহে সম্ভব নয়। জেলারের ঘর পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দু তার পরের করণীয় স্থির করে ফেলেছিল। ১৯১২ এপ্রিল ২৯-এ ইন্দুকে তার কুঠুরীর জানালার গরাদ থেকে মৃত অবস্থায় ঝুলতে দেখা গেল। তার ব্যবহারের জন্য জেলের যে কোর্ত্তা,—তাকে ছিঁড়ে ফালি করে জুড়ে জুড়ে সে দড়ি তৈরী করে নিয়েছিল। সেইটাই তার ফাঁসির দড়িরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এসে হাজির হলে কারারক্ষক (Jailor) বলে তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে তাঁর সঙ্গীরা তাকে মেরে ফেলতে পারে এই রকম আতঙ্কের বশীভূত হয়ে কয়েদী আত্মহত্যা করেছে। এত বড় ঘৃণিত মিথ্যা মাত্র সয়তানের মাথায় গজাতে পারে, অপরের নয়।

গল্পটা তখনই বিশ্বাস করে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট সেই 'সত্য' প্রচার করে দেয়। সমুদ্রতীরে বুদ্বুদের মত ইন্দুর দেহ অনন্তে মিলিয়ে গেল। সহকর্মী, সমদুঃখভাগী বন্ধুরা সমবেদনার নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেছিল; স্মৃতি সে ঘটনাকে বহন করছে চিরকাল। আত্মীয়-স্বজনরা শোকাভিভূত হয়েছিলেন, জিঘাংসা চরিতার্থ করার উপায় ত নেই। কিন্তু ইন্দুভূষণের আত্মত্যাগ ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তরে আঘাত করে গেল, সেখানে ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী একটা গভীর আচড় কেটে দিলেন।

'আলিপুর বোমা' কাহিনী এখানে শেষ নয়। আরও দুটি বিপ্লবী (চারু বসু ও বীরেন দত্তগুপ্ত) জীবন এবং সরকারের তিন শক্তিশালী স্তম্ভ (নন্দলাল ব্যানার্জি, আশু বিশ্বাস ও সামসুল আলম) লুপ্ত হয়েছিল। সে কাহিনী যথাস্থানে বিবৃত হবে।

অন্যান্য আসামী

আলিপুর মামলার আরও তিন দণ্ডিত ব্যক্তির পরিচয় দরকার। প্রথম ভবভূষণ মিত্র। ইনি পরে ধরা পড়েন ৩-রা নভেম্বর বোম্বেতে এবং পূর্ব্বের সাক্ষী ধরে বোমার (অতিরিক্ত) মামলার বিচার আরম্ভ হয়। ১৯০৯ এপ্রিল ২৩-এ দায়রায় মামলা চলে; ভবভূষণের সাড়ে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। হাইকোর্টে আপীলে (১৯১০ জুলাই ৩০-এ) পূর্ব্ব দণ্ডাদেশ সমর্থিত হয়।

হরিশচন্দ্র ঘোষ মুরারিপুকুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে পুলিশ খোঁজ করতে আরম্ভ করলে তিনি ফেরার হন। পরে ধরা পড়লে আলিপুর জেলা হাকিমের নিকট তাঁকে ১৯১০ অক্টোবর ২১-এ হাজির করা হয়। ১৯১১ জানুয়ারী ৩১-এ দায়রা সোপর্দ্দ হ'লেন। পলাতক অবস্থায় বহু কষ্ট সহ্য

করবার পর অর্থহীন অবস্থায় আর আদালতের ঝামেলা আর বিফলে সহ্য করার প্রয়োজন অবাস্তব বোধে তিনি অপরাধ স্বীকার করে নেন। তখন তাঁকে চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আলিপুর বোমার মামলার জের মিটতে চায় না। এ সম্পর্কে তারানাথ রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয় মে ১৯-এ (১৯০৮) এবং প্রথম দিকে বিশেষ কোনো অপরাধের পরিচয় না থাকায় জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়। পরেই গুপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে ৪, রাজা লেনে তাঁর বাসা খানাতল্লাসী করে একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে কতকগুলি কার্তুজ ও রিভলবার আবিষ্কার করা হয়। এদিকে আসামী জামীন পেয়েই পলাতক। বহু চেষ্টায় আর সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে ১৯১০-তে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাইকোর্ট দায়রায় বিচারের জন্য চালান দেয় ১৯১০ মার্চ্চ ২৯-এ। মে ১৯ দায়রার রায় বেরোয় তারানাথের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আলিপুর অস্ত্র আইন মামলা

কথায় বলে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা" আর মানিকতলা বাগানবাসীর মামলায় নানা রূপ যতরকমে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাজা শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। (১৯০৮) এপ্রিল ২৬-এ উল্লাসকর ৩৪ গোপীমোহন দাস লেন থেকে (ঘোড়ার গাড়ী নং ৪৯৪) তিন চারটি বাক্স নিয়ে ৩০।১, হ্যারিসন রোডে আসে। পুলিশ সে ঘটনা লক্ষ্য করে। মে ১লা (মানিকতলা বাগান তল্লাসীর আগের দিন) পুলিশ বাড়ীতে হাজির হয়ে মালগুলি হস্তগত করে এবং একসঙ্গে তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। পরে অন্য এক দলে সেখান থেকেই আর দুজন এবং আরও একজনকে মানিকতলা বাগান থেকে পাকড়ে মোট ছজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা জুড়ে দেয়। ১৯০৮ মে ১২-ই প্রাথমিক তদন্তের পর দায়রা আদালতে জুলাই ২৮-এ মামলা আরম্ভ হয়। আগষ্ট ৭-ই রায় বেরোয় এবং নগেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, ধরণী সেন গুপ্ত ও উল্লাসকর দত্ত. প্রত্যেকের সাত বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে আলিপুর বোমা মামলার পূর্ব্বেই উল্লাসকরের সাত বৎসর পরিমাণ জেল হয়ে গিয়েছে। অশোক নন্দী মামলায় আসামী ছিল, কিন্তু নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় মুক্তি পায়। পরে আলিপুর বোমার মামলার আসামী করা হয়। একেই বলে বাঘের চেয়ে পুলিশ বেশী মারাত্মক।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতিচারণ

শত্রু আমার জননী আমার

জাতক

জহরলাল নেহেরু রোডের উপর দাঁড়িয়ে বোবা দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। ত্রিশ বছর আগের কলকাতার সাথে হাল আমলের কলকাতার মিল খুঁজবার চেষ্টা করছিলেন হ'য়ত। ক্ষতবিক্ষত রাস্তাগুলি দেখে ভাবছিলেন হ'য়ত যুদ্ধ-পরিত্যক্ত কোন নগরী। আর দেখছিলেন এই রাস্তাগুলির নামকরণের মধ্যে দিয়েই মহাপুরুষদের স্মরণীয় করে রাখবার এক চেষ্টা। ময়দানের দিকে ঘুরতেই চোখ পড়ল ঐ বড় মহতী সভাটার দিকে। হাওয়ায় ভেসে আসা শব্দগুলিতে হট্টগোল ছাড়া আর কিছুই বুঝছিলেন না। ঐ সভার দিক থেকেই ফিরছিল এক যুবক। কিছু উত্তরের আশায় এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন ক'রেছিলেন যুবককে। না। সঠিক উত্তর দিতে পারেনি যুবক। দ্বিধা আর সংশয়ে তাকাল বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ বুঝতে পারেন তা'র মনের কথা। এবার যুবকের হা'ত ধরে এগিয় যান মাঠের দিকে আর অতীত-স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকেন।

স্মৃতির অতল থেকে বেড়িয়ে এলো :

মনে রেখো! এই বঙ্গদেশই একদিন. শুধু কুমারিকাই নয়, কুমারিকার পরপারে সিংহল বিজয়ীনি ছিলো। মনে রেখো—এই বাংলাই হিমাচ্ছন্নহিমাময়ী পারে—মহাচীনকে জাগিয়েছিল—প্রাণবন্ত করেছিল —আজও তাঁর পূজা হচ্ছে। মনে করে ত্যাখো। তোমার আমার বঙ্গজননীর শঙ্খধ্বনি, দূর দুরান্তরে, পর্ব্বতমালার শিখরে শিখরে. সমুদ্র-মেখলা—মরু-মেখলা প্রান্তে, গান্ধার, গাজন. মলয়, কম্বু, কম্বোজ, শঙ্কু, যব, বলী, অঙ্গ, Angkor, উরল, বিকরাল, অগ্নিমুখ, বর্তমান মক্কা—মদিনা কাবা—মঙ্গল হোয়ে ঘুরে ইক্ষুদেশ হোয়ে—সমুদ্রের ধারে স্থির ছিলো। এসব তো ঠাকুরমার ঝুলির কথা নয়। এসব প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য।

আমি বুড়ো হোয়ে পড়েছি, তবু এখনও মরিনি। শুধু আমাকে বলে দাও, "কোথায় গ্যালো আমার সেই বাংলা মা? কোথায় লুকিয়ে আছেন আমার মাঁ? কোথায় লুকিয়ে আছেন আমার বাংলা মা? শুধু বলে দাও। বলে দাও। যদি নরকে গিয়েও খুঁজে—ফিরিয়ে আন্‌তে হয়—তাও একবার, আর একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বো! শুধু বলে দাও, কোথায়??

তারপর, তারপর, এলো, আর একদিন : বাংলা মা'কে (গা শিউরে উঠছে) কাটা হ'লো। এক-টুক্‌রো হোয়ে গ্যালো "বিহার"। একটুক্‌রো

"উড়িষ্যায়" জুড়ে দেওয়া হোলো। একটুক্‌রো "মাদ্রাজে"। একটুক্‌রো হোয়ে গ্যালো "আসাম"। উফ্‌ফ্‌! তবু শান্তি নেই, তবু বাংলাকে ছেড়ে দেওয়া হোলো না। গুপ্ত আততায়ীর মস্তির, বারবার তোমার মা'য়ের বুকে পড়লো। যে শক্তিহীনা—ক্ষুদ্রাবশিষ্ট বঙ্গ ছিল—তা'ও অর্দ্ধেক করে দেওয়া হোলো। এখনও বেঁচে আছো? ওই হুক্কাহুয়ার দল, কেশরীয় সিংহভুক্ত ত্যক্ত মাংসে জীবিত থাকার দল—এখনও বেঁচে আছে? PAK-এ যখন অর্দ্ধেক বাংলা কেটে দেওয়া হোলো—তখন এই সব হুক্কাহুয়ার দল কোথায় ছিলো? তখন এঁদের বীরত্ব কোথায় সেঁধিয়ে গেছলো??

মনে রেখো—W. Pak এর প্রত্যেক Refugeeকে, তার ছেড়ে আসার ক্ষতির সওয়া গুণ, দেড়গুণ দেওয়া হোয়ে গ্যাছে। কিন্তু ৪০-৫০ লক্ষ পূর্ব্ব Pak-এর Refugee দের এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। কেন? ভিক্ষে স্বরূপ doles 40-50 কোটী টাকা খরচ কোরেচে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের জন্য—এক পয়সাও না। and to add insult to injury :—all this is being done through the hands of a Bengali—who is himself a E. Bengal Refugee!!!

আমি জিজ্ঞেস করছি—"তখন কি, এই পদলেহী হুক্কাহুয়ার দল ঘুমুচ্ছিলেন?? It was only Bengal (Calcutta) which was bombed. লক্ষ লক্ষ লোক পালিয়েছিলো। Only on Bengal—scorched earth policy-র দরুণ লক্ষ লক্ষ মণ চাল-ধান গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। ফলে man-made মহামারী মড়কে ৫০ লক্ষ লোক মরলো। কোথায় ছিলেন তখন এরা!? The Refugees of E. Pak. left a very prosperous state of affairs. They came bereft of everything.....I say' they came bereft of everything—even of the courage they had.....Oh! Oh!! these people were left on their own,—deserted both by God and man. After all, partition was not their fault. Why they should suffer! Daughters, Sisters, Mothers were keeping their soul in their body by white slavery!!!

ওহ :—আর বলতে পারছি না—বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো।—

হ্যাঁ! কি বলছিলুম! হ্যাঁ, এই বাংলাদেশকে পুরাকাল থেকে সব্বাই ভয় ক'রে এসেছে। হিন্দু সাম্রাজ্যের পর থেকে, সকলেই (সেইজন্য) একই চেষ্টায় লেগেছে "বাংলাকে দাবিয়ে রাখো।" মুসলমান সাম্রাজ্যেও তাই হ'য়েছে। তারপর এলো লালমুখো বাঁদর। মনে রেখো—মুসলমান সম্রাটের সময় থেকেই বাঙ্গালা, ভারত ইংরাজের হাতে গিয়েছে। ইংরাজেরা—জগতের মধ্যে (বর্ত্তমান জগতে) সব চাইতে বুদ্ধিমান—চতুর—কৌশলী—রাজনীতিতে এবং কূটনীতিতে। ও'রা দেখলো—বাংলাকে—বাঙ্গালীকে বুঝে নিল, সব। বাংলা

টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটা হতে থাকলো। বাংলার এক এক অঙ্গ (কাটা অঙ্গ) দিয়ে—চারটে আলাদা দেশ হোয়ে গ্যালো। ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, বলি, কম্বোজ ইত্যাদি সব ভারত থেকে কেটে আলাদা দেশ করে দেওয়া হ'লো। শুধু এক কারণের জন্য—বাংলাকে নির্ব্বল কোর্ত্তেই হ'বে; বাংলাকে সব প্রকারেই বলহীন—লক্ষ্যহীন—কর্ত্তব্যহীন—সংস্কৃতি-হীন—নির্জ্জীব করে দিতেই হ'বে। নইলে ভারত-শাসন চলবে না॥

হতভাগ্য-বাংলার সামনে, বাংলার হাতে, সহস্র-বৎসরের সব চাইতে বড্ডো সুযোগ এলো (বাংলারই এক সর্ব্বত্যাগী পথিক ফকিরের দেওয়া) পুনরায় গৌরবমণ্ডিত হ'য়ে দাঁড়াবার। তাও বাঙ্গালীরা হারালো—এই হুক্কাহুয়ার দলের জন্য।—আর কারও নয়।

যুবক। আচ্ছা বাঙ্গালা কি চিরকালই বিদ্রোহ করেছে।

হ্যাঁ। মনে রেখো—ইংরাজের বিরুদ্ধে একেবারে প্রথমে—বাংলাতেই মুক্তি সংগ্রাম হ'য়েছিল—lead করেছিলেন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীরাই। যাকে Govt. "Sannyasi Rebellion" নাম দিয়েছিলো। এরা জানে এদের যদি কেউ সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে—তবে এক বাংলাদেশ—এদের পূর্ণ সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে। তারপর মাদ্রাজ। কিন্তু এরা জানে, মাদ্রাজ এদের সর্ব্বনাশ করতে পারবে না—কিন্তু ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং মোটা বুদ্ধির লোকও বুঝতে পারে যে, যদি বাংলাকে মেরে ফ্যালা যায় তবে—বেঘোরে "মূল শিকড়ই" উপড়ে যাবে চিরকালের জন্য—এরা নিশ্চিন্ত হ'বে।

মনে রেখো—Calcutta and Bombay এই দুটো জায়গা whole national income এর ৮০% দ্যায়। একথা ভুলো না—Calcutta "was" the 2nd city of the British Empire. 1st City ছিলো London, Calcutta "was" the 1st City throughout the British Commonwealth. The port of Calcutta "was" the First and best port and harbour. Calcutta University was the largest University in the world—এবং এখনও তাই। মনে রেখো—It is conceded in all quarters within an without India—that Bengal has the BEST BRAINS.

এসব কথা এরাও জানে। এবং তা থেকেও বেশী জানে যে, "কেবলমাত্র বাঙ্গালীর কাছেই এরা বার বার হেরেছে; গো-হারা হোয়েছে।"

এসব মনে রাখার কথা। কারণ যদি গাছের বীজ এবং শিকড়, উপশিকড়—গোড়ার কথাই কেউ না জানে, না বোঝে, তবে ঐ গাছের সম্বন্ধে—ওর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে। কী করে, কেন, কেমন ধারা করে, কি কি সার পেয়ে, কেমন ধারা জলের সিঞ্চন পেয়ে—ও গাছ ফল-ফুল দিচ্ছে।

মনে রেখো। বাংলার বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে জহরলাল publicly গভীর insult ক'রেছেন।

মনে রেখো, বাংলার হতভাগ্য Refugeeদের জন্য ওঁদের হৃদয়ে দয়া নেই।

মনে রেখো, There is not a single Bengali in any key and vital position.

মনে রেখো, ধীরে ধীরে লোকের চোখে যুক্তি তর্কের ধূলো দিয়ে, Port of Calcutta কে গলাটিপে ক্রমে ক্রমে মেরে ফ্যালা হ'চ্ছে, silted হ'তে দেওয়া হ'চ্ছে। শুধু Port of Calcutta ই নয়, Harbour ও, এবং হুগলিও।

এই ভয়ানক নৃশংসতার পরিণাম : বাংলা শুকিয়ে মরবে। পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী,—পরদাস, ভিক্ষুক হ'য়েই যাবে।

মনে রেখো—Harbour, Port, Hooghly—upto Padma বাংলার প্রাণ—রক্তবাহী ধমণী। বুঝে ছাখো—মানুষের শরীরে—এ, কে!

মনে রেখো, Economy and importance এর দোহাই দিয়ে শত-শত সহস্রকোটী টাকা অন্যান্য lesser, insignificant, inland "port"-এ ছড়িয়ে, নূতন ক'রে—Major ports বানানো হোয়েছে এবং হ'চ্ছে।

মনে রেখো—জহরলাল নিজ মুখে বলেছিলেন—"Calcutta is a Dead City"। যখন কেউ কেউ (দিল্লীতে) অনুযোগ ক'রেছে, তখন কথাটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বলে দিলেন—"I did not mean in that sense"—"গরু মেরে জুতো দান।"

মনে রেখো—Though Bengal has the greatest number of F. R. S. and far ahead of other scientists in the field of Physics none of them was trusted for Atomic undertakings.

মনে রেখো—যদিও বার বার পার্লামেণ্টে প্রতিজ্ঞা ক'রে declare করেছিলো যে encroachment of even one inch by Pak, will be considered an act of war and shall be resisted by entire force of the Govt, তবু Bengal এরই part দিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে।

মনে রেখো—যখনই নিজের, নিজেদের দরকার হ'বে—তখনই Constitution এর দোহাই দিয়ে কাজ ক'রে নেবে। আবার যেখানে ওদের স্বার্থতে Constitutionই বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—ঐ ধারাটি বদলে দেওয়া হচ্ছে।

মনে রেখো—Frantic efforts করা হ'চ্ছে। entire Hindi-speaking girdle কে যতটা তাড়াতাড়ি হতে পারে—ততটা তাড়াতাড়ি "আগে বাড়ানোর জন্য"। এই উদ্দেশ্য পূর্ত্তির জন্য ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির কোন বাধা মানা হচ্ছে না। কোনও রকমে—এদেরকে বাংলার চাইতে বেশী weightage এ নিয়ে আসা চাই-ই-ই॥

So, you see, it is starkly plain to a Nincompoop that, they are proceeding in a premeditated co-ordinated plan to stiflee Bengal, for ever.....

Oh! Boy! Boy! This is the the

stark naked factual truth—bare to its bones.

He has many skeletons in his cupboard—and he knows that, they might, might come out ONE DAY. So these frantic efforts.....Blast it all, Boy! Where are those howlers of Bengal?

মনে করে ছাখো : It is an International law-in-practice that when a country or people, to a man, wants something and suffers all sacrifices—That country or people gets it, Is n't it?

তবে ?! তোমরাই আমাকে বলে দাও—আমার বলা অতগুলো points এর মধ্যে—"কোন্নও একটার জন্যই শুধু"—ওই পরপদলেহীর দল এক সঙ্গে এক হোয়ে ঘেউ ঘেউ কোরচে ?!

বাংলায়—বাঙ্গালী সত্যই পরপদলেহী, পরদয়া-ভিক্ষাকারী, নীচ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, সজাত নিন্দুক, ঈর্ষাদ্বেষ-হিংসাতে হৃদয় ভরা কাপুরুষের জাত হোয়ে গেছে এক হাজার বছর থেকে। আশা করেছিলুম বাঙ্গালীরা জেগে উঠেছে। কিন্তু এ'যে দেখছি—বাঙ্গালী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে। বরং আরো বেশী। সম্পূর্ণ বাংলাদেশে (সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে) আমার আশা-বিশ্বাস-ভরসা জাগিয়ে রাখতো (এবং এখনো রেখেছে) বাংলার বিপ্লবী সন্তানেরা। এর মানে "'আধুনিক" বা "মাধ্যমিক" "তথাকথিত বিপ্লবীরা" নয়॥ আসল পুরোনো—জননী জন্মভূমির বিপ্লবী সন্তানেরা—তাঁদেরই কথা আমার হৃদয়ে আছে। মায়ের বিপ্লবী সন্তানদেরই মধ্যে সত্যকার শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রম, সত্য আদর্শের প্রতি অটুট দৃঢ়তা, আত্মবলিদান এবং শক্তি ছিলো। এই বিপ্লবীদের দেখেই আমার হৃদয় বোলতো,—

"না-না-না বাংলা এখনো ম'রেনি, বাংলা ম'রবে না; মর্ত্তে পারে না, জননী জন্মভূমি বঙ্গ মাতেশ্বরী নির্বীর্য্যা হন্‌নি। হোতো পারে না—না। বাংলার জাগরণের আশা আছে, বাংলা জাগবেই॥

এসো, ছাখো, এই বুড়োর জীর্ণ পাঁজরার ভেতোরে কিসের আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে—

বলো—বলো—

হও, ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর;
হও উন্নত শির নাহি ভয় !!!

ধারাবাহিক উপন্যাস

সাবিত্রী

মূল রচনা ঃ পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে

অনুবাদক ঃ পিনাকীপ্রসাদ ধর

তিরুপেট ঃ কুর্গ, মার্চ ১৯৪৬—জুন ১৯৪৭

তেত্রিশ

যুদ্ধ শেষ হবার পর জাপান থেকে ফিরে যাবার সময় আমি তোমাকে দুটো চিঠি লিখেছিলাম,—একটা লণ্ডনে, আরেকটা তোমার বাড়ীর ঠিকানায়। মনে হয় তুমি কোনোটাই পাওনি। এখানে একটা দু' মাসের পুরোনো চিঠি অপেক্ষা করছিল। চিঠির ঠিকানাতেই লিখছি ; যদি তুমি পাও।

শুরুতে সমস্ত ঘটনার একটা ছোটখাটো বিবরণী দিচ্ছি, কেননা এই চার বছরে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।

আমি তোমাকে নিশ্চয়ই আপ্পার সম্বন্ধে লিখেছিলাম। আপ্পা এরপর আর বেশীদিন বাঁচেননি। ওঁর নাম এখন চিরকালের জন্য আনন্দ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। ওই শেষ দিনগুলিতে প্রত্যেকেই আমাকে অনেক মনের জোর আর সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সরকারও আমাদের সঙ্গে বিদেশীর মতো ব্যবহার করেননি।

এর কয়েকদিন পরেই দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে একটি নতুন ঢেউ এসে লাগলো। তার ফলেই গড়ে উঠলো নেতাজীর আই, এন, এ, (আজাদ হিন্দ ফৌজ)।

প্রথম দিকে আনন্দ মিশনে থাকলেও পরে আমি ওসাকা সামরিক হাসপাতালে নার্সের কাজ নিয়েছিলাম। হাসপাতালের কাছেই ছিল থাকবার ঘর। এক হিসেবে এই সমস্ত অভিজ্ঞতাই আমার পক্ষে নতুন। কিন্তু কুর্গও যোদ্ধাদেরই জায়গা—আর আমি সেখানকারই মেয়ে। সুতরাং খুব তাড়াতাড়িই আমি কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম। আমাকে বেশীর ভাগ সময় ভারতীয় সৈনিক আর অফিসারদের দেখতে হোত।

মেজর অগ্নিমিত্র সেন ছিলেন আই, এন, এর সঙ্গে যুক্ত একজন ডাক্তার। তিনি ওসাকার সামরিক হাসপাতালেই কাজ করছিলেন। কাজের ব্যাপারে মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে দেখা হোত। তিনি ছিলেন খুব অল্প কথার মানুষ। মাঝে মাঝে দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। এ ছাড়া বাকী সময়টা কাজ নিয়েই থাকতেন তিনি। পরে সমস্ত পরিচয় আর ইতিহাস জেনে উনি আমার বিষয়ে একটু আগ্রহী হলেন। তাহলেও আগের দূরবর্ত্তী মনোভাবটা তিনি কখনোই ঠিক ত্যাগ করেননি। আমিও ওঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলাম। কিন্তু সে সব দিনে কেউ কারো কাছে আসতে পারতো না।

কয়েকদিন পরে জানতে পারলাম যে উনি আমাদের হাসপাতালেরই একজন জাপানী নার্সের স্বামী। একদিন মেজরের ঘরে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন উনিই ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেন। ওঁর স্ত্রী চলে

যাবার পর মেজর আমাকে বল্লেন এবার থেকে আপনি ওঁর একটু যত্ন নেবেন। আমি জানতাম কেন, মেজরের স্ত্রী অল্পদিন পরেই মা হতে চলেছেন।

এরপর থেকে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় মেজর সেনকে আরেকটু খোলামেলা বলে মনে হোত। আমিও সময় পেলেই মিসেস সেনকে দেখতে যেতাম। উনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। প্রসবের তখনো প্রায় দেড় মাস দেরী। আমি, এমনকি মিসেস সেনও বুঝতে পারতেন কেন মেজর এত উদ্বিগ্ন।

হঠাৎ একদিন ডকে বোমা পড়ার পর মেজর সেনকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই শোকে মিসেস সেন অনেক আগেই প্রসব করলেন। শিশুর জন্মের পরেই তাঁরও মৃত্যু হোল। তাঁর মেয়ে বীণা কিন্তু বেঁচে রইলো। এখন ওর বয়স আড়াই বছর। আমি ওকে এখানে নিয়ে এসে নিজের মেয়ের মতো বড়ো করে তুলেছি।

তুমি আমার জীবনে এসেছিলে কিন্তু আমাকেই চলে যেতে হোল। নিজের পুরোণো সত্তাকে হারিয়ে ফেললাম আমি। লোরের সঙ্গে দেখা হোল; ওর মধ্যে একটি সমর্পিত প্রাণ বন্ধুকে খুঁজে পেলাম—যে আমাকে কিছু দিতে চায়নি, কিছু নিতেও চায়নি আমার কাছ থেকে। আমার অজ্ঞাতেই বীণা আমাকে পূর্ণ মাতৃত্বের স্বাদ দিয়েছে। অনেকদিন আগে যেই আনন্দের কথা তোমায় বলেছিলাম গত ছয় বছরের তীব্র যন্ত্রণা আর দুঃখের মধ্য দিয়ে সেই আনন্দ যেন হঠাৎ আমার কাছে ঠিক্‌রে এসে পড়ছে।

এসবের মধ্যে আরেকটা রহস্য খুঁজে পেয়েছি আমি। এজওয়ার্থ ১৯৪৫ সালের তেসরা জানুয়ারী এই ভারতবর্ষেই মারা গেছেন। তার ঠিক আটমাস পরে—১৯৪৩ সালেরই তেসরা সেপ্টেম্বর বীণা জন্মেছিল। মনে হচ্ছে আমি যেন এজওয়ার্থের জন্যই জাপান থেকে একটি কুর্গী মেয়েকে নিয়ে এসেছি, যার বাবা বাঙালী আর মা জাপানী।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তুমি যেন অন্তত এই চিঠিটা পাও।

চৌত্রিশ

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি এখন ভীষণ, ভীষণ খুশী। তোমার প্রথম চিঠি পেয়েও আমার এত আনন্দ হয়নি।

আমি জানি তুমি কোথাও আছো, ভালোভাবেই আছো। কিন্তু মাঝে মাঝে কেন জানি আমার সমস্ত জোর চলে যায় আর নানা ধরণের চিন্তা আমাকে বড়ো কষ্ট দিতে থাকে। আজকে তোমার পরিচিত হাতের লেখা দেখতে পেয়ে আমি যেন আবার নিজেকেই ফিরে পেয়েছি।

যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে, তোমাকে কি এখনো বিদেশেই থাকতে হবে? তুমি বলেছো যথাযথ পড়াশুনো করে নিতে হলে তোমাকে এখনো আরো অন্তত একবছর চারমাস সেখানেই থাকতে হবে। কথাটায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু তাহলে অন্তরা কি করে বলতো?

আমার চিঠি পেয়েই অধ্যাপক যোশী মালন আর সুভাষকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। বীণা আর আমি ওদের সঙ্গে কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটিয়েছি।

এখন আমার প্রধান কাজ হচ্ছে বাবার কাগজপত্র, পাণ্ডুলিপি আর খসড়াগুলি গুছিয়ে নিয়ে প্রকাশের জন্য তৈরী করা। যুদ্ধের জন্য 'অভিজ্ঞতা আর বিকাশ' বই হয়ে বেরোতে একটু দেরী হয়ে গেল। এখন লণ্ডনের উইলসন আর টড সেটি প্রকাশ করবেন। যোশী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আগামী ছুটিতে আমি ওঁর খানিকটা সাহায্য পাবো।

লণ্ডন থেকে এজওয়ার্থের সলিসিটারদের চিঠি পেয়েছি এখানকার সমস্ত সম্পত্তি এজওয়ার্থ আমার নামেই উইল করে

দিয়ে গেছেন।...আমার প্রতি কতটা ভালোবাসা আর বিশ্বাস ছিল ওঁর।

লোরে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল তাহলে। কি বলেছিল ও? কতক্ষণ ছিল? আমাকে সমস্ত কিছু জানাবে কিন্তু।

হাতের কাজ একটু কমলে আমি সিমহাচলমে গিয়ে অধ্যাপক গুরুপদস্বামীর সঙ্গে দেখা করবো। আমরা সবাই যাবো।

তুমি জানতে চেয়েছো আমি ঠিক কি চাই। এই একই প্রশ্ন আমি তোমাকেও করতে পারতাম। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা এলোমেলো ভাবে অনেক কিছু পড়ে নিজেদের সমস্যার কথাই ভুলে গেছি। আপাতদৃষ্টিতে তোমার প্রতি আমার অতীত আর বর্তমান মনোভাব দুটি পৃথক ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। ছ'বছর আগে যে কেউ আমাদের মধ্যে একটা স্বেচ্ছামূলক দূরত্ব দেখতে পেতো, আর এই মুহূর্তে আমরা যেন ঈষৎ দূরত্ব নিয়েই মিলে গেছি। বাইরে কিন্তু এ সবের কিছুই নেই। আমার পৃথিবী আয়তনে বেড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ততটাই সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। যা হয়েছে তা কেবল একটি মাত্র ছবিকেই আরো বড়ো করে তোলা নয়। কিন্তু তবু আরো নতুন নতুন এলাকার অধিকারও আমি পাইনি। শুধু দিনের পর দিন প্রত্যেকটি অংশের অনুপুঙ্খ আরো বেশী জরুরী, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই বোধ ও চেতনাগুলিকে আমরা অত্যন্ত তীব্রভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পেয়েছিলাম বলেই এখন তাদের মধ্যে একধরণের বিবিক্তি অনুভবযোগ্য।

এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে তোমার অসুবিধে হবে না। পরিবর্তনের নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নেই,—সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আমার ধারণায় এর মধ্য থেকে যে সচেতনতা বেরিয়ে আছে সেটাই আরো বেশী প্রয়োজনীয়।

পঁয়ত্রিশ

আমার গত চিঠি তোমাকে পুরোপুরি খুশী করতে পারেনি জেনে আমিই সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে তোমার চিন্তার ধরণ আরো অনেক বেশী সজাগ।

তুমি ভালোবাসা চাও আর আমি তা চাই না? তাহলে এই ছয় বছর ধরে আমি তোমাকে কি দিয়েছি? শুধু আমি যা চেয়েছিলাম আর এখানো যা চাই তার নামটাকে জট পাকিয়ে ফেলিনি। আমাকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তোমার, টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল,—হ্যাঁ আমি যা লিখছি তা ভীষণভাবে সত্যি, সম্পূর্ণ সত্যি। বিশ্লেষণ করে কখনো কিছু পাওয়া যায় না। আমরা কেবল নিজেদের কাছেই অপরিচিত হয়ে যাই।

মনস্তত্ত্বের ভাষায় আমিও কথা বলতে পারি। নিজের ব্যবহারের একটা সুবিধাজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন,—তাই বাবার প্রতি আমার এতো অনুরাগ। এই ভালোবাসা বা পিতৃ-আসক্তির ফলেই অন্য একজন মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা ঠিক সেই পরিমাণে কমে গিয়েছিল। এই ভিত্তির ওপরেই লোরের প্রতি আমার অনুভূতি আর আরো অল্প একটু এগিয়ে বীণার প্রতি আমার মাতৃত্ববোধের ব্যাখ্যা করতে পারো তুমি, ধরো এই সমস্তই বিশ্বাস করে নিলাম, কিন্তু তাতেই কি আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমরা একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নিই। তোমাকে আমার প্রথম চিঠি লেখা, তিরুপেটে তোমাকে আমন্ত্রণ জানানো এ ধরণেরই সিদ্ধান্ত। তুমি চলে যাবার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এরকম আরেকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি তার পরিবর্তন করিনি। আমার ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি এ সব ক্ষেত্রে

আমাকে চালিত করেনি। কেবল আমি তোমার কাছ থেকে যে সাড়া চেয়েছিলাম তা পাওয়া গেল না। সাড়া পেলে আমি তোমার সঙ্গে যে কোনো জায়গায় চলে যেতাম, তোমার জন্যে সব কিছু করতাম। প্রত্যেক মেয়ে তার জন্মের মুহূর্তেই মা-বাবাকে ত্যাগ করতে তৈরী হয়ে আসে।

অবশ্য বলতে পারো তুমিও একটি উত্তর চেয়েছিলে আর আমার কাছ থেকে তা পাওনি। কি ভাবে এর জবাব দেবো? বাস্তবিক পক্ষে অনুরোধ এবং অনুমোদনের তোমার কথা না বলে আমাদের উচিত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো।

এ সমস্ত লিখে আমার এখন অস্বস্তি লাগছে। যদি দুঃখ পাও তাহলে আমাকে চিরকালের মতো ভুলে যেও।

ছত্রিশ

তুমি আমার চিঠির উত্তর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরবার আয়োজন করছিলে; এর মধ্যেই আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। কিন্তু আমি আরেকটু ধৈর্যশীল হতে চাই আর সে জন্য তোমাকেও ধৈর্য ধরতে বলবো।

লোরে কোনো খবর না দিয়েই এখানে চলে এসেছে। ভারতবর্ষ দেখতে নয়, আমাকে দেখতে। আমরা এখনো সমস্ত কথা শেষ করে উঠতে পারিনি। ও আর বীণা খুব বন্ধু হয়ে গেছে। এর ফলে বাড়ির অনেক সমস্যাই আর রইলো না।

তাহলে আমি পাবার আগেই তুমি আপ্পার একটি বই পেয়ে গেছো। আমি এখনো অপেক্ষায় আছি। যোশী বলছেন যে আপ্পার অনেক লেখা এখনো এখানে পড়ে রয়েছে। অবসর সময়ে সে সব গুছিয়ে নিতে হবে। ছুটির সময় তিনি সে সমস্ত ঠিক করতেই এখানে আসবেন।

মাঝে মাঝে এজওয়ার্থের অভাব খুব দুঃখ দেয় আমাকে। এমন কি বাবার জন্যও এতটা কষ্ট লাগেনা। এজওয়ার্থকে এখানে সবাই ভালোবাসতো ওঁর খোলামেলা স্বভাব আর অন্যদের সঙ্গে মিশে যাবার সহজ ভঙ্গির জন্য, আমি ওঁর বাড়িটাকে নাটকের জন্য আলাদা করে রাখবো, বাড়িটা নানা ধরণের শিল্প, নাটক, ব্যালে, গান আর গল্প বলার আসর হবে। আমার শেষ ব্যালেটি অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল লোরে সেটার ওপর কাজ করতে শুরু করেছে।

বীণা বলছে তোমাকে চিঠি লিখবে,—সবে মাত্র কয়েকটি অক্ষর চিনতে শিখেছে ও। মা চিঠি লেখে, ওকেও তাই লিখতে হবে। লোরেকেও লিখবার জন্য বলবো? তাহলে তোমাকে একেবারে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা যাবে। (অথবা লোরে কি তোমার আগে থেকেই চিঠি লেখে?)

পুনশ্চঃ বীণার চিঠি এই সঙ্গে দিয়ে দিলাম। কিছু কিছু অক্ষর নেই। সেখানে তোমাকেই ঠিক ভাবে পড়ে নিতে হবে। সমস্ত কিছু পরিষ্কার ভাবে বোঝাবার জন্য ও ডানদিকে একটুকরো সূর্য এঁকেছে। বাঁদিকে দুটো পাখির মতো ব্যাপার আগলে দুটো বাড়ি,—একটা ওর, একটা আমার। আর তুমি বাইরে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছো।

সাঁইত্রিশ

যতদিন যায় ততই পুরোনো স্মৃতিরা ভিড় করে আসে .....আমি আবার যেন আমার হারিয়ে যাওয়া গীটারটা বাজাচ্ছি.....রাজাম্মার কোলে মাথা রেখে ওঁর নতুন গল্প শুনছি। (বীণা আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও উনি এখনো আমাকে সেই ছোটটিই মনে করেন।).....এজওয়ার্থ ছোট্ট একটি কথা খুঁজে পেয়ে আমাকে খেপাচ্ছেন.....আপ্পার শরীর ব্যথা হয়েছে কিন্তু তিনি আমাকে গা টিপতে দেবেন না..... তুমি গাড়ী থেকে নেমে ঠিক আমার মতো দু'জন মেয়েকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেছো.....আমি অসুস্থ আর লোরে আমাকে হাসাবার জন্য পাগলের মতো ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে.....আপ্পার বক্তৃতা শেষ হয়েছে আর নামুরা ওঁকে

জড়িয়ে ধরেছেন……তিনদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত চোখ নিয়ে মেজর সেন এখনো অপারেশন টেবিলে কাজ করছেন। ওঁর দক্ষ হাত খুব দ্রুত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে……আমি এইমাত্র জাপান থেকে ফিরে এসে দরজার বাইরে ফুলন্ত গ্লুমেরিয়া দেখছি।

তুমি বীণাকে যেই চিঠিটা মনে করে দিয়েছিলে ও পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছে। চিঠির গল্পটা ও সবাইকে পরে শোনাচ্ছে এখন। দ্রৌপদী নিজের দামী শাড়ি ছিঁড়ে ফেলে কৃষ্ণের আঙুল বেঁধে দিচ্ছেন। আমি জানি তুমি কেন গল্পটা বেছে নিয়েছো।

লোরে ব্যালেটি সম্বন্ধে এখনো মনস্থির করতে পারেনি। 'চোর পঞ্চাশিকা'কে ও অবশ্য তুমি না আসা পর্যন্ত সরিয়ে রাখছে। 'নার্সিসাস আর প্রতিধ্বনি'র গল্প সবাই নিতে পারবে না। (অন্তত লোরের তাই ধারণা; কিন্তু কথাটা ঠিক নয়।) এখন আমি এক বেপরোয়া, সুন্দর রাজপুত্রের গল্প খুঁজছি। না পাওয়া গেলে আমাদের গল্পের সমুদ্র রাজাম্মা তো আছেনই।

তুমি মসলা দেওয়া মিষ্টিগুলি পেয়েছিলে তো? ওগুলো রাজাম্মাই অনেক ভেবে ভেবে তৈরী করেছেন।

চেষ্টা করে দেখো ওগুলো ঘুষ দিয়ে পরীক্ষা ছাড়াই একটা ডিগ্রী পাওয়া যায় কি না।

আটত্রিশ

পেছনের পাহাড়ে লোরে তোমার জন্য একটি ছোট বাড়ি তৈরী করছে। দুটো বড় ঘর আর সামনে পেছনে দুটো বারান্দা, আর তুমি যদি রান্নার ব্যাপারে উৎসাহী হও তাহলে একটা রান্নাঘরও থাকবে। আলোর যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবে। জানালার সংখ্যা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করা হবে না, বসবার ঘরে একটা ডিভান থাকবে যাকে বিছানা হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে, এ ছাড়া থাকবে একটি নীচু, লম্বা টেবিল (যেটায় অনেক ভিড় হলেও কিছুটা জায়গা ফাঁকা থাকবেই) আর যদি খুব দরকার বলে মনে করো তাহলে একটি বইয়ের তাকও থাকবে অনেকগুলো মাদুর, আর কয়েকটা ছোট টুল, একটা আয়না আর কাপড়-চোপড়ের ক্যাবার্ড দেবো তোমার যাতে খুব একটা অসুবিধে না হয়। লোরে বলছে: জিনিসপত্র খুব জমে গেলে মানুষরাই তখন ছুটে আসে। এলওয়ার্থি একবার বলেছিলেন যে একটি মানুষ আর একটি চেয়ারের চেয়ে দুজন মানুষই তাঁর বেশী পছন্দ।

প্রকাশকদের কাছে থেকে পাওয়া আপ্পার বইয়ের দুটো সমালোচনা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শব্দের সমস্যা বিষয়ে হিবার্ট জার্নলের সমালোচক যা বলেছেন তার সঙ্গে তুমি কতটা একমত? তাঁর মতে বইটার মূল প্রতিপাদ্য অনুযায়ী নাম হওয়া উচিত ছিল 'অভিজ্ঞতা: বিকাশ'। বইটার এখনকার নাম শুনলে মনে হয় অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিকে লেখক দুটো পৃথক অস্তিত্ব বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তাঁর বলার কথা সম্পূর্ণ অন্য কিছু। অভিজ্ঞতা আর বিকাশ দুটি ভিন্ন স্তরের প্রক্রিয়া। তারা কার্যকারণ সূত্রে যুক্ত নয়, দুটি ব্যাপারের মধ্যে একটি বিনিময়ের সম্পর্ক আছে। লেখকের এই ধারণা বইটির নামের মধ্যে আরো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এই ধারণার প্রতি আমারও কিছুটা সম্মতি রয়েছে। মেচারের আলোচনা অনুকূল হলেও অত্যন্ত ছোট আর গতানুগতিক।

অধ্যাপক যোশী আগামী সপ্তাহে পড়ানোর কাজে ইস্তাফা দিয়ে দিল্লীতে পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি পদ নেবেন্। মনে হয় তাঁর অনেকগুলি ভাষা বলবার ক্ষমতা আমাদের নতুন সরকারের কাজে লাগবে।

পরের বার চিঠি লিখবার সময় বীণাকে লিখতে ভুলো না যেন।

উনচল্লিশ

অবশেষে লোরে ওর মনঠিক করতে পেরেছে। আমার আগের ধারণা অনুযায়ী রাজাম্মাই এবারে আমাদের উদ্ধার করলেন। আমরা লাচ্চি আর ময়ূরের নাচ দিয়ে এজওয়ার্থ নাট্যসদনের (সংক্ষেপে এল্ হাউস্) উদ্বোধন করবো। বীণা হবে লাচ্চি আর লোরে ওর ঠাকুরমা, ময়ূর সাজবে তুমি। গান আর কথা আমি লিখেছি লোরে সমস্তটা পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছে। পেছনের সুর আর কথা রাজাম্মার তৈরী। জুলাই মাসে তুমি এলেই রিহার্সল শুরু হয়ে যাবে। এবার আর এড়ানো চলবে না, কোনো অজুহাতই শুনবো না আমি। নাচটা তোমাকে পুরোপুরি শিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। এবার (এবার যুদ্ধটা যেন আমাদের সবারই বিরুদ্ধে।) যদি একটু ভাবো তাহলেই বুঝতে পারবে ময়ূর কি আর সত্যি সত্যিই নাচে? ও এক পা তোলে……তার পরে শরীরের টাল সামলাতে পারে না, তখন সেই পা'টা মাটিতে রাখতেই হয়……তারপর আরেকটা পা তোলে। এ রকমই হতে থাকে বার বার, সারাক্ষণ যারা দেখে তারাই একে নাচ বলে। (এই কথাই আমি কোথাও পড়েছিলাম।)

নাটকের তারিখটা যেন খেয়াল রেখো: পনেরোই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল।

সমাপ্ত

অনিল ব্রাহ্মের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ২·৫০

"…সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" … (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·৫০

(তৃতীয় সংস্করণ)

"… নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে:

জয়শ্রী: ২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলি-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

নিগ্রহ ও দণ্ডবিধানের ইতিবৃত্তান্ত

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

যুগে যুগে মানুষ শত সহস্র উপায়ে আনন্দ উপভোগের রসদ সন্ধান করেছে। গান বাজনা ছবি আঁকা কবিতা খেলাধুলো ত' আছেই। এ ছাড়া সবল দুর্বলের ওপর নানারকমের নিপীড়নের মধ্যেও পেয়েছে তীব্র আনন্দ। আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত এর শত সহস্র নজির ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। এই সেদিনও ইভতুশেংকোর কবিতায় উসুরি নদীর তীরে একটি রুশ সৈনিকের ওপর চীনা সৈন্যের মর্মন্তুদ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত পেয়েছি :

"মা তার জন্যে খেত থেকে শশা
তুলে রেখেছিলেন
কিন্তু তাঁর ছেলে এখন পড়ে আছে
উসুরি নদীর রক্তাক্ত দুয়ারে
প্রথমে ওরা তাকে খুব সামনে থেকে গুলি করেছে
তারপরে খতম করেছে বেয়নেটে খুঁচিয়ে।"

আবার নিরপরাধ ভিয়েতনামীদের ওপর মার্কিন সৈন্যদের অত্যাচারের কাহিনীও কারো অবিদিত নয়। আইখম্যানের কাহিনীও আমাদের সন্ত্রস্ত করেছে। ইতিহাসের পাঠক জানেন নাৎসীশিবিরের অত্যাচারের কথা। আর মুক্তি-পাগল ভারতীয়দের ওপর বৃটিশরাজ শক্তির জালিয়ানওয়ালাবাগে নিপীড়নের নারকীয় উল্লাস।

বিশ্বপ্রেম, বৌদ্ধদর্শন, উপনিষদ ও বৈষ্ণব ধর্মের যে আদর্শ ভারতকে শ্রেষ্ঠ জাতির সম্মান দিয়েছে সেখানেও অপরাধীর শাস্তি প্রদানে মৃদুতা লক্ষ্য করা যায় না। সূর্পনখার নাসাছেদন, খাণ্ডবদাহন, জনমেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ, জতুগৃহদাহ ও আরো অনেক পৌরাণিক কাহিনী আমার ঐ সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য দেবে। বৌদ্ধধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে ও পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মকে বিনষ্ট করবার জন্য বিধর্মী, নাস্তিকরা কাফের আখ্যা দিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নরহত্যার রক্ত লীলায় মত্ত হয়েছে। শাস্তি প্রদানের আদি কাহিনী বাইবেলে রয়েছে। নিষিদ্ধ ফল খাবার ফলে আদম ও ইভের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ। প্রায় সবদেশের পুরাণেই মৃত্যুর পর পাপাত্মার নরকবাসের ভীতিপ্রদ দৃষ্টান্তের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই নিপীড়ন-নিগ্রহ-দমন-দলনের আশ্চর্য ও রোমহর্ষক সব প্রক্রিয়া-প্রণালীর কথা ইতিহাস থেকে জানতে পারি।

সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে দণ্ডবিধান কেবল প্রকৃতিদত্ত বা ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন থাকল না, ক্রমে ক্রমে মানবসমাজ বা সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের আওতায় এসে পড়ল।

মায়ের সামনে শিশুহত্যা, তিলে তিলে দগ্ধ করে মেরে ফেলা, নারীধর্ষণ, গরম তেলে ফুটিয়ে মেরে ফেলা শূলে বিদ্ধ করা, বন্য পশু দিয়ে খাওয়ানো এবং জনসমক্ষে অপরাধীর প্রাণনাশ করে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, শাসনকর্তাদের কাছে একান্ত আবশ্যক বলে মনে হল। রাষ্ট্ররক্ষার জন্য দণ্ডবিধানের গুরুত্ব সবযুগের শাসনকর্তারাই উপলব্ধি করেছেন।

কংসের কাহিনী আমরা জানি। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের

বিনষ্ট করবার জন্য জন্মের সংগে সংগে সে তাদের কঠিন শিলার ওপর আছড়ে মেরেছে।

এমনি করে সিরিয়ার রাজা আন্তিওকাস একদিন ইহুদি নিধন করেছিলেন। মিশর অভিযান থেকে তিনি ফিরে এসে যখন শুনলেন যে প্রবল প্রতাপান্বিত আত্মাভিমানী ইহুদিরা তাঁকে মারবার চেষ্টা করছে তখন প্যালেস্টাইনে ফিরে তিনি দুটি শিশুর মুণ্ডছেদন করে তাদের মায়েদের গলায় ঝুলিয়ে জেরুসালেমের প্রাচীর থেকে ফেলে হত্যা করেছেন। শুধু তাই নয় বিপ্লবীদের সন্ত্রস্ত করবার জন্যে আন্তিওকাস তাদের নিষিদ্ধ মাংস খাইয়েছেন। দেবতাদের অপদস্থ করেছেন। শিশু হত্যা করতেও দ্বিধা করেন নি। প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙে দেবার এমনই এক মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ "বন্দীবীর" কবিতায়।

সুবিচারক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রজারঞ্জক রাজারাও কঠিন দণ্ডবিধানের বাঞ্ছনীয়তা স্বীকার করেছেন। পবিত্র রামরাজ্যেও সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ও বনবাস অসমর্থিত হয়নি।

অসিরীয়রা যুদ্ধকালে ব্যাপক গণহত্যার দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করত। শত্রুকে বশে আনবার জন্য এই সন্ত্রাস-কৌশল বা "terror tactics" সব যুগের ইতিহাসেই রাষ্ট্রনায়করা এক একভাবে প্রয়োগ করেছেন।

গত মহাযুদ্ধে জার্মানরা আলোকচিত্র প্রচার করে প্রতিপক্ষ দেশগুলিকে দেখিয়েছিল কি ভাবে তারা ওয়ারস ব্রুসেল্‌স্ প্রভৃতি যায়গা ধ্বংস করেছে।

বৈরসাধনের (Retaliation) এমনই একটা ভয়াবহ নজির রয়েছে খৃষ্ট পূর্ব ৪১৬ তে এথেনীয়রা যখন মেলস-দ্বীপ ধ্বংস করে। শান্তিপ্রিয় মেলস দ্বীপের অধিবাসীদের ওরা নির্বিচারে হত্যা ক'রে নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস করে রাখে। কিন্তু তার প্রতিফল ভোগ করেছিল এথেন্স। এর আশি বছর পরে আলেকজাণ্ডারের এই সন্ত্রাস-কৌশল অবশ্য খুব কার্যকরী হয়। তিনি যখন ভারতের মাটিতে যুদ্ধ করছেন তখনও স্বদেশে তাঁর বিপক্ষে কোনো জাতীয় অভ্যুত্থান হয় নি।

যুদ্ধে, বিপ্লবে, গণ-অভ্যুত্থানে এই সন্ত্রাসকৌশল সব সময় রাষ্ট্রিক প্রয়োজন সিদ্ধ না-ও করতে পারে। সিপাহী বিপ্লবে নির্মম শ্বেতাংগ হত্যাকাণ্ড বৃটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে আরো নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাত নিয়ে এসেছিল। আজ ভিয়েতনাম ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইংগ-মার্কিন উপনিবেশবাদ ও জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ এবং তারো আগে হিরোসিমা-নাগা-সাকির ধ্বংসকে মনে হতে পারে একটা রাজনৈতিক প্রয়োজন। কিন্তু এতে কেবলই মৃত্যুর পাহাড় জমছে। আক্রান্ত হবার আশংকায় পাল্টা আক্রমণের ঢেউ আসছে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে। আজ তাই সুস্থ সচেতন মানুষ এই সমরানলের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, ততঃ কিম্।

ক্লাসে পড়াবার সময় ছাত্রদের বেয়াদপি দমিয়ে দেবার জন্যে শিক্ষক বেত দেখিয়ে সব সময় কার্য উদ্ধার করতে নাও পারেন। একটা অবদমিত প্রতিশোধের বাসনা তখন ছাত্রদের বিকৃত পথে চালিত করে।

অথচ নিপীড়ন-দলনের একটা প্রয়োজনমাফিক প্রস্তুতির জন্যই রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনী বা পুলিশকে প্রস্তুত রাখে। একথা বঙ্কিমচন্দ্র "বাহুবল বাক্যবল" প্রবন্ধে ভাল করে বুঝিয়েছেন।

রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে আজ সাম্যবাদের ব্যাকরণ যতই বদলাক একদিন উভয়তই নয়া সমাজব্যবস্থা চালু করবার জন্য পুরানো ক্ষতকে নির্মমভাবে অপসারিত করতে হয়েছে। এজন্য ব্যাপক নরহত্যার ঘটনাও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অবধারিত হয়েছে। আজ যে সোবিয়েতে বিশ্ব-সংস্কৃতির অবাধ প্রবেশ ঘটেছে, একদিন তাকেই সৌ-বর্মে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করতে হয়েছে।

কিন্তু নির্যাতনের চেহারাটা সকল সময় রাষ্ট্রীক প্রয়োজন-ভাত্তিক না হতেও পারে।

আঘাত দিয়ে আনন্দ পাবার যে বৃত্তিকে মনস্তত্ত্বে "Sadism" বলা হয়েছে, তার কী ভয়াবহ স্বরূপ ও বিচিত্র রকমের উদ্ভাবন যুগে যুগে হয়েছে সে সবের খতিয়ান করতে গেলে অবাক হতে হয়।

নির্যাতন, অত্যাচার, আঘাত, বা শাস্তি-প্রদানের দেশ-কাল ভেদে প্রকারভেদ আছে।

প্লুটার্কের বিবরণ থেকে প্রাচীন পারস্যের এক অদ্ভুত শাস্তি-প্রদানের কথা জানা যায়। অপরাধীকে একটি নৌকোর হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুইয়ে রেখে হাত পা বের করে মুখময়, চোখে ও সারা গায়ে মধু বা মাদক দ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়া হত, তার ফলে ক্রমাগত বিষাক্ত কীটপতংগ ও মৌমাছির ভীড় জমত। তাদের কামড়ে বেচারা শুধুই যন্ত্রণায় চীৎকার করত; কতক গিয়ে ঢুকতো তার নাকে মুখে ও পেটে আর এমনি করে তিলে তিলে তার মৃত্যু ঘটতো। এইভাবেই পারস্যের এক উদ্ধত বীর যুবক মিথিরাইদাতেসকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। পাকিস্তান পুলিশের হাতে ধরা পড়ে একটি হিন্দু যুবক এইভাবে নির্যাতিত হয়েছিল, এক প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর কাছে শুনেছি—অবশ্য সেক্ষেত্রে নৌকার বদলে টেবিল বা তক্তার ব্যবহার করা হয়।

ঐতিহাসিকরা বলেন গ্রীকরা স্বভাবত নিষ্ঠুর ছিল না তবে কখনও কখনও, বিশেষত এথেনীয়রা মৃত্যুতাণ্ডবে খেপে যেতো। তবে খৃঃ পূঃ ৪১৬তে সক্রেটিসকে হেমলক পান করিয়ে হত্যা করার ঘটনা ইতিহাস-বিশ্রুত। এবং কোনো কোনো অত্যাচারী নরপতির আমলে গাছের সংগে বা মস্ত চাকার সংগে বেঁধে পাক খাইয়ে অথবা স্ববেশিনী নারী মূর্তির অন্তরালে লোহার পেরেক প্রচ্ছন্ন রেখে তার ওপর আছড়ে ফেলে মানুষ মারবার বিচিত্র কৌশলের কথা জানা যায়।

অনেকে মনে করেন বনবাস দণ্ডবিধানের ইতিহাসে প্রাচীনতমরীতি। রামায়ণ ও মহাভারতে বনবাস পর্বই একটি প্রধান ঘটনা বলতে পারা যায়; আদম-ইভের নির্বাসনের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু আধুনিক কালেও নির্জন দ্বীপে কারারুদ্ধ করে রাখা বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করে শাস্তি বিধানের প্রথা একেবারে অচল হয়ে যায় নি।

ফাঁসী দেওয়া অথবা শূলে চড়ানো কিংবা গিলোটিনের সাহায্যে প্রাণদণ্ড দেওয়ার কথা আমাদের নিতান্ত পরিচিত।

ইংলণ্ডে অলুক্ষুণে মেয়েদের ডাইনি সাব্যস্ত করে এক সময় মেরে ফেলবার একটা সংস্কার সমাজে অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। জোয়ান অব আর্ককে ইংরেজরা যাদুকরী ডাইনি মনে করে রুইয়েনের বাজারে সর্বসমক্ষে অগ্নি দগ্ধ করেছিল। ব্লাডি মেরীর ছেলে প্রথম জেম্‌স্ যখন রাজা হলেন তখন সারা দেশ জুড়ে ডাইনি নিধনের এক লাভজনক ব্যবসা ফেঁদেছিলেন হপকিন্স সাহেব। তাঁর নামই হয়ে যায় "Witch finder" ডাইনি সাব্যস্ত করবার নানারকম টোটকা তুকতাকে তিনি নাকি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই করে তখনকার দিনে তিনি বছরে প্রায় হাজার পাউণ্ডেরও ওপরে লাভ করতেন। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের তিনটি ডাইনির ভূমিকা কেবল শিল্পীর কষ্টকল্পনা নয়। ডান বা ডাইনির কু-সংস্কার খানিকটা আমাদের দেশেও ছিল। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখেছিলাম বাংলাদেশেরই কোনো এক গ্রামে দুই নিরপরাধা গরীব মা-মেয়েকে ডাইনি মনে করে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। আর রাজস্থানের অনাবৃষ্টির বাধা দূর করবার জন্য শিশুমেধ-যজ্ঞও এই সেদিনের কথা।

অবশ্য Daniel, P. Manix তাঁর History of Torture বইতে এসিয়াবাসী, বিশেষত চীনাদের "নিপীড়ন শিল্পী" ("famous for their elaborate and ingeni-

ous tortures")) বলে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু হিটলার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ইউরোপীয় দেশের শাসনকর্তারা যে আশ্চর্য ভয়াবহ নির্যাতন শিল্পের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তার সংখ্যাও ত বড় কম নয়।

ঐতিহাসিকরা বলেন জঙ্গিস খাঁ প্রায় সতের লক্ষ সাত চল্লিশ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু হিটলারের নরমেধ যজ্ঞে ষাটলক্ষেরও বেশি লোকের প্রাণ গেছে। ১৯৩৩ সালের ২২শে মার্চ দাচাউ বন্দী শিবিরে হিমলার যে কলঙ্কিত অত্যাচারের নজির দেখিয়েছিলেন তা জার্মানীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

আগেই বলেছি মানুষের শোণিতপিপাসা এক আদিম প্রবৃত্তি; তাকে দেশকাল ধর্ম বা সভ্যতা দিয়ে বিচার করা চলে না।

সুসভ্য ইংরাজরা ভারতবর্ষে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়ে রাষ্ট্রীয় দুর্নামের ভাগী হয়েছিল তাদের নিজের দেশে। আইন সভায় বার্কের কণ্ঠ সেদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, সবাই তা জানি।

যে মোগলসম্রাট শাজাহান তাঁর সৌন্দর্য ও রুচিবোধের জন্য কবির বন্দনা লাভ করেছেন ও ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি তাঁর কন্যা জাহানারার এক গোপন প্রণয়ীকে গরম জলে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের সভায় বসে একদিকে যখন জয়দেব গীত-গোবিন্দ রচনায় নিয়োজিত, সেই সময়ই অপরদিকে কত বিচিত্র অপরাধ ও তার শাস্তিবিধানই না সংঘটিত হয়েছে। সেক শুভোদয়া লিখছেন লক্ষ্মণ সেনেরই এক শ্যালক এক রূপসী সুবর্ববণিক কন্যার বস্ত্রাকর্ষণ করেছিলেন প্রত্যক্ষ রাজপথে। ফলে তাকে গাধার পিঠে উল্টোমুখো বসিয়ে সমস্ত শহর পরিক্রমা করানো হয়েছিল। কারণ তখন মনে করা হত বণিক অস্পৃশ্য।

ফরাসী আমলের চন্দননগরে "তোরমা ঠোকা" বলে একরকম শাস্তির বিধান ছিল। মদ্যপলম্পটদের এই রকম সাজা দেওয়া হত। অপরাধীকে দাঁড় করিয়ে হাত বেঁধে দিয়ে খড়মের মত একটি প্যাঁচালো কপিকলের সাহায্যে পা দুটোকে দুই প্রান্ত পর্যন্ত টান করে রেখে বেত্রাঘাত করা হত। অথবা হাতুড়ির সাহায্যে পায়ে বা অন্য কোনো প্রত্যঙ্গে আঘাত করা হোতো। তোরমা কথাটি ইংরেজি torment থেকে এসেছে, যার অর্থ দৈহিক যন্ত্রণা।

১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত কেনিয়ায় মাউ মাউ অভ্যুত্থানের ফলে প্রায় বারো হাজার আফ্রিকান নিহত হয়। এই রক্তপ্লাবী আন্দোলন দমন করতে গ্রেট বৃটেনের খরচ হয়েছিল প্রায় একশো পঞ্চাশ লক্ষ ডলার।

বিশ শতকে বিদ্যুৎ শক্তি নিগ্রহ নির্যাতনের সবচেয়ে বড় সহায়। 'শক' দিয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো এবং চেয়ারে বসিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট করে মেরে ফেলা আধুনিক কালের অনেক দেশের শাস্তিবিধানের চরম পরাকাষ্ঠা। আর্জেন্টিনার পুলিশ কমিশনার লোম্বিলা কয়েদীদের ভিজে পোষাক পরিয়ে বিদ্যুতের প্রতিক্রিয়া তীব্রতর করবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাশিয়া, আমেরিকা ও পরাধীন ভারতে মানসিক অত্যাচারের শত সহস্র কাহিনী যুদ্ধের দলিলে ও পুলিশী রেকর্ডে উল্লিখিত আছে। আসামীর নেড়ামাথার ওপর ফোঁটা ফোঁটা করে বরফ জল ফেলা; দিনের পর দিন ঘৃণ্য অন্ধকার কারাকক্ষে আটক রেখে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক বন্দী শিবিরের এক কয়েদীকে শত শত প্রশ্নের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একবার করে জিজ্ঞাসা করা হ'ত আপনার নামটাত বললেন না?)

রাত্রিতে হাজার হাজার শক্তি সম্পন্ন আলো জেলে রেখে নিদ্রাতুর কয়েদীকে ঘুমোতে না দেওয়া, ও আরো কত ভাবে মানুষের মন ও স্নায়ুকে নির্মমভাবে নষ্ট করে দেওয়ার পন্থা এখন উদ্ভাবিত হয়েছে যার কাছে দৈহিক নির্যাতনও

হয়ত অনেকটা হালকা বলে মনে হবে। অগ্নি যুগের এক বিপ্লবী বন্ধুর কাছে শুনেছি উদয়পুর জেলে আটক থাকবার সময় ক্রমাগত অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কারাকক্ষে থাকতে না পেরে তাঁরই এক বন্ধু পাগলের মত নিজের কাপড় খুলে উলংগ অবস্থায় উঁচু একটা গর্তের ওপর কোনোরকমে ছুঁড়ে আটকে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, আর বার বার বলে ছিলেন, 'আলো দেখব আলো, সূর্য উঠছে।'

আজকের দণ্ডনীতিতে এই Brain Washing বা মস্তিষ্ক বিকলনের প্রক্রিয়া দারুণ মর্মান্তিক!

নিপীড়নের ইতিহাস পড়লে জানা যায় কোনো-যুগে কোনো দেশে কোনো শাসন-ব্যবস্থায় মানবসমাজে দেবলোকের দৃষ্টান্ত সুলভ ছিল না। দমননীতিই আজ অবধি মানুষকে পশুসমাজ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এমন কি আমাদের শিরোধার্য গীতাতেও ভগবান দুষ্কৃতের বিনাশের কথা বলেছেন।

ক্ষমতার নেশাই মানুষকে নবনব ইতিহাস রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনে দুষ্ট দমনের যে অধিকার ক্ষমতাবানের হাতে দেওয়া হয়েছে তার চরমসীমায় যখন নিরপরাধকে নিজিত হতে দেখা গেছে তখনই যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মানবপ্রেমিক শান্তি ও বিশ্বপ্রেমের বাণীতে পৃথিবীকে কলংকশূন্য করবার জন্য আবির্ভূত হন।

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক সডাক ১০·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।
কবিতা সম্বন্ধেও একই নিয়ম।

৪. রচনা ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাকটিকিট লেখার সঙ্গে দিতে হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়

প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী
২৫১এ/৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
পোঃ নাকতলা
কলিকাতা-৪৭

সাক্ষী

নমিতা রায় চৌধুরী

বিশ্ববিশ্রুত I. N. A. Trial শেষ হয়েছে। বন্দীরা সবাই মুক্তি পেয়েছেন।

কর্ণেল রাও-ও ছাড়া পেয়েছেন। তিনি বোম্বাইতে এসে আছেন। এখানেই তিনি ডাক্তার হয়ে বস্‌বেন স্থির করেছেন। তবে তিনি আর এখন নিঃসঙ্গ নন। সঙ্গে তাঁর নব-বধূ কোয়াসীমা। এঁকে তিনি যুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরেই বিয়ে করেন। তাঁর বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলেন ওটী তাঁর 'war booty' লড়াইয়ের লুটের সেরা মাল। কর্ণেল মৃদু মৃদু হাসেন।

কোয়াসীমার জীবন বড়ই এক বিচিত্র ইতিহাস। সে ছিল জাপানের "গেইসা-গার্ল"। যৌবনের মোহমদিরায় ঘর ছেড়ে একটি যুবকের সঙ্গে আনন্দ হিল্লোলে সিঙ্গাপুরে এসে বাসা বাঁধে। তারপর যা' হয় তাই হোল। রূপের মোহ দুদিনেই কেটে গেল। ওকে একা ফেলে যুবকটি সরে পড়লো। এই নিষ্ঠুর ধাক্কায় কোয়াসীমার মোহের জাল ছিঁড়ে গেল, কিন্তু সে দমলো না। সে রূপসী গায়িকা ও নর্ত্তকী। বাক্‌চাতুরীও তার অপূর্ব্ব। সে সিঙ্গাপুরের Aristooratic Society'র পরম আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল। শ্রাবণের ধারার মতো মণি-মুক্তা অর্থ সম্পদ তার মুঠোর মধ্যে আস্‌তে লাগলো। কিন্তু এততেও সে তার মনের রূপ হারাল না। অবসর সময়ে সে পড়াশুনা করতো। ক্রমশঃ সে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ "ধর্ম্মপদ" পড়লো, সেই মহান উক্তি "মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া" অর্থাৎ মনই ধর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বগামী—সে দিন থেকে এইসব চিন্তাধারা তার মনের গভীরে শিকর মেলে বসল।

ডাক্তার রাও সিঙ্গাপুরের নামজাদা ডাক্তারদের মধ্যে অন্যতম। তা ছাড়া তিনি একটু উদার ও উদ্দাম প্রকৃতির। খেলাধুলা, সভাসমিতি থিয়েটার-ক্লাব সবটার মধ্যেই তিনি আছেন। এইজন্য তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র। তাঁরা ওখানকার বহুদিনের বাসিন্দা। তাঁর পিতামহ ব্যবসা উপলক্ষে বোম্বাই থেকে সিঙ্গাপুরে গিয়ে বাস করেন। বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। ডাক্তার রাও-এর পিতাও ডাক্তার ছিলেন, ওদেশে ওঁদের খুবই খ্যাতি ছিল।

কোয়াসীমার অসুখে-বিসুখে তার চিকিৎসার জন্য ডাঃ রাও মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে যেতেন। ক্রমশঃ ডাঃ রাও-এর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যেতে লাগল। রোজই বিনা দরকারে কোয়াসীমার বাড়ী যাতায়াত সুরু করলেন; এমনি করে দুজনের মনের কথা দু'জনেই বুঝতে পারলেন। সহরে বেশ কানাকানির মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিও শোনা যেতে লাগল।

তারপরে ক্রমশঃ এমন হোল যে ডাঃ রাও-এর বাড়ী ফেরার সময় হলেই হাস্যময়ী কোয়াসীমা কেমন আন্‌মনা হয়ে পড়ত—ডাঃ রাও দরজা অবধি গিয়ে ঘুরে তাকালে চোখাচোখি হ'তেই কোয়াসীমার চোখ ভিজে উঠত।

এমনি সময় নেতাজী হঠাৎ সিঙ্গাপুরে এসে I. N. A. বাহিনী গড়ে তুল্লেন। দেশের জন্য, দশের জন্য, উৎপীড়িত-

জর্জ্জরিত লক্ষ লক্ষ মানুষের দাসত্বের বাঁধন কেটে মুক্তি দেবার জন্য, জলন্ত আগুনের ভাষায় সকলের নিকট তেজোময়ী আহ্বান জানাতে লাগলেন—তাঁর ঐ শহীদ মহাযজ্ঞে সকলের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে সহায়তা করবার জন্য ডাক্ দিলেন।

তাঁর সেই ডাকের আবেগে কত শত লোক তাদের সর্ব্বস্ব তাঁর পায়ে ঢেলে দিল, একজন তো তাঁর ধন দৌলত যা কিছু ছিল সব তো দিলোই, এমন কি তার সাত বছরের শিশু পুত্রকে নেতাজীর হাতে সমর্পণ করলো। এ সব ইতিহাস বলবে, এ যেন সব যাদু-কাহিনী।

কোরাসীমাও সেই ডাকে বিভোর হয়ে তার ধনসম্পদ মণিমুক্তা-সোনাদানা-বাড়ীঘর; এক কথায় তার সর্ব্বস্ব প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকার সম্পদ নেতাজীর হাতে সমর্পণ করলো। নিপীড়িত জনগণের মঙ্গলের জন্য ভগবান বুদ্ধের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে শান্ত মনে ফিরে এল। সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল তার এই ত্যাগ দেখে। রাও এবং অনেকেই সেখানে হাজির ছিলেন। পুরানো সব কিছুই কোরাসীমার জীবন থেকে জীর্ণ-পাতার মতো খসে পড়ল—তার জীবন আবার নতুন করে সুরু হোল।

ঐ দিন ডাঃ রাও নতজানু হয়ে নেতাজীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে তাঁর বাহিনীতে যোগদান করলেন। এরই কিছুদিন পর ডাঃ রাও কোরাসীমার প্রতিটি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে জীবনসঙ্গিনী করে নিলেন।

বোম্বাইতে মালাবার হিলস এর ওপরে ডাঃ রাও এর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুশান্ত বরাটের অতি আধুনিক সুন্দর বাংলো বাড়ী। সুশান্তর স্ত্রী মিসেস কবরী বরাট বোম্বাই-র মহিলা সংস্কৃতি সংঙ্ঘের সেক্রেটারী।

আজ সুশান্তদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাঃ রাও সস্ত্রীক এসেছেন। "Rising Sun" দেশের মেয়েকে মহিলা-সংস্কৃতি সংঙ্ঘ আজ সকালে এক অভ্যর্থনা সভায় আহ্বান করেছেন। সীমা ও কবরী সভায় গিয়েছে। দুই বন্ধু বাংলোর বারান্দায় বসে গল্প করছেন।

বাংলোর সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন; তার চার দিকে কেয়ারী করে ছাঁটা ফুলগাছ; চিত্র-বিচিত্র পাতাবাহার লতা, গুল্ম, অর্কিডস, রডোডেনড্রন গুচ্ছ; আরো কত কি সাজানো। দিকে দিকে সুরুচির পরিচয়। নানা রং এর ফুলের ফসল ফলেছে। তার উপর সকালের সোনালী রৌদ্র পড়ে চারিদিক যেন হাসিতে খুসীতে ভরে গিয়েছে। ল'নের শেষ প্রান্ত যেখানে একটু একটু ঢালু হয়ে নিম্নগামী —ঠিক তার মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড য়ুক্যালিপ্‌টস গাছ। তার পাতাগুলো হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। সুশান্ত একটা চুরুট ধরিয়ে বললো: "আচ্ছা তারপর বল—শুনি রাও-কোরাসীমা মিলন কাহিনী"। রাও তার পকেট থেকে একটা ডায়রী বের করে খুলে পড়া সুরু করলো "সুন্দরী মেয়ে তো জীবনে অনেক দেখেছি—কিন্তু তারা কেউই মনের পটে কোনও রেখাপাত করতে পারে নি। কোরাসীমাকে দেখা মাত্রই আকৃষ্ট হলাম, তার সৌন্দর্য প্রভাতের মতো স্পষ্ট, তার মুখে চোখে কি বুদ্ধির ছাপ! একটা শান্তির রূপ যেন তাকে ঘিরে রয়েছে। ক্রমশঃ তার মনের রূপেরও পরিচয় পেতে থাকলাম। স্নেহ, মায়া, মমতা, সৌজন্য এ সব তো হামেশাই মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু কোরাসীমা মধুর—অপূর্ব্ব তার দরদী মন!

সুশান্ত বলে উঠল: তুমি ডাক্তার; সায়েন্সের ছাত্র। তাই তোমার এই কাহিনী যে কাব্যের স্বপ্ন নয় তা বিশ্বাস করছি। তবে কি জানো?···

রাও তাকে থামিয়ে বললো: অধৈর্য্য হও কেন ভাই! আগে সবটা শোন।

"আচ্ছা বলো"—বলে সুশান্ত তার দিকে তাকাল। সদ্য ফোটা লাল লাল গোলাপের গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে রাও পড়তে লাগল "কোরাসীমা সত্যিই পদ্মফুলের মতোই নির্ম্মল-

সদা হাস্যময়ী। মলিনতা তার মধ্যে কিছুই নেই। সে রূপোপজীবিনী কখনও ছিল না। আমোদ পরিবেশন করতো, নাচে, গানে সবাইকে মোহিত করে রাখ্‌তো। কিন্তু তাই বলে সে নিজেকে হারায় নি। এই সত্য আমি নানা ভাবে জান্‌তে পারলাম।"

সুশান্ত মন্তব্য করলো "কষিত-কাঞ্চন—কেমন?"

রাও একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললো "হ্যাঁ ভাই! ঠিক তাই।"

চুরুটের বাক্সটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে সুশান্ত বললো "কি ভাবছ? থামলে কেন?"

রাও বলল: না ঠিক ভাবছি না। কোয়াসীমার উপর আমার প্রথম আকর্ষণের ঘটনাটা মনে এল তাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। তখন বর্ষাকাল। মেডিক্যাল ইউনিটের চেম্বারে বসে আছি রোগীর খুব ভীড; একজন এসে বললেন কোয়াসীমা খুবই অসুস্থ একবার যদি দয়া করে দেখে আসেন। তখন তো সীমা তার সব কিছু দান করে একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে গেছে। অবশ্য তার আগে থাকতেই ওর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল।

যাই হোক্ গিয়ে দেখলাম যে একদম বেঁহুস হয়ে ঘরের মেজের উপর পড়ে আছে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে তার মাথায় জল দিয়ে বাতাস করছে, জ্ঞান একদম নেই, দেখে কেমন মায়া হোল। খাটের ওপর বিছানায় শুইয়ে দেবার জন্য তাকে আড়কোলা করে ধরে তুলতেই সে চোখ মেলে আমাকে দেখে কাঁদতে লাগল। "বড় যন্ত্রণা" বলে সে এলিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ব্যাগ্ থেকে ওষুধ বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে—খাইয়ে দিতে বলে পাশের ঘরে এসে বসলাম। তার এই অসহায়তা, আমার ওপর এই নির্ভরতা—তার স্পর্শ সব মিলিয়ে আমাকে কেমন বিহ্বল করে ফেললো।

জানো বরাট্! ওকে দেখে আমার শুধু মনে হতে লাগল সেই সুপ্রাচীন বৈশালী নগরের বিখ্যাত নটি আম্রপালির কথা। জানো তো আম্রপালি তার সারা জীবনের উপার্জ্জিত ধন-সম্পদ ভগবান বুদ্ধের শরণে উৎসর্গ করে তাঁর জন্য একটি "বিহার" ও একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়ে ধন্যা হয়েছিলেন। আম্রপালির মুক্তির এই আদর্শ যেন কোয়াসীমার মধ্যে পুরোপুরিই ছিল।

সুশান্ত বললো হ্যাঁ ঠিক ঠিক। এপারের সব কড়ি দিয়ে তিনি খেয়া-পারের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তাই সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তে পেরেছিলেন।—

রাও মৃদু হেসে বললেন: জান সুশান্ত তার ঐ "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি" ভাবটাই আমাকে বিশেষ করে অভিভূত করে ফেলেছিল। কেবল মনে হচ্ছিল আমরা এদের দিয়ে আমোদ করে এদের সব রস নিংড়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিই—গ্রহণ করে এদের জীবনকে কেন সুন্দর সার্থক করি না। মন স্থির করে ফেললাম—একে আমি বিবাহ করবো।

ধীরে ধীরে ওকে সুস্থ করে তুল্‌লাম। তারপরে একদিন ওকে মনের কথা জানাতে সে চমকে উঠল। বললো আমাকে বিয়ে করে ঘরে তুলবে? এ তোমার নিছক ভাববিলাস। তা ছাড়া তোমাদের সমাজ আমাকে নেবে কেন? তুমি যে সকলের চোখে বড় ছোট হয়ে যাবে। না-না এ হয় না।

বুঝলাম তার মনের সুর। বুঝ্‌লাম সে আমাকে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। বললাম সীমা জানো কি ভাল এবং মন্দ বলে কিছুই নেই। আজ যা ভাল অন্য পরিস্থিতিতে কাল তা' মন্দ হয়ে দাঁড়ায়। তমসার তপস্যাই আলো ফোটাবার। আমরা নিজেরাই আমাদের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা ভাল-মন্দ সৃষ্টি করি। তা ছাড়া আমি সৈনিক্। ভাববিলাস—'স্বপ্নই' আমাদের একান্ত ধন? যখন কামান বন্দুকের গর্জ্জনে দশদিক কেঁপে ওঠে তখনও আমরা ঘর সংসারের কথা জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায় প্রেয়সী বধূর সঙ্গে

মিলনের কথার স্বপ্ন দেখি। ঐ স্বপ্নই নিরন্তর আমাদের মনে উদ্দীপনা জাগায়, সেই স্বপ্নই মৃত্যু পথ-যাত্রায় আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

কোয়াসীমা তার দুচোখের জলে আমাকে প্রণাম করে বললো আমি ধন্য হলাম। এই বলে বুকে লুটিয়ে পড়ল। আমার বুক ভরে গেল। তাকে তুলে তার চোখের জল মুছিয়ে বললাম তুমিই আজ থেকে আমার জীবনের সীমা।

এর কয়েকদিন পরেই আমাদের বিয়ে হল। ভগবান যুদ্ধের মন্দিরে গিয়ে আমরা দুজনে মালা বদল করলাম, এবং তথাগতের উদ্দেশে প্রণাম করে দুজনে বললাম জীবন আমাদের এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেল।

"আমরা সহযাত্রী—আমরা সাথী।" এইই শুধু আমাদের পরিচিতি। কি একটা উৎসবে সেই যে গানটা শুনেছিলেম "সাথী। মম সাথী"—তার সুরের রেশটা কানে বাজছে এখনও। বারান্দায় খাঁচার ময়নাটা অমনি চেঁচিয়ে উঠল 'সাথী সাথী'।

সুশান্ত অবাক হয়ে শুনছিল। ময়নাটার চিৎকারে চমকে নড়ে চড়ে রাও এর কাঁধে হাত রেখে বললো "তাই তো ভাই! এ-ত নিছক কবিতা। কল্পনার মায়া কি বাস্তবের সংঘাতে টিকবে?" রাও একটু চুপ করে থেকে বললেন "কল্পনাই ত সৃষ্টির মূলতত্ত্ব—কল্পনাইতো জগৎ চালায়।—"

এমন সময় বাংলোর গেটে মোটারের হর্ন শোনা গেল। তাঁদের কথা এখানেই থেমে গেল। কবরী ও সীমা বারান্দায় উঠে বল্লো "জয় হিন্দ! ঠিক সময় এসে পৌঁছিয়েছি তো?"

চারিদিক একটা খুসীর আবহাওয়ায় ভরে গেল।

সীমার কপালে একটা সিঁদুরের টিপ জল জল করছে। সভার সভানেত্রী ঐ টিপ্‌টি পরিয়ে দিয়েছেন।

রাও ও সীমা, সুশান্ত ও কবরীর দিকে হাত জোড় করে বললো "নমস্তে" এখন চলি তবে। এই বলে ওঁরা দুজনে এগিয়ে চললেন, ময়নাটা আবার চেঁচিয়ে উঠল 'সাথী সাথী'।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি: এ.

শ্রীগীতা	৭·৫০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৭·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নবেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

পারুষ্নি বা ইরাবতীর তীরে

বিভা সরকার

রামচৌতরার 'সিধনাই' Head Works এ তাঁর বাংলোর বারান্দায় আরাম কেদারাখানায় বসে স্মৃতির রোমন্থন করে চলেছেন চৌধুরী সাহেব।

এই রাবি বা ইরাবতীর তীরেই সেই কোন আদি যুগে রাজা সুদাস যুদ্ধকরে অন্য দশজন রাজাকে হারিয়ে প্রথম রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছিলেন—হয়েছিলেন দিগবিজয়ী সম্রাট। ভারতের মাটিতে আর্যরা নানা গোত্রে বা শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার প্রধান হয়েছিলেন ভরতরা। এঁরা সরস্বতী ও দ্বিসদবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করতেন। মৎসবংশীয়রা বাস করতেন অধুনা আলওয়ার, জয়পুর ও ভরতপুরে। অনু ও দ্রুহুরা পঞ্জাবে, তুর্বসুরা দক্ষিণ পূর্ব দেশে, যদুরা পশ্চিমে আর পুরুরা সরস্বতী নদীর ধারে ধারে। এঁদের মধ্যে পুরুরা ছিলেন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন। এঁরা একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারে বিবদমান থাকতেন। ঋগবেদে আমরা ভরতদের ত্রিৎসু গোত্রীয় রাজা সুদাসের সঙ্গে, পুরুদের অধীনে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের আরও দশটি শাখার সহায়তায়, পঞ্জাবের উপর আধিপত্য লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উল্লেখ পাই। ভরত ও অন্য দশটি শাখার মধ্যে পুরোহিত নির্বাচন নিয়েই বিবাদ ঘটে। প্রথমে কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্রমুনির অধীনেই ভরতেরা যুদ্ধে বিজয়ী হন কিন্তু কিছু পরে বিশ্বামিত্রকে অপসারিত করে বশিষ্ঠ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতের আসন দখল করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহায় বিশ্বামিত্র পঞ্চম পঞ্জাবের দশটি শাখাকে উত্তেজিত করে ভরতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভরতবংশীয় রাজা সুদাস এই ইরাবতীর তীরেই তাঁদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। বহুদিন এই ভরতরা পরাক্রমের সঙ্গে পঞ্জাবের বুকে রাজত্ব চালান। কালক্রমে পুরু ও কুরুরা ক্ষমতা বিস্তার করে ভরতদের হটিয়ে দিয়ে সমস্ত পঞ্জাবে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

আর্যদের দৃষ্টিতে আর্য-অনার্যের প্রধান প্রভেদ ছিল বর্ণে। আদিম অধিবাসীদের তাঁরা নিষাদ, দস্যু বা দাস বলতেন। কৃষ্ণকায় মানুষদের তাঁরা ঘৃণা করতেন।

রামায়ণে আমরা দেখি আর্য ও অনার্যের মধ্যে কি গভীর ভেদ, যার জন্য গুরু বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে রাজা রাম অনিচ্ছা সত্বেও তপস্যারত শূদ্র রাজা শম্বুককে বধ করেন।

মহাভারতের যুগে আর্য-অনার্যের বিভেদ অনেকটাই কমে এসেছে বলা যায়। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস স্বয়ং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং এক ধীবর কন্যার সন্তান। পরাশর মুনির ঔরসে মৎস্যগন্ধাগর্ভে যমুনা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ধৃতরাষ্ট্র সভার দাসী-পুত্র মহাজ্ঞানী বিদুরের উচ্চমর্যাদা উল্লেখের নিষ্প্রয়োজন পাণ্ডুর কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রী ছিলেন অনার্য মদ্ররাজ কন্যা।

পাণ্ডবদের অনার্য পত্নীদের সন্তানেরা আর্য পত্নীদের গর্ভজাত সন্তানদের সমমর্যাদাই পেয়েছেন। কালক্রমে আদিম অধিবাসীরা আর্যদের আচার-আচরণ শিক্ষা-দীক্ষা নাম-গোত্র

গ্রহণ করেছিলেন আর আর্যরাও তাঁদের সভ্যতা, ধর্ম, দেবদেবী দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

আজকের ভারতবর্ষ আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে মিলিত সভ্যতায় পুষ্ট। পঞ্জাব সেই মিলনের প্রথম ক্ষেত্র।

বর্তমান পঞ্জাবের জনতা প্রধানত হিন্দু-মুসলমান ও কিছু খৃষ্টান। হিন্দুর মধ্যে কিছু আবার নানকের অনুগামী শিখ আর কিছু দয়ানন্দজীর অনুগামী আর্যসমাজী।

গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়ে উদীচ্য ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন দয়ানন্দ সরস্বতী। এই মেধাবী শৈব্যকুলের ছেলে পাঁচ বছর বয়সেই বেদমন্ত্র আয়ত্ত করেন। শাক্ত পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল শিব মন্ত্রে দীক্ষিত করবেন পুত্রকে। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেলো। বিধির বিধান অন্যরূপ। দয়ানন্দের বয়স যখন চৌদ্দ—সবশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ফেলেছেন। পিতা এক শুভদিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। পবিত্রশিবরাত্রির দিনে পিতা পুত্রকে মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন বিনিদ্র থেকে প্রহরে প্রহরে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করতে। নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রি অতীত হয়ে যায়—বিগ্রহের দিকে চেয়ে মৌন হয়ে বসে আছে এক তেজস্বী বালক। মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। হঠাৎ ফুল বিল্বপত্র নড়ে উঠলো, সচকিত বালক তাকিয়ে দেখলো নৈবেদ্যের ফল-মূল চাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবতার আহার চুরি করে পালাচ্ছে দুরন্ত ইঁদুরের পাল। বালক-মনে প্রশ্ন জাগলো—এই কি সেই সর্বশক্তিমান দেবাদিদেব যাঁর ওপর দিয়ে তুচ্ছ ইঁদুরগুলো সহজে ঘুরে বেড়াচ্ছে? বিহ্বল বিভ্রান্ত বালক মন্দির ছেড়ে বেড়িয়ে এল আর কখনও ঢুকলো না। পিতা ব্যথিত হলেন।

আর্য সমাজী ও আদি ব্রাহ্মদের মধ্যে বড় নিবিড় মিল রয়েছে। দুইটিই বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বলা যায়। বেদ-উপনিষদ এই দুই ধর্মের ভিত্ত। শুধু কালের অনবধানতায় যে অজ্ঞান লোকাচার ও কুসংস্কারের পলিমাটি ধর্মের ওপর আরোপিত হয়েছিল এঁরা বিবেক ও বুদ্ধির জলধারায় তা ক্লেদমুক্ত করে নিয়েছেন। স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহবোধ ও গোড়ামীর হাত থেকে এঁরা ধর্মকে অনির্বাণ সত্যে উত্তীর্ণ করে দেন।

ইংরেজ ভারতীয়দের সঙ্গে কিছুতেই এ মাটিতে মিলে-মিশে আপন হতে পারলো না। অত্যাচার-অনাচার শাসন-শোষণেই এদের আয়োজন নিঃশেষিত। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ স্মরণীয় হয়ে আছেন। যেমন, ড্রেভিড হেয়ার সাহেব, বেথুন সাহেব, কেরী সাহেব, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদকারী লর্ড বেন্টিক।

কলকাতার প্রবর্তক জব চার্নক বাঙালী সহধর্মিণী গ্রহণ করে আচার-আচরণে আধা বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্জাবের জলসেচ ব্যবস্থা, রুড়কী স্থাপত্য মহাবিদ্যালয় এ সবই লর্ড ড্যালহৌসি সাহেবের সুকীর্তি। পূর্ত বিভাগ তাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ভারতীয় রেললাইনের জয়যাত্রাও তাঁরই স্পর্শধন্য। টেলিগ্রাফ, দু পয়সায় ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি বহু কীর্তি তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। বন্ধুবর বেথুন সাহেবের মেয়েদের জন্য কলেজের সমস্ত খরচ তিনিই বহন করতেন। বাদশাহী সড়ক বা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড যা সেই বাংলা থেকে সুদূর পঞ্জাব পর্যন্ত চলে এসেছে এর পূর্ণ সংস্কারও তিনি করিয়ে গেছেন। মাধোপুরের কাছে রাবি নদীর বাঁধও তিনিই করিয়েছিলেন, তার আগে সৌখিন সম্রাট শাহজহানের লাহোরের বাগানগুলিতে জলদানের জন্য তাঁর সুযোগ্য পারস্যবাসী এঞ্জিনীয়র আলিমর্দান খাঁন এখান থেকে 'হসলী' নামে একটি মৌসুমী নহর কাটান। লর্ড ডালহৌসী 'হসলী'-কেই উর্ধ বারি ডোয়াব নহরে পরিণত করান।

পঞ্চনদীর দেশ এই পঞ্জাব—তবু কি রুক্ষ, কি বন্ধুর আর মরুময়। যত্রতত্র বালুকার স্তূপ বা ছোট ছোট বালুর পাহাড়। বালুকার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত এ অহল্যা ভূমি।

এ দেশ তাই গ্রীষ্মে অত্যন্ত তাপদগ্ধ, শীতেও অতি শীত-পীড়িত। ভারত মহাসাগর আজ অনেক দূরে সরে গেছে তবু পঞ্জাবের ঝেলমের পূর্বতীরের ভূমি কোথাও হাজার ফিটের বেশী নয় আর দিল্লী ও লাহোর এ দুটি প্রধান সহরই সাতশ ফিটের কিছু উর্দ্ধে মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ ভূমি সমুদ্র গর্ভের অংশ ছাড়া যে আর কিছু ছিল না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পঞ্চ-অব পঞ্জাব কথাটি ফার্সী আর এই পঞ্চনদের জন্যই সারা পঞ্জাব প্রদেশকে সাধ্যমত সরস করে ফলে ফুলে ভরিয়ে মুলতান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় 'পঞ্চ নদে' গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই 'পঞ্চনদ' আবার আরও ৪৪ মাইল নীচে প্রবাহিত হয়ে সিন্ধু নদে গিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আর সেই নদীগুলি থেকে নহর বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্জাবের রুক্ষমাটি এমনি করেই এই নদী পাঁচটির করুণাধারায় শস্যপূর্ণা অন্নদাত্রী। নদী পাঁচটি যথাক্রমে বিয়াস, শতলেজ, চেনাব, রাবি ও ঝিলম। সংস্কৃতে নদী পাঁচটিকে বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা নামে আমরা পাই।

আর্যরা এই দেশটিকে সপ্তসিন্ধুর দেশ বলতেন আর তাঁরা এই পাঁচটি নদ র সঙ্গে সিন্ধু ও সরস্বতীকেও জুড়ে দিয়েছিলেন। ঝিলম ও শতলেজ অর্থাৎ বিতস্তা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী ভূমিই প্রধানত পঞ্জাব বলে আমরা উল্লেখ করি, পশ্চিম থেকে পূবে এর মধ্যবর্ত্তী নদীগুলি চেনাব রাবি ও বিয়াস।

বৈদিক ঋষিদের এই পারুষ্ণি অর্থাৎ ইরাবতী বা রাবির জন্মস্থান কাঙড়া জিলার রোটাগ পাশের কাছে। সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম বাহিনী হয়ে চম্বানগরীর নীচে দিয়ে উপল চপল পায়ে প্রমত্তা ধারায় চটুল নর্ত্তকীর বিমোহিনী মূর্ত্তিতেই বেরিয়ে এসেছে এ পর্ব্বততনয়া। চম্বার কাছে এ নদী কিশোরী। তার কৈশোর স্বপ্ন তখনও অনাগত যৌবনের দূর পদধ্বনির ইশারা শোনে। এইখানে রাবির বুকে একটি সুন্দর সেতু আছে। সেখান থেকে সে ছুটেছে ডালহৌসি শৈল নগরীর দিকে বিচিত্র গতিতে। তারপর ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের প্রান্ত-সীমা ছুঁয়ে আপন পথের দুধার ফলে-ফুলে সাধ্যমত ভরিয়ে প্রাণ চাঞ্চল্যে কঠিন বনভূমিকে শ্যামল সরস করে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম ঘুরে গিয়ে এর স্রোতধারা বাসোলিতে মিলিত হয়েছে। সেখানে কাশ্মীর ও চম্বার সঙ্গে গুরুদাসপুর জিলা মিলেছে। এখানে এ নদী সমুদ্র পৃষ্ঠথেকে দু হাজার ফিট উচ্চে। মাধোপুরের ঠিক ওপরেই বারি ডোয়াব নহরের প্রধান কার্যালয়। রাবি এখান থেকে পাহাড় ছেড়ে সমতলের দিকে গুরুদাসপুরের মাঝদিয়ে চলে গেছে। মাধোপুর নহরের জল যোগাতে এ গিরি কন্যা শীর্ণা হয়ে পড়েছে। এই দূর পথে সিধনাই পর্যন্ত আর আসতে হত না এ নদীকে যদি না জম্মু পর্বত উত্থিত উঝ-এর বিশাল জলরাশি এসে ইরাবতীকে যৌবনমত্তা কলনাদিনী করে তুলতো অলোচ্ছ্বাসে। জম্মু-কন্যা উঝ-এর জলরাশিপুষ্ট এ প্রবাহিনী রাজেন্দ্রাণীর মতই পরিপূর্ণা রূপ নিয়ে শিয়ালকোট সহরের প্রান্ত ঘেঁসে এই জিলাটিকে গুরুদাসপুর আর অমৃতসর থেকে বিমুক্ত করে দিয়ে সোজা লাহোরের পশ্চিম বাহিনী হয়ে মন্টগোমারী ও লায়েলপুর সহরকে বিভক্ত করে মুলতানের উত্তর দিয়ে ঝঙ সহরের কাছে চেনাবে মিলিয়ে গেছে। মুলতানের কাছেই এই সোজা দীর্ঘবাহী নদী, যাকে বলা হয় 'সিধ্ নাই'। এই 'সিধনাই' থেকে একটি ছোট নহর বের করা হয়েছে। এই জায়গাটিই হল রামচৌতরা বা 'সিধনাই' বাঁধ। উপস্থিত চৌধুরীর কর্মকেন্দ্র। সিধনাই এর এ নহর হেড বল্লোকির 'ত্রয়ীপরিকল্পনার নিম্ন বারি দোয়াব' নহরের তুলনায় নালামাত্র। লাহোরের দক্ষিণে হেড বল্লোকিতে তিনটি নদীর জল নিয়ে বিজ্ঞানের সার্থক লীলা হয়েছে বলা যায়। পঞ্জাব জলসেচ-প্রণালীর গর্বের বস্তু এই ত্রয়ী পরিকল্পনা। উর্ধ ঝেলাম ও নিম্ন চেনাব নহর দুটি, নিম্ন

বারি ডোয়াব ক্যানেল এই তিনটি মিলে ত্রয়ী পরিকল্পনা। ঝেলম, চেনাব ও রাবির বিপুল জলরাশি বহন করে নিয়ে এই সহর তিনটি পঞ্জাবের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই রাবি নদী যদিও ঝেলমের মতই দীর্ঘ ৪৫০ মাইল পথ প্রবাহিনী তবুও ঝেলমের তুলনায় এ ক্ষীণা। শীতের দিনে নহরগুলি এতই জল শুষে নয় যে মাধোপুর প্রধান কার্যালয়ের নীচে এর জল প্রধানত উঝ-এর জলধারাই জোগায়। উঝ-এর জলধারাও আবার নিম্ন বারি ডোয়াব নহর শুষে নিচ্ছে। মণ্টগোমারীর পর থেকে মাসের পর মাস, রাবির বুকে হেঁটে পারাপার হয় মানুষ, জীবজন্তু। রামচৌতরার 'সিধনাই' প্রধান কার্যালয়ের নীচের অবস্থাও সেই একই। সারা শীতকালটা প্রায় চড়া পড়েই থাকে কিন্তু গ্রীষ্মে যখন বরফ গলতে সুরু হয়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঢল নামে এই সব নদীগুলিতে, বর্ষার সে গতি হয় দুর্বার। সে যেন দু কূল প্লাবিত করে বন্যার রূপ নিয়ে মত্তমাতঙ্গের মতই বাঁধন হারা হয়ে ছুটে আসে। শীতে যারা শীর্ণা, গ্রীষ্মে তারাই আবার প্রমত্তা প্রাণোচ্ছ্বাসে। সামনে তার যা পড়ে ভেসে চলে যায় স্রোতের কুটোর মন। শুকনো নদীর চড়ার তীরে তীরে অকস্মাৎ সামাল সামাল রব ওঠে। এত ক্ষিপ্র গতিতে আর এত ভীষণারূপ নিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কাল-গর্জনে ছুটে আসে এই স্রোতধারা, যে কতলোকের কত সর্বনাশই না ঘটে যায়। ছোট ছোট ছেলেরা হয়ত বা গোধন, নয়ত বা ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে, শুকনো মাঝ নদীতে সামান্য যেখানে একটু ক্ষীণ স্রোতধারা বইছে সেখানে জল খাওয়াতে নিয়েছে। দূর থেকে কল-কল্লোলিত জলগর্জন আর উত্তাল তরঙ্গরাশি তাদের অন্যমনস্ক শিশু মনকে সাবধান করতে যথেষ্ট হয়নি—নয়ত তাদের জীবজন্তুরা সহজাত সাবধানতায় জানতে পেরেও সময় মত বালু ভেঙে পাড়ে পালাতে পারেনি। ফলে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে ভীমগর্জনে জলস্রোত পলকে তাদের গ্রাস করে কোথায় নিয়ে ফেলে তার চিহ্নটুকুও রাখে না। এমনই জীবন মৃত্যুর-খেলার খেলোয়াড় এই প্রদেশের লোকেরা।

ইংরেজ রাজত্বের বহু অপকীর্ত্তির মধ্যেও মহৎ কীর্ত্তি পঞ্জাব জলসেচ ব্যবস্থা। সারা প্রদেশটায় শিরা উপশিরার মতই ছড়িয়ে আছে নহরের শাখা-প্রশাখা। রুক্ষ, শুষ্ক, মরুময় এ দেশটার বেশীর ভাগই নিষ্ফলা হয়ে পড়ে থাকতো যদি না জলসেচ প্রণালী প্রাণবাহী নালা নহরের জলধারা ঢেলে সরস সিক্ত করে শ্যামলে ঢেকে দিতো পঞ্জাবের বেশীর ভাগ চাষ আবাদই এই জলসেচ প্রণালীর সাহায্যেই হয়ে থাকে। পঞ্জাব, এর বদলে ইংরেজকে যুগিয়েছে সবল সুস্থ সৈনিক আর তেজীয়ান আরবি সুঠাম ঘোড়া।

কমদিন তো নয়—কত অভিজ্ঞতার আয়াস-অধ্যবসায়ের ইতিহাসে ভরা চৌধুরী সাহেবের এই দীর্ঘ পথটি। সে সব দিনগুলি আজ তাঁর কাছে স্বপ্নের মতই মনে হয় যখন তাঁবুতে তাঁবুতে মাঠে ঘাটে জরিপ করে করে ঘুরে বেড়াতেন। দারুণ গ্রীষ্মে এক একদিন প্রাণ তাঁর ছটফটিয়ে উঠেছে, একটু ঠাণ্ডা জলের জন্য, একটি ছায়াশীতল গাছের জন্য। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে কখনও তা জুটতো, কখনও তাও জুটতো না।

একবার তখন তিনি বাহাওয়লপুর ষ্টেটে জরিপে ব্যস্ত, নতুন নহর বার করা হবে। বড় সাহেব এলেন তাঁদের কাজের পরীক্ষা করতে। সঙ্গে তাঁর নিজের নতুন ঝকঝকে মোটর—মোটর কেরিয়ারে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা রাখা। সতরঞ্চ পেতে এক গাছের ছায়ায় সেদিন বসেছিলেন তাঁরা ঘুরিয়ে। তপ্ত তামার মত চারিধার খাঁ খাঁ করছে। তারই মধ্যে দেবতার আশীর্বাদের মত সেই ছায়া আশ্রয়টুকু। পঞ্জাবের ল্যু হাত মুখ ঝলসে দিয়ে চলে যাচ্ছে। খাস ইংরাজ মণ্টেগু সাহেব খাদ্য যত না খেলেন পানীয় পান করলেন তার চতুর্গুণ। বরফের বাক্স থেকে একটি হিমশীতল কমলা লেবু চৌধুরী সাহেব উপহার দিয়ে ছিলেন। ফুটি

হাতে নিয়েই যেন প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিলে তাঁর। স্বর্গের অমৃত কি এর চেয়েও মধুময়! তারপর চমকে উঠেছিলেন সাহেবের গ্লাসের পর গ্লাস মদ্যপান দেখে। তাঁর অনভ্যস্ত চোখ এটা ঠিক সইতে পারেনি কেবলই মনে হয়েছিলো এ প্রচণ্ড দাবদাহে সর্দি গর্মি হয়ে না মরে! এই প্রচণ্ড গরমে বরফ পরম তৃপ্তিদায়ক হলেও শরীর সব সময় এটা সইতে পারে না। আর হঠাৎ সর্দিগর্মিতে গ্রীষ্মে যদি নিমোনিয়া হয় বাঁচা কঠিন। সেদিন কিন্তু দিব্য পানাহারে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন সেই ইংরাজ নন্দন। মিতাহারী সংযত-স্বভাব চৌধুরী সাহেব জীবনে কখনও কোন মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেন নি—এমন কি ধূমপানের অভ্যাস-টুকও তাঁর নেই। এই নিয়ে কত সময় কত উপহাস সইতে হয়েছে তাঁকে সমকর্মিদের কাছে।

বাহাওয়ালপুর মুসলমান প্রধান ষ্টেট। মুসলমান নবাব সেখানের শাসক। সামান্য সংখ্যক হিন্দু যারা আছেন তার বেশীর ভাগই দোকানদার, ব্যবসাদার। হিন্দুরা তাই 'ফেরাও' বলে খ্যাত। ফেরাও শব্দটির পেছনে দস্তুর মত অবহেলা ও অবজ্ঞা আছে ঠিক যেমনটি আছে য়ুরোপিয়ান-দের মনে ইহুদী শব্দটির উচ্চারণে। পঞ্জাবের বৃহত্তম রাজষ্টেট এটি। উত্তরে ফিরোজপুর থেকে আরম্ভ করে সিন্ধের প্রান্ত পর্যন্ত এর বিস্তার। শতলেজ, পঞ্চনদ, ও সিন্ধুনদ তিনটি মিলিয়ে তিনশো মাইল এর নদীবিস্তার বা River frontage। বালুময়, প্রায় মরুভূমি এ দেশ। সারা বছরে বৃষ্টিপাত ইঞ্চি পাঁচের বেশী হয় না। নদীগুলির দক্ষিণ পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা দক্ষিণের দিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে। সামান্যই এখানের চাষ-আবাদ। কিছু অংশ বন্যা প্লাবিত পলি মাটিতে, কিছু বা পাতকুয়ার জল তুলে পারসীয়ান হুইল বা চরখি চালিয়ে বলদ বা উটের সহায়তায়। কষ্টের চাষ-আবাদ এ দেশের। এ জায়গাটি "হাকরা" নামে পরিচিত। সম্ভবত একসময় এটি শতলেজ নদীর গর্ভ ছিলো। "হাকরার" দক্ষিণে চোখ ফেরালে শুধু বালু আর বালুর পাহাড়, উত্তপ্ত ল্যু চালিয়ে বালুর ঝড় তুলে সর্বনাশা রূপ নিয়ে রাক্ষসীর মত যেন খাঁ খাঁ করে। দৈবাৎ পথভ্রান্ত পথিক যদি বিপথে যায় তার আর রক্ষে নেই। রাজস্থানের বিরাট মরুভূমির এইখানেই সূচনা। মিনচিনাবাদ, খানপুর ও ও বাহওয়ালপুর এই তিনটি প্রধান সহর নিয়ে এই রাজ্য। অধমওহানে এ শেতলেজ সেতুর ওপর দিয়ে নর্থ ওষ্টোর্ন রেলওয়ের যাতায়াত। এর কাছেই বহওয়ালপুর রাজধানী। নবাবের বাসস্থান। খানদানী বংশ নবাবের। অব্বাসী দৌউদ-পোত্রা তাঁদের গোত্রা। কুলমর্য্যাদায় নবাবকুলে পরম কুলীন। সিন্ধুই তাঁদের আদি নিবাস ভূমি। এ রাজ্যের প্রথম নবাব ছিলেন শাদিক মোহম্মদ। নাদির শাহ যখন ১৭৩৯ এ ডেরামাট আক্রমণ করেন তখনই তাঁকে সন্তুষ্ট ক'রে নবাব উপাধি অর্জন করেন তিনি তুষ্ট নাদির শাহের কাছে, আর এই রাজ্য বা state.

নবাব তৃতীয় মহম্মদ বাহাওয়ালখাঁন পঞ্জাব কেশরী মহারাজা রঞ্জিত সিংহের আক্রমণ ভয়ে ভীত হয়ে ১৮৩৩ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় ইংরেজকে তিনি নানা ভাবে উপকৃত করেন। এ ছাড়া ১৮৪৮ সনে মূলতানের দেওয়ান বিদ্রোহী মূলরাজের বিরুদ্ধাচরণের সময়েও অত্যন্ত মূল্যবান সাহায্য দেন ইংরেজ বাহাদুরকে। ইংরেজ রাজের তাই প্রিয় পাত্র এঁরা। খানদানী বংশ এঁদের। বংশ গৌরব রক্ষায় তাই সদাই সচেতন। সমকক্ষ ঘর তাঁদের সব সময় না পাওয়ায় তাঁদের ঘরের অনেক কুমারী মেয়েকেও মোগলদের অনুকরণে চিরকুমারী থাকতে হয়। এই রাজ্যেরই এক রিক্তা ভূমিতে গেরুয়া বালিয়াড়ীর প্রান্তে এক সুরক্ষিত দুর্গে আছে রাজ অন্তঃপুরিকাদের নন্দনকানন। সম্পূর্ণ প্রমীলার রাজত্ব নাকি সেটি। রাজবংশের অনূঢ়া কন্যারাই শুধু নহেন উপরন্তু গত নবাবের বেগমরাও স্থান পান সেইখানে। নবাব গত হলে

তাঁর বহু বেগমরা নতুন নবাবের কাছে সমস্যা বিশেষ। হারেম যদি পূর্ণ থাকে মৃত নবাবের বেগম দিয়েই, নবীন তাঁর নবীনাদের স্থান দেবেন কোথায়? পুরাতনীদের তাই সে দুর্গ ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। আজন্ম অসূর্য্যম্পশ্যা হয়েই তাঁদের অবশিষ্ট জীবন সেখানে শেষ হয়। সেই দুর্গেই আছে তাঁদের নিজস্ব মসজিদ, সমাধিভূমি। সবই আছে সে রাজত্বে। পার্সীয়ান হুইল চালিয়ে জল তুলে তুলে হয়ত সবুজের সমারোহ করে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় অন্তঃপুরিকাদের ভ্রমণ উদ্যান, বিলাস কুঞ্জগুলিকে কিন্তু এ সবই অসুমান।

জরিপ করতে করতে একবার এই দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন তিনি, দূর থেকে একটি অস্পষ্ট বিন্দু মহাসমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র জাহাজের মতই এ মরু সাগরে দুর্গটিকে মনে হয়েছিল তাঁর।

সকৌতুকে সেই দিকে দূরবীণ তুলেছিলেন। চকিতে যেন যাদুর খেলা ঘটে গিয়েছিলো। আকাশে বালুর ঝড় উড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মতই ছুটে এসেছিলো কে জানে কোন দিক থেকে এক সশস্ত্র ঘোড় সওয়ার। কি হিংস্র, তীক্ষ্ণ তার চেহারা। তার দিকে চেয়ে নির্ভয় চৌধুরী সাহেবেরও কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা শিহরণ নেমেছিলো পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে। কষ্টে বাইরের দৃঢ়তা বজায় রেখে তার দিকে নির্ভয় দৃষ্টি মেলে জানতে চেয়েছিলেন তার বক্তব্য। ঘোড়া থেকে নেমে সেলাম জানিয়ে সে সসম্ভ্রমেই জানিয়েছিলো আপনি সরকার বাহাদুরের লোক এ আমরা জানি কিন্তু গোস্তাকি মাফ করবেন, ভুলেও ওদিকে তাকাবেন না। এখান থেকে সরে যান। আপনি আপনার 'হুদ্দার' অর্থাৎ সীমানার বাইরে এসে পড়েছেন। আজ যদি আপনাকে ইংরাজ বাহাদুরের লোক না জানতুম এতক্ষণে আপনার দেহ এইখানে লুটিয়ে পড়ত, এই রুক্ষ মরুকে রক্তে রাঙা করে।

সাহব বহুৎ হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ারী সে চলনা চাহিয়ে। ইহ হমলোগ পর হুকুম হ্যায়! হুকুম মওয়াফিক না করনা তো বেইমানী—বিলকুল হরামী! নবাব সাহেব কি রোটি খা রহে হৈ, নিমক হরামী কভি নহি করেঙ্গে! আদাব জনাব। আপ যাইয়ে! বলে তেমনি বালুর তুফান তুলেই সে দূরে মিলিয়ে গিয়েছিলো। স্তব্ধ নির্বাক হয়ে খানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন চৌধুরী সাহেব। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিলো। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে চলে গিয়েছিলেন আপন আস্তানায়। পথ প্রদর্শক না নিয়ে আর কখনও সে পথে আসেন নি।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

জাতীয়তার রূপায়ন

দীপঙ্কর

গুপ্তযোগী বা গুহাহিত যোগী ঋষিদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। তাঁহারা ছিলেন এবং এখনও আছেন লোক-চক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু সমাজের মাঝেও ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁহার বিশ্ববিজয়ী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা দেখিতে পাই। কলিকাতার দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মন্দিরের এই পরমপুরুষ পরমশক্তির কথাই সকলকে বলিয়া গিয়াছেন। নিজে যাহা মুখে প্রকাশ করেন নাই তাহা সবই প্রকাশ করাইয়াছেন তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যের মাধ্যমে। যেমন গুরুদেব তেমন তাঁহার মহান শিষ্য। এই যোগাযোগ এক জন্মের নহে। যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাহাদের প্রধান কাজ সত্য, শিব এবং সুন্দরের অনুসন্ধান এবং অনুসরণ করা। আর তাহাদের কাছে সত্যই হইতেছে ঈশ্বর কারণ তাহারা 'সত্যের জন্য সব কিছুকে পরিত্যাগ করিতে পারে কিন্তু কোন কিছুর জন্যই তাহারা সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।' এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ভারতীয়গণ জন্মান্তরবাদকে বিশ্বাস করে বলিয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের পূর্বজন্মের যে সম্পর্ক ছিল এই মতকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহাকে বিশ্বাস করিবার আরও কারণ এই যে বিবেকানন্দ যেদিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন সেদিন বিবেকানন্দকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রথম উক্তিটি এখানে লক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "এতদিনে এলি. তোর অপেক্ষায় আছি।" স্বামীজীও ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্তাবাহক। তাঁহার না বলা-বাণী, অব্যক্ত উপদেশ বিবেকানন্দ সব দেশবাসীর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "মনকে একমুখী কর।" বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মনে শক্তি আন।" গুরু এবং শিষ্যের দুই মহান উপদেশ একত্রে যুক্ত করিলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে, চাই একমুখী শক্তিশালী মন। একমুখী শক্তিশালী মনের ক্ষমতা অসীম। ব্যক্তিগত স্বার্থে এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হইলে মানুষ মুক্ত জীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। আর 'জগৎ হিতায়' অর্থাৎ পরার্থে ব্যবহৃত হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। শ্রীনলিনী কিশোর গুহ মহাশয় তাহার 'বিপ্লবের পথে' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে বাণী লইয়া দেখা দিয়েছেন, তাহা যে অবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়হীনতা হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবারই বাণী তাহা কে না জানে?" সুতরাং জড়তা কাটাইয়া, সুপ্তিভাব পরিত্যাগ করিয়া মানুষকে মানুষের মত দাঁড় করানই ছিল তখনকার প্রধান কাজ। বিবেকানন্দ তাই তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী উদাত্ত কণ্ঠে জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশবাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "What makes you weep, my friend? In you is all power. Summon up your all powerful nature, Oh! mighty one, and this whole universe will be at your feet. It is the self alone that predominates and not matter. It

is those foolish people who identify themselves with their bodies that pitiously cry, 'weak, weak, we are weak'. What the nation wants is pluck and scientific genious. We want great spirit, thunderous energy and boundless enthusiasm, no womanishness will do. It is the man of action, the lion heart that the goddess of wealth resort to. No need of looking behind. Forward! We want infinite energy, infinite zeal, infinite courage and infinite patience, then only will great things be achieved.

[Thus spake Vivekananda, P. 3-4]

বিবেকানন্দের উপরোক্ত কথাগুলি প্রত্যেকটী ভারতবাসীর নিকট তাঁহার আন্তরিক আহ্বান। তিনি জনগণকে জাগ্রত হইয়া নিজের শক্তি, সাহস, বল, বীর্য লইয়া গড়িয়া উঠিতে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, তোমরা ওঠ, জাগো, তোমাদের সীমাহীন ক্ষমতা, সীমাহীন সাহস এবং সীমাহীন অধ্যবসায় লইয়া মহৎ সফলতার জন্য অগ্রসর হও। বিবেকানন্দ আরও বলিয়াছেন, "Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny."

[Thus spake Vivekananda P. 7]

মানুষের প্রতি অগাধ করুণা, মমতা এবং ভালোবাসার চরম অভিব্যক্তি বিবেকানন্দর এই কথাগুলির মধ্যে নিহিত। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পরাধীন জাতির মানুষকে এমন আহ্বান জানানোর মধ্যে ধর্মীয় ভাব ছাড়াও রাজনৈতিক দিকও পরিস্ফুট রহিয়াছে। এখানে ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রধারা প্রবাহিত। প্রকৃতপক্ষে ভারত এমন একটি ভূমি, যেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রেও ধর্মের সংমিশ্রণ বিদ্যমান। বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন। মানুষ যদি মানুষরূপে তৈয়ারী না হয় তাহা হইলে সে যেমন তাহার ব্যক্তিগত জীবনে কৃতকার্য হইতে পারে না, সমষ্টিগতভাবেও সে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বিবেকানন্দ তাই দেশের মানুষকে মানুষরূপে তৈয়ারী করিবার মহান ব্রত লইয়া আসিয়াছিলেন। জমিতে ফসল ফলাইতে হইলে প্রথম উপযুক্তরূপে জমি কর্ষণ করিতে হয়, পরে বীজ বপন এবং শেষ পর্যায়ে ফসল কাটিয়া ঘরে তোলা। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে জমি কর্ষিত হইতেছিল, বিবেকানন্দ সেই জমিতে বীজ বপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি আমাদের কাছে অনেক আশা নিয়া বলিয়াছেন। "Your Country requires heroes; be heroes, stand firm like rock. Truth always triumphs. What India wants is a new electric fire to stir up a fresh vigour in the national veins. Be brave, be brave; man dies but once.

[Thus spake Vivekananda. P. 1]

স্বামীজীর 'Truth always triumphs" কথাটী বিশেষভাবে লক্ষণীয়,—সর্বদা সত্য জয়ী হয়। এই সত্যকে সর্বদা প্রমাণিত করিতে হইবে জীবনের মাধ্যমে অর্থাৎ মানব-জীবন সত্যকে কেন্দ্র করিয়াই সত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া ওঠে। জাতীয় জীবন হইতেছে জনগণের জীবনের সমষ্টি। সুতরাং একটি একটি করিয়া প্রত্যেকটি জীবন সত্যের আলোয় ভাস্বর হইয়া উঠিলেই জাতীয় জীবন সত্যের মহিমায় শুভ্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং সেই জাগ্রত সমুজ্জ্বল জীবন কখনই অপরের দাসত্ব করিতে অবনত মস্তক হইতে পারে না।

উপরে বিবেকানন্দকে স্বাধীনতার বীজ বপনকারী হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে অন্য আর

এক রূপেও পাওয়া গিয়াছে—উহা তাঁহার বিদ্রোহীরূপ। উচ্চ শিরে বুকের উপর হাত দুইখানি ভাঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকার যে অতি-পরিচিত ভঙ্গি উহা তাঁহার নমনীয়, কমনীয় ভাব প্রকাশ না করিয়া বরং অন্তরের উৎসারিত তেজ-বীর্যভরা বিদ্রোহী মনের মূর্ত্ত প্রতীক। তখনকার সময়, সমাজ এবং পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে পথের পথিক হইয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়াছেন, সে-পথই ছিল ন্যায়-নীতির সুষ্ঠু পথ। জাতির জীবনে জাতীয়তা বোধ আনিবার জন্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের সাত্ত্বিক যোগাযোগের সেতু রচনা করিয়াছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খ্রীস্টান রূপ জাতিভেদ প্রথার কোন প্রশ্নই নাই। সেখানে শুধু এক পরিচয়—মানুষ! 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। স্বামীজী বলিয়াছেন, "The only God to worship is the human soul in the human body. Of course all animals are temples too but man is the highest, the Tajmahal of temples. If I cannot worship in that, no other temple will be of any advantage."

এখানে স্বামীজী গতানুগতিক পথে পদার্পণ না করিয়া তাঁহার হিসাব মত ন্যায়, নীতি এবং সত্যের পথে চলিয়াছেন। প্রচলিত জাতিভেদের বনিয়াদকে অস্বীকার করিয়া হিন্দু হইয়াও সকল ধর্মকে নিজের মনের মন্দিরে সমান সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি তাহার বিদ্রোহী-রূপেরই পরিচয় দিয়াছেন। এখানে তাহার বিদ্রোহ মানব প্রেমিক মনের এবং তাঁহার প্রেম মানুষের জন্য সত্যের প্রেম এবং স্বদেশের জন্য স্বাধীনতার প্রেম। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে আমরা এমন মনের পরিচয় পাইয়া থাকি। তিনিও বলিয়াছেন :

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে যায় সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।

প্রকৃত পক্ষে দেখা যায়, স্বামীজীর উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ধর্ম,—যাহা ধরিয়া রাখে তাহাকে ধর্ম বলে। তদানীন্তন ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক চেতনার প্লাবন না আসিলেও ধর্ম বা ভারতীয় মননা ঐ সমাজকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এই মননা হইল ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং সত্য ও ন্যায়ের পূজা। ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার 'Unity of India' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "In India where for long ages there had been a large measure of local self-government, the people were far more interested in their local freedom and rights than in the machinery of Government at the top.. ...An all India political unity thus was not possible in the past.....this Indian background and unity were essentially cultural."

[Page 18-15]

এই Culture বলিতে যাহা বুঝায়, বাংলার আকাশে বাতাসে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের শ্যামা সংগীতাঞ্জলির অপূর্ব সমন্বয়, বাংলার হরি সংকীর্তন, মাঠে-ঘাটে, হাটে-পথে বাউলদের পল্লীগীতি, নদীর বুকে বুকে ভাটার টানে মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালী গান সব মানুষকে বাউলদের একতারার তারে বাঁধিয়া একত্র করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য শিল্প-কলায়, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, বয়নশিল্পে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণে বনিয়াদী কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি চৈতন্য চরিতামৃতের চরণামৃত, পরমহংসদেবের

কথামৃত তো আছেই। সেই অমৃত পানের অমোঘ ফল যাহা হইল তাহা শ্রীশ্রীঅরবিন্দের মতে, "নবীনদিগের মধ্যে সত্য যুগ প্রকাশের একটি অপূর্ব লক্ষণ, ধর্মে মতি ও অনেকের হৃদয়ে যোগলিপ্সা ও ঊর্দ্ধ বিকশিত যোগশক্তি।"

[ধর্ম ও জাতীয়তা পৃঃ ৫৭]

শ্রীশ্রীঅরবিন্দ আরও বলিয়াছেন, "ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতর বেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশ প্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবকবৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্য জাতি নহি, আমরা এশিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য। আমরা জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয়ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান বাহেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।"

[ধর্ম্ম ও জাতীয়তা পৃঃ ১৪]

'স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা' অরবিন্দের মত এমন তথ্যপূর্ণ কথা আমরা পূর্বেও শুনিয়াছি। মা-ই দেশ এবং দেশই মা। আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরের মহাজন ব্যক্তিগণ যেমন কবি, সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং রাজনৈতিক নেতা অনেকেই এমন কথা বলিয়াছেন। একজন গর্ভধারিণী মাতা এবং অন্যজন ক্রোড়দায়িনী মাতা। যোগসূত্র এমন ভাবে স্থাপিত যে, এক মাতাকে ভালোবাসিলে অন্যমাতাকেও ভালোবাসিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "ও আমার দেশের মাটী তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।" সাহিত্য সাধনা মাধ্যমে শরৎচন্দ্র স্বদেশকে ভালোবাসিয়াছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, জে. এম. সেনগুপ্ত সকলেই ব্যক্তিগত জীবনের ভোগ-বিলাস, আশা-আকাঙ্খাকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া মাতৃপ্রেমের উন্মাদনায় জীবন বিসর্জন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন-দৃষ্টান্ত এবং বাণী আমাদের দেশের সমক্ষে এবং প্রত্যেকের কর্ণগোচরে পুনঃ পুনঃ পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাঁহারা তাহা পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহাদের কর্তব্যের সুষ্ঠু সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশবাসীগণও শিক্ষার মাপকাঠিতে শিক্ষিত না হইলেও আন্তরিক পবিত্রতার দিক হইতে তাঁহারা অনগ্রসর ছিল না। তাহাদের উদ্দেশ্য এবং আশাকে রূপদান করিবার কর্মপ্রেরণাও ছিল যথেষ্ট। স্বামীজী ডাকিয়া বলিয়াছেন, "Remember always that there is not in the world any other Country whose institutions are really better in their aims and objects than the institutions of this land. I have seen castes in almost every country in the world, but nowhere in their plan and purpose so glorious as here. If caste is thus unavoidable, I would rather have a cast of purity and culture and self-sacrifice than a caste of dollars. Therefore utter no words of condemnation, close your lips and let your hearts open. Work out Salvation of this land and of the whole world, each of you thinking that the entire burden is on your shoulders. Carry the light and the life of Vedanta to every door, and rouse up the divinity that is hidden within every soul."

[Thus spake Vivekananda : p 86-88]

(ক্রমশঃ)

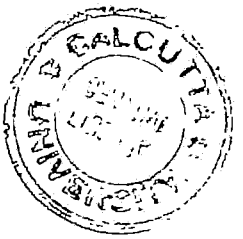

বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৪ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৬

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		
অনিল রায়	মহাত্মাজী, স্বামিজী ও নেতাজী (প্রবন্ধ)	৬০৬
অন্নদাশঙ্কর রায়	সুধাকান্ত রায়চৌধুরী স্মরণে (প্রবন্ধ)	৬৫৫
ডঃ অশোক কুমার মজুমদার	সম্পাদকীর দপ্তরে চিঠি	৬৮
অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	সাকার ও নিরাকার উপাসনা (প্রবন্ধ)	৩৯৭
আ		
	আমাদের কথা (সম্পাদকীয়)	চ
ক		
কালীচরণ ঘোষ	রূপায়িত প্রতিরোধ (প্রবন্ধ)	১৭
	বঙ্গ বিভাগের শিক্ষা ও উগ্রপন্থীর আবির্ভাব (রাজনৈতিক প্রবন্ধ)	৮৯
	বাঙ্গালার জাগৃতি (রাজনৈতিক প্রবন্ধ)	১৫৫, ২১৭, ২৬৭, ৪৯৩, ৫৪৫
	বিস্ফোরণের পূর্বে সংবাদপত্র ও নেতৃবৃন্দ (প্রবন্ধ)	৬৩৫
	বিস্ফোরণ (প্রবন্ধ)	৬৬৯, ৭২৯, ৭৭৯
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	কবিতাগুচ্ছ : এখন ভীষণ সময়	১৮৫
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	হৈ চৈ আর্তনাদের মধ্যে	১৮৬
	যে ভূমিকায় প্রতিদিন, সাড়া	১৮৭
	অন্বেষণ	১৮৭
	পটভূমি	৪৮৯
	উত্তাল সমুদ্র যাত্রা	৫৭৯
কৃষ্ণধর	দিন রাত্রি একা একা (কবিতা)	৩৬৫
কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	নিগ্রহ ও দণ্ডবিধানের ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)	৮০৩
গ		
গিরিজাকুমার মুখার্জি	গান্ধীজী, নেহেরু, বসু (প্রবন্ধ)	৩১৯
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	নিজেকে সমগ্র নিয়ে (কবিতা)	৩৬২
গৌরাঙ্গ ভৌমিক	যাযাবরের সংসার (কবিতা)	৩৬৬
চ		
চারণিক	ভারত কন্যার শয্যাপার্শ্বে অতন্দ্র প্রহরী (স্মৃতিচারণ)	৫৯৯
জ		
জাতক	বঙ্গ আমার জননী আমার (স্মৃতিচারণ)	৭৯২
ত		
তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	নেতাজী সুভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ)	৬০৯

বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৪ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৬

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
দ		
দেবদাস জোয়ারদার	রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প ও সুভাষচন্দ্র (আলোচনা)	৬১৯
	বইপড়া (প্রবন্ধ)	২৫
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বপ্নের ভিতরে (কবিতা)	৩৬৪
দীপঙ্কর	জাতীয়তার রূপায়ন	৬৫৯, ৭১৫ ৭৬৫, ৮২১
ধ		
অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য	পাঁচশালা আর্থিক পরিকল্পনা : উদ্যম (সমীক্ষা)	৮৫
	চতুর্থ পরিকল্পনা উদ্দেশ্য ও সাধন-পদ্ধতি (সমীক্ষা)	১৫২
ন		
নন্দ মুখোপাধ্যায়	নেতাজী ও আরব স্বাধীনতা-সংগ্রাম (প্রবন্ধ)	৩৪৬
নচিকেতা ভরদ্বাজ	নীলপদ্ম হয়ে যাবার আগে (কবিতা)	৩৫৯
	মহামানব সুভাষচন্দ্র (প্রবন্ধ)	৬৪৩
নীরদবরণ	বকুল গাছ (কবিতা)	৮
নমিতা রায় চৌধুরী	সাথী	৮০৮
প		
পথচারী	চার্লস ডিকেন্স (সাহিত্য আলোচনা : অনুবাদ)	১২৫, ১৬৩, ২২৩, ২৭৭, ৪৯৭
পথচারী	স্মৃতির উপরে নূতন আলোকপাত (প্রবন্ধ)	৫৬৯
	অহিংসা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভাবনা (জে, বি, এস, হলডেন-এর অনুবাদ)	৬৭৭
	ডাব্লিয়ু.বি. ইয়েটস (প্রবন্ধ)	৭৩৫
পথিক	পথিকের ডায়ারী	২৫৯
	পথিকের ডায়ারী (পথ কড়চা)	৯৩৫
পবিত্রকুমার ঘোষ	নিবেদিতা : প্রেরণাদীপ্ত জীবনী (গ্রন্থ-পরিচয়)	৩৭
	গান্ধী ও সুভাষ (প্রবন্ধ)	৩২৭
	সুভাষচন্দ্রের মানবতান্ত্রিক প্রত্যয়	৬২৩
পুরুষোত্তম শিবরাম রেগে	সাবিত্রী (উপন্যাস) (অনুবাদ : পিনাকী প্রসাদ ধর)	৫৬১, ৬৮৫, ৭৪৫, ৭৯৭
ব		
বারীন বর্ধন	আপানের দিনগুলি (ভ্রমণকাহিনী)	৫১, ১১৩, ২৩৮, ২৯৭, ৫৩১, ৭০৯, ৭৫১
বাসুদেব দত্ত	কয়েকটি কবিতা (কবিতাগুচ্ছ)	৬৫
বাসুদেব দেব	অন্তর্ভুবন তৃষ্ণা আর্তি (কবিতা)	৩৬৫
বিজনকুমার ঘোষ	আয়ুরেখা (গল্প)	৫১৫

বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ৩৪ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৬

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিজয়কুমার দত্ত	মহাকাশে নক্ষত্র বিন্দু (বাংলা উপন্যাস : ১৩৭৫)	৪৩
	যে কথা বুকের মধ্যে (কবিতা)	৩৬৬
	কথামুখ, আভিধানিক (কবিতা)	৭৪৩
বিজয় নাগ	শ্রদ্ধার্তর্পণ	৫১৯
বিভা সরকার	পারুফি বা ইরাবতীর তীরে	৮১৩
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কোজাগর পূর্ণিমা, পৌষ, গান্ধীজী (কবিতা)	৩৬৩
ভ		
অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী	সুভাষচন্দ্র : এ কালের মহাকাব্য (গ্রন্থ-পরিচয়)	৩৩
ম		
মনিদীপা বিশ্বাস	কবিতাগুচ্ছ :	
	সে যেন আমার,	২৫
	মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে	
	প্লাবিত আঁধারে	২৫৪
	আমাকে বলে দাও	৫৮২
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	আবাল্য (কবিতা)	৩৬৫
মহাকাল	বজ্রবাণী	খ, ৫৯৫
মহীতোষ বিশ্বাস	দিকভ্রম (গল্প)	৫৮৩
মনোজ বসু	জয়তু নেতাজী (প্রবন্ধ)	৬১৩
মিহির মুখোপাধ্যায়	কণ্ঠভরা বিষ	১০৫, ১৯০,
	(ধারাবাহিক উপন্যাস)	২৪৫, ৩০২, ৫২৫, ৫৭৩, ৭০১, ৭৫৩
মিহির মুখোপাধ্যায়	ধূলোমুঠি (সম্পূর্ণ উপন্যাস)	৪২৭
য		
যতীন সরকার	আমার মুখোশই আমি (নাটিকা)	৩৮৭
র		
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার	নেতাজী ও মহাত্মাজী (প্রবন্ধ)	৬০৩
রমেন্দ্র নারায়ণ সরকার	সুভাষ-ভাবনা এবং তিনটি গ্রন্থ (গ্রন্থ-পরিচয়)	৫৯
রাজর্ষি	ঋণ পরিশোধ (প্রবন্ধ)	৩৬৭
ল		
লীলা রায়	একটি অসম্পূর্ণ খসড়া (আত্মজীবনী)	৩১১
শ		
শান্তশীল দাশ	নববর্ষ, নবযাত্রা ও আমার কথা (কবিতা)	৬
	আমার স্বপ্নরা	৩৬২
শান্তি লাহিড়ী	কবিতাগুচ্ছ	
	পুরোনো চাবি	১২৯
	ফুলগুলি	১৩১
	প্রবাস	১৩২
	আমার গানে তুমি, জন্ম,	
	তীর্থযাত্রা	১৩৩
	সমর্পণ	১৩৪
শঙ্কর	মানুষের চন্দ্রাভিযান (সমসাময়িক প্রবন্ধ)	১৭১

বর্ষসূচী

জয়শ্রী : ২৪ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র : ১৩৭৬

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	কবিপত্রে কাব্যচিন্তা	৩৪৯, ৫০৯
	(পত্রাবলী)	৫৮৯, ৬৯৩
শচীন্দ্রনাথ বসু	দূরজগতের মানুষ (বড়গল্প)	৩৭৫
স		
সুরজিৎ দাশগুপ্ত	ভারতের শিল্প ও আমার কথা (গ্রন্থ পরিচয়)	৯
	উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার আর্যান সংস্কৃতির চর্চা (প্রবন্ধ)	৯৭
	একটি তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পপ্রদর্শনী (সমীক্ষা)	২৩৩
	বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র : (ধারাবাহিক আলোচনা)	৮ ২৮৯
সুনীল দাস	জমি দখল : প্রকৃতি ও পরিণতি (প্রবন্ধ)	৭৯
	ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের রাজনীতি (প্রবন্ধ)	১৪৪
	ধানকাটার সংগ্রাম :	
	গরীব চাষীর ক্ষতিপূরণ চাই	৫৫৬
সুভাষচন্দ্র বসু	জাতির জনক	৩০৩
সুশান্ত বসু	প্রশ্ন (কবিতা)	৫৮১
অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত	পঞ্চম ফিনান্স কমিশন এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রতি আবার অবিচার (প্রবন্ধ)	৪৮১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	ভাড়া নিতে চাই (কবিতা)	৩৬১
স্বদেশ রঞ্জন দত্ত	বাঁচাও (কবিতা)	৫৮১
স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ	"মেঘঘোররূপা" (আবাহন)	৭
সমর গুহ	ভারতের জাতীয় সংকট ও নেতাজীর পথ (প্রবন্ধ)	৬১৫
সুনীথ মজুমদার	কবিতা :	
	মুহূর্ত যূথিকা : তার সংঘনাদ	
	মনস্তাপ, শান্তি, নিঃসঙ্গতার গান	
	নির্বাচনের দায়িত্ব	৭৪১
	আর যেখানেই যাও, যখন	
	ডাকাই দূরে, ডাকাডাকি	৭৪২
	সম্পাদকীয়	২, ৭৪, ১৪০ ২০২, ২৬২, ৪৮৬, ৬৩৮, ৫৯৭, ৬৬২, ৭২২, ৭৭২
সুভাষবাণী		১, ৭৩, ১৩৯, ২০১, ২৬১, ৪৮৫, ৫ ৩৭, ক, ৬৬১, ৭২১, ৭৭১
	বাদশা খাঁ (শ্রদ্ধার্ঘ)	৫৫৫
	বাদশা খাঁর দৃষ্টিতে (মতামত)	
	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (আলোচনা)	২০৫

সম্পাদনা : সুনীল দাস

সহযোগী সম্পাদক

Per Copy Rs. 1·00. wit
A/32, Netaji Subhas Ch. Bo